শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

# পাঁচটি উপন্যাস

পত্র ভারতী

# তিনহাজার দুই

কপিলদেব ভূগর্ভস্থ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। মুখখানা খুব বিষণ্ণ। যতদূর দেখা যায় লম্বা প্ল্যাটফর্মে আর একজনও মানুষ নেই। তবে উলটো দিকের ডাউন প্ল্যাটফর্মে আর একজন লোক পায়চারি করছে। তার হাতে একটা কুকুরের শিকল। শিকলে কুকুর বাঁধা নেই। শূন্য বকলসটা মেঝেতে গড়াচ্ছে। লোকটা শিস দিচ্ছে।

কপিলদেব লোকটার দিকে চেয়েছিল। লোকটা পাগল। এই তিন হাজার দুই খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে অবশিষ্ট মাত্র দশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক লক্ষই পাগল। মাঝে-মাঝে আরও পাগল হওয়ার সংবাদ আসছে। কপিলদেবের নিজের মাথাটাও আজকাল কেমন লাগে যেন। হাঁটছে, চলছে, কাজকর্ম করছে, আর মাঝে-মাঝে চমকে উঠে মনে হচ্ছে—আমি যা করছি সব স্বাভাবিক মানুষের মতো তো! পাগল হয়ে যাইনি তো নিজের অজান্তে!

ওপাশের প্ল্যাটফর্মের লোকটা কপিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলল—ও মশাই, শুনছেন?

—বলুন। কপিলদেব শান্ত গলায় বলল।

—বলুন তো কার গাড়ি আগে আসবে, আপনার না আমার?

—আপনার।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল—আপনার। বাজি?

কপিলদেব বিষণ্ণ হেসে বলে—আমার ট্রেন পাঁচটা দু-মিনিটে, আপনার ট্রেন ঠিক পাঁচটায়।

লোকটা ভ্রূ কোঁচকাল। বলল—বটে। ও। আমি অবশ্য গাড়ির সময় জানতাম না।

—আমি জানি।

লোকটা আবার কুকুরের চেন টানতে-টানতে পায়চারি করতে লাগল। শিসে একটা খুব করুণ গান বাজাতে লাগল। একটু বাদে মুখোমুখি এসে বলল—এখন ক'টা বাজে?

দুটো প্ল্যাটফর্মেই বিশাল টেলিভিশন পরদায় ঘড়ির ছবি ফুটে আছে। চুলচেরা সময়। এখন ঠিক পাঁচটা বাজতে আড়াই মিনিট বাকি। কিন্তু লোকটা সেদিকে তাকাচ্ছে না।

কপিল জবাবে প্রশ্ন করল—কোথায় যাবেন?

লোকটা উদাস হয়ে বলে—কোথাও না। আমার সমুদ্রে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। এখন ভাবছি, কী হবে গিয়ে! সমুদ্রের ধারে বড় একা লাগে। আমার একটা কুকুর ছিল। সেটা কোথায় পালিয়ে গেল! আমি কুকুরটার জন্য অপেক্ষা করছি।

—আপনার গাড়ি এক্ষুনি আসবে।

—কিন্তু আমি কোথাও যেতে চাই না। আবার এখানেও থাকতে চাই না।

কপিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারও মাঝে-মাঝে এরকম হয়। কোথাও থাকতে ইচ্ছে করে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

বিশাল দুই প্ল্যাটফর্মে মাত্র দুজন লোক। তারা দু-দিকে যাবে। সামনে পিছনে আরও অন্তত চল্লিশটা প্ল্যাটফর্ম শূন্য খাঁ-খাঁ করছে, কেউ কোথাও নেই। একটা স্পিকার কথা বলে উঠল হঠাৎ। ডাউন গাড়ি আসছে। সাবধান লাইনের কাছাকাছি থাকবেন না। আপনার জীবন মূল্যবান—মনে রাখবেন, পৃথিবীতে মাত্র দশ লক্ষ লোক অবশিষ্ট আছে।

কথাটা ঠিক নয়। পৃথিবীতে দশ লক্ষ লোকে এখন আর নেই। একটু আগে কপিলের

কাছে খবর এসেছে একজন বুড়ো লোক মারা গেছে প্যারিসে। আর একজন আমস্টারডামে একটা চারশোতলা বাড়ির ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। পৃথিবীতে আছে মাত্র নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো আটানব্বই জন। বিনা মৃত্যুতে পনেরো দিন কেটে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ দু-দুটো মৃত্যু বড় দুঃসংবাদ মানুষের কাছে। তবে সুখবর এই যে আগামী তিন মাসের মধ্যে আরও প্রায় ছাব্বিশটি শিশু জন্মগ্রহণ করার কথা। যদি তারা নিরাপদে জন্মায় তবে এ ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে যাবে। কিন্তু দুশ্চিন্তা এই যে মাঝে-মাঝে আত্মহত্যার খবর আসছে। অনেকেই পৃথিবীর এই নির্জনতা সহ্য কবতে পারছে না।

ওপাশের প্ল্যাটফর্মে উল্কার গতিতে ট্রেন ঢুকছে। ট্রেনটা অনেকটা লম্বা নলের মতো দেখতে। রং সাদা এবং কালো। কোনও শব্দ নেই। এই ট্রেনগুলি মাটি এবং সমুদ্রের তলা দিয়ে অবিরল পৃথিবী পরিক্রমা করে আসে। তাই ওই ট্রেন কখনও আপ লাইন দিয়ে উলটো দিকে আসবে না। কেবলমাত্র ডাউন লাইন দিয়ে পৃথিবী ঘুরে আসবে বারবার। মোট বিয়াল্লিশটা প্ল্যাটফর্মে এরকম অজস্র গাড়ি আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু লোক নেই।

কপিলদেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উলটো দিকে চেয়েছিল। পাগল লোকটার হাবভাব ভালো ঠেকছে না। যদি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে? করল না। গাড়ি এসে দাঁড়াল। চলে গেল। কপিলদেব দেখল, লোকটা ওঠেনি, কুকুরের চেন টানতে-টানতে পায়চারি করছে।

বহুদূরের একটা প্ল্যাটফর্মে লাল রঙের ডাউন ট্রেন থেকে একটা মেয়ে নামল। সেদিকে তৃষিতের মতো চেয়ে রইল কপিলদেব। তার ভাগ্য ভালো আজ স্টেশনে সে দু-দুটো মানুষ দেখতে পেল। প্রায়দিনই একজনেরও দেখা পায় না।

আপ-গাড়ি আসবার খবর দিল স্পিকার। দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল কপিলদেব। লালরঙের গাড়িটা রক্তমাখা তীরের মতো চলে আসে। দাঁড়ায়। কপাটগুলো খুলে যায় আপনা থেকে। কেউ নামল না। কপিল উঠল।

বিশাল গাড়ির মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত টানা একটা হলঘরের মতো। নীলাভ উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সবুজ কুশনের চেয়ার খালি পড়ে আছে।

কপিল উঠতেই গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য একটু দোল খেয়ে ট্রেন ছুটতে থাকে। কপিল একটা চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দেওয়ালে একটা বোতামে চাপ দেয়। গাড়ির সেখানে জানলা থাকবার কথা সেখানে জানলার বদলে সারি-সারি টেলিভিশন পরদা লাগানো। কপিলের পাশের পরদায় ছবি ফুটে উঠল। কপিল ঘুরন্ত চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে সেদিকে মুখ করে বসল।

পরদায় একটি মেয়েকে দেখা গেল। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু তাকে খুব অস্থিরমতি লাগছে। খবর পড়তে-পড়তে মেয়েটি নিজের ঠোঁট জিভ দিয়ে বারবার ভিজিয়ে নিচ্ছে। নিজের অজান্তে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে। মেয়েটি বলছে—দুটি মৃত্যু আমাদের কাছে আজ মর্মান্তিক। অন্যদিকে, কোনও জন্মের খবরও আজ নেই। আমরা দুঃখিত, পৃথিবীতে এই জনসংখ্যা হ্রাসের গতিকে কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। বন্ধ করা যাচ্ছে না আত্মহত্যা। উপরন্তু এক লক্ষ পাগলের মধ্যে আজ আরও দশজনের নাম যুক্ত হয়েছে। সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে কারও মধ্যে আত্মহত্যার বিন্দুমাত্র প্রবণতা বা পাগলামির সামান্যতম লক্ষণ দেখলেও আপনারা গণপ্রহরী কেন্দ্রে খবর দিন। সর্বশেষ হিসেব মতো, পৃথিবীতে গর্ভধারণ করবার ক্ষমতাসম্পন্ন নারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র এক লক্ষের কাছাকাছি। সক্ষম পুরুষের সংখ্যাও এক লক্ষের মতো। কোনও মহিলা সন্তানসম্ভবা হলে তাঁকে জাতীয় সম্মান দেওয়া হবে...

কপিল টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়। গাড়ির ছাদের গায়ে লাগানো সারি সারি আলোর চৌখুপি একটার পর একটা জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। অর্থাৎ, একটার পর একটা স্টেশনে থেমে

গাড়ি চলছে।

পরের স্টেশনেই কপিল নামবে। মাত্র দশ মিনিটে সে প্রায় চারশো মাইল এসে গেল।

কপিল নামল। খাঁ-খাঁ করছে স্টেশন। সে ধীর পায়ে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের একটা রেলিংঘেরা চৌখুপিতে দাঁড়ায়। চৌখুপিটা আস্তে ওপর দিকে উঠে যায়। একটা প্রকাণ্ড হলঘরের মেঝের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ায় সেটা। কপিল নেমে আসে।

হলঘরের বাইরে এসে বিকেলের আলোয় সে মস্ত শহরটা দেখতে পায়। আদিগন্ত আকাশপ্রমাণ উঁচু-উঁচু বাড়ি। উত্তরদিকে শহরের বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে বিশাল বুলডোজার দিয়ে। অজস্র শূন্য বাড়ি রেখে লাভ কী? সেগুলোয় পাখির আস্তানা, সাপখোপ কীট পতঙ্গের বাসা, উদ্ভিদের জন্ম দেখা যাচ্ছে। ভেঙে ফেলাই ভালো। শহর ছোট হলে অনেক ভালো লাগবে। এই বিশাল শহরে মাত্র দু-হাজার লোকের বাস.

স্টেশনের বাইরে অজস্র গাড়ি দাঁড় করানো। সবুজ, মেরুণ, লাল, সাদা। প্রতিটি গাড়িই দেখবার মতো সুন্দর। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, টিভি আর টেলিফোন লাগানো, রাডার এবং কমপিউটার যন্ত্রে গাড়িগুলো চালিত হয়। শুধু স্টিয়ারিং ধরে থাকলেই হল।

কপিল গাড়িগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না। হাঁটতে লাগল।

ফুটপাতের ধারে ধারে দোকানঘর খোলা রয়েছে। খাবার, পোশাক, শৌখিন নানান জিনিস। দোকান নামে মাত্র। একটা জিনিসের জন্যও এক পয়সা ব্যয় নেই। আসলে পয়সা টাকা ব্যাপারটাই এখন অপ্রচলিত। দশ লক্ষ লোকের জন্য এত অজস্র খাদ্য ও জিনিস রয়েছে যে কেনা বেচার প্রশ্নই ওঠে না। দোকানে দোকানদার নেই, ক্রেতাও নেই। কপিল আনমনে দোকানগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। একবার পিছু ফিরে দেখল। কেউ নেই। সামনে যতদূর চোখ যায়, কেউ নেই।

একটা ফ্লাইওয়ে ধরে অল্প একটু উঠেই কপিল দাঁড়ায়। দেখে উত্তর দিকের শহরে চারটে বাড়ি এখন আর দ্যাখা যাচ্ছে না। এদিক থেকে শহরপতনের একটা ক্ষীণ যান্ত্রিক শব্দ আসছে। সূর্য ডুবছে পশ্চিম ধারে। একটা বিশাল উঁচু ব্রিজের কানায় এখন লাল সূর্য লেগে আছে। একটা এরোপ্লেন পাখির মতো নিঃশব্দে ব্রিজের ওপর দিয়ে ঝোড়ো গতিতে উড়ে যায়। এইসব এরোপ্লেনে মানুষ নেই। শুধু ক্যামেরা, যন্ত্রপাতি আছে। এরা উড়ে-উড়ে মানুষের খবর নেয়। আকাশে অন্তত আট-দশটা কৃত্রিম উপগ্রহ দেখতে পায় কপিল। একটা উপগ্রহ খুবই বিশাল। প্রায় দুশো মাইল শূন্যের দূরত্বেও একটা নৌকোর মতো দেখাচ্ছে। ওই উপগ্রহে প্রায় দশ হাজার লোক বাস করতে পারে! এখন অবশ্য কেউ থাকে না। যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা গত শতাব্দীর প্রথম দিকে খুব বেড়ে গিয়েছিল তখন অতিরিক্ত আবাস হিসেবে উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছিল। শূন্যে। এখন বেশিরভাগই খালি পড়ে আছে।

কপিল আনমনে আরও খানিক হাঁটল। তারপর রাস্তার পাশে একটা ঝকঝকে হুভারক্র্যাফট দেখে উঠে বসল।

বিশাল চওড়া রাস্তার দু-মিটার উঁচু দিয়ে কপিলের গাড়ি একশো বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটার গতিতে চলতে থাকে। কোথাও ট্র্যাফিক জ্যাম নেই, কোনও লোক রাস্তা পেরোচ্ছে না। শুধু কিছু কুকুরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। কপিল একঝলক দেখল, এই চমৎকার শহরের রাস্তায় একটা মাঝারি বড় সাপ রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে।

কপিলের মুখের দুশ্চিন্তার রেখাগুলি গভীর হয়। প্রতিটি শহরেই প্রচণ্ড জঙ্গল সৃষ্টি হতে চলেছে। কিছুতেই অরণ্যের প্রসার ঠেকানো যাচ্ছে না। নিউ ইয়র্ক শহরের গভীর জঙ্গলে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। মস্কোতে শ্বেত ভল্লুকের উপদ্রব। এই কলকাতার আশেপাশে মানুষখেকোর চলাফেরা।

বিশাল হাসপাতালের বাড়ির লবির ভেতর কপিল তার গাড়ি দাঁড় করায়। সাদা রঙের

স্তম্ভহীন বিশাল সুন্দর ঘরখানা। কপিল দ্রুত পায়ে রিসেপশনের দিকে এগিয়ে যায়।

রিসেপশনে একজন মানুষ বিষণ্ণমুখে বসে আছে, তার পিছনে বড় একটা ইলেকট্রনিক বোর্ড। বোর্ডের সবার ওপরে যে খোপটায় আলো জ্বলছে তাতে লেখা 'মেটারনিটি—১'। তার মানে, সন্তানসম্ভবা অন্তত একজন মহিলা এখানে রয়েছেন।

কপিল কাউন্টারে কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলে, রুগি ভালো তো?

রিসেপশনের যুবকটি করুণ মুখ তুলে বলে—ভালো কী করে বলি? রুগির হার্ট রিউম্যাটিক। শরীরে রক্ত নেই। হিস্টেরিক। বাচ্চা হতে গিয়ে যদি কোলাপস করে।

চিন্তিত কপিল বলে, ব্যবস্থা কী নেওয়া হচ্ছে?

—যতরকম নেওয়া সম্ভব। কিন্তু রুগি নিজেই সাইকোলজিক্যাল প্রেশারে দুর্বল। কিছু খেতে চায় না। সবসময় হ্যালুসিনেশন দেখছে। কেবল বলছে—পৃথিবীতে কেউ নেই। পৃথিবীতে কেউ নেই।

কপিল দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—কিন্তু আমাদের পক্ষে আর একজন মানুষের ক্ষতিও সহ্য করা সম্ভব নয়। আজকের খবর শুনেছ? দুজন মারা গেছে এবং একজনও জন্মায়নি।

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে, জানি। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, কিন্তু ভয় হয়, এই রুগির বাচ্চা যদি জন্মায়ও তবু অ্যাবনর্মাল হবে।

কপিল বলে—আমি একটু দেখব।

—চলে যান।

কপিল রিসেপশন পার হয়ে ভেতরের দিকে যায়। ঢুকতেই একটা ঘর, তার ওপরে লাল আলোর অক্ষরে লেখা—জীবাণুমুক্তি কক্ষ। এখানে কপিলকে একটা সর্বাঙ্গ ঢাকা ওভারল পরতে হল। দাঁড়াতে হল একটা আলোর নীচে। এই আলো জীবাণু নাশক। প্রায় পাঁচ মিনিট আলোর স্নানে সর্বাঙ্গ জীবাণুমুক্ত করে তারপর ভেতরের দিকে দরজা খুলে কপিল করিডোরে পা দিল। করিডোরে বিশুদ্ধ বাতাস রয়েছে। হাসপাতালের অভ্যন্তর সম্পূর্ণভাবে বীজাণু ও মলমুক্ত। একটিও পোকামাকড়ের অস্তিত্ব নেই। কোনও শব্দ নেই।

দীর্ঘ করিডোর পার হয়ে 'ডাক্তার' লেখা একটা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল কপিল।

দুজন সাদা ওভারল পরা ডাক্তার নিবিষ্টমনে রিপোর্ট দেখছেন। কপিল ঢুকতেই তাঁরা চমকে মুখ তুললেন।

কপিল বলল—কোনও খবর?

ডাক্তারদের মধ্যে প্রবীণজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। উনি একটু হেসে বললেন—কম্পিউটারের হিসেবে বাচ্চা হতে এখনও বিশ দিন বাকি। তার আগে কোনও সুখবর দেওয়া অসম্ভব।

—রুগির অবস্থা?

—কম্পিউটার খুব ভরসার কথা বলছে না। এমনকী বাচ্চা হওয়ার আগেও রুগি একসপায়ার করতে পারে। রুগির স্বামীও এজন্য ভীষণ নার্ভাস।

কপিল গম্ভীর চিন্তিত স্বরে বলল—একজন মানুষের রোগ হলে এখন দুনিয়ায় সবাই নার্ভাস হয়ে পড়ে ডাক্তার। প্রতিটি মানুষ এখন প্রতিটি মানুষের পরম সম্পদ।

প্রবীণ ডাক্তার বিষণ্ণমুখে বলেন—আমরা জানি, একটা মানুষকে বাঁচানো এখন একটা সাম্রাজ্য বাঁচানোর চেয়েও জরুরি। কিন্তু রুগি যদি নিজের জীবনের মূল্য বুঝতে না চায় তবে বড় মুশকিল।

—আমি রুগিকে দেখতে চাই।

তরুণ ডাক্তারটি উঠে বললেন—আসুন।

বাঁ-দিকের করিডোর ধরে খানিকটা গেলেই রুগির ঘর। মস্ত ভারী পাল্লা ঠেলে দুজনে ঢোকে।

ভারী বিস্ময়কর ঘরখানা। প্রথমে দেখলে একটি বাগান বলে মনে হয়। পায়ের নীচে দুর্বা ঘাস রয়েছে, ডানধারে একটি জলাশয়, চারধারে হাজার হাজার ফুলের গাছে ফুল ফুটে আছে। একটা বউ কথা কও পাখি ডেকে উঠল। আকাশে ঝিকমিক করছে তারা, মস্ত চাঁদ উঠেছে। মৃদুমন্দ দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

জলাশয়ের ধারে একটা হেলানো চেয়ারে বসে আছে মেয়েটি। তার পায়ের কাছে উর্ধ্বমুখ হয়ে একজন পুরুষ।

কপিল কাছে এগোতেই পুরুষটি তাকাল। তারপর নিঃশব্দে হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। মেয়েটি কপিলের দিকে তাকাল না।

কপিল মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দেখল। বড় শীর্ণকায়া, সাদা এবং দুর্বল মহিলাটি তার দুটি বড়-বড় ভাসন্ত চোখে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

কপিল তার মথিত হৃদয় থেকে একটি শব্দ তুলে ডাকল—মা।

মেয়েটি ধীরে মুখ ফেরায়।

কপিল বলে—মা, কেমন আছেন?

মেয়েটি বিস্ময়ভারে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে—তুমি কার ছেলে? আমার? আমার তো ছেলে হয়নি!

কপিল বলল—হবে মা। যেদিন হবে সেদিন সারা পৃথিবীতে আমরা উৎসব করব।

—কাকে নিয়ে উৎসব করবে বাবা? পৃথিবীতে কেউ নেই।

কপিল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ভয় কোরো না মা। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে।

—বাড়ছে? মেয়েটি অবাক হয়ে বলে—সারাদিন আমি মানুষ দেখার চেষ্টা করি। দেখতে পাই না তো। শহরের রাস্তাঘাট এত খাঁ-খাঁ করে।

—একদিন রাস্তাঘাট আবার মানুষে ভরে যাবে। সেই অসহ্য আনন্দের দিন আসছে। সন্তান দাও মা। তোমার সন্তানের জন্য সারা পৃথিবী কোল পেতে আছে।

মেয়েটি দু-কানে হাত চাপা দিল। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল—আমার এই জ্যোৎস্না ভালো লাগছে না। আমি ভোরবেলার দৃশ্য দেখতে চাই।

তরুণ ডাক্তারটি দ্রুত পায়ে গিয়ে একটা গোলাপ ঝোপের আড়ালে সুইচবোর্ডে আঙুল ছোঁয়াল। আপনি আকাশের তারা নিভে গেল, চাঁদ মুছে গেল। চারদিকে জেগে উঠল পাখির কলকোলাহল। ঘরের একধারে ঠিক ভোরের মতো সূর্য উঠতে দেখা গেল। এ সবই কৃত্রিম। বাইরের দিনরাতের সঙ্গে এঘরের দিনরাতের কোনও সম্পর্ক নেই।

মেয়েটি ভোরের সূর্যের দিকে চেয়ে বলল—আমাকে মা বলে ডেকো না। আমার বড় ভয় করে। তোমরা এখন যাও, আমি ভোরের বেলাটা দেখি।

তিনজন পুরুষ নিঃশব্দে সরে আসে। তরুণ ডাক্তারটি আর একটি সুইচ টিপে দেয়। দেখা গেল, সাদা পোশাকের একটি নার্স দ্রুতপায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি হঠাৎ আর্তস্বরে বলে ওঠে—ও মাগো।

কপিল দৌড়ে আসে।

—কী হয়েছে মা?

গর্ভবতী মেয়েটি খুব বড়-বড় ভয়ের চোখে নার্সের দিকে তাকিয়েছিল অস্ফুট স্বরে বলল—একে কেন পাঠাও তোমরা? এ তো পুতুল। আমার কাছে সত্যিকারের মানুষ নার্সকে পাঠাতে পারো না?

কথাটা সত্যি। মানুষের অভাবে অবিকল মানুষের মতো দেখতে রোবোট দিয়ে আজকাল কাজ চালানো হয়।

কপিল নার্সের দিকে তাকাল। ফুটফুটে সুন্দর মুখশ্রী, হাসি মাখানো ঠোঁট, চোখে করুণা ঝরে পড়ছে। দু-হাতে ধরা একটা ট্রেতে অনেক ফলমূল, খাবার, চা রয়েছে।

কপিলের দিকে চেয়ে নার্স বলল—আ—আমি আ—আমার ক—কর্তব্য ক—করছি।

যন্ত্রের কথাবার্তা এরকমই হয়। এখনও নিখুঁত হয়নি।

কপিল বলল—তুমি ট্রে রেখে চলে যাও। ওঁর সামনে বেশি আসবে না।

কলের নার্স মাথা নাড়ল। ট্রেটা ছোট টেবিলের ওপর রেখে মানুষের মতো চমৎকার নির্ভুল পায়ে হেঁটে ফিরে গেল।

গর্ভবতী মেয়েটি কপিলের দিকে চেয়ে বলল—আমার কি একজনও মানুষ সঙ্গী জুটবে না সারাদিন? বড় একা লাগে।

কপিল তার নিজের ভিতরে রক্তক্ষরণ টের পায়। কান্না আসে।

তরুণ ডাক্তার আর একটি সুইচ টিপে দেয়। অমনি চারদিকে ত্রি-স্তর কতগুলি ছবি ভেসে ওঠে। হঠাৎ দেখা যায়, চারদিকের বাগানে, পুকুরের ধারে, রাস্তায় যেন হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ আর শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা চেঁচায় হল্লা করে, ধাক্কাধাক্কি করে পথ হাঁটে। দেখা যায়, মেলা বসেছে। হাজারটা দোকানে লক্ষ মানুষের কেনাকাটা। ভেঁপুর শব্দ। সার্কাসওলার চিৎকার।

মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে দেখতে-দেখতে বলে—ঠিক এইরকম ইলিউশনের মতো একদিন যদি সত্যিকারের মানুষ দেখতে পেতাম?

কপিল বেরিয়ে আসে।

মেয়েটির ম্লানমুখ স্বামী বিষণ্ণ গলায় বলে—ওর জন্য আমিও ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ছি। আমার কিছু ভালো লাগছে না। বড্ড একা।

কপিলের মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। বেরোবার মুখে সে একটা টেলিফোন-টিভির সামনে দাঁড়িয়ে বোতাম টেপে। টেলিভিশনের পরদায় তার ঘরের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। কপিল আকুল স্বরে ডাকে—শুভ্রা। শুভ্রা।

কিন্তু তার বউ শুভ্রা সাড়া দেয় না।

অজানা আশঙ্কায় বুকটা ধক করে ওঠে কপিলের। সারাদিন শুভ্রা একা পড়ে থাকে বাসায়। কখন কী হয়।

—শুভ্রা! শুভ্রা! পাগলের মতো ডাকতে থাকে কপিল।

হঠাৎ টেলিভিশনের পরদায় শুভ্রাকে দেখা যায়। বাথরুম থেকে সে বেরিয়ে এল। সারা গায়ে একটা মস্ত তোয়ালে জড়ানো। চোখ মুখ ভীত ত্রস্ত। সে কপিলের দিকে চেয়ে বলে—কী হয়েছে?

কপিল নিশ্চিন্ত হয়ে বলে—কতক্ষণ ধরে ডাকছি। শোনো, আমার ফিরতে দেরি হবে।

—রোজই তো হচ্ছে।

—আমি টপ করে আমস্টারডাম থেকে ঘুরে আসছি। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব।

—কতকাল বাচ্চাগুলোকে দেখিনি। আজ ইচ্ছে ছিল দুজনে মিলে দেখতে যাব ওদের।

কপিল বলে—বাচ্চারা ভালো আছে, চিন্তা নেই। আমস্টারডামে একজন আজ মারা গেছে।

—ওমা! তাই নাকি! কী হবে?

সত্যিকারের আতঙ্ক ফুটে ওঠে শুভ্রার গলায়।

কপিল মৃদুস্বরে বলল—বড় দুঃখের ঘটনা।

শুভ্রা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। তারপর দেখা গেল তার চোখ টলটল করছে অশ্রুতে।

কপিল সুইচ টিপে পরদা অন্ধকার করে দিল। তারপর একটা কাচের তৈরি শ্যাফটের ভেতরে এক্সপ্রেস লিফটে উঠল এসে। এক লহমায় লিফট তাকে হাসপাতালের একশো চল্লিশতলা ওপরের ছাদে নিয়ে এল। বিশাল ছাদে নানাদিকে মুখ করে গোটা পঞ্চাশেক ছোট-বড়, মাঝারি রকেট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে রাখা আছে। কপিল একটা রকেটে উঠে যন্ত্র চালু করে দিল। মৃদু শিসের একটা শব্দ করে রকেটটা ঝাঁপিয়ে পড়ল দূরত্ব গ্রাস করে নিতে।

রকেটের পেটের মধ্যে ছোট্ট আরামদায়ক কেবিনে একটা জানলার ধারে বসে কপিল বাইরে চেয়ে রইল। নীচে কলকাতা পেরিয়ে গেল। মাঠঘাট প্রান্তর উড়ে যাচ্ছে। শহরের পর শহর। সব ফাঁকা, নিঃঝুম। কোনও-কোনও ছোট শহর ঘন সবুজে আংশিক ঢেকে গেছে। ঘোর জঙ্গলে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে অধিকাংশ জনপদ। সমুদ্রে জাহাজ চলাচল নেই। অজস্র তিমি আর হাঙর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কম্পিউটার নিখুঁত দক্ষতায় রকেটটিকে চালিয়ে নিচ্ছে। বাতাসের বাধা গতিকে শ্লথ করে দেয় বলে রকেটটা প্রায় চল্লিশ মাইল ওপরে উঠে গেল। ওপর থেকে কপিল গোটা ভারতবর্ষের একটা আবছা বিশালত্ব দেখতে পায়। দক্ষিণে ঢালু হয়ে সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে গেছে দক্ষিণ। পূর্বদিকে আবছা আঁধিয়ার ছায়া-ছায়া হয়ে মুছে দিচ্ছে ভূ-প্রকৃতি।

নির্জন ইউরোপের ওপর খানিকক্ষণ উড়ে রকেট নামতে থাকে।

আমস্টারডামের হাসপাতালের মাথায় যখন নামল কপিল তখন মূল্যবান কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। এখানে এখন দুপুর। আকাশ মেঘলা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

নির্জন ছাদ পেরিয়ে লিফটে নেমে আসে কপিল।

লবিতে দু-চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা এতক্ষণ কপিলকে লিফট থেকে নামতে দেখে সবাই চিৎকার করে ওঠে—আরে। এসো-এসো।

মানুষ দেখলেই সবাই আনন্দিত হয় আজকাল।

লবিতে একটা গাড়ি দাঁড় করানো। গাড়িতে কাচের কফিন। কফিনের ভেতর একটি মৃতদেহ অনেক ফুল দিয়ে ঢাকা। কপিল এগিয়ে গিয়ে কাচের ভেতর দিয়ে লোকটাকে দেখল। প্রৌঢ় লোক। ভাঙাচোরা মুখখানা যত্নে আবার যথাসাধ্য ঠিকঠাক করে দিয়েছে ডাক্তাররা।

কপিলের শ্বাস কাচের গায়ে একটা তাপের বৃত্ত তৈরি করল। একটু ফুঁপিয়ে উঠে কপিল বলল—ভাই। আমার ভাই।

যারা অপেক্ষা করছিল তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সবাই বলে ওঠে—ভাই আমাদের ভাই। গাড়ি চলতে থাকে। ধীরে হাসপাতালের চৌহদ্দি পার হয়ে চলে যায় কবরখানার দিকে।

শোকে মূক কয়েকজন মানুষ উজ্জ্বল আলোয় পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

একটা লম্বা লোক হঠাৎ বলল—বেঁচে থাকাটা যে আমাদের পক্ষে ভীষণ জরুরি সেটা মানুষ বুঝতে পারছে না কেন বলো তো।

কপিল উত্তর দিল না। বিকেলে সে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে মুখোমুখি প্ল্যাটফর্মে যে লোকটাকে দেখেছিল তার কথা বড় মনে পড়ছে তার। লোকটা পাগল। যদি সে লোকটা হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসে।

একজন হঠাৎ বলে ওঠে—জর্জ বিয়ে করেনি।

কপিল জিগ্যেস করল—জর্জ কে?

—যে মারা গেল।

—বিয়ে করেনি?

—না।

লম্বা লোকটা বলল—ক্রাইম। যে নিজের সন্তান রেখে যেতে পারে না সে আজকের যুগের বড় ক্রিমিনাল।

প্রথম লোকটা বলল—সে তো ঠিক কথা। কিন্তু জর্জ বলত, তার কোনও সেকসুয়াল আজ নেই। পৃথিবীর নির্জনতা তাকে এত হন্ট করত যে সে দেহের কোনও চাহিদা বুঝতে পারত না। সব সময়ে ভয়ে-ভয়ে থাকত। বিয়ের কথা বললেই বলত—আমার সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই।

কপিল দুই হাত মুঠো করে উত্তেজনায়, দুঃখে! পৃথিবীতে প্রজনন ক্ষমতাবিশিষ্ট নরনারীর মোট সংখ্যা মাত্র দু-লক্ষের মতো। মহিলারা তাঁদের সাধ্যমতো সন্তান প্রসব করে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যেকেবই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জোর করে আর কিছু করা যাবে না। এই দুই লক্ষ নরনারীর সন্তানেরা মিলে বাকি আট লক্ষ মানুষ পৃথিবীতে। গড়ে প্রতিটি মহিলা আটটি করে সন্তান দিয়েছেন পৃথিবীকে। আর বেশি দাবি কবা চলে না। তাঁরা ক্লান্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য, আরও সন্তানবতী হতে গেলে অনেকেই প্রাণ হারাবেন। এবছর শিশুদের মধ্যে মাত্র পঁচিশ হাজার ছেলেমেয়ে ষোলো বছর বয়স পার হয়েছে। ষোলো পাব হলেই এখন দ্রুত বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। উপায় নেই, পৃথিবীতে এখন মানুষ বড় দরকাব।

একটা মোটাসোটা বেঁটেখাটো আমুদে চেহারার লোক কপিলের কাছ ঘেঁষে এসে বলল—আমাব বড় ভূতের ভয়, বুঝলে। আমি আজকাল প্রায়ই ভূত দেখছি। চলো, একটু কফি খাই।

কপিল লোকটার সঙ্গে হেঁটে রেস্টুরেন্টে এল। থরে-থরে খাবার সাজানো রয়েছে। সেদিকে কেউ তাকালও না। একটা রাস্তার কুকুর খাবারের টেবিলে দু-পা তুলে একটা স্টেক মুখে নিয়ে চলে গেল।

দুজনে কাগজের গ্লাসে পারকোলেটার থেকে কফি নিয়ে মুখোমুখি বসল। দূর থেকে বুলডোজারেব শব্দ আসছে। শহর পতনের শব্দ।

কপিল বলল—এ শহরে কতজন আছে?

লোকটা শ্বাস ফেলে বলে—এক হাজারও নয়। কেবল ভূত আছে অজস্র। তুমি ভূতে বিশ্বাস করো?

—না।

—আমিও করতাম না।

কপিল হাসল।

লোকটা বলল—ইয়ার্কির কথা নয়। আমি ইনডোর স্টেডিয়ামে একদিন একটা রোবটের সঙ্গে টেনিস খেলছিলাম। রোবোটটা এরাটিক। মাঝে-মাঝে সহজ মার ফসকাচ্ছিল। খুব বিরক্তি লাগছিল। আসলে টেনিস খেলার তো এখন আর কোনও আনন্দ নেই। স্টেডিয়ামে বসে কেউ দেখছে না, কেউ বাহবা দেওয়ার নেই, এমনকী প্রতিপক্ষও একটি যন্ত্রমাত্র। সবই তো জানো। তবু আমি সময় কাটানোর জন্য ব্যায়ামেব জন্য খেলতে বাধ্য হই। কয়েকটা রোবোট বল-বয় আমাদের বল কুড়িয়ে দিচ্ছিল। খেলা চলছে। থার্ড সেটটাও আমার ফেবারে এসে গেল। শেষ গেমে রোবোটের সার্ভিস ভেঙে আমি যেই গেম, সেট আর ম্যাচ জিতেছি অমনি স্টেডিয়ামে একটা লোক হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু বিশ্বাস করো কেউ সেখানে ছিল না। আমি প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাই।

হঠাৎ রেস্টুরেন্টের দেওয়ালে বিশাল টিভি পরদায় ঝলসে ওঠে আলো। একটা কম্পিত গলা বলে ওঠে—দেয়ার ইজ এ ট্রেমর। তারপর চুপ। সাদা বোবা পরদা।

উৎকণ্ঠ কপিল আর তার সঙ্গী কফি এবং ভূত ভুলে পরদার দিকে তাকায়।

পরদায় ঘোষকের উদ্‌ভ্রান্ত মুখ ভেসে ওঠে। সে বলে—উত্তর আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ডে

প্রচণ্ড...প্রচণ্ড ভূমিকম্প হচ্ছে।

আমরা কী করব বুঝতে পারছি না। সেখানে প্রায় দেড় লক্ষ লোক রয়েছে।

কপিল লাফিয়ে ওঠে। লোকটাও।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। হু-হুঙ্কার হাওয়া। ঝড়। কিন্তু দেড় লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে কথা। কপিল বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে গিয়ে হাসপাতালের বাড়ির মধ্যে ঢুকল। পিছনে লোকটা।

সেই লম্বা লোকটা লবিতে একা দাঁড়িয়ে টিভির পরদার দিকে চেয়ে আছে।

টিভির পরদায় আবার ঘোষকের উদ্‌ভ্রান্ত মুখ ভেসে ওঠে। একটু থেমে-থেমে সে বলে যায়—আমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ধরা পড়ছে, এই রাগি ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ক্রমশ সরে যাচ্ছে দক্ষিণে। এই রাগি ভূমিকম্প চার মিনিট ধরে সমস্ত দেশের চেহারা পালটে দিয়েছে। চল্লিশটি উপগ্রহকে আমেরিকার আকাশে পাঠানো হয়েছে। তারা যে দৃশ্যের ছবি পাঠাচ্ছে তা দেখুন।

বিশাল পরদা জুড়ে কিছুক্ষণ সাদা আলো দেখা গেল। তারপরই ভেসে ওঠে শহরের ছবি। শহরের ছবি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উঁচু-নীচু হয়ে আছে। বিশাল এক ফাটল থেকে অবিরল বাষ্পরাশি উঠে এসে গ্রাস করছে চারিধার। বাড়ি ঘর পড়ে আছে যুদ্ধে বিধ্বস্ত মৃতদেহের মতো। ক্যামেরার লেন্স ক্লোজ-আপে তুলে আনে ধ্বংসস্তূপের খুঁটিনাটি। বেশি মানুষ ছিল না শহরে। তবু দুটি একটি হাত, পা, মুখ বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়। একটা একশো পঞ্চাশতলা বাড়ির ছাদে চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যান্তর ঘটে, আর একটা শহরের ছবি আসে। একই দৃশ্য। শহর থেকে শহরান্তরে চলে যায় দৃশ্যাগুলি। উড়াল রাস্তা ভেঙে পড়েছে, বাড়ি-ঘর মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, পৃথিবীর অভ্যন্তর পর্যন্ত উন্মুক্ত করে বিশাল ফাটলের গহিন গহ্বর দেখা যায়। ধোঁয়া উঠে আসছে। ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে চারিধার।

লম্বা লোকটা ডুকরে কেঁদে ওঠে হঠাৎ। চেঁচিয়ে বলল—ভগবান। এটা যেন আমাব দুঃস্বপ্নমাত্র হয়।

বেঁটে লোকটা কপিলের হাত চেপে ধরে বলে—মানুয কমছে। ভূত বাড়ছে! আমরা কোথায় যাব বলত পারো? বেঁচে থাকা বড় কষ্টকর।

কপিলের ভ্রূ অসম্ভব কোঁচকানো। মুখ থমথম করছে, অবরুদ্ধ কান্নায় চোখদুটো লাল, হাত-পা থরথর করে কাঁপছে।

সে ফিসফিস করে বলে—এরকম হওয়ার কথা নয়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ অনেক আগেই যন্ত্রে ধরা পড়েছিল নিশ্চয়ই। কেন সেটা মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হল না?

লম্বা লোকটা দু-হাতে মুখ ঢেকে মেঝের ওপর বসে ছিল। আস্তে-আস্তে মুখ তুলে নিজের কান্না গোপন না করেই বলল—মানুষ বড় অসতর্ক। বন্ধু, কেউই এখনও ভালো করে যন্ত্রের সংকেত লক্ষ করে না। এই নির্জনতায় তারা অহরহ পাগল হয়ে যাচ্ছে।

কপিল অন্যমনস্কভাবে পরদার দিকে চেয়ে আছে। বীভৎস ধ্বংসের ছবি দেখে আর বিড়বিড় করে বলে—মানুষের প্রজাতি ধ্বংসের মুখে। ঠেকানো যাবে না। কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

টেলিভিশনের পরদা থেকে স্বর ভেসে আসে—উত্তর আমেরিকার দিকে কেউ যাবেন না। সমস্ত রকেট ও উড়োজাহাজের গতি পরিবর্তন করুন। আমাদের হিসেব মতো প্রায় এক লক্ষ মানুষ, আমাদের আত্মার এক লক্ষ আত্মীয়...গেছেন। যাঁরা প্রাণে বেঁচে আছেন আর এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের ইউরোপে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমাদের স্বয়ংচালিত যান ও যন্ত্র উদ্ধার

কাজে নেমেছে।

বেঁটে লোকটা হঠাৎ হাঃ-হাঃ করে হেসে ওঠে। হাসতেই থাকে। হাসতে-হাসতে নিজের পেট চেপে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বলে—বেঁচে থাকার চেষ্টা করে লাভ নেই। লাভ নেই। এর চেয়ে ভূত হওয়া ঢের ভালো। ভূতের মৃত্যু হয় না। আমাকে মরতে দাও। আমাকে মরতে...।

এই বলে হঠাৎ লোকটা ছুটতে থাকে দিকবিদিকের জ্ঞান হারিয়ে।

কপিলের মাথাটা ঝিমঝিম করে। মাথাটা ফেটে যেতে চায়। এক লক্ষ লোক নেই! অবিশ্বাস্য! দুহাতে বারবার মুঠো পাকায় সে। দাঁতে দাঁত ঘষে।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়, বেঁটে লোকটা মরবার জন্যে দৌড়োচ্ছে।

দুর্বলতাকে ঝেড়ে কপিল দ্রুত পায়ে লবির বাইরে ছুটে যায়। লবির মুখে একটা অদৃশ্য পরদা রয়েছে। দরজার কাঠামোর ভেতরে লুকোনো রন্ধ্র দিয়ে অবিরল প্রচণ্ড এক বাতাস ছাড়া হয়। সেই বাতাসের পাতলা আস্তরণ ভেদ করে বাইরের কোনও পোকামাকড় আসতে পারে না।

ঠিক এই বাতাসের পরদার মধ্যে দাঁড়িয়ে চিকন বাতাসেব সুড়সুড়ি সারা দেহে অনুভব করে কপিল। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখে রাস্তার চলন্ত ফুটপাত বেয়ে গভীর বৃষ্টির বেঁটে লোকটা ছুটে যাচ্ছে। রাস্তাটা ফ্লাইওয়ে। যে-কোনও সময়ে লোকটা এই প্রায় চল্লিশতলা সমান উঁচু রাস্তা থেকে রেলিং টপকে ঝাঁপ দিতে পারে।

মাথাটা ঝিম করে ওঠে কপিলের। বাঘের মতো সে লাফিয়ে পড়ে রাস্তায়। চারদিকে অজস্র গাড়ি প্রয়োজনের অপেক্ষায় ছড়িয়ে রাখা। কিন্তু গাড়িতে ওঠা বৃথা জেনে কপিল ছুটতে থাকে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সে ভিজে যায়, চোখ ঝাপসা লাগে। বহুকাল সে ভেজেনি।

স্কাইওয়ে ঘুরে গেছে ডানদিকে। জনমানবহীন। অপরাহ্ণের মেঘচাপা আলোয় ঝিকিয়ে ওঠে জল। মেঘ ডাকে। কপিল প্রাণপণে রাস্তার চড়াই ধরে ছোটে।

বেঁটে লোকটা অন্তত একশো গজ সামনে চেঁচাচ্ছে—মরে যাও সবাই। মরে যাও। আমরা ভূত হয়ে বেঁচে থাকব।

বলতে-বলতে লোকটা ডান ধারের একটা ঢালু বেয়ে তীরের মতো নামতে থাকে।

কপিল দাঁড়ায়। এভাবে ওকে অনুসরণ করা অসম্ভব। ও পাগল। যা খুশি তা-ই করতেই পারে। ওকে তাড়া করতে গিয়ে কপিল নিজে মারা পড়বে।

রাস্তার ধারে রাখা একটা বাতাসি নৌকো পেয়ে গেল কপিল। মুহূর্তের মধ্যে উঠে সে যন্ত্রটাকে চালু করে। কাচে ঢাকা ছোট্ট মোটরবোটের মতো দেখতে যানটি নিঃশব্দে শূন্যে উঠে পাখির মতো স্বচ্ছন্দে উড়তে থাকে।

কপিল জানে, বৃথা। এই দ্রুতগতি যানে লোকটার কাছে পৌঁছনোর আগেই ও ভালোমন্দ কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তবু চেষ্টাই জীবন।

বাতাসি ভেলা সন্ধানী আলো ফেলে রাস্তায়। তারপর স্কাইওয়ে ছেড়ে তীব্র গতিতে শূন্যে নেমে যেতে থাকে। লোকটা অসম্ভব দ্রুতগতিতে ডানধারের রাস্তা দিয়ে দৌড়ে নামছে। বৃষ্টিতে আবছায়া অশরীরী দেখাচ্ছে তাকে। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তায় তার শরীরটা দেখাচ্ছে পিঁপড়ের মতো ছোট।

বাতাসি ভেলার গতি বাড়িয়ে দেয় কপিল। অন্তত দুশো মাইল বেগে রাস্তার সমান্তর ধরে ভেলা ছুটতে থাকে শূন্য পথে। তীক্ষ্ণ আলো ফেলে লোকটার ওপর।

লোকটা একবার তাকায় ভেলাটার দিকে। চিৎকার করে বলে—আমি থামতে পারছি না। আমাকে আটকাও।

কিন্তু আটকানোর উপায় কী?

লোকটার মাথার ওপর দিয়ে ভেলাটাকে উড়িয়ে দেয় কপিল। তারপর লোকটাকে পার হয়ে সে ভেলাটাকে নামিয়ে আনতে থাকে রাস্তায়।

কিন্তু এত ওপরে বড্ড বেশি ঝোড়ো বাতাস। পাগলের মতো বাতাসের তোড় আর বৃষ্টির খরশান ঝাপটা। কিছুই প্রায় দেখা যায় না

রাস্তার ওপর ভেলাটাকে নামিয়ে পিছু ফিরে চায় কপিল। বর্ষার নীচু মেঘ এসে রাস্তাটা গ্রাস করে নিয়েছে। ঘন কুয়াশার রেলগাড়ি বয়ে যাচ্ছে। কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না।

পায়ের শব্দের জন্য কান পেতে ছিল কপিল। কিন্তু কিছু শোনা গেল না। আঁধার ভেদ করে লোকটাও বেরিয়ে এল না।

বাতাসি ভেলা আবার শূন্যে তোলে কপিল। ফিরে যায়। আঁতিপাঁতি করে রাস্তাঘাট খুঁজতে থাকে। আমস্টারডামের নিস্তব্ধ জনবিরল উঁচু রাস্তাগুলি থেকে শহরের ভিত পর্যন্ত। কোথাও নেই।

একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে অনুসন্ধান অফিসে খবরটা জানায় কপিল। বলে—লোকটাকে এক্ষুণি আটকানো দরকার।

অনুসন্ধান অফিস একটু অপেক্ষা করতে বলে কপিলকে। বলে—আমরা চারদিকে সন্ধানী রশ্মি পাঠাচ্ছি। কোথাও মৃত মানুষের দেহ থাকলে এক মিনিটের মধ্যে খবর দেব আপনাকে।

এক মিনিট অপেক্ষা করে কপিল।

তারপর অনুসন্ধান অফিস থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—একশো চৌদ্দ নম্বর স্কাইওয়ের ওপর সে পড়ে আছে। কিছু করার নেই। মনে হয় একশো পনেরো নম্বর স্কাইওয়ে থেকে সে পড়ে গিয়েছিল।

কপিল বেরিয়ে এসে বাতাসি ভেলায় বসে। তারপর ধীরে ধীরে ভেলাটাকে মেঘের স্তরের ওপরে তুলে উড়তে থাকে। নীচে চারদিকে কোপানো জমির মতো মেঘের রাশি। ওপরে নীলাভ আকাশে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ আলো। কপিল সেদিকে চেয়ে আছে। আপনমনে অনেকক্ষণ কাঁদে কপিলদেব। উত্তর আমেরিকায় এক লক্ষ লোক মারা গেছে। আমস্টারডামে এইমাত্র আরও একজন গেল।

একটা মস্ত বাড়ির মাথায় নেমে এল কপিল। এখানে রকেটের স্টেশনে রয়েছে। দ্রুতগতি একটি রকেট বেছে নিয়ে পূবালি পথে নক্ষত্রের বেগে ছুটে চলল।

সারা রাত ধরে শহর পতনের শব্দ হয়েছে। তার শব্দনিয়ন্ত্রিত ঘরের জানলা খুলে অনেক রাত পর্যন্ত সেই শব্দ শুনেছে কপিল। শুভ্রাও অনেকক্ষণ জেগেছিল তার সঙ্গে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুভ্রা বলেছে, আমাদের এত বড় আর সুন্দর শহর কীরকম ছোট হয়ে এল।

অন্যমনস্ক কপিল জবাব দিয়েছে—আমরা ভেঙে না ফেললেও একদিন আপনা থেকেই ভেঙে যাবে। জঙ্গল এগিয়ে আসছে। বেড়ে যাচ্ছে ভয়াল সব জানোয়ার। দিল্লির জঙ্গলে অতিকায় বুনো হাতি দেখা গেছে। এরা কবে জন্মাল, কবে বড় হল আমরা জানতেই পারিনি।

—কী করে জানব! শুভ্রা বলে—গোটা ভারতবর্ষের বিশাল অঞ্চল ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে কী হচ্ছে তোমরা কী করে খবর নেবে?

কপিল মাথা নেড়ে বলে—সেই জন্যেই আমরা শহর ছোট করে ফেলেছি শুভ্রা। ছোট শহরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সহজ হবে। গতকাল রাস্তায় আমি সাপ দেখেছি। কুকুরগুলোও ক্রমে বুনো প্রকৃতির হয়ে যাচ্ছে। পাখিদের আকার বড় হচ্ছে।

কী হবে বলো তো।

—আরও একলক্ষ লোক চলে গেল শুভ্রা। পৃথিবীর মানুষ প্রজাতি বুঝি আর থাকে না। শুভ্রা, আর একবার মা হবে?

আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল শুভ্রা। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তাবপর আস্তে বলল—আমি পৃথিবীকে দশটি সন্তান দিয়েছি। দশটি। আমার শরীরের সমস্ত প্রাণশক্তি নিংড়ে আমার সর্বশেষ সন্তান জন্মেছে মাত্র দু-মাস আগে। তোমবা আর কত চাও? আমার উর্বরতা কি অসীম? আমার ক্লান্তি নেই?

—জানি শুভ্রা, তোমাব বয়স মাএ আঠাশ। গত বারো বছর ধরে তোমাকে এক নাগাড়ে সন্তান প্রসব করতে হয়েছে। তুমি ধন্য করেছ আমাদের। তবু বলি, ভেবে দ্যাখো। এক লক্ষ মূল্যবান মানুষ আমরা হারিয়েছি।

—আমি পারব না। শুভ্রা মাথা নেড়ে বলেছে—আমি আর পারি না। আমার সাধ্য নেই। প্রাণ নিভে আসে। চোখ নিভে আসে। শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

শুভ্রা অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপব ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর সারা রাত ঘুমহীন কপিল বসে নগরপতনের শব্দ শুনল। স্বয়ংক্রিয় বুলডোজার নির্ভুল যান্ত্রিক নিয়মে বাড়িঘর ভাঙছে, ধ্বংসস্তূপ তুলে নিচ্ছে ধাতব দাঁতে। সেগুলো গুঁড়ো করে রাসাযনিক পদ্ধতিতে তৈরি করছে মণ্ড, সেই মণ্ড দিয়ে একদিন ছোট শহরের চারদিকে দেওয়াল তোলা হবে। মানুষ কমে আসছে, সংকুচিত হয়ে আসছে, শহর, পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল চলে যাচ্ছে ভয়াবহ অরণ্যের কবলে।

ভোরবেলা কপিল একটা উৎক্ষেপণ রকেট ধরে আকাশের হাজার হাজাব উপগ্রহের মধ্যে একটিতে এসে উঠল। উপগ্রহটি মাঝারি ধরনের। ভেতবে অন্তত পঞ্চাশজন লোকের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবী থেকে তিনশো মাইল উঁচুতে উপগ্রহটি সূর্যের পথে বিষুবরেখার ত্রিশ ডিগ্রি কোণ করে ঘুরছে।

উপগ্রহের ইলেকট্রনিক, দূরবীক্ষণ আর ক্যামেরা নিয়ে বসে থাকে কপিল। গোটা পৃথিবী তন্নতন্ন করে দেখতে থাকে। দূরবীক্ষণে মাটির ওপরকার একটা ঢেলাও স্পষ্ট দেখা যায়। কপিল দেখে আর দেখে। নিউজিল্যান্ড জনশূন্য, অস্ট্রেলিয়া বিরলবসতি, আফ্রিকা গভীর অরণ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে।

যোগাযোগকারী আর একটি যান চালিয়ে ভিন্ন এক উপগ্রহে চলে যায় কপিল। অন্ধকারে কোথাও বিশাল অঞ্চল জুড়ে দাবানল জ্বলতে দেখা যায়। দু-একটা শহবে ক্ষীণ আলো জ্বলে।

টেলিভিশনের পরদা জীবন্ত করে কপিল খবর শোনে। ঘোষক বলে—আমরা এখন আপনাদের মানুষের ছবি দেখাব। আজকের নির্জন পৃথিবীর অধিবাসীরা দেখুন, পৃথিবীতে এক সময়ে কত মানুষ ছিল।

পরদা জুড়ে ভিড়ের ছবি ফুটে ওঠে। বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে পুরোনো আমলের শহরের ভিড় দেখতে পায় কপিল। পিকিঙের বাজার, টোকিয়োর ভূগর্ভস্থ রেল, কাশীর স্নানের ঘাট, নিউইয়র্কের খ্রিস্টমাস উৎসব, কলকাতার দুর্গাপুজো, প্যারিসের নিউ ইয়ারস ডে। মানুষ আর মানুষ। কত মানুষ ছিল যে পৃথিবীতে। কলকাতার রাজপথের একটি বিজ্ঞাপনও দেখতে পাওয়া যায়—সীমিত পরিবারই সুখী পরিবার। ভেসে ওঠে সে আমলের এক খবরের কাগজের হেডিং—পৃথিবীর জনসংখ্যা অকল্পনীয় ভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপিল। তারপর স্থির উপগ্রহ ছেড়ে এক চলন্ত উপগ্রহ ধরে চলে আসে

কলকাতার আকাশে। পৃথিবীগামী রকেটে করে নেমে আসে নিজের বাড়ির ছাদে। মূল্যবান তিনঘণ্টা সময় নিয়ে সে পৃথিবীর যে চিত্র দেখল তা তাকে একটুও খুশি করেনি।

গৃহপালিত পশুকেন্দ্র থেকে কপিলের কাছে টিভি টেলিফোনে ডাক আসে। কেন্দ্রের অধিকর্তা জান-এর ভয়ার্ত মুখ ভেসে ওঠে পরদায়। সে বলে—কপিল একবার এসো।

—কেন?

—খুব জরুরি দরকার। গৃহপালিত পশুর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

কপিলের সময় লাগল না। তৈরিই ছিল সে, ছাদ থেকে একটি মোটর-কপ্টার নিয়ে সে বেরোয়। চারশোতলা উঁচু ছাদের সংলগ্ন আকাশিপথ। এ পথ এত উঁচু যে মেঘ করলে ঢেকে যায়। কপিলের মোটর-কপ্টার যন্ত্রটি রাস্তা ধরে চলতে পারে, আবার রাস্তা না থাকলে কিছুক্ষণ উড়তেও পারে। গতি ঘণ্টায় চব্বিশ কিলোমিটারের মতো।

আকাশিপথ ধরে কপিল শহরের প্রান্তে আসে। এখানে বিশাল এলাকা জুড়ে খামার বাড়ি। অন্তত চারশো একর জমিতে কেবল পশুখাদ্য তৃণের চাষ হচ্ছে। অন্যদিকে ফাইবার কাচের তৈরি গোশালা, মোষের আস্তানা, ছাগলের আবাস, ঘোড়ার আস্তাবল এবং হাস-মুরগির অতিকায় পোলট্রি।

মোটর-কপ্টার থেকে নামতে না নামতেই জান দৌড়ে এসে বলল, কপিল, পশুরা কোনও নিয়ম মানতে চাইছে না।

কপিল কথা বলল না। পশুকেন্দ্র তার চেনা। সে গিয়ে কাচঘরের দরজা খুলে ঢুকল। এখানে গরুকে খাওয়ানো হয়। একটা বিশাল গোল যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন খোপে গরুদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাদের মুখের কাছে থাকে একটা খাবারের পাত্র। সেই পাত্রে নল দিয়ে সঠিক ক্যালোরিসম্পন্ন খাবার এসে জমা হয়। একইসঙ্গে গরুর ওজন, রক্তচাপ, এক্স-রে সব নেওয়া হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিনা আয়াসে দুগ্ধবতীদেব দুধ টেনে নেয় এখান থেকেই।

কপিল ঘরে ঢুকতেই অনেকগুলি ফোঁস-ফোঁস শব্দ শোনে। ক্রুদ্ধ শ্বাসের শব্দ। এগিয়ে যায় যন্ত্রটার কাছে। একটা খোপের দরজা খুলতেই ভীষণ গলার শব্দ তুলে হুড়মুড় করে একটা প্রকাণ্ড কালো গরু বেরিয়ে আসে। গরুটার মুখে ফেনা, চোখ লাল, শ্বাস গভীর।

কপিল তাকিয়ে থাকে। গরুটা কপিলের মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর মেঝেতে খুব ঘষে মাথা নীচু করে আচমকা ধেয়ে আসে।

কপিল বিনা আয়াসে দু-পা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াতেই গরুটা গা ঘেঁষে ছুটে খোলা দবজা দিয়ে গিয়ে ফাঁকায় পড়ে।

জান কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলে—দেখলে?

—দেখলাম। কপিল গম্ভীর জবাব দেয়।

—কী হয়েছে ওদের বলো তো!

কপিল চিন্তিতভাবে স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে গরুটাকে দেখছিল। তৃণভূমির ভেতর দিয়ে, চারণখেত পার হয়ে গরুটা জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে।

কপিল মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল—আমি কিছু একটা টের পাচ্ছি জানো।

—কী সেটা?

—এসো, আরও একটু দেখি।

এই বলে কপিল গিয়ে একের পর এক দরজা খুলে দিতে লাগল। এতকাল যারা পোষ মেনে নিরীহের মতো দিন কাটাচ্ছিল সেই সব গরু মোষের আচরণে এক আশ্চর্য পরিবর্তন এসে গেছে। হিংস্র, লালচোখো, ক্রুদ্ধশ্বাস গরু মোষ তাদের খোপ থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসে। তেড়ে ঢু মারবার চেষ্টা করে, তারপর চাপা হর্ষের ধ্বনি দিতে-দিতে বেরিয়ে পড়ে বাইরে।

চারণভূমি পার হতে থাকে ঝড়ের বেগে।

মুরগির খাঁচা খুলতেই হিংস্র বন্য আনন্দে তারা ডেকে ওঠে। তীব্র ডানায় উড়ে যায় বাইরে। হাঁসের পাল দৌড়তে থাকে মাটি আঁকড়ে। ঘোড়া প্রচণ্ড হ্রেষায় চারিদিক প্রকম্পিত করতে থাকে।

জান বিস্ময়ভরে বলে—এ যে অবিশ্বাস্য কপিল! এরা সব যাচ্ছে কোথায়?

কপিলের কপালে বেখা, সারা শরীরে ঘাম, চোখ ভয়ার্ত। সে একবার জান-এর দিকে চেয়ে বলল—তুমি কোনও গন্ধ পাচ্ছ জান?

—না তো! কীসের গন্ধ?

কপিল মাথা নেড়ে বলে—আমিও পাচ্ছি না। কিন্তু একটা গন্ধ অবশ্যই আছে আর ওরা সেট টের পেয়েছে।

—কীসের গন্ধ কপিল?

—আমার মনে হয় গন্ধটা জঙ্গল থেকে আসছে। জঙ্গলেরই গন্ধ। এসো।

এই বলে কপিল তার মোটর-কপ্টারে গিয়ে ওঠে। সঙ্গে জান। মোটর-কপ্টার সামান্য গতিতে ওপরে উঠতে থাকে। কপিল তাকে শহরের প্রান্তের দিকে চালিয়ে দেয়।

বেশি দূব যেতে হয় না। হঠাৎ তারা দেখতে পায় শহরের জনবিরল পুবদিকের গোটা এলাকা সবুজে-সবুজে ছেয়ে গেছে। এই সেদিনও এখানে উদ্ভিদের কোনও আক্রমণ ছিল না। কিছু গাছ ছিল, কিছু ঘাস ছিল সাজানো বাগানের মতো। আজ এ কী! নিয়মহীন, উচ্ছৃঙ্খল আগাছা উঠেছে রাস্তা ভেদ করে। বড়-বড় কংক্রিটের ইমারত ফাটিয়ে দেখা দিয়েছে গাছের অপ্রতিরোধ্য নিশান। লতানে গাছ ফ্লাইওয়ে বেয়ে উঠে আসছে। একটা বাড়ির ছাদ ছেয়ে গেছে বুক সমান ঘাসে। একটু দূরে, যেখানে ফাঁকা প্রান্তর ছিল সেখানে কালো মেঘের মতো ঘনিয়ে উঠেছে বিশাল মহাবৃক্ষের অরণ্য। নীচে পথ ঘাট ভেঙে পশু পাখিবা যে যার মতো চলে যাচ্ছে সেই মহারণ্যের দিকে।

—দেখেছ জান?

—দেখছি। কিন্তু এর অর্থ কী?

—আদিম পৃথিবী ঠিক ওইরকম ছিল। নিবিড়, ঘন মহারণ্য। ওরা একদিন সেই জঙ্গলের অধিবাসী ছিল। রক্তে তার স্মৃতি আজও রয়ে গেছে। আবার সেই অরণ্যের দিন ফিরে আসে বুঝি জান। মানুষের প্রজাতি শেষ হয়ে এল। তাই নিবিড় আদিম অরণ্য ডেকে নিচ্ছে ওদের। ভেবো না জান! আমাদের আর খুব বেশি দুধ, মাংস বা ডিমের দরকার হবে না।

জান বাক্যহাবা হয়ে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ কয়েক ফোঁটা জল জন্মায় তার চোখে। সে মাথা নাড়ে। তারপর হঠাৎ হু-হু করে কাঁদতে থাকে।

কপিল তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে না। শুধু নীচের দিকে সম্মোহিতর মতো চেয়ে থাকে।

কপিল ভাবে, প্রকৃতি তার কত প্রিয় ছিল। এই বিপুল শহরে বাস করতে-করতে কতবার তার ইচ্ছে হয়েছে, নিবিড় জঙ্গলের ধারে গিয়ে বাস করবে। যেতে ইচ্ছে হয়েছে নির্জন পাহাড়ে, সমুদ্রের ধারে, জনবিরল গাছপালার মধ্যে। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে শীতে পাতা ঝরার সময়ে বড়-বড় গাছের তলা দিয়ে শেষ সূর্যের নরম আলো আর গাছের প্রলম্বিত ছায়ার আলো-আঁধারিতে ধীর পায়ে বেড়াবে। গাছে ও বাতাসে মর্মরধ্বনি ছিল তার প্রিয়, ভালোবাসত সবুজ রঙের অনন্ত চিস্তার, ফুলের ফুটে ওঠা কী অসীম আনন্দের সঞ্চার করেছে তার প্রাণে। আজও সে বলতে পারে না, অরণ্য তার প্রিয় নয়। কিংবা বলা যায় না যে, গাছপালাকে সে ভয় পায়। সেটা খুব মিথ্যে শোনাবে।

কিন্তু তবু ওই এগিয়ে আসা মহা, আদিম, অন্ধ অরণ্যকে দেখে তার বুক কেঁপে ওঠে। মানুষের শহর, জনপদ, বসতি গ্রাস করতে নিঃশব্দ চকিত পায়ে এগিয়ে আসছে যে মূক নীরবতা তার ভিতরেই নিহিত আছে মানুষের সম্পূর্ণ পরাভব, তারপর বিলুপ্তি। খুব আদিম যুগে একদিন অরণ্যের দয়ায় মানুষ বেঁচে থাকত। তারপর ইতিহাস পালটে গেল, পৃথিবী জুড়ে জঙ্গল হাসিল করে মানুষ পত্তন করেছিল তার নগর-বন্দর। মানুষ বাড়তে লাগল। জঙ্গল সরে যেতে লাগল দূরে। তখন ছিল মানুষের দয়ায় অরণ্যের বেঁচে থাকা। আবার আজ ইতিহাস পালটাচ্ছে। মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অরণ্যের অমোঘ চিন্তার।

—জান। কপিল মৃদু স্বরে ডাকে।

—আমি বেশিদিন বাঁচব না কপিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে জান বলে।

—বাঁচতেই হবে জান।

—আমি ওই দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না।

কপিল মৃদু সম্মোহিত স্বরে বলে—এখনও প্রকৃতি বড় সুন্দর জান। চেয়ে দ্যাখো, কী সবুজ! কী সবুজ! কতকাল দু-চোখ ভরে এত সবুজ দেখিনি। মহা-অরণ্যের মধ্যে নিবিড় ঠান্ডা ছায়ায় কত প্রাণ জন্ম দিচ্ছে। পৃথিবীর মাটি যে উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছিল তা আবার ফিরে আসছে জান।

জান কথা বলল না। দু-হাতে চোখ ঢেকে রইল।

শিশু আবাসের চারধারে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা চমৎকার বাগান ছিল। ফোয়ারা ছিল, সাঁতারের কৃত্রিম পুকুর, খেলার মাঠ, ইস্কুল। চাবদিকে নিরাপত্তার সুকঠোর ব্যবস্থা। শিশুবাই এখন মানুযেব ভবিষ্যৎ, শিশুরাই মানুষের পরমতম সম্পদ।

শিশু আবাসের মাঠে বাতাসি-ভেলায় করে নেমে এল কপিল আব শুভ্রা।

শুভ্রাকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। মুখের ভাবে একটা গভীর আতঙ্ক। কপিলের মুখে ভ্রূকুটি, চোয়ালে শক্ত কঠিন নিষ্ঠুরতা।

শিশু আবাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ। তার মুখেও গভীর বিষণ্ণতা। সে অন্যমনস্কভাবে বাগানের দিকে চেয়ে ছিল। কপিল আর শুভ্রাকে দেখে সামান্য নড়ল মাত্র।

—ফিলিপ। কপিল গভীর স্বরে ডাকে।

ফিলিপ একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে—কপিল, আমাদের বাগানের দিকে চেয়ে দ্যাখো।

কপিল মুখে ফিরিয়ে দেখে।

যেখানে সুন্দর ফুলের কেয়ারি ছিল, সবুজ ছাঁটা ঘাসের মখমল ছিল সেখানে হঠাৎ প্রাণ পেয়ে গজিয়ে উঠেছে অগণ্য উদ্ভিদ। সাজানো বাগান আগাছা আর মস্ত গাছের ভিড়ে ডুবিয়ে দিয়েছে কখন। চোরকাঁটায় ঘিরেছে খেলার মাঠ। লতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পাঁচিল। ফোয়ারার গা বেয়ে উঠে কংক্রিটে চিড় ধরাচ্ছে উন্মাদ লতানে গাছ।

ফিলিপ বলল—কালও আমরা জঙ্গল সাফ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বৃথা। গাছ গজাতে আজকাল সময় নেয় না। কপিল, আমাদের আশেপাশে আমরা বড়-বড় জন্তুর চলাফেরার শব্দ পাচ্ছি আজকাল। বাঘের ডাক আসে। বুনো মোষের পায়ের শব্দ হরিণের ডাকের পিছু ধাওয়া করে।

শুভ্রা আর্তকণ্ঠে বল ওঠে—আমাদের বাচ্চারা?

ফিলিপ ম্লান হেসে বলে—ভালো আছে শুভ্রা। বাচ্চাদের আমরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা ক'দিন?

শুভ্রা মৃগী রোগীর মতো দাঁতে দাঁত চেপে একটা অস্ফুট শব্দ করে। হাতের মুঠো পাকিয়ে বলে—আমাদের অস্ত্র আছে। মৃত্যুরশ্মি, ট্রেসার বুলেট, বিষের গ্যাস। আমরা সব বন্যজন্তু শেষ করে দেব। স্বয়ংক্রিয় মেশিনে জঙ্গল মুড়িয়ে দেব।

ফিলিপ ম্লান হাসে।

কপিল শুভ্রার হাত ধরে বলে—শান্ত হও। শোনো। আমাদের যা করবার সবই আমরা করব। করছি! কিন্তু লড়াই কার সঙ্গে শুভ্রা? অরণ্যের সঙ্গেও নয়, বন্য-জন্তুর সঙ্গেও নয়। ওরা তো আমাদের আক্রমণ করেনি এখনও। আমাদের লড়াই মৃত্যুর সঙ্গে, অবলুপ্তির সঙ্গে। মানুষ যেখানে নেই সে জায়গা তো অরণ্য দখল করবেই! সারা পৃথিবীতে মাত্র নয় লক্ষ লোক কী করতে পারে বলো? কত জায়গায় মানুষ থাকবে?

শুভ্রা বিভ্রান্তের মতো কপিলের দিকে চেয়ে বলল—আমরা উপগ্রহে গিয়ে যদি থাকি?

—কত দিন থাকবে? মাটির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে বংশপরম্পরা সেখানে বাস করা অসম্ভব। পৃথিবীতে মানুষের অভাব দেখা দেওয়ায় আমরা চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে, নেপচুনে আমাদের বসবাস বন্ধ করেছি। সেখান থেকে আমাদের উপনিবেশ গুটিয়ে আনতে হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকেও সব লোক এনে পৃথিবীতে বসতি বাড়াতে চেষ্টা করেছি। কারণ পৃথিবীর বাস উঠে গেলে গ্রহ বা উপগ্রহের উপনিবেশ ক'দিন থাকবে? তাদের সব রসদ তো পৃথিবী থেকেই নিতে হয়।

—তাহলে কী হবে আমাদের?

—অপেক্ষা করো।

কপিল আর কোনওদিকে তাকায় না। বিশাল শিশু আবাসের দরজা দিয়ে ঢুকে যায় ভিতরে।

এখানে কৃত্রিমতা খুবই কম। স্বাভাবিক ঘর দুয়ারের ভেতরে আসবাব অল্পই চোখে পড়ে। চারদিকে আগোছালো খেলনা, বই, জামাকাপড় ছড়ানো। এখানে অপার স্বাধীনতায় শিশুরা মানুষ হয়। তাদের ওপর কোনও কৃত্রিমতা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তারা দৌড়োয়, ভাঙে, ছেঁড়ে, পড়ে যায়, চেঁচায়, হল্লা করে, কেউ বাধা দেয় না। তাদের মনের স্বভাবজ আনন্দ কখনও কেড়ে নেওয়া হয় না, বাধা দেওয়া হয় না তাদের আচরণে। শুধু লক্ষ রাখা হয় তাদের নিরাপত্তা এবং পুষ্টির দিকে।

এখানে শিশু আবাসে খুব বেশি শিশু নেই। সংখ্যায় মাত্র পঞ্চাশজন। এরকম অজস্র শিশু আবাসে গত হাজার বছর ধরে শিশুরা বাস করছে। তাতে মা-বাবার কাজের সুবিধে হয়। বাচ্চারাও ঠিক মতো মানুষ হয়।

কপিলের এগারো বছরের বড় ছেলে কৌশিক সামনে এসে দাঁড়ায়। পরিপুষ্ট শরীর, অত্যন্ত বুদ্ধিমান মুখচোখ। সামান্য একটু হেসে বিনা ভূমিকায় বলল—বাবা, আমরা ছায়াপথের অন্য কোনও সৌরলোকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করিনি কেন?

কপিল অবাক হয়ে বলে—তার কি কোনও দরকার ছিল?

কৌশিক বলল—নিশ্চয়ই ছিল। পৃথিবীতে মানুষ ভীষণ বিপন্ন। আমি জানি।

—কে তোমাকে বলল?

—আমি জানি।

কপিল শ্বাস ফেলে বলল—ছায়াপথের অন্য প্রান্তে কি মানুষের জন্য কোনও নিরাপদ গ্রহ আছে?

—থাকতে পারে। খোঁজ নিতে দোষ কী ছিল?

কপিল হাসল। বলল—মানুষের আয়ু কত জানো? আলোর গতিতে ছুটেও ছায়াপথের

কাছাকাছি কোনও সৌরলোক পৌঁছতে হাজার-হাজার বছর কেটে যায়। কিছু দূরত্ব আছে যা অনতিক্রমণীয়। কিছুতেই তা পার হওয়া যায় না। মানুষ অনেক চেষ্টা করেছে। পণ্ডশ্রম।

ছেলেটি এ কথা বিশ্বাস করল না। কিন্তু কিছু বললও না।

শুভ্রা তার ছোট মেয়েটিকে বুকে তুলে নিল। মেয়েটি অচেনা মায়ের কোলে উঠে প্রথমটায় হতবাক, হয়, তারপর কেঁদে ওঠে। শুভ্রা তাকে ছেড়ে দেয় ফের। একটা শ্বাস ফেলে।

শ্বাসের শব্দে কপিল ফিরে তাকায়।

শুভ্রা সজল চোখে চেয়ে বলে—আমি আমার বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

—কোথায় নেবে?

—আমার কাছে।

—সেটা তো নিয়ম নয়।

—এখন নিয়ম ভেঙে ফেলাই প্রয়োজন।

কপিল উত্তর দেয় না। ভ্রূ কুঁচকে থাকে কিছুক্ষণ।

ফিলিপ এগিয়ে এসে বলে শুভ্রা, তুমি কোনওদিন শিশুদের যত্ন করার শিক্ষা পাওনি। গত সাত-আটশো বছর ধরে শিশুরা তাদের মা-বাবার কাছে থাকেনি। বাচ্চাদের যদি নিজের কাছে নাও তো দু-দিনেই ওরা অযত্নে মরে যাবে।

শুভ্রা শুধু বলল—তবু।

কপিল মাথা নেড়ে বলল—তা হয় না শুভ্রা। আমরা কোনওদিন শিশুকে বড় করিনি। আমাদের কাছে রাখলে যদি ওদের কোনও ক্ষতি হয়? এখন একটি মানুষের ক্ষতিও আমরা সহ্য করতে পারি না।

শুভ্রার সাদা মুখ আরও সাদা হয়ে গেল। সে বলল—শোনো, তোমরা শোনো। আমি টের পাচ্ছি আমার ভেতর একটা আদর জন্মাচ্ছে। বড় ভীষণ সেই আদরের খিদে। সবসময় আদর করার জন্য আমার জন্য আমার একটা বাচ্চা অন্তত ফিরিয়ে দাও। আমি তাকে শুধু সারাদিন চুমু খাব বুকে ধরে রাখব। কাঁদাব হাসাব।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে ফিলিপ চেয়ে থাকে শুভ্রার দিকে।

তারপর কপিলের কানে কানে বলে—কপিল, পৃথিবীতে আর একটা পাগল বাড়ল।

কপিল উত্তর দেয় না।

শহর পতনের অবিরল শব্দ ভেসে আসে। ঘুরে ঘুরে যান্ত্রিক দাঁত গুঁড়িয়ে ফেলছে শহর। তার সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশব্দ চরণ ফেলে এগিয়ে আসছে বনভূমি।

কপিল অস্থির পায়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়।

একটা ভাসমান ঘন বাতাসের স্তরে শুয়ে আছে শুভ্রা। ঠিক মনে হয়, যেন শূন্যে ভাসছে ভৌতিক প্রক্রিয়ায়। কিন্তু তা নয়। ঘনীভূত বাতাসের গদির ওপর নিশ্ছিদ্র আরামে শুয়ে আছে শুভ্রা। ফোম রবারের চেয়ে বহুগুণের নরম আর স্পর্শহীন এই বিছানা। যতবার পাশ ফেরো, যতক্ষণ খুশি শুয়ে থাকো শরীরে কোনও ঘর্ষণ-জনিত অস্বস্তি হবে না। তপ্ত হবে না বিছানা।

কপিল শুভ্রার দিকে চেয়ে বলল—তুমি রাজি নও?

—আমি আর পারি না। আমি তো যন্ত্র নই।

—যন্ত্র হও শুভ্রা। শেষ শক্তি দিয়ে আর একবার মা হও।

শুভ্রা অকপট হতাশার সঙ্গে বলে—যদি হই তুমি তখনও আবার এমনি অনুরোধ করবে, কাকুতিমিনতি করবে। দশম সন্তানের বেলাতে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আর আমাকে মা হতে

বলবে না।

কপিল মৃদুস্বরে বলে—তখনও পৃথিবীতে বিশ লক্ষ লোক ছিল। গত এক বছরে এগারো লক্ষ কমে গেছে শুভ্রা। পরিস্থিতির বদল হয়েছে।

শুভ্রা শ্বাস ফেলে বলে—তুমি বৃথা চেষ্টা করছ। যা হওয়ার তা হবেই।

—জানি। তবু আমাদেরও শেষবারের মতো চেষ্টা করতে হবে। আমাদের একমাত্র কাজ, মানুষের চাষ। এর চেয়ে জরুরি কাজ আর কিছু নেই।

—আমি পারব না। ক্ষমা করো।

শুভ্রা, সন্তানধারণ কি এখন আর আগের দিনের মতো কষ্টকর? এখন কি প্রসবযন্ত্রণা বলে কিছু আছে? আমাদের ওষুধপত্র আর চিকিৎসা কি সে সবের সমাধান করেনি?

—আমি প্রসবযন্ত্রণা কেমন তা জানি না। গর্ভধারণে কোনও শরীরের কষ্টও টের পাইনি কখনও। শুধু জানি, আমার শরীর থেকে কেবল একের পর এক শরীর জন্মায়। নিজেকে আমার অদ্ভুত লাগে। আমি যাদের জন্ম দিই তারা কেউ আমার থাকে না, তোমরা কেড়ে নাও। তাই বড় ক্লান্তি লাগে। অসম্ভব ক্লান্তি। তুমি বুঝবে না। আমার ভিতরে এক বিন্দু ইচ্ছেও অবশিষ্ট নেই।

কপিলের মুখ ভয়ংকর হতাশার ছাই মেখে নিল। ধীর পায়ে সে জানালার কাছে এল। দূরে যন্ত্রের শব্দ শুনল। একটা কেউ ডাকছে কোথায়! সামনের উঁচু স্কাইওয়ে দিয়ে অসম্ভব দ্রুত পায়ে দৌড়ে গেল কয়েকটা বুনো কুকুর। কপিল হঠাৎ স্কাইওয়েব ওপরে একটা মস্ত হাতিকে হেঁটে যেতে দেখল।

ভয়ে চোখ বুজল কপিল।

ঘবের ভিতরে টেলিভিশনের পরদায় সাদা আলো জ্বলে ওঠে। হাসপাতাল থেকে কপিলকে ডাকে সেই গর্ভবতী মেয়েটির স্বামী। বলে—কপিল, এসো শিগগির।

তিন রাত ধরে কপিলের ঘুম নেই। চোখ বুজলেই আতঙ্কজনক স্বপ্ন দেখে। অবশ্য স্বপ্নরোধী বড়ি খেয়ে সে ইচ্ছে করলে নিবিড় ঘুমে ঘুমোতে পারে। কিন্তু ওই কৃত্রিম ঘুম তার আর ভালো লাগে না।

শরীরে অপরিসীম ক্লান্তি। মনে হতাশা। চোখে জ্বালা। তবু কপিল ওঠে।

ছাদ থেকে মোটর-কপটার নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

ইচ্ছে করেই কপিল যন্ত্রটাকে ওড়ায় না। আকাশিপথ ধরে চলতে থাকে। উজ্জ্বল আলোয় রাস্তা ঝকমক করছে। জনমানবহীন মরুভূমির মতো ফাঁকা। সেই নির্জনে একপাল হায়না হঠাৎ হাঃ-হাঃ করে হেসে ওঠে।

কপিল অসম্ভব অবাক হয়। তার ধারণা ছিল, পৃথিবীতে হায়নার প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। কয়েকটা শুধু বেঁচে ছিল বিভিন্ন চিড়িয়াখানায়। তাহলে কোথা থেকে আবার জন্মাল এরা?

স্কাইওয়ের চওড়া রাস্তার এক জায়গায় কপিল একটা অশ্বত্থের চারা গাছ দেখতে পায়। গাড়ি থামিয়ে সে নামে। ক্লান্ত পায়ে রাস্তার ধারে রেলিঙের কাছে এগিয়ে যায়!

কংক্রিটে ছোট্ট একটু ফাটল। তাতে বুঝি কোনওদিন কোনও পাখি ঠোঁটে করে এনে ফেলে গিয়েছিল বীজ। সেই বীজ থেকে গাছ উঠে এসেছে। গাছের শিকড় চলে গেছে কংক্রিটের গভীরে। একদিন ফাটল বড় হবে। চিড় ধরবে আকাশিপথে।

গাছটাকে ছুঁলও না কপিল। লাভ কী? মেঘের মতো চার দিক থেকে ঘনিয়ে আসছে অরণ্য। সে ক'টা গাছ উপড়ে ফেলতে পারবে?

হাসপাতালে আসতে একটু দেরি হল কপিলের। আজ রিসেপশনে কেউ নেই। সম্পূর্ণ

শূন্য অভ্যন্তর পেরিয়ে সে রুগির ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে।

মেয়েটি আগের দিনের মতোই বসে আছে জলাশয়ের ধারে। অত্যন্ত শান্ত মুখ। চোখে দূরের দৃষ্টি। নিজের চারপাশকে মেয়েটি যেন লক্ষই করছে না।

স্বামী বেচারা অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে পায়চারি করছিল। কপিলকে দেখে ছুটে এল কাছে।

—কপিল ও চলে যেতে চাইছে?

অবাক কপিল বলে—কোথায় চলে যাবে?

স্বামীটি মাথা নেড়ে বলে—তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো কপিল।

কপিল এগিয়ে যায়। সন্তর্পণে সে মেয়েটির সামনে গিয়ে কুণ্ঠিত পায়ে দাঁড়ায়।

—মা।

মেয়েটি তার দূরের চোখ অতি কষ্টে যেন কাছে ফিরিয়ে আনে। কপিলের দিকে তাকায়। তার ঠোঁট কাঁপে। অস্ফুট স্বরে মেয়েটি বলে—আমি কারও মা নই। তুমি কে?

কপিল হাঁটু গেড়ে সামনে বসে। মুখ তুলে, যেন প্রার্থনা করছে, এমনভাবে বলে—মা, তুমি কোথায় যাবে?

মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আমি যাব।

—কোথায় যাবে মা?

—আমি যাব। আমাকে ডাকছে।

—কে ডাকে?

মেয়েটি তার শীর্ণ হাত তুলে দূরের দিকে দেখিয়ে বলে—ওই ডাকে। শুনতে পাচ্ছ না?

কপিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—ও ডাক শুনো না মা।

মেয়েটি অসহায়ভাবে বলে—কিন্তু সব সময়ে ডাকছে যে! কেবল ডাকে। ঝড়ের শব্দ পাঠায়। বাতাসে ভেসে আসে কেমন পাগল করা গন্ধ। ছায়া ডাকে। নির্জনতা ডাকে। মুক্তি দেবে বলে ডাকে।

—যেয়ো না মা। কপিল অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলে—মহা অবণ্য তোমাকে ডেকে নিয়ে মেরে ফেলবে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে—আমি যাব। আমি একদিন ওইখানে ছিলাম।

কপিলের সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে ভয়ে। গায়ে রোমরাজি দাঁড়িয়ে যায়, দু-হাতে মুখ ঢেকে সে প্রবল কান্নার স্বরে বলে ওঠে—যেয়ো না। যেয়ো না। যেয়ো না।

মেয়েটি হঠাৎ তার শীর্ণ একটি হাত বাড়িয়ে কপিলের মাথা স্পর্শ করে। শান্ত নিরুদ্বেগ আয়ত দুটি চোখ দিয়ে নিবিড়ভাবে দেখে কপিলকে। তারপর মৃদুস্বরে বলে আমরা ওইখানে ছিলাম। ওখানে ছায়া ছিল। নির্জনতা ছিল। মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি করে কী আশ্চর্য সুন্দর খেলার মতো ছিল জীবন। লক্ষ বছর আগে। চলো আবার ফিরে যাই।

মেয়েটির হাত মাথায় স্পর্শ করতেই বিদ্যুৎ চমকের মতো শিহরিত হয় কপিল। তার ভিতরে যেন অবিরল ভেঙে পড়ে যেতে থাকে এতকালের অভ্যস্ত জীবন সংস্কার। তার ঘ্রাণে এক নিবিড় আশ্চর্য বনের গন্ধ ভেসে আসে। তার শ্রবণে মর্মরধ্বনি তোলে গাছে বাতাসের মর্মরধ্বনি। সে দেখতে পায় হাজার হাজার বছরের পুরোনো বিশাল আকাশপ্রমাণ গাছের কালো ছায়ার নীচে মাটিতে পুরু শ্যাওলা পড়েছে। পিছল পথে ঝরনার জলের শব্দ লক্ষ করে সে চকিত চটুল পায়ে হেঁটে যাচ্ছে পথের গন্ধ শুঁকে শুঁকে। তার গা নিরাবরণ, হাতে পাথরের অস্ত্র।

এক ঝাঁকিতে উঠে দাঁড়ায় কপিল। রক্তের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা অরণ্যের স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে সে। আর্তস্বরে বলে ওঠে—না। এ কখনও হতে পারে না।

শীর্ণ মেয়েটি অরণ্যবালিকার মতো অনাবিল হেসে ওঠে। বলে—কোথায় পালাবে তুমি?

কপিল উগ্রকণ্ঠে বলে—পালাব না। জিতব।

মেয়েটির দুই চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। নিজের স্ফীত পেটে একটি সতর্ক হাত নরম করে রেখে বলে—আমার সন্তান আমি ওকে দেব।

—কাকে?

—ওই, যে আমাকে ডাকে।—ও একদিন তো নেবেই সব শিশুকে।

—কী করে নেবে?

—যখন শিশুদের সব বাপ-মাকে মেরে ফেলবে ও, তখন নেবে। দেখো। একে একে সব বয়স্ককে মেরে ফেলবে।

অস্থির কপিল সরে আসে মেয়েটির চোখের সামনে থেকে।

মেয়েটির স্বামী বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মুখ চিন্তাশূন্য, বিভ্রান্ত হতবাক।

কপিল তার কাঁধে হাত রাখল। নরম স্বরে বলল—ওকে ঠেকাতেই হবে।

স্বামী মাথা নেড়ে বলে—কী করে ঠেকাব কপিল? চারিদিকে কেবলই পায়ের শব্দ হয়। হাসপাতালের লবিতে একটু আগেই আমি একটা হনুমানকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। সে আমার দিকে হিংস্র চোখে চেয়েছিল কিছুক্ষণ। কুকুরের ডাক শুনি, কিন্তু আগের মতো ডাক নয়। এখন কুকুরেরা খুব অন্যরকম স্বরে ডাকে। শুনলে ভয় হয়।

—আমি জানি।

—টের পাচ্ছি আমাদের চারিদিকে এক শব্দহীন ষড়যন্ত্র। ও যদি যায় তবে কী করে ঠেকাব?

কপিলের মুখে একটা মরিয়া ভাব ফুটে ওঠে। সে গিয়ে ঝোপের আড়ালে বোতাম টিপে ধরে।

অমনি সেই সাদা পোশাকের নার্স মেয়েটি ছুটে আসে। কলের মানুষ নার্সটিকে অবিকল মানুষের মতো দেখায়।

রোবট নার্স বলে—য-যথা আ-আজ্ঞা।

কপিল এই বিশ্বস্ত কলের পুতুলের দিকে চেয়ে বলে—তোমাদের সবাইকে নিয়ে এসো। এ মেয়েটিকে পাহারা দাও। দেখো, এ যেন চলে যেতে না পারে। কেউ যেন আসতেও না পারে এর কাছে।

নার্স বলে—তা-তাই হ-হবে।

বলে চলে যায়। একটু বাদেই প্রায় পঞ্চাশটা কলের পুতুল চলে আসে। তারা সারি দিয়ে চারিদিকে দাঁড়ায়।

নার্স পুতুল কপিলকে বলে—আ-আমরা য-যথাসাধ্য ক-করব। আ-আর কি-কিছু আ-আদেশ আ-আছে?

কপিল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল—না!

গর্ভবতী মেয়েটি সম্পূর্ণ অন্যমনে বসে চেয়েছিল দূরের দিকে। তার ঘরের একটা দেওয়াল সরানো রয়েছে। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বহু দূরের বিস্তার। নীল আকাশ, আকাশকে ছুঁয়ে কালো মেঘের মতো ঘনায়মান গাছপালা।

ঘরের মধ্যে উড়ে এল একটা চন্দনা। চারদিকে অশ্রান্ত ডানায় পাখিটা ওড়ে আর এক অদ্ভুত স্বরে পাখিটা ডাক দেয়।

কপিল অবাক হয়। ওই ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে পাখি আসবার কথা নয়। দেওয়ালে সরানো ওই জায়গায় প্রবল বাতাসের একটি পাতলা পরদা রয়েছে। সেই পরদা ভেদ করে কীটপতঙ্গ

কেউই আসতে পারে না। তবু কী করে যেন পাখিটা এসেছে!

গর্ভবতী মেয়েটি হঠাৎ চমকে ওঠে। তারপর চারদিকে চায়। সে দেখতে পায়, তাকে ঘিরে পুতুল মানুষেরা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক পলক বিস্ময়ভরে শীর্ণকায় মেয়েটি দৃশ্যটা দেখে। তারপর হঠাৎ শরীরের সব দুর্বলতা নির্মোকের মতো ফেলে সে উঠে দাঁড়ায়। প্রথমে অস্ফুট একটা শব্দ করে। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে ছুটে যায় একবার এদিকে আর একবার ওদিকে।

সে চেঁচিয়ে বলে—হো আ! হো আ! হো আ!

কপিল কাঠ হয়ে যায়। মেয়েটি এ কোন ভাষার চিৎকার করছে? এ তো সভ্য মানুষের ভাষা নয়! এর তো কোনও অর্থ নেই! এ কার ভাষা কবে শিখল ও?

মেয়েটি বলতে থাকে—আ! হো আ-আ। আ!

পুতুলেরা দাঁড়িয়ে থাকে দৃঢ়ভাবে। হাত বাড়িয়ে শৃঙ্খলা রচনা করে। একজন পুতুল গিয়ে মেয়েটিকে জোর করে বসিয়ে দেয় চেয়ারে।

মেয়েটি তার সেই আদিম ভাষাহীন চিৎকার পাঠাতে থাকে চারিদিকে। পাখিটা ঘুরে-ঘুরে তার উঁচু মিঠে স্বরে অবিরল ডাকতে থাকে। বাইরে থেকে এক গভীর বাতাসে ভেসে আসে অরণ্যের গম্ভীর মর্মরধ্বনি।

ভূগর্ভস্থ স্টেশনে দাঁড়িয়ে টেলিভিশনের পরদার দিকে চেয়েছিল কপিল। নিজের চোখ-কানকে তার বিশ্বাস হচ্ছে না আজ।

পরদায় একটি ছেলের মুখ ভেসে উঠেছে। ছেলেটি কাঁপা স্বরে বলে—ফ্লাশ!

কিছুক্ষণ চুপ। পরদা সাদা হয়ে যায়।

ছেলেটির মুখ আবার ভেসে ওঠে পরদায়। ছেলেটি বলে—ঝড়। এরকম ঝড় আর কখনও হয়নি ইউরোপে! রক্ষা করো।

পরদা সাদা হয়ে যায়।

তারপরই কোনও উপগ্রহ থেকে স্বয়ংচালিত যন্ত্র ঝড়ের দৃশ্যটা ধরে পরদায় ফেলতে থাকে।

চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না কপিল। সে দেখতে পায় একটা ধোঁয়াটে আবর্ত গোটা সমুদ্রকে যেন তুলে আনছে ভূখণ্ডে। পাহাড় প্রমাণ জলস্তম্ভ এগিয়ে-এগিয়ে আসছে। ধোঁয়াটে ঘূর্ণিঝড় শহর থেকে মুঠো মুঠো যানবাহন তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে দিগ্‌বিদিক। বাড়িগুলো দুলছে, হেলছে, মড়াৎ করে ভেঙে যাচ্ছে বড় গাছের মতো।

সে চোখ বুজে ফেলে। তার গা বেয়ে এক সর্পিল বিবমিষা উঠে আসতে থাকে।

হঠাৎ সে একটা শিসের শব্দ শুনতে পায়। সুরহীন অদ্ভুত শিস।

টিভির পরদা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে তাকায়। দেখে আজও উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে সেই লোকটা পায়চারি করছে। হাতে শিকল।

লোকটা তার দিকে চেয়ে বলে—ক'টা বাজে?

কপিল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। অনেক কষ্টে সে হাত তুলে ঘড়ির ছবিটা দেখিয়ে দেয়।

লোকটা মাথা নেড়ে বলে—আমি ঘড়ি দেখে কিছু বুঝতে পারছি না। অক্ষরগুলো বড় অচেনা।

অতি কষ্টে কপিল উচ্চারণ করে—পাঁচটা বাজতে দু-মিনিট।

—আমার গাড়ি কখন?

—আজ গাড়ি আসবে না।

—কেন? লোকটা অবাক হয়ে জিগ্যেস করে।

—ওটা উত্তর আমেরিকার ভেতর দিয়ে আসা লাইন। ভূমিকম্পে সেখানকার লাইন ধসে গেছে। গাড়ি বন্ধ।

লোকটার মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সে মাথা নেড়ে বলে—বাঃ-বাঃ চমৎকার খবর। আমি এই খবরটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

—কেন?

—আমি গত সাতদিন ধরে এইখানে পায়চারি করে যাচ্ছি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাড়ি আসছে, চলে যাচ্ছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমার কোথাও যাওয়ার কথা। কোথাও আমাকে যেতেই হবে। যতবার গাড়ি আসে ততবার মনে হয়। আজ বুঝতে পারলাম, আমার কোথাও যাওয়ার নেই। এখন আমি আমার কুকুরটাকে খুঁজতে যাব।

—তোমার কুকুর কোথায় গেছে?

লোকটা মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—কী জানি। সে আমার অত্যন্ত বাধ্য পোষা কুকুর ছিল। আমি যা বলতাম তা-ই করত। একদিন কুকুরটাকে নিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে সমুদ্রের ধারে যাব বলে আমি এইখানে গাড়ি ধরতে আসি। হঠাৎ শিকলে প্রচণ্ড টান। চমকে দেখি, আমার কুকুরটা শিকল ছিঁড়বার জন্য প্রচণ্ড লাফালাফি করছে। তাকে ধমক দিলাম। শুনল না। মারলাম। সে কামড়ে দিতে এল। তাই ভাবলাম, ছেড়ে দিই। আমার প্রিয় কুকুর ঠিক আমার কাছেই থাকবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড। বকলস থেকে শিকলের হুক খোলামাত্র সে একটা অদ্ভুত ভীষণ ডাক ছেড়ে ছুটে কোথায় চলে গেল। গেল তো গেলই। আর এল না। ওই সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠে গিয়েছিল। আমিও দৌড়ে বাইরে গিয়েছিলাম। অনেক খুঁজেও তাকে কোথাও পাইনি। সেই থেকে আমি এই প্ল্যাটফর্মে তার জন্য অপেক্ষা করছি। সে না এলে আমি কোথাও যেতে পারছি না। আমার বড় প্রিয় কুকুর। তাকে ফেলে যাই কী করে? গাড়ির পর গাড়ি চলে যাচ্ছে, আমি কোনও গাড়িতেই চড়তে পারছি না। যদি চলে যাই তবে সে হয়তো, এখানে আমাকে খুঁজতে এসে ফিরে যাবে। অনবরত শিস দিয়ে তাকে ডাকছি।

কপিল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—এখন কী হবে?

লোকটা খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলল—আমি আর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করব না। আমি এবার নিশ্চিন্তে আমার প্রিয় কুকুরটার খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। যদি তাকে খুঁজে পাই তবে এরপর থেকে সে যেখানে থাকতে চাইবে সেখানেই থাকব আমি। সে যা কবতে বলবে করব।

এই বলে লোকটা তার জামা খুলে ফেলল। পরিধান সবই ফেলে দিল বাহুল্য বোঝার মতো। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সে একবার কপিলের দিকে চেয়ে হাসল। কোনও কথা বলল না। তারপর শিস দিতে দিতে সে এসকালেটার বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

ফিরতে কপিলের কিছু রাত হল আজ। ঘরের জানলার কাছে আকাশি ভেলাটা দাঁড় করাতেই শুভ্রা উন্মাদিনীর মতো ছুটে আসে। চেঁচিয়ে বলতে থাকে—ওগো, শিশু আবাসের কেউ সাড়া দিচ্ছে না কেন? সাড়া দিচ্ছে না কেন ওরা? আমি সারাদিন ধরে কতবার ফিলিপকে ডেকেছি।

ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এসেছে কপিলের শরীর। তবু সে তার জ্বালাধারা চোখে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বলে—উঠে এসো শুভ্রা। চলো, দেখি।

কয়েক পলকে আকাশি ভেলাকে শিশু আবাসের বাগানে এনে ফেলে কপিল।

প্রথমে তারা বাগানটাকে চিনতেই পারে না। ঘন জঙ্গলে গোটা বাগান আর বাড়ি ছেয়ে

গেছে। কত অজানা লতা আর আগাছা আর গাছ লকলকিয়ে উঠেছে। বনজ গন্ধে ভারী বাতাস।

শুভ্রা ভেলা থেকে নেমে ছুটে যায় ভিতরে। আর্তস্বরে চেঁচায়—ফিলিপ! ফিলিপ! আমার বাচ্চারা কোথায়?

কেউ উত্তর দেয় না।

কপিল মৃদু পায়ে এসে শিশু-আবাসের দরজা দিয়ে ঢোকে। দরজা আচ্ছন্ন করে লতানে গাছে উঠেছে। তাতে ফুল ফুটেছে অনেক। ঘরের মেঝে ছেয়ে গেছে লতায় পাতায়। দেওয়ালে সবুজ শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। মেঝে থেকে একটা কালো সাপ হঠাৎ ফণা তোলে। তার শ্বাসের শব্দে বাতাস শিউরে ওঠে।

শুভ্রা সাপটার ছোবলের নাগালে দাঁড়িয়ে চারদিকে বিহ্বলভাবে তাকাচ্ছে। লক্ষও করছে না সাপটাকে।

কপিল তার কোমর থেকে রশ্মি-যন্ত্রটা খুলে নেয়। সাপটাকে লক্ষ করে বোতাম টিপে ধরে। অদৃশ্য রশ্মিতে সাপটা পলকে ছাই হয়ে যায়। আশেপাশে কুঁকড়ে যায় কয়েকটা গাছের পাতা।

শুভ্রা তার অদ্ভুত মুখখানা ফিরিয়ে বলে—কোথায় ওরা?

কপিল মাথা নেড়ে বলে—জানি না।

—কোথায়? বলো! শুভ্রা চিৎকার করে ওঠে।

কপিল ফিসফিস করে বলে—ওদের ভালো হোক।

শুভ্রা কপিলের সামনে এসে হঠাৎ দুহাতে আঁকড়ে ধরে তাকে। মুখমণ্ডল ভেসে যায় চোখের জলে তার। সে অগাধ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে—ওগো ফিরিয়ে দাও। আমি যে কখনও তাদের ভালো করে আদরও করিনি।

কপিল বনজ গন্ধটা পায়। বড় অস্বস্তিকর। এত তীব্র গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না। সে শুভ্রার কোমরে জড়িয়ে ধরে টেনে আনে বাইরে। গাছপালা থেকে কতকগুলো হনুমান ব্যাঙের শব্দ করে ওঠে।

কপিল দৌড়ে আসে আকাশি ভেলার কাছে। দেখতে পায় একটু সময়ের মধ্যেই কখন দুটো দড়ির মতো লতা ভেলার গা আঁকড়ে ধরেছে। কপিল তার রশ্মিযন্ত্র দিয়ে লতা দুটোকে পুড়িয়ে উঠে পড়ে ভেলায়। শুভ্রাকে টেনে তুলে নেয়। তারপর উড়ে যায় শহরের দিকে।

শুভ্রা দুহাতে প্রাণপণে কিল দেয় কপিলের পিঠে। চিৎকার করে বলতে থাকে—আমাকে ছেড়ে দাও! আমি আমার বাচ্চাদের কাছে যাব! ছেড়ে দাও।

রাত্রে শুভ্রাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখল কপিল। আজ রাতেও তার নিজের ঘুম এল না। জানালার ধারে সে বসে দেখল আকাশি পথের এত উঁচুতেও বন্য জন্তুরা চলাফেরা করছে। তাদের জ্বলজ্বলে চোখ বারবার ঝিকিয়ে ওঠে কপিলের দিকে। ঘরে বাতাসের বিছানায় শুভ্রার শরীর ভেসে আছে। অঘোর ঘুম। ওরকম ঘুমোতে ইচ্ছে করে কপিলেরও। কিন্তু বড় ভয়, ঘুমোলেই কখন বাহির এসে দখল করে নেয় ভেতরকে। কখন ঘন হয়ে যায় মহারণ্য।

সকালে শহর পতনের শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ঢুলতে-ঢুলতে চমকে ওঠে কপিল। সারাক্ষণ তার আধোচেতনায় শব্দটা তরঙ্গ তুলেছে।

একটা কাচতন্তুর পোশাক পরে কপিল বেরিয়ে পড়ে ছোট্ট এক মোটর-কপটারে। উড়ে আসে পশ্চিমে। দূর থেকেই পায় অতিকায় বুলডোজারটা থেমে আছে। গোঙাচ্ছে তার পারমাণবিক ইঞ্জিন, কিন্তু ওই মহা শক্তিধর যন্ত্রটা এগোচ্ছে না।

কপিল দেখে, যতখানি জায়গার বাড়িঘর ভেঙে জমি চৌরস করেছে যন্ত্র, ততখানি জায়গা জুড়ে কয়েক দিনেই গজিয়ে উঠেছে দেড় মানুষ উঁচু সব গাছপালা। সৈনিকের মতো সারিবদ্ধভাবে

এগিয়ে আসছে আদিম অরণ্য।

কপিল নেমে এগিয়ে যায় যন্ত্রটার কাছে। মহাযন্ত্রের সামনে তাকে পিঁপড়ের মতো ছোট লাগে। সে ঘুরে ঘুরে দেখে ধাতব যে পাতের খাঁজে যন্ত্রের দাঁতাল চাকা ঘোরে তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে লতানে গাছ ঢুকে গেছে। নিষ্পেষিত হয়েছে, ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তবু লতাগুলো অবিরল প্রবেশ করেছে চাকার খাঁজে। পরতে-পরতে জমে গেছে ভেতরে। উঁচু-উঁচু গাছ থেকে মোটা লতার আঁকশি এসে ধরেছে যন্ত্রের উপরকার রাডার যন্ত্রকে। ছেয়ে ফেলেছে যন্ত্রের উপরিভাগ। ভিতরে ইঞ্জিন গজরাচ্ছে, কাঁপছে যন্ত্রের শরীর, কিন্তু এগোতে পারছে না। তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে অরণ্যের মহাগর্ভ।

কোমর থেকে রশ্মি যন্ত্রটা খুলে হাতে নিল কপিল। বোতাম টিপতে যাবে, হঠাৎ সে সময়ে একটা পাথর উড়ে এল তার দিকে।

চমকে মাথা সরিয়ে নিল কপিল। পরমুহূর্তেই আর একটা পাথর এসে যন্ত্রের গায়ে খটাং করে লাগল।

কপিল বিস্ময়ভরে মুখ ফিরিয়ে দেখে, দেড় মানুষ সমান উঁচু আগাছার জঙ্গল ভেদ করে একটা নগ্ন মানুষের মূর্তি বেরিয়ে এসেছে। তার দুহাতে ধরা হিংস্র পাথর।

কপিল চেঁচিয়ে ওঠে—জান।

নগ্ন জান, কোনও জবাব দেয় না। শুধু সরোষে আর একটা পাথর ছুঁড়ে মারে কপিলকে।

কপিল বসে পড়ে। পাথরটা মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

কপিল তীব্র স্বরে বলে—জান। আমার হাতে রশ্মি যন্ত্র রয়েছে। তুমি কী করছ জান? বাধা দিও না, মরবে।

জান অকপট হিংস্রতায় চেঁচিয়ে উঠল—আ! হো-আ-আ-হো-আ।

অমনি সেই ডাকের প্রতিধ্বনি ওঠে অরণ্যের ভেতর থেকে। জঙ্গল ভেদ করে অনেক পাথর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে কপিলের দিকে। কপিল দেখতে পায় জঙ্গল ভেদ করে আরও কয়েকজন নগ্ন মানুষ বেরিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে তাব নিজের ছেলে এগারো বছর বয়সের কৌশিক।

একটা পাথর ছুটে এসে কপিলের মাথায় লাগে।

কপিল পড়ে যায়। মাথাটা চেপে ধরে সে ফের ওঠে। তারপর দৌড়ে গিয়ে তার মোটর-কপ্টারে উঠে পড়ে। কিন্তু অবিরল বৃষ্টি ধারার মতো পাথর এসে পড়তে থাকে যানটির গায়ে। ক্রুদ্ধ কপিল তার রশ্মি-যন্ত্রটা তোলে। বোতামে আঙুল।

কিন্তু বুকের মধ্যে এক মায়া তার আঙুলকে শিথিল করে দেয়। কী করে সে তার বন্ধু জানকে মারবে? কিংবা ছেলে কৌশিককে?

মোটর-কপ্টারটাকে তীব্র গতিতে ওপরে তুলে নেয় কপিল। তারপর ভাসতে-ভাসতে ফিরে যায় শহরের দিকে।

একদিন মাঝরাতে কপিলের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে নিঃশব্দে খুলে যায়। একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায় দরজায়। তার চুল দীর্ঘ, সম্পূর্ণ নগ্ন সে! হাতে ধারালো পাথর।

বাতাসের বিছানায় উঠে বসে শুভ্রা। চেয়ে থাকে বিস্ফারিত চোখে।

ছায়ামূর্তি চাপা স্বরে বলে—আ! হো-আ!

তীব্র হর্ষধ্বনি করে শুভ্রা চেঁচিয়ে ওঠে, কৌশিক! আমার ছেলে!

ছায়ামূর্তি বলে—আ! হো-আ!

শুভ্রা সম্মোহিতের মতো বাতাসের বিছানা ছেড়ে নেমে আসে। সম্মোহিতের মতো, ঘুমঘোরে এগিয়ে যেতে থাকে দরজার দিকে। সামনে প্রসারিত দুই হাত। ফিসফিস করে বলে— ছেলে। আমার ছেলে।

কৌশিক বলে—আ! হো-আ!

শুভ্রা মাথা নাড়ে। সে বুঝেছে। এক-পা এক-পা করে সে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। তারপর একবার মুখ ফিরিয়ে চায়। কপিল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। নিষ্ঠুরতায় কঠিন তার মুখ। হাতে রশ্মিযন্ত্র।

শুভ্রা একটু বুঝি হাসে। তারপর আস্তে বলে ওঠ—আ! হো-আ।

অমনি বাইরে থেকে কয়েকটি কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে ওঠে—আ! হো-আ!

কপিল যন্ত্র নামিয়ে রাখে। শুভ্রা দরজা পার হয়ে চলে যায়। বাইরে হর্ষধ্বনি শোনা যায়।

কপিল আলো জ্বালাবার সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। টেলিভিশনের বোতামে চাপ দিল। পরদা অন্ধকার রইল। টেলিফোনে ডাক পাঠাল এদিক-ওদিক। টেলিফোন নিস্তব্ধ রইল।

ভোর পর্যন্ত জানালার ধারে বসে ঘুমহীন কপিল। শহরের আলো নিভে গেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র আর কাজ করছে না। টেলিভিশন বোবা। বেতারযন্ত্র অচল।

ভোরের প্রথম আলো এসে শহরে পড়লে কপিল দেখে, কী সুন্দর সবুজের ঢেউয়ে সবুজের বন্যায় ডুবে যাচ্ছে সব কিছু। বাড়ির মাথায় মাথায় জাতীয় পতাকার মতো উড়ছে সবুজের নিশান। আকাশে অজস্র পাখি। মাটির বুকে বন্যজন্তুর পায়ের শব্দ, জয়ের চিৎকার, আর ভালোবাসার ডাক। অরণ্যের গন্ধ আসছে। মর্মরধ্বনি আসছে।

পৃথিবীর সব যান্ত্রিক শব্দ কয়েক হাজার বছরের জন্য থেমে গেছে।

# ইশারা

এ সপ্তাহে আরও দু-হাজার লোক পাগল হয়ে যাবেন, বিভিন্ন কল কারখানা, অস্ত্রাগার, বিমান, সড়ক ও রেলপথে অন্তর্ঘাতের দেড়শো ঘটনা ঘটবে। জ্ঞানী, গুণী, চরিত্রবান মানুষেরা প্রকাশ্যে অপমানিত হবেন, মানুষে মানুষে ঝগড়া, বিবাদ, খুনোখুনি দাঙ্গা ক্রমশ বাড়বে। অকারণ হত্যাকাণ্ড ঘটবে বহুল পরিমাণে। কেউই কোথাও নিরাপদ নয়। বড়-বড় শহর শূন্য হতে থাকবে আরও। টিপসি সুলতান আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছে এ সপ্তাহে এবং আগামী সপ্তাহগুলিতে খুবই সতর্ক থাকুন। মনে রাখবেন, আপনার প্রাণ সম্পত্তি ও সম্মান আপনাকেই বাঁচাতে হবে। আপনার আর কেউ নেই, আপনি একা।

লম্বাটে, রোগাটে এবং ফরসা ধরনের লোকটার নাম গুণ, অফিস থেকে ফেরার পথে গুণ রোজকার মতো অফিসবাড়ির ত্রিশতলার ছাদে উঠে নিজের বাতাসগাড়িতে চড়ে বসেছিল। কাচের বুদ্বুদের একটি ঢাকনার মধ্যে চমৎকার গদির আসন, দুজনে বসতে পারে তাতে। আসনেব নীচে সিলিন্ডার এবং অন্যান্য যন্ত্র লাগানো। কয়েকটা বোতাম টিপে আর একটি হাতল ধরে চালাতে হয়। সিলিন্ডার থেকে নিম্নমুখী প্রবল জ্বলন্ত গ্যাস নিষ্কাশিত হয়। তারই উলটো চাপে বাতাসগাড়ি শূন্যে ভেসে যায়। খুব জোরে নয়, ঘণ্টায় বড় জোর দুশো কিলোমিটার। বেশি দূর যাওয়াও যায় না। সিলিন্ডারে যে পরিমাণ গ্যাস ভরা যায় তাতে যন্ত্রটা মোটামুটি তিন ঘণ্টা নিরাপদে উড়তে পারে। গ্যাস ফুরোলেই একটা প্যারাসুট আপনা থেকে খুলে যায়। বাতাসগাড়ি ভাসতে-ভাসতে নীচে নামে। মাটির খুব কাছাকাছি এলে প্যারাসুট কাজ করে না, তখন বোতাম টিপলে ভিন্ন সিলিন্ডারের মধ্যে দুটো মিশ্রণের মিলন ঘটে হিলিয়াম গ্যাস তৈরি হয়ে যায়। সেই গ্যাস বাতাসগাড়িকে মাধ্যাকর্ষণের টান থেকে বাঁচিয়ে ধীরে প্রায় হাত ধরে নামিয়ে দেয়।

গুণ বাতাসগাড়িতে উঠে যন্ত্র চালাতে গিয়ে বুঝতে পারল সিলিন্ডারে এক ফোঁটা গ্যাস নেই। নেমে দেখল, সিলিন্ডারের বর্মের মতো ইস্পাতের গায়ে একটা নিখুঁত ছাঁদা। এই ইস্পাত ফুটো করা সহজ নয়। কিন্তু আজকাল এত সব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে আর তা এতই সহজলভ্য যে, যে-কেউ তা যখনতখন ব্যবহার করতে পারে!

তার বাতাসগাড়িটিকে বিকল করে কার কী লাভ তা গুণ জানে না। ইদানীং প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা নানাজনের ঘটেছে। তার ঘটল এই প্রথম।

আকাশে অবশ্য অজস্র উড়ছে বাতাসগাড়ি! তাদের মধ্যে ভাড়ার গাড়িও আছে। ভাড়াটে গাড়িগুলোর তলদেশ গাঢ় লাল, সেরকম কয়েকটা গাড়ি দেখতে পেয়ে গুণ তার কবজির ঘড়ির বোতাম টিপে ধরে ঘড়িটা আকাশের দিকে তুলে নাড়তে লাগল। সাদা চোখে কিছু দেখা যায় না বটে কিন্তু ঘড়ি থেকে একটা বিদ্যুৎ চৌম্বক ঢেউ গিয়ে লাল বাতাসগাড়ির একটা অ্যান্টেনাতে জানান দেয় যে, কেউ গাড়ি চাইছে।

কোনও কাজ হল না। সবকটা ভাড়াটে বাতাসগাড়ির নীচেই হলুদ আলো জ্বলছে, তার মানে সওয়ারি আছে। এই অফিস ছুটির সময় খালি গাড়ি পাওয়ার ভরসাও গুণেব ছিল না।

গুণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাতাসগাড়ির কঠিন ইস্পাতের সিলিন্ডারে রহস্যময় ছিদ্রের কথা ভাবতে-ভাবতে আকাশে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। আকাশ ভরে গেছে বাতাসগাড়িতে। অজস্র অফিসের ছাদ থেকে হাজার হাজার বাতাসগাড়ি ধীর গতিতে আকাশে উঠে বোঁ-বোঁ করে ছুটে যাচ্ছে চতুর্দিকে। তাদের লেজের জ্বলন্ত আগুন অবিকল হাউইয়ের মতো দেখাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রবল শিসের মতো শব্দ। হাজার হাজার বাতাসগাড়ির শিস কান ঝালাপালা করে দেয়।

গুণ কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের অফিসের কাছে প্রায় শ' তিনেক বাতাসগাড়ি রোজ জড়ো হয়ে। সেগুলোর মধ্যে এখন গুটিচারেক মাত্র পড়ে আছে, গুণেরটা নিয়ে। বাকি তিনটি গুণের ওপরওয়ালাদের। ওপরওয়ালাদের গাড়িতে লিফট পাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না গুণ। তবে সে একটু দাঁড়িয়ে গাড়িগুলো দেখল। ওপরওয়ালাদের বাতাসগাড়িগুলো অনেক বেশি দামি! সেগুলোতে চার-পাঁচজনের বসবার আসন রয়েছে, অনেক দূর যাওয়ার মতো গ্যাস তাতে ভরা যায়। এরকম একটা বড় বাতাসগাড়ি কেনার ইচ্ছে তার বহুদিনের। কিন্তু হয়ে উঠছে না।

ভাবতে-ভাবতে গুণ লিফটে একতলায় নেমে রাস্তায় পা দেয়। রাস্তায় সারি সারি মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। রোলস রয়েস, ক্যাডিলাক, মারসিডিজ। পুরোনো আমলের যানবাহন। এখন কেউই পারতপক্ষে মোটরগাড়িতে চড়ে না। সারি সারি গাড়ি সওয়ারির জন্য রাস্তায় হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুণ রাস্তায় পা দিতে না দিতেই গাড়ির ড্রাইভাররা ডাকাডাকি শুরু করে, আসুন মহারাজ, আসুন। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেব। অ্যাক্সিডেন্টের কোনও ভয় নেই।

গুণ হাসল। সে থাকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে। মোটরে গেলে কম করেও মিনিটচল্লিশেক লাগবে। কিন্তু সময় বড় মূল্যবান। অবশ্য এ কথা ঠিক মোটরগাড়িতে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় কম। সড়কপথে আজকাল ভারী মালের গাড়ি আর কদাচিত কয়েকটি মোটর চলে। তাই শহরের বিশাল চওড়া রাস্তাগুলি প্রায় ফাঁকা পড়ে থাকে, অব্যবহারে রাস্তাগুলিতে শ্যাওলা পড়ছে। তাই ফাঁকা রাস্তায় দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। অন্যদিকে আকাশে কিন্তু দুর্ঘটনা বাড়ছে। বাতাসগাড়িগুলোর গতিপথের উচ্চতা নির্ধারিত না থাকায় প্রায়ই ধাক্কা লাগে। লোকে মরে। তবু গতি ও সময়ের দিক থেকে বাতাস-গাড়ির তুলনা হয় না।

গুণ একবার ওপরের দিকে তাকাল। শহরের সিকি মাইল পর্যন্ত অজস্র বাড়ির ছাদ উঠে গেছে, বহু উঁচু দিয়ে গেছে ফ্লাইওভার। তা ছাড়া টাওয়ার, হেলিপ্যাড আর শূন্যে স্থাপিত বিশেষ ধরনের বিমানবন্দর। আছে রকেট স্টেশন। সুতরাং এই একুশশো বিশ সালে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়ালে আকাশ দেখা খুবই দুঃসাধ্য। গুণ ফাঁকা রাস্তা পার হয়ে চলন্ত ফুটপাতে দাঁড়াল। কিছুদূর গিয়ে ভূগর্ভের ট্রেন ধরতে এসকালেটর পাতালে নামবার আগে সে একটা স্টলের শ্লট মেসিনে পয়সা ফেলে বিকালের খবরের কাগজ কিনে নিল।

নামে কাগজ। আসলে সংবাদপত্র আজকাল ছাপা হয় পাতলা পলিথিনের ওপর। অসম্ভব সুন্দর ছাপা। হাজার রঙে রঙিন সব ছবি কমিকস, বিজ্ঞাপন। পড়া হয়ে গেলে সংবাদপত্রটি ফেলে দেওয়ার নিয়ম নেই। বিভিন্ন জায়গায় পুরোনো সংবাদপত্র রাখার জন্য ট্রে থাকে। সেখানে জমা হওয়া সংবাদপত্র আবার ফেরত যায়। পলিথিনের ওপর থেকে সব ছাপা ছবি ও অক্ষর মুছে আবার পরের দিনের সংবাদপত্র ছাপা হয়।

এসকালেটরে অজস্র মানুষের ভিড়। গায়ে গায়ে লোক দাঁড়ানো। তার মধ্যে দাঁড়িয়েই গুণ কাগজ পড়তে থাকে। এত সুন্দর ছাপা সংবাদপত্রে কিন্তু আনন্দের খবর অল্পই আছে। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে মনোরোগ। শুধু যে পাগলামির বাড়বাড়ন্ত তা নয়, মনোরোগের হাজার রকম প্রকারভেদ দেখা যাচ্ছে। কখনও তীব্র নিঃসঙ্গতাবোধ, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতা, কুঁড়েমি, যৌন অত্যাচার, সন্দেহবাতিক ইত্যাদি থেকে মনোরোগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত শতাব্দী থেকে যথেচ্ছ বিবাহ ও রক্তের মিশ্রণের ফলে জিনমালা বিশৃঙ্খল হয়েছে। ওই দোষ দূর করা শতাব্দীর কাজ।

আজ খবরের কাগজে দিয়েছে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার আশি শতাংশই মনোরোগী। এদের মধ্যে আবার পঁচিশ শতাংশ সুস্পষ্টভাবেই উন্মাদ লক্ষণাক্রান্ত। উন্মাদের মধ্যে আবার নব্বই

শতাংশই হিংস্র ও বদমেজাজি। মনোরোগীদের এক বড় অংশের মধ্যে চাপা জিঘাংসা রয়েছে। এরা খুব সামান্য কারণে বা বিনা কারণেও যে-কোনও পুরুষ নারী বা শিশুকে হত্যা করতে পারে।

রোজই সংবাদপত্রে নতুন নতুন মনোরোগীদের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়। আজ জনা পনেরো বিশিষ্ট ও অ-বিশিষ্ট লোকের তালিকা দেওয়া হয়েছে, যারা গত চব্বিশ ঘণ্টায় স্বাভাবিক মানসিকতা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন।

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নীচে ডানদিকের কোণে সপ্তাহে একবার টিপসি সুলতানের ভবিষ্যদ্বাণী বেরোয়। আশ্চর্য এই, ঘোরতর টেকনোলজির যুগেও এই ছদ্মনামের আড়াল থেকে একটি লোক নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করে যায়। টিপসি সুলতানের কোনও টিপস ব্যর্থ হয় না। কোথায় ঝড় বা ভূমিকম্প হবে কি না, মহাজাগতিক রশ্মি কোথায় কখন কতটা ক্ষতি করবে, কোন মানুষের শরীরের দুর্জ্ঞেয় অভ্যন্তরে কোনও জটিল রোগ দেখা দিয়েছে তা বৈজ্ঞানিকরা হুবহু বলতে পারেন। কিন্তু টিপসি সুলতান আরও এক ধাপ এগিয়ে তার টিপস দেয়। বৈজ্ঞানিকদের চেয়েও তা অনেক বেশি অব্যর্থ। কয়েক সপ্তাহ আগে টিপসি বলেছিল, এক বিশেষ তারিখে চাঁদের উপনিবেশ প্রচণ্ড উল্কাপাতের ফলে প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। তাই হয়েছিল। ওই বিশেষ দিনে চাঁদের বৈজ্ঞানিক উপনিবেশে উল্কাপাতের ফলে ফটো প্রসেসিং ল্যাবরেটরির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়, কয়েকজন মারা যায়, জনা কুড়ি কর্মী গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাগলামির লক্ষণ ডাক্তাররা খুঁজে পাওয়ার অনেক আগেই টিপসি তা জনসাধারণকে জানিয়ে দিয়েছিল।

আজকের কাগজে টিপসি যে টিপস দিয়েছে তাও বড় হতাশাব্যঞ্জক।

গুণ ভূগর্ভ রেলের দুটি স্তর পেরিয়ে একেবারে নীচের তলায় নেমে এসে এসকালেটর ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। ওপরতলার দুটি স্তরে দূরপাল্লার পাতালে রেল চলে। অল্প পাল্লার ট্রেন চলে সবচেয়ে গভীর পথে। ভিড় এইসব ট্রেনেই বেশি। এসকালেটর উগরে দিচ্ছে হাজার হাজার মানুষ।

প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন ডাকল—গুণ! মহিলার গলা।

গুণ খুব আস্তে ঘাড় ঘোরালো। দেখল কাচতন্তুর কৃত্রিম পশমের শাড়ি পরা প্রকৃতি দাঁড়িয়ে। প্রকৃতি দেখতে খুব সুন্দর নয়। কিন্তু আজকাল নিজের চেহারাকে নতুন ছাঁচে ঢালার এমন ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে যে হরদম লোকের চেহারা বদলে যাচ্ছে। খুব চেনা লোককেও চেনার উপায় থাকে না। প্রকৃতি তার মুখখানাকে আগের চেয়ে অনেক সুন্দর করেছে। ছোট চোখ চিবে বড় করিয়েছে, মোটা ঠোঁট পাতলা করেছে। তবে একেবারে আমূল পালটে ফেলেনি। এখনও চেনা যায়।

গুণ এক-পা এগিয়ে বলল, কোথায়?

প্রকৃতি—টোকিও। কাল ফিরব।

গুণ বলে এরোড্রামে যেতে বাতাসগাড়িই তো ভালো ছিল।

প্রকৃতি একটু মজার হাসি হেসে বলল, তোমারটা কই?

সিলিন্ডার ফুটো।

আমারও।

সে কী! গুণ চমকে জিগ্যেস করে।

প্রকৃতি তেমনি হেসেই বলে, উঠতে গিয়ে দেখি, গ্যাস নেই, সিলিন্ডার ছ্যাঁদা। স্কুলের কোনও দুষ্টু বাচ্চার কাজ।

গুণ চিন্তিতভাবে বলে, দুষ্টু বাচ্চা? কই, আমার অফিসে তো দুষ্টু বাচ্চা নেই। তবে

আমারটায় কী করে হল?

প্রকৃতি ঠোঁট উলটে বলে, কে জানে! ঝিমি কেমন?

ভালো। তবে অনেক প্রেমিক তার, আমি বেশি পাই না।

আমার অত প্রেমিক ছিল না।

তা বটে। বলে গুণ প্রকৃতির দিকে নিস্পৃহভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। প্রকৃতি ছিল তার তৃতীয় বিয়ের বউ। বছরচারেক আগে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন গুণের দশম বিয়ের বউ ঝিমির সঙ্গেও তেমনি বনিবনা হচ্ছে না, বিচ্ছেদ আসন্ন। স্ত্রীদের প্রেমিক থাকবে, স্বামীদের প্রেমিকা—স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ঝিমির প্রেমিকের সংখ্যা এত বেশি যে তাকে গুণ সাতদিনেও একদিনের জন্য পায় কি না সন্দেহ। ঝিমি এর আগে আরও সাতবার বিয়ে করেছে—সব স্বামীরই একই অভিযোগ। গুণ প্রকৃতিতে বলল, তোমার চতুর্থ বিয়ে হবে বলে শুনেছিলাম। কী হল?

করছি না। ও পার্ট এবার তুলে দেব। বিয়ে নয়।

বিয়েটা অবশ্য বাহুল্য মাত্র। আজকাল বিয়ে হয় হাতে গোনা সংখ্যায়। বিয়ে ছাড়াই মেয়ে পুরুষে একসঙ্গে থাকাটা প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল। গুণ বলল, আমিও তাই ভাবছি।

ঝিমিকে ছেড়ে দেবে?

নিশ্চয়ই।

তুমি?

আমি জেফরের কাছে থাকছি।

জেফরে? যে বিশাল চেহারার কানাডিয়ান ছেলেটা স্থির বিমান কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার?

প্রকৃতি ঠোঁট উলটে বলে, চেহারাই বিশাল। আসলে কোনও উত্তেজনাই নেই। ভেড়া।

গুণ চুপ করে থাকে। মেয়েরা ছেলেদের কাছে প্রচুর শারীরিক উত্তেজনা আশা করে। কিন্তু সেটা কী আর সম্ভব। সর্বশেষ আদমসুমারিতে দেখা গেছে, পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা আড়াইগুণ বেশি। অসম হারের দরুণ একজন পুরুষকে গড়ে আড়াইটি মেয়েকে খুশি করার ভার নিতে হয়। এটা অঙ্কের হিসেব। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আরও জটিল। মানুষের মধ্যে আজকাল একটা বিশাল শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে যাদের, নিস্পৃহ নামে অভিহিত করা হয়। এরা হল অতিরিক্ত যৌনমিলনের শিকার। দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে এরা সম্পূর্ণ অক্ষম। নিবীর্য তো বটেই, উপরন্তু মেয়েছেলের নাম শুনলে পর্যন্ত ভয় পায়। এইসব পুরুষেরা অধিকাংশই সমাজ সংসার থেকে বহুদূর কোন নির্জন দ্বীপে বা জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করে। পরিসংখ্যানে এরা পুরুষ গণ্য হলেও কার্যত পুরুষ নয়। ফলে সক্ষম পুরুষের সংখ্যা বড়ই কম। সক্ষমদের প্রতিদিন এত বেশি সংখ্যক মহিলার সন্তুষ্টিবিধান করতে হয় যে তাদের আর কোনওরকম মহিলাপ্রীতি থাকে না। বেচারা জেফরেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

গুণ একটু হেসে বলল, টোকিওয় কোথায় যাচ্ছ? মা-বাবার কাছে?

মা মারা গেছেন পরশু।

ও।

সুইসাইড।

গুণ ভ্রূ তুলে বলে, হঠাৎ? কী হয়েছিল?

প্রকৃতি ভ্রূ কুঁচকে কী একটা ভাবছিল অন্যমনস্কভাবে বলল, পুরোনো আমলের লোক, ওদের মনে নানারকম সংস্কার। কিছু একটা মনের ব্যাপার হয়েছিল। বাবা টেলিফোনে বলল, তোমার মা সুইসাইড করেছে। ব্যস, ওইটুকু জানি।

তোমার যাওয়ার দরকার কী? ডেডবডি তো এতক্ষণে ফার্টিলাইজারের কারখানায় পাচার। বোধহয় তা দিয়ে মণ্ড তৈরি হয়ে গেছে।

প্রকৃতি হেসে বলল, ওসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয়, মা মারা যাওয়ায় বাবা খুব একা, ওরা একটা ছোট্ট দ্বীপে একদম একা একা থাকত। মা মারা যাওয়ায় বাবা আরও একা। বোধহয় সহ্য করতে পারছে না।

আবার বিয়ে দাও।

প্রকৃতি হেসে বলে, দেখি। কিন্তু বাবা তো খুব অথর্ব। হাঁটাচলাও করতে পারে না ভালো করে। যাচ্ছি, দেখি কী করা যায়।

প্রায় নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতি ট্রেনটি এল। এই ট্রেনের চাকা নেই, এয়ার কুশনের ওপর দিয়ে চলে।

প্রকৃতি আর গুণ প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে একটা কামরায় উঠে দাঁড়াল। আশেপাশে সব মানুষই অন্যমনস্ক, নিস্পৃহ। প্রায় কেউই কারও দিকে তাকায় না। গায়ে ধাক্কা লাগলে বা পায়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে কেউ কারও কাছে দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা করে না। গায়ে পড়ে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। মানুষকে আজকাল বোবায় ধরেছে।

গুণের হাতের কাগজটা দেখে প্রকৃতি হেসে জিগ্যেস করে, টিপসি কী বলছে?

খারাপ।

প্রকৃতি মাথা নেড়ে বলে, প্রায়ই তাই বলছে। এবার কতটা খারাপ?

খুব।

টিপসি সব সময় খারাপ দেখে, আমি দেখি না।

খারাপ নয়।

প্রকৃতি মাথা নেড়ে বলে, না। বেশ তো আছি।

পাগলামি বাড়ছে।

তাতে আমার কী?

মানুষের ভাবনাচিন্তা আজকাল সোজা পথে চলে। যতক্ষণ আমি ভালো আছি ততক্ষণ দুনিয়া রসাতলে গেলেই বা আমার কী?

কী কারণে কে জানে, গুণ এখনও ওরকম ভাবতে পারে না। সে এখনও আর পাঁচজনকে নিয়ে ভাবে। গুণ বলল, খুন হবে।

হোক। যা ভিড় চারদিকে। লোক কমলে বাঁচি।

যদি তুমিও খুন হও?

যতক্ষণ তা না হচ্ছি ততক্ষণ তো সব ঠিক আছে। প্রকৃতি খুব নিস্পৃহ গলায় কথাটা বলে।

গুণ চুপ করে থাকে।

গুণের পিছনেই একজন নগ্ন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর ভিড়ের চাপে গুণের শরীরের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। হয়তো এই গা ঘষাঘষির মধ্যে মেয়েটির নিজেরও কিছু অভিসন্ধি থাকতে পারে। গুণ একবার পিছন ফিরে মেয়েটিকে নিষ্কাম চোখে দেখল। ভারী সুন্দর চেহারার মেয়েটি মৃদু হাসে।

গুণ হাসিটা ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে একটু সরে দাঁড়ায়। বহুদিন হল তাব কামেচ্ছায় ভাঁটা পড়েছে। এ মেয়েটি তাকে শরীরের আমন্ত্রণ জানাতে চাইলেও সে তা রক্ষা করতে পারবে না।

প্রকৃতিও মেয়েটিকে দেখল। ভাবলেশহীন মুখে গুণের দিকে একবার চেয়ে বলল, আমি এবার নামছি।

গুণ মাথা নাড়ল। ট্রেন থামল এবং প্রকৃতি নেমে গেল অজস্র লোকের সঙ্গে।

বসার জায়গা পেয়ে গুণ বসল। সেই নগ্ন মেয়েটি তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, বসার জায়গা পায়নি। দাঁড়িয়ে হাসছে। গুণ শিউরে চোখ বন্ধ করে থাকে।

নগ্ন মেয়েটি তার অনিচ্ছা লক্ষ করেই বোধহয় ধীরে-ধীরে এক প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

গুণ সংবাদপত্রটি বের কর আবার পড়তে থাকে। টিপসি সুলতানের ভবিষ্যদ্বাণীই আবার পড়তে থাকে সে। ভ্রূ কুঁচকে যায়। চিন্তার রেখা পড়ে মুখে।

টিপসি কি ছদ্মনামের আড়ালে কোনও মানুষ? না কি অত্যাধুনিক কোনও কম্পিউটার? টিপসির এসব টিপস কি ইনটুইশন না ক্যালকুলেশন? এ নিয়ে আরও লক্ষ লোকের মতো গুণও ভাবে। আজ পর্যন্ত টিপসির প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র হদিসও কেউ পায়নি। কিন্তু টিপসির টিপসগুলো বড় চমকপ্রদ।

গুণ চোখ তুলে কামরার ছাদের কাছে কাচের প্যানেলের গায়ে তাকাল। একের পর এক স্টেশনের নাম ফুটে উঠেছে! ট্রেন স্টেশনে থেমেই আবার দৌড়চ্ছে।

গুণ উঠল, পরের স্টপই তার।

দরজার কাছ-বরাবর সে দেখতে পেল সেই নগ্ন মেয়েটি আর প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মেয়েটি রাগে ফুঁসছে। প্রৌঢ় কিন্তু শক্ত চেহারার। লোকটি কঠিন গলায় বলল, না।

মেয়েটি সপাটে একটা চড় কষাল লোকটার গালে। লোকটাও মেয়েটির ডান হাত মুচড়ে ধরল ভয়ংকরভাবে।

রাস্তায় ঘাটে এরকম হামেশাই ঘাটে। কেউ গা করে না, তাকিয়েও দেখে না।

গুণের একটু খারাপ লাগল। প্রৌঢ়ের মুখটা তার চেনা-চেনা। একটু এগিয়ে সে দুজনের মাঝখানে পড়ে। মেয়েটির দিকে চেয়ে বলে, পুতুল সঙ্গীর তো অভাব নেই।

মেয়েটি তেমনি ফুঁসছে। প্রৌঢ় তার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। মেয়েটি গুণের দিকে চেয়ে বলে, পুতুল সঙ্গী চাই না। রক্তমাংস চাই। দেবে?

গুণ ম্লান হাসে। মেয়েদের সন্তুষ্ট করার জন্য কৃত্রিম পুতুল সঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছে অনেকদিন। প্রথম-প্রথম মেয়েরা তাতেই খুশি ছিল। ঠিক মানুষের আকার প্রকারে তৈরি এবং সবরকম যৌনমিলনের প্রক্রিয়ায় দক্ষ এইসব কলের মানুষে মেয়েরা আর তৃপ্ত হচ্ছে না, তারা মানুষ চাইছে।

গুণ মাথা নেড়ে বলে, উপায় নেই।

তোমাদের সকলেরই এক কথা। কেন? মেয়েটা প্রবল রাগ মেশানো অভিমানের গলায় বলে।

ট্রেন থামতেই গুণ নেমে পড়ে। মেয়েটাও। প্রৌঢ় নামে না।

স্টেশনে নেমে হঠাৎ গুণের মনে পড়ল ওই প্রৌঢ় তার বাবার ছোট ভাই। এক সময়ে বাবার ছোট ভাইকে কাকা বলার নিয়ম ছিল। এখনও কেউ হয়তো ডাকে। গুণ নিজে অবশ্য কখনও কাকা-জ্যাঠা বলে কাউকে ডাকেনি। আগের দিনের মতো আত্মীয়তার সম্পর্ক তো আর এখন মানা হয় না। প্রকৃতি যেমন মা-বাবার উল্লেখ করল, বাবার কাছে গেল, তেমনটাও আজকাল কদাচিৎ হয়। বাবা-মার প্রতি অতখানি কর্তব্য করার কোনও মানেই আজকাল নেই। গুণ নিজের বাবাকে দেখে না প্রায় পনেরো বছর, সে লোকটা এ শহরেই থাকে। তার মা বহুকাল আগে বাবাকে ছেড়ে গেছে। মাকেও বহুকাল দেখেনি গুণ। হয়তো মা এদেশে নেই, হয়তো মরে গেছে।

গুণ অন্যমনস্ক ছিল বলে প্রথমটায় টের পায়নি যে, নগ্ন মেয়েটি তার প্রায় গা ঘেঁষে হাঁটছে। মেয়েটির কনুইয়ের ঠেলা খেয়ে সচেতন হয়ে গুণ তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখল। বছরকুড়ির

বেশি বয়স হবে না। ভারী সতেজ, সুন্দর দীঘল চেহারা। মুখশ্রী অসাধারণ সুন্দর। মেয়েটি অর্থপূর্ণ একটু হাসে।

গুণ মাথা নেড়ে বলে, না।

কামবোধ বলতে আজকাল গুণের কিছু নেই। আরও বহুকাল বোধটা জাগবেও না। কিন্তু এই কামকাতরা মেয়েটির জন্যে তার একটু কষ্ট হচ্ছিল। সব মেয়ের জন্যে হয় না, কিন্তু এ মেয়েটির মুখে কী যেন একটু বিশেষত্ব আছে।

মেয়েটি হাল ছাড়েনি। গুণের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমরা সবাই ফিরিয়ে দিচ্ছ, আমি কোথায় যাব?

গুণ বলতে পারত, পুতুল পুরুষের কাছে যাও। কিন্তু তা করল না। গুণের এখুনি বিশেষ কোথাও যাওয়ার নেই। ঝিমি পরশু তার চারজন প্রেমিককে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে এক মাইল গভীরে জলের নীচের শহর রিদম-এ বেড়াতে গেছে। সমুদ্রের নীচে এখন হাজারটা শহর, তার মধ্যে রিদম সবচেয়ে কুখ্যাত। শুধু আমোদ আর যথেচ্ছাচার ছাড়া সেখানে আর কোনও কর্ম নেই।

তিতিরের কাছেও গুণ কয়েকদিন যাবে না। তিতিরের পেটে ক্যানসার হয়েছে, সে আছে হাসপাতালে। সেরে উঠে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে তার এখনও দিনদশেক লাগবে। মৈত্রী এখনও ফেরেনি দক্ষিণ মেরুর ভূগর্ভ শহর থাকে।

সুতরাং গুণ এখন সঙ্গীছুট। পুরুষ বন্ধু বলতে গুণের প্রায় কেউই নেই। বন্ধু কেউ কারও হয়ও না আজকাল। সবাই সবাইকে অবিশ্বাস আর সন্দেহ করে। খানিকটা বন্ধু হয় বরং মেয়েপুরুষ। তাও বেশিদিনের জন্যে নয়। ভালো না লাগার ঢেউ এসে সম্পর্ক ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

স্টেশনের চত্বরটা বিশাল। মাটির নীচে দিনের মতো উজ্জ্বল আলো। স্টেশনের চত্বরেই হরেক জিনিসের দোকান, লাইব্রেরি, ছোট-ছোট ব্যাটারিচালিত বগি গাড়ি এখানে সেখানে পড়ে আছে। স্টেশনের চত্বরের যে-কোনও জায়গায় যেতে হলে ইচ্ছেমতো এইসব বগি ব্যবহার করা যায়।

গুণ একটা বগি গাড়িতে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই মেয়েটিও বিনা প্রশ্নে উঠে তার পাশে বসে। সম্ভবত মেয়েটি বুঝতে পেরেছ, গুণ খুব নরম মনের মানুষ।

গুণ বগিটা ছেড়ে দিয়ে একটু হেসে বলল, কোথায়?

তোমার সঙ্গে।

কেন?

আমি একা।

গুণ মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বগিটা যদৃচ্ছা যেতে দিল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, একা কে নয়?

মেয়েটি তার একরাশ কালো চুল আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলল, তুমিও একা?

গুণ মাথা নাড়ে।

মেয়েটি বলে, আমি সুসি। তুমি?

গুণ।

থাকবে আমার সঙ্গে?

না।

কেউ চাইছে না। কেন? আমি কি খারাপ?

তা নয়।

খুব বেশি চাইব বলে ভয় পাচ্ছ?

পাচ্ছি। বলে গুণ বড় শ্বাস ফেলল।

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। চোখ হল সুদূর। আস্তে করে বলল, আমি একটু বেশি চাই। ঠিক। কিন্তু তোমার কাছে চাইব না। শুধু থাকব।

একাই তো ভালো।

আমার ভয় করে।

গুণ একটু চমকে চাইল মেয়েটির দিকে। কচুরিপানা সরালে যেমন স্বচ্ছ জল, তেমনি মেয়েটির মুখ থেকে উগ্র কামের ভাবটি সরে যাওয়ার পর এখন দেখা যাচ্ছে, মেয়েটির মুখে একটা কোমল লাবণ্য। সেই লাবণ্যের মধ্যে একটু ভয়ের শুষ্কতাও বুঝি আছে।

গুণ বলে, ভয় কেন?

মেয়েটি বলল, কী জানি খুব ভয়।

বয়স?

কুড়ি। তিন হাজার এক সালে আমার জন্ম। আমি বড় হয়েছি দোলনায়।

যেসব বাচ্চাকে জন্মের পরই মা-বাবা ত্যাগ করতে চায় তাদের লালনপালন করার জন্যে সরকারের যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার নাম দোলনা।

ও। গুণ মুখটা ফিরিয়ে দেয়। তারপর বলে, হাজার হাজার লোক দোলনায় বড় হয়েছে।

সে সত্যি! কিন্তু আমার সমস্যা অন্য। আমাকে সবাই এড়িয়ে চলে, ভয় পায়।

গুণ গম্ভীর হয়ে বলে, এখন কী চাও?

চাই! বলে মেয়েটি যেন ভাবতে থাকে।

গুণ বগি গাড়িটা চালিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। রেস্তোরাঁর হলটি বিশাল। অজস্র লোক বসে খাচ্ছে। মানুষ খাবারের প্যাকেট কিনছে। আজকাল কেউ রান্নাবান্না করে না!

গুণ বগি থেকে নামে। সঙ্গে সেই মেয়েটি।

নিরিবিলি একটা টেবিলে গিয়ে তারা বসে। টেবিলের কাচের ওপর একটা ইলেকট্রনিক খাদ্যতালিকা পড়ে আছে। খাবারের নামের পাশে-পাশে ছোট-ছোট বোতাম। গুণ তিন-চারটে বোতামে চাপ দিল। মেয়েটি চাপ দিল একটি বোতামে।

খানিকক্ষণ বাদে পরোক্ষ চালিত একটা ট্রলি নিজে থেকেই গড়িয়ে এল টেবিলের পাশে। তার ওপর তাদের পছন্দমতো খাবার সাজানো।

গুণ তার খাবারের প্লেট তুলে নিতে-নিতে দেখল, মেয়েটি শুধু এক বোতল ঠান্ডা পানীয় চেয়েছে। এই বিশেষ পানীয়টিতে ওষুধ মেশানো থাকে। খেলে কিছুক্ষণের জন্যে কোনও শরীরিক অনুভূতি থাকে না আর খুব আনন্দ হয়। তবে নেশা নয়।

গুণ বিরক্ত হচ্ছিল আবার করুণাও বোধ করছিল। খেতে-খেতে সে বললে, এখান থেকেই কিন্তু আমরা যে যার পথে যাব।

আমার পথ নেই। গন্তব্য নেই।

সে আমি জানি না।

তোমার কে আছে?

গুণ ভ্রূ কুঁচকে বলে, কয়েকদিন আমি একা। ভালো আছি।

মেয়েটি ঢকঢক করে অনেকখানি পানীয় গিলে ফেলে। তারপর বোবা মুখে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

রেস্তোরাঁয় আরও বহু নগ্ন ও পোশাক পরা মেয়ে-পুরুষ রয়েছে। বেশিরভাগই সঙ্গীহীন। কথাবার্তায় প্রায় কোনও শব্দই নেই। হাসির আওয়াজ শোনা যায় না। আর একটা জিনিসও

আজকাল দুর্লভ দর্শন—সেটা হচ্ছে শিশু। আজকাল শিশুরা প্রায় বর্জিত। মা-বাপ তাদের দায়িত্ব নেয় না। তারা বড় হয় দোলনায়।

গুণ চোখ তুলে দেখল মেয়েটি বিহ্বল চোখে একদৃষ্টে তাকেই দেখছে। তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পানীয়ের ফেনা গড়িয়ে নেমে আসছে থুতনি বেয়ে।

মেয়েটি নতমুখে বোধহয় নিজের শরীরের দিকেই চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর মুখ তুলতেই গুণের কথা মনে হল, এ মেয়েটির চোখে একটা অদ্ভুত চকিত আলো খেলে যাচ্ছে। পাগল?

গুণ আস্তে করে বলে, আর কী চাও?

তোমাকে।

এমনভাবে বলল যে গুণ একটু চমকে যায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে, আমিও আর পাঁচজন পুরুষের মতো! কোনও উত্তেজনা নেই।

তবু। আমি একা থাকব না।

আমার একা থাকাই দরকাব।

আমি তোমার কাছে কিছু চাইব না। শুধু থাকব।

তোমার ডেরা কোথায়?

কোথাও কিছু নেই। আমি এর-ওর কাছে থাকি।

কেন? ডেরার তো অভাব নেই।

ডেরা থাকলেই তো একা।

ও। গুণ বিরক্ত হয় আবার।

তুমি কেন রেগে আছ? আমি তো কিছু চাইনি।

কিন্তু...।

আমি নিজেকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখব।

ঘুমোলে আর সঙ্গীর দরকার কী?

ঘুমের মধ্যেও আমি ভয় পাই যে। মনে হয়, কেউ খুন করবে।

আমার কাছে সে ভয় নেই?

হয়তো আছে।

আছেই তো। আমিও হয়তো খুন করতে পারি।

পারো?

নয় কেন?

মেয়েটি হেসে বলে, তবে অনুরোধ, ঘুমোলে মেরো না। জেগে থাকতে-থাকতে মেরো।

গুণ অবাক হয়ে বলে, কেন?

ঘুম বড় ভালো জিনিস, তখন মারলে আমি কষ্ট পাব।

তা ছাড়া এমনিতে মারলে কষ্ট পাবে না?

মেয়েটির মুখে মৃদু একটু রহস্যের হাসি। বলল, পাব। তবে আমার কাছে ঘুম বড় দুর্লভ জিনিস। কোনওদিনই ঘুমের ওষুধ না খেলে আমার ঘুম আসে না, ঘুম আসে না কেন জানো?

কেন?

ওই ভয়েই। সব সময়ে মনে হয় আমি ঘুমোলে কেউ এসে আমাকে খুন করবে। ঘুমের মধ্যে খুন হতেই আমার যত ভয়।

গুণ এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। হাজারটা মানসিক রোগে মানুষ আজকাল ভুগছে। কেউ পুরো পাগল, কেউ বা অস্বাভাবিক। টিপসি ঠিকই লিখেছে। তাই সে বলল, আমি

খুনি নই। তবে ভালো লোকও নই।

আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমাকে ক'দিন একজন সঙ্গী দাও।

আমি সঙ্গী হিসেবেও ভালো নই। গুছিয়ে কথা বলতে জানি না, প্রশংসা করতে জানি না, এমনকী আমি কর্কশভাষীও। খুব রেগে যাই অল্পে।

মেয়েটি পানীয় শেষ করার পর যথেষ্ট উজ্জ্বল ও লাল হয়ে উঠেছে। খুব গভীর শ্বাস ফেলে বলল, তুমি খুব নরম মনের মানুষ।

এ কথাটা আজকাল নিদ্রার সমগোত্রীয়। নরম মনের মানুষকে এ সমাজে কেউ পছন্দ করে না, বরং সন্দেহের চোখে দেখে। নরম লোকেরা সহজে আত্মীয়তা ভুলতে পারে না, ভাবাবেগের দরুণ তারা দখলিস্বত্ব রাখার চেষ্টা করে। তারা বাবা-মা হিসেবে দাবি ফলায়, প্রেম-ট্রেম জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তারা পরিচিত কারও মৃত্যু হলে দুঃখ পায়।

কিন্তু গুণ জানে, মেয়েটা মিথ্যে বলেনি। বাস্তবিক সে কিন্তু নরম মনের মানুষ। সে মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে মুখভাব যথেষ্ট কঠিন করে রূঢ় গলায় বলে, আমি যাই হই তোমার সঙ্গে আমার খাপ খাবে না। আমার সব সময়ে সঙ্গী ভালো লাগে না।

দয়া করো।

না।

আমি দরকার হলে চুপ করে থাকতে জানি। তুমি টেরও পাবে না আমি আছি।

টের পাবই।

আমি খুব ভালো ভালো কথা বলতে জানি।

কথা শুনতে আমার আর ইচ্ছে নেই।

মেয়েটি একটু ঝুঁকে চাপা স্বরে বলে, আমাকে সব সময়ে কে একজন যেন লক্ষ করে, একা হলেই টের পাই।

বিরক্ত হয়ে গুণ বলে, সুসি, এটা লক্ষ করার যুগ নয়। একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় গোয়েন্দগিরি দরকারি ব্যাপার ছিল। এখন তা নেই।

কিন্তু এটা গোয়েন্দার ব্যাপার নয়।

তবে?

আমার একটা টের পাওয়ার ক্ষমতা আছে।

বাজে কথা। গুণ খাবার শেষ করে টেবিল থেকে ভেজা তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছল। বলল, আর যদি লক্ষ করেই তবে তো তুমি ভাগ্যবতী। বুঝতে হবে কেউ তোমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এ লক্ষটা সেরকম নয়। ঘৃণার।

গুণ উদাস হয়ে বলে, মনে হওয়া আর মনে হওয়া। মানুষের অকারণে যত কিছু মনে হয়। তুমি কোনও কাজ করো না?

আমি মহাকাশ গবেষণার সহকারী ছিলাম। সৌরলোকের সব গ্রহে আমি বারবার গেছি। ঠিক পনেরো দিন আগে আমাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।

এখন?

কিছু না। গ্রহে-গ্রহে ঘুরে বেড়ানোর মতো আনন্দ আর কোনও কাজে পাব?

গুণ নিজে সব গ্রহে যায়নি। একবার সরাসরি কাজে তাকে মঙ্গলগ্রহে যেতে হয়েছিল। চাঁদে সে কয়েকবার গেছে। মেয়েটি সব গ্রহে গেছে জেনে তার মনটা কি একটু নরম হল।

গুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজকের রাতটা তুমি আমার কাছে থাকতে পারো। কিন্তু বেশি বকবক করবে না।

কৃতজ্ঞতায় মেয়েটি উদ্ভাসিত হয়ে বলল, না। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি এখনও কুমারী।

গুণ ভ্রূ কুঁচকে বলে, মিথ্যে কথা।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে, সত্যি।

কোন পুরুষ তোমাকে নেয়নি?

না।

কেন?

আগে বলো তোমার বয়স কত?

আমি চল্লিশ।

আমি মোটে কুড়ি। তার অর্থ তোমার আর আমার মধ্যে একটা প্রজন্মের তফাত।

সেটা ঠিক।

তুমি বুঝবে না, আমাদের প্রজন্মে সক্ষম ও আগ্রহী পুরুষ কেউ নেই।

গুণ এরকম কথা শুনেছে। কানাঘুষোয় জেনেছে অত্যাধুনিক যুবকরা দেহমিলন সম্পর্কে প্রচণ্ড অনাগ্রহী।

কৌতূহলে গুণ জিগ্যেস করে, যুবকেরা খুব ঠান্ডা বলছ?

খুব।

কেন?

কেন তা জানি না। তারা আগ্রহী নয় এটা দেখেছি।

তাহলে?

মেয়েটি হেসে বলে, তারা ফিরিয়ে দেয় বলেই আমি তোমাদের মতো বয়স্কদের কাছে গেছি। তারাও ফিরিয়ে দেয়। আমি কুমারী রয়ে গেছি।

গুণ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হয়তো মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে না। একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই আর কোনও মেয়ে কুমারী থাকত না। মেয়েদের কৌমার্য ছিল দুর্লভতম জিনিস। খুব বেশি দিনের কথাও তো নয়। এত অল্প দিনেই সে অবস্থাটা উলটে গেল কি?

গুণের উদাসীন ভাবটা আর রইল না। পৃথিবীতে এখন কুমারী মেয়ে আছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে এই সত্য জানতে পেরে তার একধরনের জটিল আনন্দ হল।

মেয়েটির দিকে এবার অপকট আগ্রহ নিয়ে তাকায় গুণ। একটু হাসে আপন মনে। তারপর রেস্তোরাঁ থেকে বেরেনোর সময় ইচ্ছে করেই মেয়েটির একটা হাত নিজের হাতে ধরে।

কলকাতার আট নম্বর উপনগরীর উপরিভাগে উঠে আসে তারা। সূর্য অস্ত গেছে। ফ্যাকাশে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সূর্যের মতোই আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সূর্যের মতো অবিকল নয় এবং তাপও নেই। তবু চারিদিকে একটা সুস্পষ্ট আলো সব সময়ে পাওয়া যায় তা ছাড়া রাস্তার আলো আছে। দোকান-পাট থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। অফুরন্ত আলো, পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ থেকে অঢেল শক্তির উৎস পাওয়া গেছে।

চলন্ত ফুটপাত ধরে খানিক এগিয়ে তারা ফের সিঁড়ি বেয়ে মনোরেলের একটা স্টপে উঠে দাঁড়াল। অবিরল মনোরেল চলছে। খুব ভিড় নেই।

দুজনে উঠে চুপচাপ। মেয়েটা গুণের সঙ্গে কথা বলতে বোধহয় ভয় পাচ্ছে।

গুণের বাড়ি পৌঁছোতে বেশি সময় লাগল না। উপনগরীর একপ্রান্তে চমৎকার একটা

কাচতন্তুর বাড়ি। এখানকার সমাজে নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। এ বাড়ি গুণের নয়। সরকারি কোয়ার্টার মাত্র। তবে বাড়িটি চমৎকার। বৈঠকখানার দুটো দেওয়াল স্বচ্ছ পলিথিনের তৈরি। বাইরের সবটুকু দেখা যায়।

শোওয়ার ঘরেও তাই।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে চারদিকে দেখল। খুশি হল কি না বোঝা গেল না। তবে সুসির মুখে একটা অসম্ভব স্বস্তি ফুটে উঠল। গভীর শ্বাস ফেলল সে। মুখখানা শিশুর মতো হয়ে গেল।

গুণ শান্ত স্বরে বলল, কী করবে এখন?

আমি ঘুমোব।

ঘুমোও।

মেয়েটি হঠাৎ গুণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি ঘুমের মধ্যে আমাকে মারবে না তো?

গুণ হাসল একটু। মাথা নেড়ে বলল, বলেছি তো আমি খুনি নই।

সুসি অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে গুণের দিকে। তার চোখে ঘৃণা নেই, ভালোবাসা নেই, কাম নেই, কৌতূহল নেই, সন্দেহ নেই, ভয় নেই। তবে একটু বুঝি তৃপ্তি আছে।

গুণ বলল, ঘুমের ওষুধ বিছানার ধারেই আছে।

আচ্ছা।

মেয়েটি ওষুধ খেল, বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

গুণ বেরিয়ে আসে বাইরে। সে এখন বাড়িতে বসে থাকবে না।

বেরিয়েই সে দাঁড়াল, ভাবল একটু। এ পাড়ায় গতকালও দুটো খুন হয়েছে। প্রায়ই হয়।

চমৎকার আলোয় পরিচ্ছন্ন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে চায় গুণ।

এ পাড়া নির্জন।

বারবার বিদ্যুৎচমকের মতো গুণের মনে পড়ছে তার বাতাসগাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারে নিখুঁত একটা ছ্যাঁদার ঘটনাটি। কোনও আধুনিক ড্রিল ব্যবহার করা হয়েছে ছিদ্র করতে। অত শক্ত ইস্পাতের বর্ম ভেদ করা বড় সহজ নয়।

আবার সে ভাবছে টিপসি সুলতানের টিপসের কথা। এ লোকটা কখনও বুজরুকি করেনি। টিপসি সুলতান কম্পিউটার হোক বা মানুষই হোক—এ পর্যন্ত সবই নির্ভুল টিপস্ দিয়েছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুণের তেমন কোনও মোহ ছিল না। যা হওয়ার হবে, গুণের তাতে কী? সে তার জীবনটা কোনওক্রমে কাটিয়ে গেলেই হল। কিন্তু আজকাল সে আর অতটা নিস্পৃহ নেই। পৃথিবী সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার আগ্রহ ক্রমে বাড়ছে। সুসি তাকে বলেছিল, সে নাকি নরম মনের মানুষ। শুনে প্রথম তার রাগ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কথাটা মিথ্যেও তো নয়। পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন কেউ মাথা ঘামায় না তখন তার কী দায় ঠেকল?

প্রকৃতির মা এক নির্জন দ্বীপে আত্মহত্যা করেছে: এই ছোট্ট, প্রায় তাৎপর্যহীন ঘটনাটা অনেকক্ষণ ধরে তার মনের আনাচে-কানাচে মারবেলের মতো গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতি তার মার মৃত্যুতে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু গুণ কেন যে ভুলতে পারছে না, কেবলই মনে হচ্ছে একটা কী ঘটতে চলেছে। যা ঘটবে তা ভালো নয়। ভালো নয়।

গুণ ফিরে এসে তার বাসার সামনে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছে, তার বাড়িটা খুব নিরাপদ নয়। একা ওই কুমারী মেয়েটি—কোনও বিপদ ঘটতে পারে তার অনুপস্থিতিতে। একটু ভ্রূ কুঁচকে সে ভাবল। মনটা বড্ড নরম হয়ে এসেছে তার। লক্ষণটা ভালো নয়।

গুণ জোর করে মন থেকে অকাজের ভাবনা তাড়ানোর চেষ্টা করতে-করতে হেঁটে গিয়ে টিউব রেলের স্টেশনে নামার সিঁড়িতে পা দেয়।

খানিক দূরে নেমে সে এসক্যালেটর ছেড়ে একটা চাতালে দাঁড়ায়। এখানে টেলিফোন বুথ।

গুণ টেলিফোন তুলে নম্বরের বোতামে হালকা আঙুলে চাপ দেয়।

একটু বাদেই ওপাশের একটা যান্ত্রিক গলা বলে ওঠে—সেক্টর আট...অনুসন্ধান...বলুন, আপনার কথা রেকর্ডে উঠছে।

গুণ আস্তে করে বলে, আমি আট নম্বর সেক্টরের গুণ। কিউ আটাত্তরে আমার বাসা। আমার বাতাসগাড়ির নম্বর সিএটি দু-হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ।

তারপর?

আমার গ্যাস সিলিন্ডারে আজ কে ছিদ্র করেছে।

রেকর্ড হচ্ছে। বলুন।

গুণ মৃদুস্বরে বলে, আমার অফিস সেক্টর এফ-এ। সরকারি অফিস। আমাদের কাজ পুরোনো সব নথিপত্র পরীক্ষা করা। আমি কাজ করি ইনফ্রারেড রে বিভাগে।

অপেক্ষা করুন। যন্ত্র জবাব দেয়।

একটু চুপচাপ। তারপর যন্ত্রের গলা বলে, হ্যাঁ, আপনি কে তা আমরা বুঝতে পারছি। আপনার বাতাসগাড়ির রেকর্ডও পাচ্ছি।

আমি জানতে চাই, কে এই কাজ করেছে?

যন্ত্র কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বলে, আর এক ঘণ্টা বাদে আমরা আপনাকে খবর দেব। আমাদের স্ক্যানার মেশিন আপনার বাতাসগাড়ি এবং আকাশের জায়গা পরীক্ষা করে সব তথ্য আপনাকে জানাবে।

আর একটা কথা—

বলুন।

আমার সঙ্গে আজ একটি মেয়ের আলাপ হয়েছে। নাম সুসি। সে এক সময়ে মহাকাশ গবেষণার সহকারি ছিল বলে পরিচয় দিচ্ছে। সে যা বলছে তা কি সত্যি?

অপেক্ষা করুন।

আবার চুপচাপ। তারপর যন্ত্র হঠাৎ গুণকে চমকে দিয়ে বলে ওঠে, না।

মানে?

সত্যি নয়। সুসি নামে কেউ মহাকাশ গবেষণার সহকারি ছিল না।

নাম হয়তো বানিয়ে বলছে।

চেহারার বর্ণনা দিন।

মোটামুটি লম্বা, চমৎকার গঠন, সুন্দর মুখশ্রী, গায়ের রং বাদামি, তার মাথায় লম্বা চুলের মস্ত গোছা, যৌন ক্ষুধাতুর, কিন্তু কুমারী, বয়স কুড়ি।

অপেক্ষা করুন।

গুণ অপেক্ষা করে।

একটু বাদে যন্ত্র বলে আপনি আপনার সামনে টিভির সুইচ টিপুন।

টেলিফোনের সামনেই ঘষা কাচের পরদা, নীচে বোতাম। গুণ বোতাম টিপতেই পরদা উদ্ভাসিত হল আলোয়। তারপর নানারকম রেখার ঢেউ। আস্তে আস্তে রেখাগুলো স্থির হতে লাগল। ক্রমে রেখায় ফুটে উঠল একটি নগ্নমেয়ের স্কেচ।

যন্ত্র বলে ওঠে, আপনার বর্ণনা অনুসারে আমাদের কমপিউটার এই স্কেচটি করেছে।

মেয়েটি এরকম কিনা দেখুন তো?

গুণ দেখে। অনেকক্ষণ দেখে। না, মেলেনি, হুবহু মেলেনি।

গুণ বলে, না, মুখটা লম্বা হবে। চোখ আরও বড় এবং সরল।

অপেক্ষা করুন।

পরদা সাদা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে আবার রেখার ঢেউ আসে। জমাট বাঁধে।

আবার একটি মেয়ের রেখাচিত্র ফুটে ওঠে।

যন্ত্রের গলা বলে, এবারে দেখুন।

এখনও মেলেনি। গুণ আবার কয়েকটা সংশোধন করে। আবার পরদা সাদা হয় এবং একটু বাদে আবার একটা মেয়ের ছবি আসে।

এইভাবে কয়েকবার চেষ্টায় মোটামুটি সুসির চেহারা পরদায় এল।

হ্যাঁ, অনেকটা এরকম।

অপেক্ষ করুন।

যন্ত্র চুপ করে যায়। গুণ অধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে। যন্ত্র এবার অনেকক্ষণ সময় নেয়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, আপনি সাবধান থাকবেন।

কেন?

এ মেয়েটি সুসি। মেরু শহর পোলারিস-এর বাসিন্দা। কিছুদিন আগে সেখানে সবুজ খুনি নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল তৈরি হয়। এরা অত্যন্ত চরমপন্থায় বিশ্বাসী। এ মেয়েটি সেই দলের।

গুণ চমকে যায়। মেয়েটিকে ওরকম কিছু ভাবা তার পক্ষে শক্ত।

গুণ বলে মেয়েটি সম্পর্কে আর কিছু বলুন।

দেখছি।

যন্ত্র চুপ। অনেকক্ষণ বাদে বলে, সে দোলনায় মানুষ হয়েছে। বাপ-মা কে তা অজানা। ছেলেবেলা থেকেই তার স্বভাব শীতল ও নিষ্ঠুর। কখনও ছোটখাটো দুষ্টুমি করত না, খুব শান্ত থাকত। কিন্তু বাচ্চাবেলায় সে কীটপতঙ্গ মেরে ফেলত। একটু বড় হয়ে সে জীবজন্তু মারতে খুব ভালোবাসত। সে কখনওই যৌনকাতর নয়। বরং ও ব্যাপারে তার তীব্র বিতৃষ্ণা আছে।

সে কী!

আমরা আপনাকে যথাযথ তথ্য দিচ্ছি।

কিন্তু সে যে প্রথমেই আমার কাছে শরীর চেয়েছিল।

যন্ত্র জবাব দেয়, সেজন্যই আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে। মেয়েটির সব কথা বিশ্বাস করবেন না। দোলনার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সুসি কোনওদিনই যৌনমিলনে আগ্রহী হবে না। বরং ওরকম কিছু ঘটতে গেলে সে বিদ্রোহ করবে, হিংস্র হয়ে উঠবে প্রতিরোধ করবার চেষ্টায়।

আর কিছু জানাবার আছে?

যন্ত্র খানিকক্ষণ বাদে বলে, মেয়েটি পাগল বা মনোরোগী বলে চিহ্নিত নয়। তবে তার কতকগুলো বিশেষত্ব আছে! সে একা থাকতে চায় না। মৃত্যুভয় প্রবল।

সে কি কাউকে কখনও খুন করেছে?

করলেও রেকর্ড নেই। তবে কাজটা তার পক্ষে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক।

সুসি ঘুমের ওষুধের গাঢ় নীল শিশিটা আলোর দিকে তুলে ধরে দেখে। শিশিতে খুব বেশি বড়ি নেই, দুটো কী তিনটে।

তাহলে গুণ নামে এ লোকটাও আর দশজন লোক যেমন হয় তেমনিই। অর্থাৎ স্বাভাবিক

ঘুম এরও নেই। পৃথিবীর খুব কম লোকই স্বাভাবিকভাবে ঘুমোয়, যাদের আপনা থেকে ঘুম আসে তারা বড় ভাগ্যবান।

সুসি শিশিটা রেখে দেয়। সে এক্ষুনি ঘুমোবে না। তার কাজ আছে।

কাচতন্তুর স্বচ্ছ দেওয়ালের ধারে এসে সে দাঁড়ায়। এখন গ্রীষ্মকালের মেঘহীন আকাশ। পশ্চিমে এখনও ডুবে যাওয়া সূর্যের রক্তিম আভা একটুখানি আকাশের নীচে লেগে আছে, ভারী সুন্দর ওই ক্ষীণ আভাটুকু।

সুসি সতর্ক চোখে দেখল গুণ রাস্তা ধরে খানিক এগোল। থামল, কী ভেবে ফিরে এল বাসার দিকে।. ভাবল। তারপর আবার হাঁটতে-হাঁটতে গিয়ে পাতালে নামবার সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল।

সুসি ঘড়ি দেখছে। সাতটা বাজতে তিন মিনিট সাত সেকেন্ড।

আকাশে এখনও অজস্র বাতাসগাড়ি উড়ে বেড়াচ্ছে। যত রাত বাড়ে, তত বাতাসগাড়ির চলাচল কমে যায়। এখন তেমন রাত হয়নি।

সুসি আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালে একটা সুইচ টিপল। স্বচ্ছ দেওয়ালের ওপর একটা পরদা পড়ে গেল।

ঘুরে-ঘুরে সুসি গুণের বাসাটা দেখে।

একটা ঝকঝকে মরিচাহীন ইস্পাতের শিট দিয়ে তৈরি আয়নার সামনে দাঁড়াল সুসি। অনেকক্ষণ সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে থাকে। শরীরটুকুর মধ্যেই সে শেষ। তার শরীরের চারদিকে এই যে সুন্দর সাজানো ঘর, ঘরের বাইরে যে পৃথিবী, এত মানুষজন চারদিকে—এর কোনওটার সঙ্গেই তার বনিবনা নেই, সম্পর্ক নেই, আদান প্রদান নেই। সামান্যই তার বয়স। এখনও পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থাকতে হবে। এবং সে বেঁচে থাকা হবে বড় একা একা।

আয়নার সামনে থেকে সরে আসে সুসি। ধীর পায়ে চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখে। তেমন কিছু দেখার নেই। বসবার ঘরে একটা ভুয়ো বুককেসের পিছনে সে একটা টিভি ট্র্যান্সমিশন ক্যামেরা দেখতে পায়। খুব বেশি লোকের বাড়িতে এ জিনিস থাকে না। গুণের আছে। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে গুণ বহু দূর থেকে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তার ঘরে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে পারে।

সুসির কাছে এসব যন্ত্র খেলনার মতো সহজ। সে খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যামেরাটিকে অকেজো করে দিল।

দেওয়ালের মধ্যে প্রোথিত একটা ওয়ার্ডোব খুলে সুসি দেখতে গেল অন্তত কুড়ি রকমের মেয়েদের পোশাক সাজানো রয়েছে। বেশিরভাগই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত পোশাক—যা পরলে শীতকালে শীত বা গ্রীষ্মে গরম লাগে না। রয়েছে আগুন ও জল নিরোধক কাচতন্তুর পোশাক।

সুসি খুব সাদামাটা নাইলনের একটা রোব বের করে পরল। কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি ঢাকা পড়ে গেল তার।

রান্নাঘরে এসে সে দেখে বহুকাল রান্নাবান্না কেউ করেনি এখানে। ঝকঝকে হিটার, বাসনকোসন, যন্ত্রপাতি সব সাজানো। ধুলো, বাতাস, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত এই ঘরেও সব কিছুর ওপর পাতলা ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘরটিতে মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে, কয়েকটা পিঁপড়েও দেখতে পায় সুসি।

একধারে একটা ছোট্ট দরজার ওপরে লেখা : দি ফ্রোজেন গার্ডেন।

দরজাটা খুলে সুসি ভেতরে ঢুকে যায়।

লম্বা একটা গলি। দু-ধারে র‍্যাক সাজানো। তাতে অজস্র সতেজী সবজি ফলে আছে

রাসায়নিক একটা স্তরের কৃত্রিম খেতে।

এইসব সবজির তেমন কোনও স্বাদ বা গন্ধ নেই। তবে কাজ চলে যায়। ইচ্ছে করলে আরক মিশিয়ে কৃত্রিম উপায়ে স্বাদ গন্ধ তৈরি করে নেওয়া যায়।

সুসির খিদে পায়নি, রান্নাও সে করবে না। সে শুধু ঘুরে-ঘুরে দেখে।

কী দেখতে চাইছে তা সুসি জানে না।

অনেকক্ষণ ধরে এই কৃত্রিম সবজিবাগান দেখে ক্লান্ত সুসি ফের রান্নাঘরে চলে আসে। চটচলদি কফির একটা যন্ত্র রয়েছে।

সুসি চাবি দিতেই আধ মিনিটের মধ্যে এক কাপ ফুটন্ত কফি পেয়ে গেল।

ঘুরে-ঘুরে কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে সুসি রেকর্ড ঘরে গিয়ে ঢোকে। রেডিয়ো টেপ-এর গুদাম বলা যায় ঘরটিকে। দেওয়ালের গায়ে অজস্র চৌখুপিতে সাজানো টেপ। প্রত্যেকটা খোপের গায়ে ইলেকট্রনিক টাইপ দিয়ে লেখা কোনটা কোন বিষয়ের টেপ। একটা খোপের গায়ে লেখা আছে ঃ আমার কথা। সুসি টেপটা প্রক্ষেপণ যন্ত্রে লাগিয়ে দিয়ে যন্ত্রটা চালু করে।

একটা টেলিভিশন যন্ত্রে ছবি ফুটে ওঠে ঃ

গুণ তার বসবার ঘরে একটা কৌচে এলিয়ে বসে আছে। মুখখানা বিষণ্ন।

গুণ আস্তে-আস্তে বলে, আমি আজকাল মাঝে মাঝে খুব অদ্ভুত চিন্তা করি। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে, এই সম্পূর্ণ বান্ধবহীন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের একজন ভালোবাসার লোক চাই-ই। ভালোবাসা কথাটা পুরোনো এবং সম্পূর্ণ অচল। আমরা জানি, কেবল কর্তব্য এবং উপভোগই শেষ কথা। ভালোবাসা একটা ভাবাবেগ মাত্র। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের বিষয়, মানুষের অন্তর্গত সেই ভাবাবেগের শুষ্ক নদীখাতে মাঝে মাঝে প্লাবনের ঢল নামে।...আমার স্ত্রী প্রকৃতি আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে আমার কত নম্বর স্ত্রী ছিল সেটা কথা নয়। কিন্তু কথা হল, তাকে চলে যেতে হল।

সুসি কফি খায়, একটু হাসে, শ্বাস টানে।

পরদায় গুণ ভ্রূ কুঁচকে নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চোখ তুলে বলে, এটা কোনও ঘটনাই নয়। আমরা ক্রমে বিবাহহীন সমাজের দিকে এগোচ্ছি। কারও অন্য কোনও মানুষ বা মেয়েমানুষের ওপর বিন্দুমাত্র দখলদারি থাকবে না। সমাজ মুক্ত হবে। পরিবারের বন্ধন থাকবে না। আমি এর বিরোধী নই, কুপ্রথা দূর হওয়াই ভালো। কিন্তু প্রশ্ন অন্য। মানুষ তার মরা নদীর এই অহেতুক বান কী করে সামলাবে?

সুসি নড়ে চড়ে বসে।

গুণ বলে, আমি অফিসে আটঘণ্টা পরিশ্রম করি, তার যথাযোগ্য প্রতিদানও পাই। আমার কিছুই পাওয়ার নেই আর। প্রকৃতির বদলে আজই আমার ঘরে আরও সুন্দরী মহিলার সমাগম ঘটতে পারে, আমি ইচ্ছে করলেই। তবু এক মরা গাং আজ আমাকে কেন ডুবজলে নামিয়ে দিচ্ছে?

পরদা সাদা হয়ে গেল একটুক্ষণের জন্যে। তারপর আবার ছবি আসে।

ভারী সুন্দর একটি অল্প বয়সের মেয়ে একটা কলের দোলনায় অল্প অল্প দোল খাচ্ছে বসবার ঘরে। মেয়েটির মুখে হাসি। ঘরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গুণের গলার স্বর নেপথ্যে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে, জাফরি। এ আমার সঙ্গে বাস করছে গত তিন মাস। তি-ন-মা-আ-স! জাফরি নতুন দ্বীপের মেয়ে। ত্রিশ বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে উর্বর ও নতুন মাটি নিয়ে যে প্রকাণ্ড দ্বীপটি ভেসে উঠেছিল জলের ওপর, তাতে বাস করার উদ্দেশ্য প্রথম পর্যায়ে যে তিনশো পরিবার সেখানে যায়, জাফরির বাবা-মা ছিল সেই দলে। ত্রিশ বছরের মধ্যেই নিউ আইল্যান্ড এক স্বাধীন ও ক্ষমতাবান রাষ্ট্রে পরিণত

হয়েছে। এই দ্বীপরাষ্ট্রকে বলা হয় ড্রিমল্যান্ড। সেখানে মানুষের অপ্রাপ্য কিছুই নেই। অভাববোধ সেখানে শূন্য। গত শতাব্দীতে আমেরিকার যে ঐশ্বর্যের খ্যাতি ছিল, নিউ আইল্যান্ডের খ্যাতি তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি। তবু সেখানকার মানুষ কতটা তৃপ্ত? জাফরিকেই জিজ্ঞাসা করা যাক।

জাফরি! গুণ ডাকল।

হুঁ। ভারী সুন্দর মুখের ভাব করে জাফরি জবাব দেয়।

নিউ আইল্যান্ড জায়গাটা কেমন?

নতুন দ্বীপ, ভীষণ ভালগার।

কেন?

বোরিং।

কেন?

আমরা সেখানে যা খুশি করতাম। ছেলেবেলা থেকেই।

কোনও অভাব ছিল না? গুণ প্রশ্ন করে।

অভাব! চোখ বড় করে জাফরি তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, অভাব কী!

নিউ আউল্যান্ডে পাওয়া যায় না এমন কোনও জিনিসের নাম করতে পারো?

না তো! জাফরি অবাক হয়ে বলে, পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে বলে, কী আছে চাওয়ার?

তোমরা কীভাবে বড় হয়েছ?

যেমনভাবে সেখানে বড় হয়। যা খুশি করতাম। লেখাপড়া ছিল, খেলা ছিল, আর ছিল কত কিছু। নাচ-গান হই-হুল্লোড়।

তাহলে তুমি খুব আনন্দেই ছিলে!

ভ্রূ কুঁচকে জাফরি বলল, আনন্দ! না। বড় একঘেয়ে।

জাফরি তুমি কখনও কাউকে খুন করেছ?

খুন! ও, সেখানে সবাই সবাইকে খুন করতে চায়। করেও অনেকে। খুব সাধারণ ঘটনা সেটা।

শাস্তি হয় না?

হয়। রিফর্ম সেন্টারে পাঠানো হয়।

তুমি খুন করোনি?

করেছি। তিনবার। খুব ছেলেবেলায় একটি ছেলেকে খুন করি রশ্মি বন্দুক দিয়ে। সে আমার সঙ্গে পিকনিকে যেতে চায়নি, কিন্তু আমি খুব চেয়েছিলাম, সে আমার সঙ্গে থাক। সেটা আমার দশ বছর বয়সে ঘটে। পনেরো বছর বয়সে আমি আমার এক সুন্দরী বন্ধুকে খুন করি। আমার ছেলে বন্ধুরা তার কাছে চলে যেত। সতরো বছর বয়সে আমি সন্ত্রাসবাদীদের দলে নাম লেখাই। পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোর জন্য পাইকারি হারে হত্যাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। খুব মজা ছিল তাতে। তৃতীয়বারে আমি এই সন্ত্রাসবাদীদের হয়ে খুন করি। সেবার গ্রেনেড ছুড়ে একটা ক্লাব হাউসের প্রায় আড়াইশো মেয়ে পুরুষকে মেরেছিলাম।

গুণের চাপা গলা পাওয়া গেল। স্বগতোক্তির মতো সে বলছে, মজা! নিউ আইল্যান্ডের সব মানুষই এইরকম। তাদের মধ্যে কোনও পাপবোধ নেই। তাদের কোনও কাজের জন্য কোনও মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় না। নিউ আইল্যান্ডের এই নিস্পৃহ দার্শনিকতা ক্রমশ পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই মনোভাবকে বোঝার জন্যই আমি জাফরিকে আমার কাছে রেখেছি। প্রতিদিন আমি বুঝতে পারছি...

সুসি যন্ত্র বন্ধ করে দিল।

নিঃশব্দে সে উঠে এল টেলিফোনের কাছে। কিন্তু যন্ত্রটা ব্যবহারের আগে সে একটু

পরীক্ষা করে বুঝতে পারল, এই টেলিফোনটার নেপথ্যে কোথাও রেকর্ডার লাগানো আছে। যা কথা হবে তাই দলিল হয়ে থাকবে।

সুসি খুঁজতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড ফুলদানির মধ্যে আর একটা টেলিফোনের সন্ধান পেল যেটায় কোনও গণ্ডগোল নেই। সংখ্যার বোতাম টিপে একটু অপেক্ষা করতেই ওপাশ থেকে গমগমে পুরুষ গলা বলে ওঠে, বাজ বলছি।

আমি সুসি।

বলো।

আমাদের চিহ্নিত লোকটি অপ্রকৃতিস্থ।

জানি। কী পেলে?

আমি তেমন কিছুই পাচ্ছি না। সুসি খুব উদার গলায় বলে।

ওপাশে পুরুষটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ঠিক আছে, আলোটা নিভিয়ে দাও।

কথাটার মানে সুসি জানে। আলো নিভিয়ে দেওয়া মানে খুন করা। আর এটাই হবে সুসির সর্বপ্রথম খুন।

ফোন রেখে সুসি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হল! খুন করা তেমন কঠিন কাজ নয়। তার দল বহুবার খুন করেছে। জাফরি নামে যে মেয়েটি একদা গুণের সঙ্গে ছিল সুসিও তারই দলভুক্ত।

আবার ইস্পাতের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় সুসি। সাদা চোখে তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু হায়! কোন পুরুষই তাকে একটু আদরও করেনি আজ পর্যন্ত। এই এক দুঃখ ছাড়া সুসির কোনও দুঃখ নেই। তবে একটা ভয় আছে। যখনই ঘুম আসে তখনই মনে হয় কেউ তাকে ঘুমের মধ্যে মেরে ফেলবে।

গুণ কখন ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কি না তার কোনও ঠিক নেই।

সুসি তার ডান পায়ের জুতো খুলে ছোট একটা অংশ হিল থেকে খসাল। অংশটা একটা ক্ষুদে ব্যাটারির মতো দেখতে। খুবই সহজ ব্যবহার করা। বোতাম টিপলে অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে ছ্যাঁদা করে দেয়।

যন্ত্রটা হাতে নিয়ে সে ইস্পাতের আয়নার ঠিক মাঝখানটা লক্ষ্য করে বোতাম টিপল। খুব সামান্য একটু ঝলকানি আয়নার বুকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সুসি এগিয়ে দেখে, আয়নার মাঝখানে মটরদানার চেয়েও ছোট মাপের নিখুঁত একটা ছ্যাঁদা।

হাতের যন্ত্রটার দিকে অন্যমনে চেয়ে থাকে সুসি। এরকম যন্ত্র নানা কাজে বহুবার ব্যবহার করছে সে। কিন্তু খুনের জন্য এই প্রথম। যন্ত্রটাকে কেন যেন তার হাতে রাখতে ইচ্ছে হল না। বসবার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিল।

গুণ অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। লক্ষ্যহীন। সে বুঝতে পারছে, সুসিকে নিজের ঘরে স্থান দিয়ে সে বোধহয় ভালো কাজ করেনি। তার সামান্য ভয় করছিল।

যে দিনকাল পড়েছে তাতে ভয় করারই কথা। রাষ্ট্র নামে একটি মূক বধির প্রতিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগে রাষ্ট্র কারও ওপরেই কোনও নিয়ন্ত্রণ খাটায় না। ব্যক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোনও আগ্রহ নেই। মানুষ তার নিজের দায়িত্বে বেঁচে থাকে, নিজের দায়িত্বেই মরে। তাতে রাষ্ট্রের আহ্লাদ বা শোক নেই। সরকারি কাজের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চালায় অত্যাধুনিক কম্পিউটার যন্ত্র। সেসব যন্ত্রের মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় নেই। বাজেট তৈরি করে যন্ত্র, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থির করে যন্ত্র, কোথায় কোনও প্রকল্প হবে বা হবে না সে সিদ্ধান্ত যন্ত্রই নেয়। এরকম যান্ত্রিক সরকারের কাছে মানুষ কতদূর কী আশা করতে পারে?

ভূগর্ভ স্টেশনে ট্রেন ধরে গুণ বহুদূর গেল, আবার ফিরে এল। তারপর হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিল সে।

একটা স্টেশনে নেমে সে সোজা টেলিফোন বুথে চলে যায়। নম্বরের বোতাম টিপে অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু বাদেই ওপাশে একটা গলা বলে ওঠে, সংবাদ বিভাগ।

আমি গুণ। পুরোনো তথ্য বিভাগে কাজ করি।

বলে যান।

গুণ একটু দ্বিধা করে বলে, আমার খুব বিপদ।

কীরকম বিপদ?

ঠিক জানি না। তবে আজ বিকেলে সুসি নামে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে জুটে গেছে। মনে হচ্ছে তার কোনও উদ্দেশ্য আছে।

আমাদের কী করার আছে? আপনি রক্ষীদলকে খবর দিন।

গুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনি একটু ভুল বুঝছেন। আমি মৃত্যুভয়ে কাতর নই।

তবে?

এ যুগে এবং যে সমাজে বাস করছি তাতে যে কোনও সময়ে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। সে জন্য মনে-মনে প্রস্তুত আছি। মরতে ভয় পাই না, তা নয়। তবে মৃত্যুকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তো পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

পৃথিবী! পৃথিবী নিয়ে আপনার ভাববার কিছু নেই। কেউ পৃথিবী নিয়ে ভাবে না।

আমি ভাবি। স্বীকার করছি আমার মধ্যে কিছু সনাতন প্রবণতা আছে। আমি দুর্বল মনের মানুষ।

ওপার থেকে সামান্য হাসির শব্দ আসে। ভরাট গলায় জবাব পাওয়া যায়, আপনার ভাবনা কী নিয়ে?

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

কী জানতে চান?

টিপসি যা বলেছেন তাতে মনে হয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ খুবই বিষণ্ণতায় ভরা। মানুষ আরও হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে। পাগলে ভরে যাচ্ছে দেশ।

তা তো ঠিকই। টিপসি ঠিক কথাই বলেন।

আমি কিছু আশার কথা শুনতে চাই।

আশার কথা যদি কিছু না থাকে?

গুণ হতাশ গলায় বলে, তাহলে আমার মৃত্যু ঘটবে চূড়ান্ত দুঃখবোধের মধ্যে।

মেয়েটি কি আপনাকে খুন করতে চায়?

জানি না। তবে সেটা সম্ভব।

ওকে ধরিয়ে দিন।

লাভ নেই। ও একটি সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্য। ওকে ধরিয়ে দিতে পারি বা হত্যাও করতে পারি। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। ইচ্ছে করলেই ওরা আমাকে যখন-তখন মেরে ফেলতে পারে।

আপনার সন্দেহ অমূলক নয় তো!

অমূলক হলে ভালোই। কিন্তু আজ বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময়ে আমি দেখি আমার বাতাসগাড়ির গ্যাস ট্যাংকে একটা ফুটো। বোধহয় কেউ ইচ্ছে করেই এই কাণ্ডটা করেছে।

যাতে আমি ভূগর্ভ ট্রেন বা অন্য কোনও. যানবাহনে চড়তে বাধ্য হই।

তাতে সুবিধা কী?

আমাকে অনুসরণ করার জন্য সেটা দরকার ছিল। হয়তো পথের মধ্যেই কোথাও ওরা আমাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল।

আপনি অনুমান করছেন।

করছি। কিন্তু অনুমানটা মরে যাওয়ার আগেই করা ভালো, নইলে পরে তো সময় পাওয়া যাবে না।

আপনার বাড়ির নম্বর এবং চ্যানেল বলুন।

গুণ চমকে উঠে বলে, কেন?

আপনার ঘরে যদি রিভার্স টেলিভিশনের ব্যবস্থা থাকে তো আমরা মেয়েটিকে লক্ষ করব।

গুণ দ্বিধা করল, কিন্তু অবশেষে নম্বরটা দিয়ে দিল।

সামান্য অপেক্ষা করল গুণ। তারপরেই ওপাশ থেকে গলা পেল, আপনার ঘরের যন্ত্রটি কি খারাপ?

না তো! বিস্মিত গুণ বলে।

তাহলে সেটা কেউ বিকল করে রেখেছ।

একটা শীতল স্রোত গুণের মেরুদণ্ড স্পর্শ করে নেমে গেল।

গুণ বলল, ঠিক মতো দেখুন।

ঠিকই দেখছি।

হতাশভাবে গুণ বলে, যন্ত্রটা লুকোনো রয়েছে। চোখে পড়ার কথা নয়।

কেউ খুঁজে বের করেছে। মেয়েটির পরিচয় কিছু জানেন?

কী জানব? আজকাল কে-ই বা নিজের সঠিক পরিচয় দেয়। আর পরিচয় দেওয়ার আছেই বা কি! আমি যেমন গুণ নামে একজন লোক, সে-ও তেমনি সুসি নামের একটি মেয়ে।

ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর বলে, আপনি যেখান থেকে কথা বলছেন সেখানে রিভার্স ক্যামেরা আছে?

আছে।

সুইচ অন করুন। আমরা আপনাকে দেখতে চাই।

গুণ টেলিফোন বুথের দেওয়ালে ক্যামেরার লেন্সটার পাশে ছোট্ট একটা বোতাম টিপল। যতদূর সম্ভব লেন্সের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইল।

একটু বাদে কণ্ঠস্বর বলল, হ্যাঁ। আপনি গুণ। এর মধ্যেই আমরা আপনার সম্পর্কে সব খোঁজখবর নিয়ে এসেছি। আপনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য।

আমার ভয়টাও সত্য।

হতে পারে! তবে আমরা নিঃসন্দেহ নই। ওরা আপনাকে কেন মারতে চায় তা জানেন?

না। আজকাল লোকে অকারণে লোককে মারে।

তা সত্য। কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারেন না? যে-কোনও সম্ভাব্য কারণ?

না।

আমাদের কাছে আপনি কী জানতে চান?

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

ঠিক আছে। অপেক্ষা করুন।

গুণ অপেক্ষা করে, অনেকক্ষণ। তারপর সামান্য একটু যান্ত্রিক শব্দ হয়।

হঠাৎ একটি থমথমে গলা বলে ওঠে, গুণ, আপনার পরিচয় আমি জানি, আপনি যা জানতে চান তাও। বলেই কণ্ঠস্বর থেমে যায়।

মৃদুস্বরে গুণ বলে, দয়া করে জবাব দিন।

ওপাশে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। থমথমে গলাটি যেন অনেক দূরে সরে গিয়ে বলে মানুষের সামনে কোনও পথ খোলা নেই।

নেই?

আপাতত নেই, আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জিন নষ্ট করে গেছেন। সেই মহতী বিনষ্টির বোঝা আমাদের বইতেই হবে।

কীভাবে পূর্বপুরুষরা আমাদের জিন নষ্ট করলেন?

যথেচ্ছ বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন করে।

ইচ্ছাই তো বিবাহের মূল, তবে তা যথেচ্ছ হলে দোষ কী?

বংশ নষ্ট করে যে ইচ্ছা তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। তাঁরা বিবাহ বা মিলনের ক্ষেত্রে বর্ণ মানতেন না, রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা ছিল না। তা ছাড়া ছিল কামভিত্তিক বিবাহের ফলে অতৃপ্তি, বিচ্ছেদ, অস্থিরতা—যা মানুষের ভেতরে নিরাপত্তার বোধ ও ভালোবাসা নষ্ট করে দেয়।

মানুষের আবার বর্ণ কী? সমান সমান।

এ হল প্রকৃতি বিরুদ্ধ কথা। মানুষ সবাই সমান নয়, হতে পারে না। শ্রেণিভেদ আছে এবং থাকবে, নিজের বৈশিষ্ট্য ভাঙা উচিত নয়। উলটোপালটা প্রজননের ফলে মানুষের জিন বিনষ্ট হয়েছে। এখন আমরা কেবল উন্মার্গগামী, পাগল, নিষ্ঠুর ও নিঃসঙ্গ মানুষের দেখা পাচ্ছি। এই প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অতি ভয়াবহ। মৃত্যু ছাড়া অন্য পরিণতি নেই।

সব অন্ধকার?

না, তা নয়। প্লাবনে সব ভেসে গেলেও কোথাও কিছু অঙ্কুর থেকে যায়, বীজ থেকে যায়।

সেরকম কিছু আছে?

থাকতে পারে।

আপনি নিশ্চিত কিছু বলতে পারেন না?

না, যদি কয়েকটা মাত্র সুপ্রজনন মানুষ ঘটাতে পারে, যদি কয়েকটি মাত্র স্নেহশীল নারী ও পুরুষের জন্ম হয় তাহলেও আশা আছে।

গুণ চুপ করে যায়, একটু পরে বলে, আমি হয়তো আজ রাতে মারা পড়ব। তার আগে এই আশার কথাটুকু আমার জানা দরকার ছিল।

দূরাগত গলা বলল, কত লোককে হত্যা করার জন্য কত লোক ওত পেতে রয়েছে।

গুণ সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে জিগ্যেস করে, আপনি কি মানুষ, না যন্ত্র?

সামান্য হেসে ওপারের গলা বলে, মানুষের ভালোর জন্য কিছু লোক এখনও কাজ করছে। যন্ত্রের প্রভাবে তারা এখনও যন্ত্র হয়ে যায়নি।

অনেক ধন্যবাদ।

শুনুন, যে মেয়েটি আপনাকে হত্যা করার জন্য আপনারই ঘরে অপেক্ষা করছে তার জন্ম মোটামুটি ভালো।

সে কে?

তার বাবা-মা ছিল সুখী দম্পতি। গত শতাব্দীর শেষে তাঁদের বিয়ে হয় পুরোনো প্রথায়,

বর্ণাশ্রম মেনে। এই দশকের গোড়ার দিকে তাঁরা বিবাহহীনতার আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার কাজে নামেন। ফলে কিছু উগ্র আধুনিক মানুষ তাঁদের মেরে ফেলে। মেয়েটি সবই জানে কিন্তু বলে না।

গুণ বলে, আমারও জন্ম হয়েছিল সুখী দম্পতির কোলে। কিন্তু পরে যুগের প্রভাবে আমার বাবা-মা বিচ্ছিন্ন হন।

সে সব আমরা জানি। আপনারা বর্ণে বৈশ্য।

গুণ চমকে ওঠে। বৈশ্য শব্দটা সে ভুলেই গিয়েছিল। বর্ণাশ্রম বা পদবি এ আমলে লোপাট হয়ে গেছে। বর্তমানে মানুষ কেবলমাত্র পদবিহীন নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়।

গুণ বলল, হ্যাঁ, সে কথা সত্যি।

ওপাশের মানুষ একটু হেসে বলে, সুসিও তাই। যদিও ওর দেশ ভিন্ন, কিন্তু বর্ণে ও আপনার গোষ্ঠীভুক্ত।

ও কি আমাকে মারবে?

মারারই কথা।

তাহলে?

কণ্ঠস্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, অন্যায়কে প্রতিরোধ করলে সব সময়ে লাভ হয় না।

আপনি কি বলছেন আমি বিনা প্রতিরোধে ওর হাতে খুন হতে দেব নিজেকে? তাতে কী লাভ হবে?

দূরের স্বর একটু ভেবে বলে, যতদূর জানি এ মেয়েটি আগে কখনও খুন করেনি। যদি আপনাকে খুন করে তাহলে এই প্রথম। তবে মেয়েটির একটি মনোরোগ আছে। ও একা থাকতে ভয় পায়। আর এ রোগটা ওর পক্ষে খুবই উপকারী।

কেন?

তার ফলে ও হয়তো ওর সঙ্গীকে মেরে ফেলার আগে সময় নেবে, সঙ্গ চাইবে। ও আপনাকে হুট করে মারবে না।

কিন্তু আমি কী করব?

মানুষের কখন কী করা উচিত তা তার নিজেরই স্থির করা ভালো। বিশেষত আপনিও নিঃসঙ্গ এবং আপনিও মানুষকে নিয়ে ভাবেন। এবং আপনি কখনও কাউকে হত্যা করেননি।

কিন্তু এ মেয়েটি আমাকে খুন করতে চায় কেন?

মেয়েটি চায় না, ওর দল চায়। আর খুন ওরা আপনাকে করবে কিছু একটা করার জন্যই। অন্যকে খুন না করলে ওরা নিজেরা যে বেঁচে আছে তা বুঝবে কেমন করে?

কেন যেন নিজেকে অপরিচ্ছন্ন লাগছিল সুসির। সে বাথরুমে গেল। আয়নায় নিজের দাঁত দেখে তার মনে হল দাঁতগুলো বড় অপরিষ্কার।

একটা অটোমেটিক টুথব্রাশ চালু করে সুসি। যন্ত্রটা তার মুখের মধ্যে সযত্নে ব্রাশ চালিয়ে ময়লা সাফ করে দেয়।

সুসি ঠান্ডা জলে স্নান করল খুদে সুইমিং পুলে নেমে। তরপর ড্রায়ার যন্ত্রের খোপে ঢুকে গায়ের জল শুকিয়ে নিল চোখের পলকে। সাজবার ঘরে ঢুকে একটা হেয়ার স্টাইলের যান্ত্রিক টুপি পরে নিল মাথায়। চুল আঁচড়ানো এবং সাজানো হয়ে গেল আপনা থেকেই।

সাদা রোব গায়ে ঘরে ঢুকে চারিদিক চেয়ে সুসি টের পায়, এ সব ঘরে বহু পুরোনো

দিনের ঘাম, ধুলো, গন্ধ জমে আছে।

সাফাই যন্ত্রের চোঙ হাতে সে সর্বত্র ঘরে ঘুরে-ঘুরে অদৃশ্য ময়লা আর নোংরা পরিষ্কার করতে থাকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরদোর ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

সুসি জানে, গুণের ফেরার সময় হয়নি। তার সন্দেহ, তাদের দলের সর্দার নীল গুণকে অনুসরণ করছে। সময় মতো ঠিক সুসিকে সে খবর দেবে।

নীলের কথা ভেবে সুসি এখন একটু আড়ষ্ট হয়ে যায়।

নীল হচ্ছে সম্পূর্ণ পুরুষত্বহীন এক যুবক, বয়স সুসির মতোই। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তার চোখ কুটিল, মন জটিল এবং নিষ্ঠুরতা সীমাহীন। ওর মতো বুদ্ধিমান ও নোংরা দুটি মানুষ নেই। নীল কখনও সত্যি কথা বলে না। ওর মতো বিশ্বাসঘাতকও দুটি নেই। মাত্র সাত বছর বয়সে নীল তাব মায়ের চোখে ওষুধ দেওয়ার বদলে অ্যাসিড ঢেলে অন্ধ করে দেয়। নীল মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, হত্যার প্রেরণা দেয়। তার বন্ধু না থাক অনুগামী অনেক, নীল ঠিক নিজের ছাঁচে সবাইকে তৈরি করছে।

ভাবতে ভাবতেই ফোনে ডাক এল।

সুসি ফোন ধরতেই নীলের বিরক্ত গলা ভেসে আসে ঃ কী করছ সুসি?

সুসি সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, কিছু না।

রিভার্স ক্যামেরা চালু করো, আমি তোমাকে দেখতে চাই।

সুসি আদেশ পালন করে।

নীল তাকে পরদায় দেখে বলে, তুমি স্নান করেছ?

করলাম।

আর কী?

ঘরদোর সাফ করলাম।

ঘর তোমার নয়। কেন পরিষ্কার করছ?

এমনি।

বিরক্ত নীল বলে, তৈরি থাকো। গুণ এখন দু-নম্বর সেক্টরে। বাড়ি ফিরছে। ও আমাদের সম্পর্কে সব খবর নিয়েছে। ও যে তোমার হাতে খুন হবে তাও জানে। সুতরাং ওকে মারতে কোনও আনন্দ পাবে না তুমি, মরতে ও প্রস্তুত, ভয় পেয়ো না। ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে রশ্মি চালাবে। দু-সেকেন্ডও দেরি করবে না। বাইরে আমি বাতাসগাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব, তুমি কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলেই তুলে নেব।

ও যদি খারাপ লোক না হয়ে থাকে?

তবু মারবে। আমরা মৃত্যু দণ্ডাদেশ ফিরিয়ে নিই না। তা ছাড়া তোমার প্র্যাকটিসের জন্যও এ লোকটার মরা দরকার। আজ রাতে তোমার প্রথম খুন উপলক্ষে আমরা উৎসব করছি।

ফোন নিশ্চুপ হয়ে যায়।

সুসি উঠে রান্নাঘরে আসে। আবার কফি তৈরি করে। আস্তে-আস্তে কফি খেতে-খেতে ঘুরে বেড়ায় চারিদিকে, গুণগুণ করে গান গায়। একটু বাদেই তাকে জীবনের প্রথম খুনটা করতে হবে, এ কথা তার মনেই হয় না।

রাত হচ্ছে, সুসির খিদে পেয়ে যায়। অল্প দূরেই রেস্তোরাঁ রয়েছে। ফোন করে দিলেই ইলেকট্রিক ট্রলি বোঝাই খাবার চলে আসবে। সে নিজেও রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে আসতে পারে। কিন্তু একাকীত্ব কাটানোর জন্যই সুসি আবার রান্নাঘরে চলে আসে।

মাত্র দশ মিনিটেই স্বয়ংক্রিয় এক রাঁধুনি যন্ত্র তার জন্য সুস্বাদু তিন-চার রকমের খাবার

প্রসব করে। রান্নার সময় সুসি রাঁধুনি যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল, এই রান্নাঘর এর আগে আর কেউ ব্যবহার করেনি। যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আনকোরা রয়েছে।

সুসি পেট ভরে খেল। খাওয়ার সময়ে সে টের পেল, বহুক্ষণ সে কোনও কিছুই খায়নি। বড় বেশি ক্ষুধাতুর ছিল সে। পেট ভরার সঙ্গে-সঙ্গে তার শরীরে আর মনে কিছু পরিবর্ত্তন আসে। ভারী স্নিগ্ধ লাগে। মন এবং শরীর ক্রমশ অলস হয়ে পড়ে।

সুসির গান শুনতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু যন্ত্রের গান নয়, সাদা গলার গান। ইচ্ছেটা খুব স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার মন খুব চনমন করতে থাকে। ভারী ব্যাকুলতা বোধ করে সে। তার হাতে একটা সাংঘাতিক কাজের দায়িত্ব রয়েছে সে কথাও মনে পড়ে। রশ্মিযন্ত্রটা যে কোথায় রাখল সে!

চারদিকে একবার চাইল সে, কিন্তু তেমন খুঁজল না। এক্ষুনি দরকার নেই। আসলে সে নীলের আদেশ মানবে না। গুণকে সে এক্ষুনি খুন করতে চায় না। একটু ভাব করতে চায়। কথা বলতে চায়। তারপর অবসর বুঝে যন্ত্রের বোতাম টিপলেই হল।

কখন একটা কৌচে বসে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সুসি। মুখখানা অল্প হাঁ করা, বাঁদিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে এলায়িত শরীর, চুলের গুচ্ছ মেঝে ছুঁয়েছে। সে টেরও পায়নি কখন নিঃশব্দে দরজা খুলে গুণ ঢুকেছে ঘরে।

এ লোকটাকে কী যেন করতে হবে, বলেছিল নীল! কিছুতেই মনে পড়ছে না যে! ঘুমের নেশায় মগজ বড় এলোমেলো। কফিতে কিছু মেশানো ছিল কি?

সুসি উঠে বসে দেখে, সামনে গুণ দাঁড়িয়ে। স্তম্ভের মতো স্থির। অকপট চোখে তাকেই দেখছে। কতক্ষণ এসেছে ও?

বাইরে একটা আকাশগাড়ির হর্ন শোনা গেল। অধৈর্যের ইশারা! নীল নিশ্চয়ই। হর্ন দিয়ে বলতে চাইছে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে এসো।

সুসি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওঠে।

সামান্য বিষণ্ণ হেসে গুণ বলে, তাড়া নেই।

সুসি অবাক হয়। এ লোকটা তাকে কী ভীষণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল আজ বিকেলে। এখন বলছে, তাড়া নেই।

সুসি চারিদিকে চেয়ে তার রশ্মিযন্ত্রটা খুঁজল। দেখতে পেল না। কোথায় গেল সেটা।

গুণ পোশাক পালটাল না। সুসির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, এতক্ষণ কেমন কাটল?

যেমন রোজ কাটে। একা।

তোমার কেউ নেই?

না।

আমারও না।

এ কথায় সুসির অল্প একটু অভিমান হয়। সে তো আগেই বারবার বলেছে একে যে, সে কত একা! সে কথা কি ও আগে শোনেনি? না কি গ্রাহ্য করেনি?

গুণ খুব সতর্কভাবে চারিদিকে চেয়ে বলল, তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

সুসি হেসে ফেলল, আমি কিছুই নিয়ে আসিনি। সে তো তুমি দেখেছ!

সুসি সামান্য কেঁপে গেল ভিতরে-ভিতরে। ও কী বলতে চায়? মাথা নেড়ে সুসি বলে, আমার কিছু নেই।

হৃদয়?

ও সব কুসংস্কার। পুরোনো ঠাট্টা কোরো না।

গুণ আস্তে উঠে দাঁড়ায়। একটু দূর গলায় বলে, সুসি, আমি প্রতিরোধহীন। পৃথিবীতে কেউ নিরাপদ নয়।

সুসি চুপ করে থাকে। বাতাসগাড়ি হর্ন দিচ্ছে।

গুণ শোওয়ার ঘরে যায় এবং বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলে, সুসি, ঘুমের মধ্যে মরতে আমার ভয় নেই।

সুসি ভ্রূ কুঁচকে ভাবে। বাতাসগাড়ির হর্ন তাকে ঘনঘন তাগাদা দিতে থাকে।

সুসি ওঠে। ধীরে-ধীরে সে সারা ঘর খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল তার রশ্মিযন্ত্র?

অনেকক্ষণ বাদে তার মনে পড়ে। সে গিয়ে সাফাই যন্ত্রের চোঙটা আলোয় তুলে দেখে। চোঙের ভেতর ধাতব ছাঁকনিতে রশ্মিযন্ত্রটা আটকে আছে। যন্ত্রটা খুলে আনে সুসি! তারপর হাতে নিয়ে দেখে, বেঁকে চুরে অকেজো হয়ে গেছে রশ্মিযন্ত্র।

সুসি ছুড়ে ফেলে দেয় যন্ত্রটা।

বাইরে নীল ডাকছে। কিন্তু বেশিক্ষণ ডাকবে না। আকাশে গোয়েন্দা পুলিশের ট্রেসার মডিউল ঘুরছে।

সুসি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মস্ত চুলের গোছাটা হাতের আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে-আঁচড়াতে সুসি আপন মনে বলে, একদিন যন্ত্রই যন্ত্রকে খাবে। সব খেয়ে ফেলবে। সেদিন আমরা সুখে থাকব।

নীল ঘরে ঢুকল না।

গুণ ঘুমিয়ে রইল। সুসি রইল সারারাত পাহারায়।

# নয়ন শ্যামা

বাস থেকে নেমেই শ্যামা নয়নকে দেখতে পেয়েছিল।
বাস যেখানে থেমেছে, সেখানে জাতীয় সড়কের ধারেই হাট বসেছে। ছোট হাট, তবু সেখানে ব্যাপারীর ভিড়, ক্রেতাদের আনাগোনা। মুরগির ঝাঁপি সাজিয়ে একজন দোকানি বসে আছে। তার পাশেই একজন বুড়ো চাষি একটা হাড়-বেরকরা গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে। এটা গো-হাটা নয়। তবু বুড়ো কী ভেবে তার গরু নিয়ে এসেছে কে জানে। সেই মুরগির ব্যাপারী আর গরুওয়ালা বুড়োর মাঝ বরাবর নিতান্ত বেমানান পাকা জলপাই রঙের দামি প্যান্ট আর গাঢ় হলুদ জামা গায়ে নয়ন দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে উগ্র জ্বালা, ঠোঁটে সিগারেট।

বাস থেকে প্রথমেই শ্যামা নামল, তারপর বাবা আর মা। শ্যামা নামতে-নামতেই নয়নকে দেখতে পেল, ভিড়ের মধ্যেও। একপলক দেখা। বুকটা চমকে উঠেছিল শ্যামার। পরমুহূর্তেই অবশ্য নয়ন গা-ঢাকা দিল ভিড়ের মধ্যে। শ্যামা পলকে চোখ ঘুরিয়ে বাবা মার মুখ দেখে নিল। বাবা মার মুখ দেখে বোঝা যায় যে তারা নয়নকে দেখেনি।

অনেকদিন ধরেই নয়ন পিছু নিয়ে আছে। সব জায়গাতেই পিছু নেয়। কিন্তু এতটা আসবে, আগে ভাগে এসে অপেক্ষা করবে তা কল্পনা করেনি। তার ভেতরটায় এতক্ষণ নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে আসার যে আনন্দটা ছিল তা হঠাৎ কেটে গিয়ে ভেতরটা হঠাৎ পোড়ো বাড়ির মতো ভয়-ভয় ভাবে ছেয়ে গেল। ভয়টা নয়নের জন্যে। যদি বাবা-মা টের পায় নয়ন এখানে এসেছে তবে কী হবে!

হেমন্তকাল। কলকাতায় এসময়ে শীত নেই। দুপুরে এখন পাখা চলে। শ্যামা গরম জামা কিছু আনেনি। কিন্তু সড়কে পা দিয়েই সে বাতাসে চোরা শীতের টান টের পেল। উঁচু জাতীয় সড়কে দিগন্তের হাওয়া এসে লাগছে। ভেতরটা কেঁপে ওঠে শ্যামার। ভয়ে, শীতে।

কাঁধের শালটা বাবা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে মার দিকে ফিরে বলল—বলিনি তোমাকে, মফস্‌সলে এসময়েই শীত পড়ে যায়।

—তাই তো দেখছি। ভরদুপুরেও বেশ বাতাস। এই বলে মা ভেলভেটের খাটো স্টোলটা জড়িয়ে নেয়।

বাবা শ্যামার দিকে ফিরে বলে—তুই তো কিছুই আনলি না। ফেরার সময়ে ঠান্ডা লাগিয়ে বসবি। একেই পাকা টনসিল তোর, আমার শালটা নে বরং।

—আমার তো গরম লাগছে।

বাবা একটু হাসে—ওসব কম বয়সের কথা। গরম নেই।

মা বলল—আঁচলটা জড়িয়ে নে গলায়।

শ্যামা তাই নেয়। তার শীত করছে ঠিকই। একটু আগে বাসে গাদাই ভিড়ে বসে সে ঘামছিল। মানুষের গায়ের ভাপে একটা গরম আছে তো। এখন খোলা বাতাস বলে, নাকি নয়নকে দেখেছে বলে কেন যেন তার শীত করছে, কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

—এইখানে দিব্যি হাট বসেছে দেখছি।

বাবা একটুক্ষণ নাবালের হাটটার দিকে চেয়ে দেখে। ততক্ষণ প্রায় শ্বাস বন্ধ করে থাকে শ্যামা। বাবা চোখ ফিরিয়ে বলে—ফ্রেশ ডিম-টিম, মুরগি শাকপাতা পাওয়া যায়, ফুলকপি-টপিও উঠেছে বোধহয়। ফেরার সময়ে যদি হাতে সময় থাকে তো দেখা যাবে।

—থলে টলে তো আনোনি। মা বলে।

—রুমাল আছে, শ্যামার ভ্যানিটি ব্যাগটাও বড়সড়ো—

শ্যামা এতক্ষণে একটু হাসে—আমার ব্যাগে শাকপাতা ঢোকাবে নাকি?

—শাকপাতা না হোক, ডজনখানেক ডিম এঁটে যাবে। আঁটবে না?

—যদি ডিম ভাঙে তো ব্যাগের দফা শেষ। তখন আর একটা কিনে দেবে তো?

অফিস থেকে রিটায়ারমেন্টের সময়ে ফেয়ারওয়েলে পাওয়া চমৎকার বেনারসী লাঠিখানা একবার ওপরে তুলে আবার নামিয়ে বাবা বলে—ওরে ভাবিস না, হাট যখন একটা থলেও ওখানে কিনতে পাওয়া যাবে।

—বাবা, সব জায়গায় তোমার কেবল খাই-খাই।

বাবা একটু হাসে, বলে—খেতে আর তোরা দিস কোথায়! নুন বারণ, ফ্যাট বারণ, এত সব বারণে আর খাওয়ার থাকে কী?

—ব্লাডপ্রেসার দুশোর কাছাকাছি ওঠে কেন? তুমি প্রেসার ঠিক রাখো আমরা সব বারণ তুলে নেব।

—আর কমেছে। এটাই শেষ রোগ। একটা তো হয়ে গেছে, আর দুটো স্ট্রোক মোটে পাওনা।

শুনে শ্যামা চুপ করে থাকে। চোখ ছলছল করে। মা ধমক দিয়ে বলে—সব সময়ে তোমার আকথা কুকথা। যে-কোনও ভালো কথার মাঝখানেও তুমি কেবল তোমার রোগ-ভোগের কথা তুলে ফ্যালো। ওটা ভালো নয়।

জাতীয় সড়ক ধরে একটু এগোলেই ঝকঝকে নতুন একটা কংক্রিটের পোল। নীচে ছোট্ট একটা নদী তরতর করে বয়ে যাচ্ছে। পোল পেরোলেই বাঁ-ধারে একটা বিরাট আমবাগান। জাতীয় সড়ক থেকে একটা মেটে রাস্তা নেমে আমবাগানে ঢুকে গেছে।

পোলের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা তার নকশাকাটা সুন্দর লাঠিগাছ তুলে মেটে রাস্তাটা দেখিয়ে বলে—ওই হচ্ছে রাস্তা। এখান থেকে মাইলখানেক যেতে হবে।

শ্যামা পোলের রেলিং ধরে ঝুঁকে নদীটা একটু দেখে। জল বড় পরিষ্কার। সেই জলে তার ছায়া পড়ে। চারটে নৌকো পাড়ে বাঁধা। জলের নীচে মাছের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে। জল থেকে চোখ তুলে শ্যামা একবার হাটের দিকে তাকায়। কিছুই বোঝা যায় না। কয়েকটা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, চালাঘরের নীচে দোকান দোকানে মানুষ। রংচঙে জামাকাপড় ঝুলছে এধার ওধার। হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যান্ট পরা নয়ন কোথাও নেই। শ্যামা একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে শুনতে পায় মা বলছে—রাস্তা তুমি ভারী চেনো কি না।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে—চেনার কী? এসব গাঁ-গঞ্জ জায়গা, কলকাতার গোলক ধাঁধা তো নয়। বাসে তিনজনকে জিগ্যেস করে সিওর হয়ে নিয়েছি।

—তা হোক। তবু এখানকার কাউকে জিগ্যেস করে নাও। সেবার তুমি দেওঘরে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে, মনে নেই! বুড়ো বয়সে কী কাণ্ড।

—আরে, সে তো কানাওলায় ধরেছিল বলে। নিজের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি অথচ বাসা চিনতে পারছি না। কানাওলা হচ্ছে একরকমের স্পিরিট।

—তা হোক, তবু জেনেশুনে রাস্তায় নামা ভালো।

হাতে একটা ছোট্ট শোলমাছ নিয়ে এক গেঁয়ো হাটুরে হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে, বাবা তাকে জিগ্যেস করে—মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির রাস্তা তো ওইটে, না?

—ওইটেই। আমবাগানের ভেতর দিয়ে চলে যান। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবেন তো! এখান থেকে মাইলখানেক।

—আপনি ওদিকে যাবেন নাকি?

—না। আমি যাব বামুনগাছি। সোজা কোশখানেক গিয়ে ডানহাতি।

—ওই দিকটায় লোক চলাচল নেই?

—আছে, তবে কম। মোনা ঠাকুরের জন্যেই আজকাল লোকজন যায়। হাট ফুরোলে কিছু লোক ফিরবে। কিন্তু একা হলেও ভয় নেই। রাস্তা নিরাপদ।

—সাপখোপ?

লোকটা একটু হাসে—দিনের আলো রয়েছে, ভয় কী। লাঠিটা একটু ঠুকে ঠুকে চলবেন। সাড়া পেলে ওরা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মানুষকে সবাই ডরায়। চলে যান, ভয় নেই।

শ্যামা নয়নকে আর দেখতে পেল না বটে, কিন্তু বুকের ভেতরটা খিঁচ ধরে রইল। নয়ন খামোকা এতদূর আসেনি। এসেছে যখন কাছে আসার চেষ্টাও নিশ্চয়ই করবে। ও এখন মরিয়া। ওর প্রাণের ভয় নেই।

বাবা একবার গলা খাঁকরি দিয়ে লাঠিটা বার কয়েক রাস্তায় ঠুকে নিল। বলল—চল। বড় রাস্তা ছেড়ে তারা মেটে রাস্তায় নামল। তারপরই আমবাগানের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল জাতীয় সড়ক, ওপারের হাট, নয়ন। গো-গাড়ির চাকায় রাস্তা এমনভাবে ভেঙে দু-ধারে বসে গেছে যে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। আপনা থেকেই তারা আগুপিছু হয়ে গেল। সামনে বাবা, তারপর মা, সবশেষে শ্যামা।

বাবা হাতঘড়ি দেখে বলল—মোটে পৌনে দুটো। আমরা আস্তে হাঁটলেও গিয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টা তিনেকের বেশি লাগবে না। সন্ধের আগেই বাস ধরতে হবে।

মা একটু বিরক্ত হয়ে বলে—মঠে মন্দিরে যাওয়ার সময়ে অত ফেরার তাড়া থাকলে হয় না। তুমি বাপু বড্ড ঘরকুনো হয়েছ আজকাল। বাবা একটু থতিয়ে গিয়ে বলল—তা নয়। আসলে দিনকাল তো ভালো না, তোমাদের গায়ে সোনার গয়না-টয়না রয়েছে।

—লোকটা তো বলল ভয়ের কিছু নেই।

—ওসব লোকের কথা কি ধরতে হয়? বলে দিল ভয় নেই, তা বলেই কি ভয় নেই? দেশে আনএমপ্লয়মেন্ট, খরা, বন্যা চারদিকে উপোসি অভাবী লোক। এ সময়ে চোর, গুণ্ডা, বদমাশ দেশে বাড়েই।

তারের যন্ত্র যেমন বাজে তেমনি তীব্র স্বরে গাছে গাছে পাখিদের ডাক বেজে যাচ্ছে। শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায়। শ্যামার বুক কাঁপছে। একটা পাখির শিস কানে এল। উৎকণ্ঠ হয়ে শুনল শ্যামা। নয়ন নানারকমের শিস দিতে পারে।

বাবা যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে—কী ঠান্ডা সুন্দর নির্জন জায়গা এসব। কলকাতায় আমরা যে কি নরকে থাকি। শব্দ আর শব্দ।

মা বলে—গাঁ গঞ্জ তো ঠান্ডা হবেই।

বাবা আবার হাঁটতে-হাঁটতে উদাস গলায় বলে—কলকাতার জমিটা বেচে দিয়ে এসব দিকে চলে এলে কেমন হয়। ফ্রেশ বাতাস, ভালো তরিতরকারি, ডিম, দুধ, মাছ—

মা বলে—ও তোমাদের মুখের কথা। কলকাতা তোমাদের বশীকরণ করে রেখেছে। সেবার দেওঘরে গিয়ে একমাসও থাকিনি, তুমি কি হুড়োহুড়ি শুরু করলে—এখানে সিগারেটের টোবাকো পাওয়া যায় না, এ নেই, সে নেই—কুড়ি দিনের মাথায় ফিরে আসতে হয় তোমার জন্যেই তো! তুমি আবার থাকবে গাঁয়ে।

বাবা হাসে, বলে সে অবশ্য ঠিক। এক সময়ে যখন মফঃস্বলে চাকরি করতাম তখন কলকাতার নামে ভয়-ভয় করত। তারপর কলকাতায় একটা বড় সময়ে থেকে কলকাতার সুবিধেগুলোয় এমন অভ্যাস হয়ে গেল আর কোথাও সে আরামটা পাই না। ধর গ্রীষ্মকালে। যদি কখনও ফুলকপি খেতে ইচ্ছে করে, কিংবা অসময়ে গলদা চিংড়ি—সে কেবল ওখানেই

পাবে। অন্য কোথাও—

শ্যামা হাসে—বাবা, আবার?

চারদিকে গভীর অরণ্য-ছায়ার কোথা থেকে আবার সেই শিসটা শোনা যায়। পাখির ডাকের মতো, কিন্তু পাখির ডাক কি না, তা শ্যামা বুঝতে পারে না ঠিক। উৎকর্ণ হয়ে শোনে। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়।

রাস্তার ওপর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে রোদ এসে পড়েছে। দুলছে আলো-ছায়া, দোলে রহস্য। বিচিত্র অচেনা পাখিরা ডাকে। কে জানে সেই সব অচেনা পাখিদের একজন হয়ে নয়ন ডাকে কি না। পিছন ফিরে একবার তাকায় শ্যামা। সঙ্গে-সঙ্গে হোঁচট খায়।

—সাবধানে আয়। মা হাত বাড়িয়ে বলে।

—ঠিক আছে মা।

—কদবেলের গন্ধ পাচ্ছ? বাবা জিগ্যেস করে।

মা বাতাস শুঁকে বলে—কি একটা গন্ধ যেন চামসে মতন। বাবা শ্বাস ফেলে বলে—বাঁদরলাঠি, সেই যে লম্বা লম্বা, সেগুলো ভাঙলেও এরকম গন্ধ বেরোয়।

বুনো কুলের ঝোপ পেরোবার সময়ে বাবা শ্যামাকে ডেকে দেখায়—এই কুল দেখ, বড় পুঁতির মতো হয়, পাকলে ভারী মিষ্টি, মাণিকপুরের জঙ্গলে কত খেয়েছি।

বাতাস এখানে ভারী পরিষ্কার, সতেজ, বাতাসে বন্য গন্ধ, ভেজা মাটির সোঁদা মিষ্টি গন্ধটি। ছায়ায় কেমন শীত-শীত করে। শ্যামা তার আঁচল গায়ে জড়ায়। ভীতু খরগোশের মতো চারদিকে চায়। টুপটুপ পাতা এসে পড়ছে গাছ থেকে। জলের ফোঁটার মতো টুক করে একটু শব্দ হয় কি হয় না। এই ছায়াটি, এই নির্জনতা, এই অচেনা জায়গার সৌন্দর্য কী নিবিড় সুন্দর বলে মনে হয় হেমন্তের এই গড়ানে দুপুরে! শ্যামার চোখে যদি নয়নের হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যান্টটা না ছায়া ফেলত।

আগাছা রাস্তার মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে। আঁচলে টান পড়তেই শ্যামা কেঁপে ওঠে, তারপর লজ্জিত মুখে গাছের কাঁটা থেকে তাড়াতাড়ি আঁচল ছাড়ায়। জোরে হাঁটা বাবার বহু কালের অভ্যাস। স্বভাবতই বাবা এগিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তার আর মার জন্য। আগু-পিছু তারা চলে।

—তোমার ইচ্ছের জন্যই আসা। কিন্তু আমার মন বলে, তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হবে না। বাবা উদাস গলায় বলে।

মা চুপ করে থাকে। তাদের মাঝখানে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

শ্যামা স্তিমিত, নরম গলায় বলে—মোনা ঠাকুরের খুব নাম-ডাক।

—শুনেছি, কিন্তু আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গরু। বুকের মধ্যে ভয়টা সব সময়ে থম ধরে থাকে। তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বেরিলিতে, তাও পাঁচ বছর হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে কত কী হয়ে যায় মানুষের, তার ওপর .পাগল মানুষ। বলে বাবা বড় করে শ্বাস ছাড়ে।

মার পা ধীর হয়ে আসে। তারপর একটু ধরা গলায় বলে—যা হওয়ার তা হয়েছে, তুমিও তো আর জ্যোতিষ নও।

—সন্ন্যাসী-ফকিরের পিছনে তো কম ঘোরা হল না।

—যত দিন বেঁচে আছি ততদিন ঘুরব। আমরা চোখ বুজলে তখন তার যা হওয়ার হোক। বাবা মাথা নেড়ে বলে—আমার মনে হয় না যে সে বেঁচে আছে।

বে-ফাঁস কথা। এ কথাটা মা কোনওদিন সহ্য করতে পারে না। দাঁড়িয়ে পড়ে মা হাঁফাতে থাকে। তীব্র স্বরে বলে—তোমার কেবল ওই কথা। কিন্তু সে গেছে বলে যতদিন না জানতে পারছি ততদিন তোমাকেও ঘুরতে হবে। আমাকেও। মার কাছে ছেলে যে কী তা

কোনওদিন বাবা বুঝতে পারে না।

বাবা সঙ্গে-সঙ্গে নরম হয়ে গিয়ে বলে—আমি তো ঘুরিই। ঘুরি না? বলো।

আবার তারা হাঁটতে থাকে। আগু-পিছু হয়ে। অচেনা পাখিরা ডাকে। গাছের ছায়ায় শীত জমে ওঠে। ঠান্ডা মাটি থেকে শীতলতা উঠে আসে। চারদিকে রহস্যময় আলো-আঁধারি। এর মধ্যেই কোথাও অলক্ষ্যে নয়নও চলেছে সঙ্গ দিয়ে। হয়তো পাখি হয়ে। হয়তো গাছের ছায়া হয়ে। শ্যামার বড় ভয় করে।

এখানকার তাড়িটা ভালোই। নয়ন ঠোঁটের ফেনা মুছে নেয়। এখন ঠিক এই সময়ে তাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তার। অনেক কাল নেশা-ভাঙ করেনি সে। ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু কে জানত যে এখানে কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে, ভর দুপুরে এমন শীত করবে। নেশাটা সেই জন্যেই করা। তবু, যাকে ঠিক নেশা বলে তা হয়নি।

তাড়িটা কিন্তু ভালোই। খারাপ কিছু মেশায়নি। পরিষ্কার গন্ধ, চনচনে স্বাদ। শীত ভাবটা কেটে গেল। ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে বলল—তোমাদের এখানে এত শীত কেন হে?

—শীত হয় না এ সময়ে। ক'দিন বৃষ্টি গেল পরের পর। আজ দু-দিন টেনে হাওয়া দিচ্ছে দেখছি। তাড়িওয়ালা যুবকটি বলল।

একটু আগে শ্যামা তার মা বাবার সঙ্গে নেমেছে। কোথায় যাবে তা নয়ন জানে। তাই পিছু নেয়নি, হাট পেরিয়ে দক্ষিণে গেলে একটা বাঁশের সাঁকো আছে। সেইটে দিয়ে পেরিয়ে নয়ন শর্টকাট-এ আমবাগানের গহিন জায়গাটায় পৌঁছে যাবে। তাড়া নেই। ওরা যে জোরে হাঁটবে না—এ তো জানা কথা।

নয়ন হাই তুলে জিগ্যেস করে—চাষবাস করো?

—আজ্ঞে না। বাবা করে একটু-আধটু, বছরের চালটা উঠে আসে। আমার একটা চায়ের দোকান আছে বল্লভপুরে।

—তালগাছ কটা?

—অনেক। ওইটাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। বলে হাসে তাড়িওয়ালা।

—ঝাণ্ডাওয়ালারা গাঁয়ে আসে না?

—আসে।

—কোন ঝাণ্ডা বেশি আসে?

—সবরকমই। সবাই ভালো-ভালো কথা বলে।

—তোমরা কোন ঝাণ্ডার দলের?

—সে কি বলা যায়? আমরা এখন চালাক হয়ে গেছি।

—ভোট-টোট দাও?

—দিই মাঝে-মাঝে।

নয়ন হাসে। বলে—খুব চালাক হয়ে গেছ তোমরা। ফসল-টসল কেমন হয়?

—হয়। এদিকে বৃষ্টি হো। আমনের ফসল ভালো এবার।

—ফসল রাখতে পারো? কেটে নিয়ে যায় না?

—নেয়, আবার রাখিও। যে যেমন পারে।

নয়ন লোকটার চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। লোকটা চোখ নামিয়ে নেয়। নয়ন হেসে বলে—তোমরা খুব চালাক হয়ে গেছ।

চন্‌চনে খিদে পেয়েছে। নয়ন মাটিতে বসেছিল, এবার উঠল। উঠতেই টের পেল প্যান্টের পিছন দিকটা ভেজা-ভেজা। বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব। মাটির ভেতরে চোরা জল। রসস্থ মাটি। নয়ন কয়েক পা জুতোর হিল চেপে হেঁটে দেখল নরম মাটিতে জুতো বসে যাচ্ছে।

পাশেই তেলেভাজার দোকান। সেখানে বেশ ভিড়। গন্ধটাও ছেড়েছে ভালো। কিন্তু যে লোকটা ভাজছে তার কব্জির কাছে একটা শ্বেতীর মতো দাগ দেখে নয়ন আর তেলেভাজা কিনল না। তিনটে কাঁচা মুরগির ডিম কিনে চায়ের একটা স্টলে গিয়ে দু-কাপ চা খেল পরপর। তারপর বাচ্ছা ছেলেটাকে ডিম তিনটে দিয়ে খুব অবহেলায় বলল সেদ্ধ করে দে।

ছেলেটা একপলক নয়নের চোখে চোখ রাখল। তারপর চায়ের কেটলির পাশেই উনুনের ওপর একটা মগে সেদ্ধ চাপিয়ে দিল।

তিনটে সেদ্ধ ডিমের প্রথমটা খেতেই বিস্বাদে ভরে গেল নয়নের মুখ। নেশার মুখে সেদ্ধ ডিম বড়ই পানসে। কোনক্রমে আঁশটে গন্ধের দলাটা . ালে সে দুটো ডিম পকেটে রাখল। তারপর ফিরে এল তাড়িওলার কাছে।

—আর এক ভাঁড়।

তাড়িওলা ভাঁড় দিয়ে বলে—নির্ভয়ে খান। এর নেশা খুব পাতলা। বাবু, আপনার কোন ঝাণ্ডা?

নয়ন ভাঁড় মুখে দিয়ে কুলকুচো করে মুখের বিস্বাদ তাড়িয়ে বলে—জানলে যদি প্যাঁদাও বাপু!

লোকটা হেসে বলে—ওরেব্বাস্ রে! কলকাতার বাবু আপনারা, ধমক দিলে হেগে মুতে ফেলি।

—খুব চালাক, না? আমার ঝাণ্ডা লাল, বুঝলে? তবে লালটা অনেকটা রক্তের মতো, অন্য সব ঝাণ্ডার সঙ্গে মেলে না। আমার নিজের ঝাণ্ডার রঙকে আমি নিজেই ভয় পাই।

লোকটা হেঁয়ালি শুনে চেয়ে থাকে।

নয়ন দাঁড়ায় না। এবার রওনা হওয়া উচিত। শ্যামা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। নয়ন হাঁটতে থাকে। দু-পকেটে দুটো ডিম ফুলে থাকে। নয়ন গ্রাহ্য করে না। লম্বা পায়ে হাটটা পেরিয়ে সে একটা টিবির ওপর উঠে আসে। দক্ষিণে সাঁকো, সঠিক জায়গাটা চেনে না নয়ন। এগিয়ে বাঁশঝাড়টা পেরোলে বোঝা যাবে। নয়ন হাঁটতে থাকে। হেমন্তের দুপুরকে শূন্য করে দিয়ে হু-হু করে একটা কোকিল ক্ষণেক ডেকে উঠেই চুপ করে যায়। নয়ন টিবির উতরাইটা দৌড়ে নামতে-নামতে অবিকল কোকিলের ডাকটা ডাকতে থাকে। কুহু-কুহু-কুহু...

শ্যামা যতক্ষণ পৃথিবীতে আছে ততক্ষণ ক্লান্তি নেই। সে এখানে এসেছে শ্যামারা আসবার তিন চারঘন্টা আগে। নয়নের হাতে ঘড়ি নেই। থাকলে ঠিক সময়টা বোঝা যেত। ঘড়িটা ইচ্ছে করেই পরেনি নয়ন। যখন শ্যামার জন্য সে কোথাও যায় তখন সে সময়ের পরোয়া করে না। তখন তার কাছে জীবনটাই একটা অখণ্ড, অনন্ত সময়। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কতদূর যেতে হবে তার কোনও ঠিক থাকে না। তবে সবটুকু সময় দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকে। যখন নয়ন এখানে এসেছে তখন হাটটা ভালো করে জমেনি। ব্যাপারীরা আসছে সবে, চত্বরটায় তখনও বিশৃঙ্খলা। জিনিসপত্রের টাল জমছে, চায়ের দোকানের উনুনে তখনও আঁচ পড়েনি। গত তিন-চার ঘণ্টা ধরে নয়ন হাটটাকে জমে উঠতে দেখেছে। কিংবা বলা যায় নয়ন কিস্সুই দেখেনি। তার চারধারে পৃথিবীর কিছু অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় মানুষেরা অকারণে ভিড় জমিয়েছে—এটুকুই মাত্র সে টের পেয়েছে। শ্যামা যতক্ষণ আসেনি ততক্ষণ এ জায়গাটার কোনও সৌন্দর্য ছিল না, তাৎপর্য নয়। ততক্ষণ সে অদরে তাড়ির কলসিটাও লক্ষ করেনি। শ্যামাকে বাস থেকে নামতে দেখে লুকোবার সময়ে সে গিয়ে প্রায় তাড়িওয়ালার গায়ে হোঁচট খেল। তখনই টের পেল। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। এ জায়গাটায় শীত পড়েছে বেশ।

বাঁশ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ের রাস্তাটা ঘুরে গেছে। ঝরা বাঁশপাতায় পুরু গালচের

মত হয়ে গেছে রাস্তা, পা রাখলে নরম লাগে। আরও দুবার কোকিলের ডাক ডাকল নয়ন।

বাঁশ-ঝাড়টা পেরোলেই দেখা যায় শ্মশান। চাতালটা খাঁ-খাঁ করছে। গত রাতে কারা মড়া পুড়িয়ে গেছে, কালো আংরার দাগ ছড়িয়ে আছে, ইতস্তত কাঠকয়লা। ওদের ঘর অনতিদূরে। খোড়ো ঘরের সামনে বসে এক মধ্যবয়সি মেয়েছেলে নিজের রুক্ষ চুলে আঙুল ডুবিয়ে উকুন খুঁজছে।

—এ ধারে নদীর ওপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে না? নয়ন তাকে জিগ্যেস করে।

মেয়েছেলেটা তাকে চোখ ছোট করে একপলক দেখে নিয়ে বলে—সে তো ভেঙে গেছে প্রায়। আরও দক্ষিণে।

—পেরোনো যাবে না?

মেয়েছেলেটা উদাস গলায় বলে—কে জানে! লোকে তো এখনও পার হয়। গত তিন-চার ঘণ্টা উগ্র উত্তেজনায় শ্যামার জন্য অপেক্ষা করছে নয়ন। কিছু খায়নি। চনচনে খিদের মুখে পাতলা তাড়িটা তাকে ধরেছে ভালো। গা জ্বালা করছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে ভেতরে গেঞ্জি। গলা বুক শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এগুলো কিছুই গ্রাহ্য করার মতো ব্যাপার নয়। খিদে-তেষ্টা, শীত-গ্রীষ্ম কোথায় যে উড়ে যায় এসব সময়ে! চারদিকটা নির্জন হয়ে যায় যেন। কেবল নয়ন থাকে, থাকে শ্যামা।

নয়ন জানে, শ্যামা তাকে দেখেছে। দেখে নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে। সে ওই আমবাগানে আবার তাকে পিছু নিতে দেখলে শ্যামা কী করবে? সেবার পিকনিক গার্ডেনসে তার কলেজের বান্ধবী আর বন্ধুদের সঙ্গে যখন গিয়েছিল শ্যামা তখনও এইরকম ভাবে দেখা হয়েছিল। শ্যামা তাকে দেখেছিল কিন্তু কিছু করেনি। যদি ইচ্ছে করত শ্যামা, যদি নয়নের সেই পিছু-নেওয়ার কথা বলে দিত তার বন্ধুদের তবে সেইসব বন্ধুরা পিষে ফেলতে পারত নয়নকে। কিন্তু শ্যামা অতটা করেনি। শ্যামা সেরকম মেয়ে নয়। নিষ্ঠুরতা তাব স্বভাবে নেই। আবার শ্যামার মতো নিষ্ঠুরও হয় না।

বাঁশঝাড়, কাঁটাঝোপ, বন-করমচার ভেতর দিয়ে উঁচু-নীচু পায়ের রাস্তা চলে গেছে। জঙ্গুলে জায়গা, ঘববাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ-ধারে আবাদ দেখা যায় গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে। সিকি মাইল গিয়ে নয়ন বাঁশের সাঁকোটা দেখতে পেল। চারদিকে হেমন্তর পাতাঝরা গাছ। নির্জন শীতলতা। সেই নিঝুমতায় বাঁশের সাঁকোটা বুড়ো জীর্ণ হয়ে ঝুলছে। জলে ছায়া দেখছে নিজের। কাছে গিয়ে নয়ন দেখে, পা রাখার জন্য একটি মাত্র বাঁশ অবশিষ্ট আছে, আর দু-ধারে ধরার বাঁশ নেই। পার হওয়া বেশ শক্ত। কিন্তু ও পাড়ে শ্যামা আছে, নয়নের কিছুই তেমন শক্ত মনে হয় না।

বার বার পা পিছলে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে-পড়তে ঝুলে আবার উঠতে হল, তবু হামাগুড়ি দিয়ে সাঁকোটা ঠিকই পার হয়ে গেল নয়ন। তারপর নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল। তারপর কেবল পাখির ডাক, আর ঝিঁঝির শব্দ এবং বন্য গাছের আর ভেজা মাটির গন্ধ। আগাছা, ঝোপ আর ছায়ার ভেতর দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিন্তু এ রাস্তায় যে লোক চলাচল খুব কম তা রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়। পায়ে হাঁটা রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে।

পাখির ডাক নকল করতে-করতে নয়ন হাঁটে। যত বিচিত্র ডাক শোনে ততই বিচিত্র ডাক সে হুবহু নকল করে। ভর-দুপুরে খিদে পেটে তাড়িটা গেঁজে উঠছে। নয়নের চোখের পাতা ভারী-ভারী, শরীরের ভেতরটা ঘুম-ঘুম। হাই উঠছে। কোন গাছের ছায়ায় শরীরটা একবার পেতে দিলে দিনটা নিঃসাড়ে কেটে যাবে। কিন্তু সে কথা নয়ন ভাবতেই পারে না। সে এগুচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে পুবে। শ্যামা এই বনভূমিরই উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে আসছে। রাস্তায়

তাদের দেখা হবে। এখন এই আমবাগানের বাতাসে শ্যামার গন্ধ আছে, স্পর্শ আছে। নয়নের হাজার বছর ধরে জেগে থাকতে ইচ্ছে করে। কিছুদূর গিয়েই নয়ন ভগ্নস্তূপটা দেখতে পায়। বিশাল বাড়ি ছিল কোনকালে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে বাড়িটার দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ইটের ভেতর থেকে, মেঝে থেকে বড়-বড় গাছ উঠেছে। চারদিকেই ছড়ানো ইট—পুরোনো শ্যাওলায় কালো। পায়ে-হাঁটা পথটা ভগ্নস্তূপটা এড়িয়ে ঘুরে গিয়ে অদূরে রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু সে পথে যায় না নয়ন। গেলে রাস্তা থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। সে রাস্তা ছেড়ে ধ্বংসস্তূপটার ভেতরে উঠে যেতে থাকে।

যেখানে ইট সেখানেই সাপ। পুরোনো বাড়ি, ইটের খাঁজ, এ হচ্ছে সাপের প্রিয় আস্তানা। নয়ন তা জানে, তবু সাপের কথা তার মনেই আসে না। আকীর্ণ শ্যাওলার পিছল ইটের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে, হোঁচট খেয়ে, তাল সামলে সে বাড়িটার দিকে উঠে যায়। ওই বাড়ির উঁচু ভিত থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাবে। দেখা যাবে শ্যামাকেও। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখবে নয়ন। বিপদ আপদের কথা তার মনেও থাকে না।

ওরা আসছে ঘুর রাস্তায়, আস্তে হেঁটে। নয়ন এসেছে চোরা পথে, অনেক তাড়াতাড়ি। তবু নয়নের হঠাৎ ভয় হয় শ্যামা জায়গাটা পেরিয়ে যায় নি তো! তাড়ির ঘোরে তার হয়তো সময় জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। সে হয়তো খুব আস্তে হেঁটেছে।

মোটা মোটা কয়েকটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। বেশ পুরু দেয়াল। এখন কোথাও কোথাও দেয়ালে পঙ্খের কাজের চিহ্ন দেখা যায়। থামের শীর্ষে কিছু কারুকাজ। একটা লোহার বরগা আড়াআড়ি মাথার ওপর রয়ে গেছে আজও। আগাছা ভেদ করে নয়ন ক্রমে বাড়ির ভেতরে ওপর উঠে আসে। চারদিক রহস্যময় ফাটল, ভেতরে-ভেতরে হাঁ করা জায়গাগুলোতে পাতালের অন্ধকার। চারদিকেই কাঁকড়া বিছেদের আস্তানা। একটা পিপাসা, একটা শিরা ছিঁড়ে যাওয়া প্রতীক্ষায় তার শরীরটা টান টান। বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক্‌ করে, চোখ জ্বলে, ঠোঁট শুকিয়ে আসে, জ্বর-জ্বর লাগে শরীর। তাড়িটা না খেলেই পারত সে। শরীরটা এখন কেমন কাঁপছে। খিদে মরে গিয়ে দুর্বল লাগে হাত পা। ঘুম পায়।

নয়ন জানলা দরজাহীন দেয়ালগুলোর ভেতর দিয়ে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরে দেখে। চারদিকে স্তূপ হয়ে ইট, বালি আর রাবিশ পড়ে আছে। ঘুরে-ঘুরে সে আসে সামনের দিকটায়। একটা প্রকাণ্ড থাম দেখতে পেয়ে দাঁড়ায়। একটু বসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বসে না। হাত বাড়িয়ে থামের গায়ে ভর দেয়। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠে। তার মনে হয়, ভর দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই থামটা একটু দুলে উঠল। সে সভয়ে প্রকাণ্ড উঁচু থামের দিকে চায়। তারপর হাসে। ভয়টা কেটে যায়। হয়তো তাড়ির নেশায় ভুল বুঝেছে ভেবে আবার থামটার গায়ে ভর রাখে, আবার মনে হয়।—থামটা দুলে উঠল কিন্তু এবার আর চমকে সরে গেল না নয়ন। ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নির্জন রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল। ভাঙা চোরা রাস্তা, দু-ধারে গরুর গাড়ির চাকার খাদ, সেই খাদে কাদা জমে আছে। সারা বছর ওই কাদা কমই শুকোয়। চারদিকে পাখি ডাকে। কেবল পাখি ডাকে। অন্যমনে বে-খেয়ালে নয়নও ডাকতে থাকে। প্রথমে দোয়েলের মতো, তারপর কুবো পাখির শব্দ করে, তারপর কোকিলের মত ডাকে।

তারপর ক্লান্তি লাগে। হরবোলা হয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। চাই নিজস্ব একটি শব্দ, নিজস্ব ডাক। নিজের শব্দটা কোনওদিনই খুঁজে পায় না নয়ন। চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল। ক্লান্তি লাগে, তবু অভ্যাসবশত সে ডাকে। প্রায় সমস্ত শ্রুত শব্দই হুবহু গলায় তুলে আনতে পারে সে। পাখপাখালির বিচিত্র ডাক, চাঁদের দিকে চেয়ে কুকুরের কান্না, বেড়ালের বিবাদ, ইঞ্জিনের হুইশল, কিংবা এরকম অনেক কিছু। কিন্তু হরবোলা হয়ে থাকার ক্লান্তি বড়

ভীষণ। সে তো ওইসব শব্দের কোনওটারই মূল উৎস নয়! সে পাখি নয়, শেয়াল কুকুর বা রেলইঞ্জিনও নয়। সে নয়ন রায়। তার নিজের শব্দ কোনটা? কোথায় তার নিজের ডাক? যে ডাক শুনলে শ্যামা সাড়া দেবে?

দূর থেকে একটা মেয়েলি গলার অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেল নয়ন। উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার গায়ে দিল কাঁটা। একটু শুনেই বুঝল এ শ্যামা বা তার মায়ের গলা নয়। বোধহয় একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে ডেকে কিছু বলল, একটা পুরুষের গলা উত্তর দিল। ভগ্নস্তূপের দক্ষিণে বনের মধ্যে তারা কিছু খুঁজছে। গাঁ-গঞ্জের লোকেরাই হবে। নয়ন গা করল না। হাত বাড়িয়ে বুক-সমান আগাছার জঙ্গল থেকে একটা ডাল ভেঙে দাঁতে চিবোতে লাগল। তিতকুটে স্বাদ, গন্ধও বিচ্ছিরি। কিন্তু সেসব তেমন খেয়াল করে না সে। অন্যমনে ডালটা চিবোতে থাকে।

—কোনও সুখই কখনও পরিপূর্ণ নয়, বুঝলে! আমাকেই দ্যাখো, চিরকাল ভালো চাকরি করেছি, পয়সা যথেষ্ট পেয়েছি। ছেলেমেয়ের দিক থেকেও সুখীই ছিলাম। একটা ছেলে একটা মেয়ে—সুস্থ সবল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল—

—তুমি রাস্তা দেখে চল। হোঁচট খাচ্ছ।

বাবা রাস্তা দেখতে গিয়ে ঝুঁকে লাঠিটা বার কয়েক ঠোকে। তারপর একটা 'হু-উম' শব্দ করে আপনমনেই বলে—কোনও সুখই চিরস্থায়ী নয়।

অদূরে একটা শেয়ালের হাসি শোনা যায়। পরমুহূর্তেই একটা কোকিল হু-হু করে ডেকে উঠেই স্তব্ধ হয়। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বলে—শেয়াল ডাকছে।

মা বলে—তাতে কী। এসব জায়গায় শেয়াল তো থাকবেই।

বাবা চিন্তিত মুখখানা ফিরিয়ে বলে—সে কথা বলছি না। দিনের বেলা শেয়াল বড় একটা ডাকে না।

--তোমার বাপু বড় ভয়।

বাবা ভ্রুকুঁচকে বলে—কোকিলটাই বা হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল কেন?

—তাতেই বা কী?

—কিছু না।

শ্যামার বুকটা খামচে ধরে এক ভয়। শেয়ালের ডাক নয়ন হুবহু ডাকতে পারে তা শুনলে কারও অন্যরকম সন্দেহই হবে না। কিন্তু এ ডাকটা যেন শেয়ালের ডাকের মধ্যে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে দেওয়া। নয়ন কি তাই করছে? কোকিলের ডাক ডেকেই সে চুপ করে গেল কেন? সে কি শ্যামাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, সে এখানে আছে, অদূরে?

হরবোলা নয়নকে বাবা তো জানে। যদি নয়ন ডাকগুলো ঠিকমতো না ডাকে তবে বাবা বুঝতে পেরে যাবে। বুঝলে কী হবে তা শ্যামা ভেবে পায় না।

একটা বুনো ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। সেই বাঁকটা ঘুরতেই বাবা বাহারি লাঠিগাছ তুলে হেঁকে বলল—ওই দ্যাখো, কোনও রাজারাজড়ার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। কী বিরাট বাড়ি ছিল, অ্যাঁ!

—দেখেছি।

শ্যামাও দেখল। বাঁ-ধারে, রাস্তা থেকে দূরে নয়, কয়েকটা থাম গম্বুজ পুরু দেয়াল মিলিয়ে বিশাল এক বাড়ি। তাতে অশ্বত্থ, বট আগাছার জঙ্গল। কিছু একটা আন্দাজ করে শ্যামা চেয়ে ছিল। হঠাৎ সে দেখল কিংবা তার চোখের ভুলও হতে পারে—বিশাল ভারী একটা থাম যেন খুব সামান্য একটু দুলে গেল। পলকে মুখ সাদা হয়ে গেল শ্যামার। সে কোথাও কাউকে দেখেনি, কিন্তু হঠাৎ খুব নিশ্চিন্তভাবে তার মনে হল, নয়ন ওইখানে আছে।

ওই থামটার আড়ালে। ওইখান থেকেই সে শ্যামাকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপ মেশানো শেয়ালের ডাক ডেকেছিল, কোকিল ডেকে থেমে গিয়েছিল। থামটা কি নড়ল সত্যিই? যা পুরোনো বাড়ি নড়তেও পারে। যদি থামটা ভেঙে পড়ে এখন যদি চাপা পড়ে মরে যায় নয়ন, তবে কি শ্যামা দুঃখ পাবে! ঠিক বুঝতে পারে না শ্যামা।

অনেক নীল আর বেগুনে বুনো ফুল ফুটে আছে।

—মা, আমি কয়েকটা ফুল তুলি। কী সুন্দর ফুল। শ্যামা বলে।

—এসব জঙ্গলে সাপখোপ আছে।

—কিছু হবে না। কয়েকটা তুলব।

মা-বাবা দুজনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। দাদার কথা উঠলেই তাদের এরকম হয়।

—আমরা দাঁড়াই, তুই তোল। মা বলে।

শ্যামা মাথা নাড়ে—দাঁড়াবে কেন? তোমরা এগোও না। যা আস্তে হাঁটো তোমরা, আমি ঠিক পা চালিয়ে ধরে ফেলব।

—দেরি করিস না কিন্তু! এই বলে ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব না দিয়ে বাবা আর মা হাঁটতে থাকে। দুজনে এখন দাদার কথা বলবে, শ্যামার জন্য দুশ্চিন্তা এখন অবান্তর।

শ্যামা তাই চায়। তার ধারণা, ওই পুরোনো ভেঙ্গে-পড়া বাড়ির কোন ঘুপচিতে ঠিক নয়ন আছে। কোন জাদুবলে নয়ন ঠিক তাদের আগে আগে এসেছে, অপেক্ষা করছে। এটা ভালো নয়। শ্যামা একবার নয়নের মুখোমুখি হতে চায়। এই নির্জন জায়গায় বিপজ্জনকভাবে পিছু নিয়েছে নয়ন? ঠিক ধরা পড়ে যাবে। বাবা যদি দেখতে পায় নয়নকে। গত মাসেও একবার বাবার প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। দরকার হলে শ্যামা নয়নের পায়ে ধরে বলবে—ফিরে যাও। শ্যামা তাই বাবা মাকে এগিয়ে দিতে চায়। এখন একা এই বনভূমিতে বেরিয়ে আসুক নয়ন। শ্যামা মুখোমুখি হবে।

বাবা আর মা এগিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দূর থেকে। শ্যামা একটু অপেক্ষা করে রাস্তা ছেড়ে বুনো ঝোপগুলোর কাছে এসে দু-একটা ফুল তুলল অন্যমনস্কভাবে। ফুলের প্রতি তার তেমন কোন মোহ নেই। গন্ধহীন এইসব বুনো ফুল দিয়ে কী করবে শ্যামা!

শ্যামা কেবল বারবার প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকায় আর অপেক্ষা করে। নয়ন সমস্ত ব্যাপারটাই দেখেছে। দেখেছে শ্যামার মা-বাবা এগিয়ে গেল শ্যামাকে একা রেখে। দেখেছে, শ্যামা এখন একা। এরকম সুযোগ নয়ন ছাড়বে না নিশ্চয়ই?

কিন্তু অপেক্ষা করে লাভ হল না—সমস্ত বনভূমি নির্জন। কোথাও নয়নের সাড়া শব্দ নেই। তবে কি সত্যিকারের শেয়ালই ওরকম ডেকেছিল? নয়ন নয়? শ্যামা একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। বনভূমির কোন গভীর থেকে দুটো অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পায় শ্যামা। কে যেন কাকে ডাকছে। চারদিকে নির্জন, গভীর ছায়া, শ্যামার গা ছমছম করে। বাতাস দেয়, শীত করে শ্যামার। একটু পিপাসা, জ্বরভাব, একটু ভয়—এইসব মিলে এমন সুন্দর ছায়ায় ঢাকা দুপুরটা অস্বস্তিকর লাগে শ্যামার কাছে।

অনেকটা জমি ফাঁকা ফাঁকা। কয়েকটা বুনো ফুল আর কাঁটাঝোপ ছাড়া বাড়িটার সামনের জমিতে কিছু নেই। চারদিকে একসময়ে উঁচুঘেরা-পাঁচিল ছিল। সেই পাঁচিল ভেঙে পড়ে গেছে। কোথাও কোথাও শুধু কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার ইটের গাথনি দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে দেখার জন্য শ্যামা কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ডাকল নয়ন। নয়ন...

কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু একটু দূর থেকে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শোনা গেল। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই। নয়ন সব ডাকই হুবহু ডাকতে

পারে। যখন ডাকে তখন নয়ন সত্যি-সত্যি পাখি হয়ে যায়, কিংবা জীবজন্তু। মানুষ থাকে না। নয়নের ওই রহস্যময়তা মাঝে-মাঝে শ্যামার বুকে ভয় হয়ে থাবা গেড়ে বসে।

চারদিক আকীর্ণ পুরোনো বাড়িটার ভেঙে-পড়া ইট কাঠ আর আবর্জনার ভেতরে শ্যামা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। ছায়া দোলে, একটা পাথরের ফোয়ারার চারধারে গোল জলাধার দেখা যায়। জল নেই, গাছ গজিয়েছে। ফোয়ারার মুখ কাৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। তার পাশেই একটা গোলাপ গাছ। একটা লাল গোলাপ ফুটে আছে একা। শ্যামা একটু এগিয়ে গোলাপটা তুলে নিল। তারপর ফিরে এল রাস্তায়। আপদমস্তক শিউরে উঠে দেখল, নয়ন তার মুখোমুখি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসি। কোমরে হাত।

ধকধক করে শ্যামার বুকের ভেতরটা নড়ে গেল। সে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল নয়নের দিকে। হলুদ জামা আর পাকা জলপাই-রঙের প্যান্টে নয়নকে তেমন কিছু ভয়ংকর দেখাচ্ছে না। নয়নের উচ্চতা স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য মাঝারি, মুখখানা একটু ভাঙাচোরা হলেও কমবয়সের লাবণ্য আছে। গালের দাড়ি এখনও নরম। গোঁফ জোড়া ছাঁটে নি বলে অনেক বড় হয়ে গাল পর্যন্ত পৌঁচেছে। গাঁয়ের রং না ফরসা, না কালো। একনজরে দেখলে নয়নের ভেতরে দেখবার কিছু নেই। ঘেন্না বা উপেক্ষারও কিছু নেই। বড়-বড় চুলে ঘেরা মুখখানা কেবল চোখ-জোড়াই যা একটু অন্যরকম। শ্যামার দাদার অনেকটা এরকম চোখ ছিল। নয়নের চোখজোড়া খুব নিষ্ঠুর। তাতে সহজে পলক পড়ে না। চোখের তারায় একটু কটা ভাব। মণির মাঝখানে দুটো ছ্যাদা দূর থেকেও দেখা যায়। শ্যামার দাদা বিবেকানন্দর ভক্ত ছিল। খুব ধর্মের বই পড়ত। একা-একা ধ্যান করত অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে। সাদা দেয়ালে একটা ছোট্ট ফোঁটা বা চিহ্ন দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কলিযুগেও মানুষ ইচ্ছে করলে তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারে। দাদা একবার চেষ্টা করেছিল তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার। একদিন সেই চেষ্টা সকাল থেকে খিল দিয়ে বসল, বহু ডাকাডাকিতেও সাড়া দিল না, দরজা খুলল না। দ্বিতীয় দিনও না। সেদিন পাড়ার লোক জড় হয়ে গেল বাড়িতে, মা কাঁদতে শুরু করে, বাবা অফিসের কাজে বাইরে মফস্‌সলে গিয়েছিল, ফিরে এসে রাগারাগি শুরু করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দরজা ভেঙে যখন দাদাকে বের করা হয় তখন তার চোখ ঘোলাটে লাল, মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে। ভুল বকছে। সেই ভুল বকা চলতেই থাকল। বড় ডাক্তার দেখে বলল—পাগলামি শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, আপনারা টের পাননি। অনেক পাগল এরকম থাকে, বোঝা যায় না। মানুষের নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। যখন বাড়িতে একমাত্র ছেলের জন্য উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সকলের খাওয়া ঘুম ছুটে যাচ্ছে, তখন অন্যধারে পাড়ার ছেলেরা দাদাকে দেখতে পেলেই 'ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে চিৎকার করে খ্যাপাত। ব্রহ্মজ্ঞানী শব্দটা শুনলেই চনচন করত দাদা, বড়-বড় চোখে চারদিকে তাকাত। অবিরল কথা বলতে থাকত। অর্থহীন কথা। বোঝা যেত, সে যা বলতে চায় তা বাক্য হয়ে বেরোচ্ছে না। কিন্তু সে একটা বিশেষ কথা বলতে চায়। তার কিছু বলার আছে। সেই সময়ে দাদার চোখ ছিল অনেকটা নয়নেরই মতো। শ্যামার মাঝে-মাঝে নয়নকে ডাক্তারের সেই কথাটা বলতে ইচ্ছে করে—তোমার পাগলামির শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই. তা বুঝতে পারছ না নয়ন। কিন্তু তা বলে না শ্যামা। বললে নয়ন বুঝি সত্যিকারের পাগলই হয়ে যাবে।

নয়ন দু-পা এগিয়ে এসে বলে—কার জন্য গোলাপ?

শ্যামা কিছুক্ষণ তার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলে—তুমি কেন এসেছ নয়ন?

—আগে বলো গোলাপ কার জন্য?

শ্যাম শ্বাস ছেড়ে বলে—নয়ন, তোমাকে দেখলে বাবা কীরকম ক্ষেপে যায় জানো তো! গত মাসেও একবার প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তেজনা বাবার পক্ষে ভালো নয়।

তোমাকে কতবার বলেছি!

নয়ন তার অকপট মুখে হেসে বলে—যখন গোলাপটা তুলেছিলে তখন কার কথা তোমার মনে পড়েছিল শ্যামা?

—আমার বাবার জন্য তোমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। শ্যামা রেগে গিয়ে বলে—কোনওদিন তুমি অন্যের কথা ভাবো না। তুমি খুব বাজে হয়ে গেছ, দিন-দিন আরো বাজে হয়ে যাচ্ছ।

কপালের ওপর এসে পড়া ঝুরো চুলের একটা গুছি টেনে নিয়ে আঙুলে জড়াতে-জড়াতে গম্ভীর হয়ে নয়ন বলে—আমি কেবল গোলাপটার কথা জানতে চাইছি শ্যামা। কার জন্য ওটা তুলেছো?

—তুমি ফিরে যাও।

—শ্যামা, তোমার বাবা আমাকে দেখতে পাবে না, ভয় নেই। আমি তোমাদের রাস্তায় যাব না। আমি যাব জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, ছায়ার মতো। পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি ছাড়া কেউ বুঝবেই না যে আমি আছি।

বলে নয়ন সেই অকপট হাসি হাসে।

শ্যামা রেগে গিয়ে বলে—আমিও তো তোমাকে চাইছি না নয়ন। তোমার একটুও আত্মসম্মানবোধ নেই কেন?

নয়ন অবাক হওয়ার ভান করে বলে—আমাকে চাইছ না। তবে গোলাপটা কার জন্যে?

—তুমি নও, সে তুমি নও।

সেইরকম অবাক হওয়ার ভান করে নয়ন বলে—নই? আমি নই? কেন নই শ্যামা?

—তোমার কথা আমার মনেই থাকে না।

—খুব থাকে। বলে নয়ন হাসে—তুমি আমাকে ভয় পাও।

—তুমি ফিরে যাবে না?

—তুমি আমাকে ভয় পাও কেন? তোমার অতগুলো পুরুষ বন্ধুর কাউকে তো তুমি ভয় পাও না।

—তোমাকেও পাই না।

—পাও, আমি জানি।

শ্যামা স্তব্ধ হয়ে নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—ভয় পেলে তোমার জন্য একা দাঁড়িয়ে থাকতাম না।

নয়ন ভ্রু তুলে চোখ বড় করে বলে—আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলে! তবে ফুলটা তুলবার সময়ে আমার মুখ তোমার মনে ছিল শ্যামা?

—ইয়ার্কি কোরো না নয়ন। আমি সিরিয়াসলি বলছি, আমার মন ভালো নেই।

—কেন?

—তুমি সব সময়ে কেন আমার পিছু নাও? তুমি তো জানো কোনও লাভ নেই। কায়স্থের সঙ্গে আমার বাবা বিয়ে দেবেন না। তোমাকে দেখলে বাবার প্রেসার বেড়ে যায়।

নয়ন তেমনি অকপট হাসিমুখে বলে—তোমার বাবা জাত মানলেও তো তুমি আর মানো না শ্যামা! তোমার বাবা আর কদিন? ততদিন বরং অপেক্ষা করব।

শ্যামা মুখ নামিয়ে অসহায়ভাবে বলে—নয়ন, তুমি বয়সে আমার ছোট।

—ছোট!

শ্যামা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—তুমি চলে যাও।

—আগে বলো।

—বলব না।

—মেয়েরা বয়স লুকোয় অন্যের কাছে আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। আমার কাছে তো তোমার সে ভয় নেই! তুমি তো আমাকে আকর্ষণ করতে চাও না? আমাকে তোমার ডেট অফ বার্থ বলতে ভয় কি?

অনেকক্ষণ পরে শ্যামা এই প্রথম হাসল, বলল—নয়ন, স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার বয়স চব্বিশ।

নয়ন গম্ভীর মুখে বলে—আমারও তাই।

শ্যামা হেসে বলে—না, তোমার আরও কম। তা ছাড়া সার্টিফিকেটে আমার বয়স আরও দু-বছর কমানো আছে। আমার এখন ছাব্বিশ।

নয়ন হাসে—আমারও কমানো আছে, তিন বছর। আমার এখন সাতাশ।

—না! তোমার এখন বাইশ কী তেইশ।

—সাতাশ। বলে নয়ন হাসে তারপর আস্তে-আস্তে গম্ভীর হয়ে যায়। ব্যথিত মুখে বলে—জাত বা বয়স কিংবা তোমার বাবার মতামত এর কোনটাই তোমার প্রবলেম নয় শ্যামা, আমি জানি। তোমার আসল প্রবলেম কী?

শ্যামা ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থাকে, তারপর বলে—তুমিই আমার চারদিকে প্রবলেম তৈরি করছ। তুমি ছাড়া আমার আর কোনও প্রবলেম নেই। তুমি দয়া করে চলে যাও।

নয়ন তার সরল হাসিটি হেসে, শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বলে—শ্যামা আমি ব্রাহ্মণ, আমার বয়স সাতাশ।

—তার মানে?

নয়ন শ্যামার মুখখানা তার কটাসে চোখে পান করতে-করতে বলে—জাত বা বয়স দুটোই হচ্ছে ইমাজিনেশন, বেহেড কল্পনা। এক সময়ে সমাজের প্রয়োজনে জাত ভাগ করা হয়েছিল। সেটা ছিল একটা আইডিয়া, সেই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এখন সমাজ বদল হয়েছে, সেই প্রয়োজন আর নেই। রক্তের বিশুদ্ধতাও আর টিকছে না শ্যামা। মেডিকেল কলেজে যাও, দেখবে, কত কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রের রক্ত কত ব্রাহ্মণের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। জাতফাত একাকার হয়ে যাচ্ছে।

—আমি তোমার মতো ডাক্তারি পড়িনি নয়ন। ওসব জানি না। আমার বাবা—

নয়ন সে কথায় কান না দিয়ে বলে—আর বয়স, শ্যামা? বয়স আর একটা ইমাজিনেশন। মানুষের যে রূপান্তর হয়, পৃথিবীর যে পরিবর্তন হয় সেটা দেখেই মানুষ সময় নামে এক আপেক্ষিক কল্পনাকে আবিষ্কার করে। নইলে, সময় বলে যে সত্যিই কিছু আছে, তার কোনও প্রমাণ নেই। ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের রূপান্তরই হচ্ছে সময়। যদি রূপান্তরকেই সময় বলে ধরো, যদি পরিবর্তন বা অভিজ্ঞতাই বয়স হয় তবে বলি, আমার পরিবর্তন হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা, বিপুল—সে হিসেবে আমার বয়স, বোধহয় পঞ্চাশ ষাট।

—অত কথা শোনার সময় আমার নেই নয়ন, বাবা-মা আমাকে না দেখে এক্ষুনি অস্থির হবে, হয়তো ফিরে আসবে।

সে কথাতেও কান দেয় না নয়ন। শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থেকে বলে—সেবার কয়েকজন শুয়োরের বাচ্চা আমাকে ইউনিভার্সিটির পাশের গলিতে ছোরা মারে তখন মেডিকেল কলেজে আমার শরীরে যারা রক্ত দিয়েছিল—আমার সেই চারজন বন্ধুই ছিল ব্রাহ্মণ। আমার শরীরের অর্ধেক রক্তই তাদের দেওয়া। সে হিসেবে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি।

—নয়ন, আমাকে যেতে দাও, তুমি চলে যাও।

—শ্যামা, আমি ব্রাহ্মণ। আমার বয়স তোমার চেয়ে বেশি। এ কথা তুমি তোমার

বাবাকে বলো।

—ওটা তোমার কথা নয়ন, আমার কথা নয়। আমি বাবাকে বলব কেন?

নয়ন একটু হেসে বলে—ঠিক আছে, তবে বোলো না। কিন্তু অপেক্ষা করো শ্যামা, তোমার বাবা বেশি দিন নিশ্চয়ই বাঁচবে না; তারপর—

শ্যামার কান-মুখ ঝাঁঝাঁ করে ওঠে, রাগে ঘেন্নায় সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে—বারবার তুমি বাবার মরার কথা তোল কেন? নিজের ওপর তোমার ঘেন্না হয় না?

একপা পিছিয়ে যায় নয়ন, তারপর তার অনাবিল হাসিটি হাসে। বলে—কেউ কি চিরকাল বেঁচে থাকে?

রাগে দুঃখে শ্যামার চোখ ছলছল করে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে চেয়ে থাকে নয়নের দিকে। গলার কান্না সামলায়, ঠোঁটের কেঁপে ওঠা থামায়। তারপর ধীর গলায় বলে—কবে তোমার এই পাগলামি বন্ধ হবে নয়ন?

—যে দিন আমার লাশ পড়ে যাবে।

কথাটা শ্যামাকে চমকে দেয়। আস্তে আস্তে বলে—ফিরে যাও নয়ন চলে যাও।

—আমার কি ফিরে যাওয়ার জায়গা আছে শ্যামা? আমি তো সব ছেড়ে বেরিয়েছি। যে জায়গা থেকে রওনা হই সে জায়গায় কদাচিৎ ফিরে যাই। তুমি আমাকে চলে যেতে বলতে পারো, ফিরে যেতে নয়।

—তাই যাও নয়ন চলে যাও।

নয়ন বলে—শ্যামা, তুমি খুব দুশ্চিন্তা কোরো না। আজ হোক, কাল হোক আমার লাশ একদিন পড়বেই। নিশ্চিত। তখন আর নয়ন তোমার পিছু নেবে না। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি শ্যামা, ততদিন আমি তোমার পিছু নেবই।

—কেন নয়ন?

—কী জানি কেন! তুমি এমন কিছু সুন্দর নও শ্যামা। তোমার রঙ শ্যামলা, নাক চাপা, খুঁজলে আরও কিছু ডিফেক্ট বেরবে, তা ছাড়া তোমার স্যুটার অনেক। তোমার লাবণ্য থাকতে পারে, কিন্তু সেসব আমি লক্ষ্যই করি না। তুমি যা তোমাকে তার চতুর্গুণ করে দেখতে পাই। যেদিন আমাকে ওরা স্ট্যাব করে সেদিন অনেকক্ষণ আমি হিন্দু হস্টেলে গেট থেকে কয়েক গজ দূরে গাছতলায় পড়েছিলাম। জ্ঞান ছিল, কিন্তু ডিলিরিয়ামের মতো অবস্থা। চারদিকে স্বপ্নের মতো অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, অ্যান্ড ব্লাড ড্রিপিং আউট। টিপটিপ করে রক্ত পড়ছে তো পড়ছেই।

শরীর থেকে নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে রক্ত। তার কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। সেই সময়েও, সেই আশ্চর্যরকমের ভয় আর বিকারের মধ্যেও তোমাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম, একটা নির্জন মেঠো রাস্তা দিয়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ, কিংবা জানলার কাছে বসে চেয়ে আছ বাইরের এক মেঘলা আকাশের দিকে। সব ঠিক মনে নেই, কিন্তু বারবার তোমাকেই দেখছিলাম, মনে আছে। আতঙ্কে চিৎকার করে বলতে চেষ্টা করেছিলাম—শ্যামা তুমি সাবধানে থেকো, ভীষণ বিপদ, তোমাকে যেন ওরা না পায়। আবার কখন হয়তো বলছিলাম—শ্যামা, আমি মরে যাচ্ছি, তুমি বিধবা হবে তো?

নয়ন তেমনি অনাবিল হাসি হাসে।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—এ সব আমাকে বোলো না নয়ন, আমার ভালো লাগে না।

—তুমি গোলাপটা কার জন্য তুলেছ?

—নয়ন, রাস্তা ছাড়, আমি অনেক পিছিয়ে পড়েছি। মা-বাবা নিশ্চয়ই আছেন। এক্ষুনি

খুঁজতে আসবেন। তুমি চলে যাও। পিছু নিও না।

—আমি ছায়া হয়ে যাব শ্যামা, পাখি হয়ে যাব।

—দয়া করো নয়ন, তুমি যাও।

দূর থেকে বাবার ডাক শোনা যায়—শ্যামা-আ—

নয়ন রাস্তা ছাড়ে না।

শ্যামা হাতের গোলাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—এটা তুমি নেবে? নাও।

নয়ন হাত বাড়ায় না, বলে—নেব কেন—আগে বলো, কার মুখ ভেবে তুলেছিলে, কার নাম ভেবে।

—তুমি নাও।

—কেন নেব?

—নাও। দিচ্ছি।

—এই দেওয়ার মধ্যে কোনও ইঙ্গিত নেই শ্যামা?

—না।

—তাহলে নিয়ে কী হবে!

—রাস্তা ছাড়ো।

—দাঁড়াও। তোমাকেও তাহলে একটা জিনিস প্রেজেন্ট করি। বলে পকেট থেকে ডিম দুটো বের করে নয়ন।

শ্যামা অবাক হয়ে বলে—ডিম? ও দিয়ে আমি কী করব?

—খাও।

—ডিম খাব কেন?

—খাব বলে কিনেছিলাম, খেতে পারছি না। খালি পেটে খানিকটা তাড়ি খেয়ে খিদে মরে গেল। তুমি অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছ, তোমার খিদে পেয়েছে।

শ্যামা কুঁকড়ে গিয়ে বলে—না। ডিম নেব কেন? ডিম কেউ কাউকে প্রেজেন্ট করে নাকি? আমার খিদে পায়নি।

নয়ন একটু স্থির চোখে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে—এই ডিম দুটো দিলে এখনও এই দেশে কোথাও কোথাও রাতভর একটা আস্ত মেয়েমানুষের শরীর পাওয়া যায় জানো?

শ্যামা লাল হয়ে বলে—তুমি—তোমার মুখে কিছুই আটকায় না নয়ন?

নয়ন ধীর স্বরে বলে—মিথ্যে কথা নয় শ্যামা, এই ডিম দুটোর যা দাম তা অনেকের কাছে অনেকগুলো পয়সা। আমি দেখেছি। আমার অভিজ্ঞতার বয়স অনেক।

—তুমি বরং মেয়েমানুষের শরীর কিনো নয়ন, আমার পথ ছাড়ো, বাবা এসে পড়বে।

—রাগ কোরো না শ্যামা, আমি শুধু ডিম দুটোর আপেক্ষিক দাম বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। দামটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার যা অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এ ডিম দুটোর দাম অনেকের কাছে অনেক, আবার কারও কাছে কিছুই নয়।

শ্যামা হেসে বলে—ফুলের বদলে ডিম?

নয়নও হাসে—ফুলের তুলনায় ডিম অনেক সলিড জিনিস শ্যামা। তুমি জিতে যাচ্ছ। নাও।

শ্যামা একটু ইতস্তত করে। কিন্তু সে জানে, নয়ন বড় দুরন্ত। বাবা এগিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে, তাকে না দেখে ফিরে আসবে। এসে যদি নয়নকে দেখতে পায় বাবা, তাহলে কী হবে। ইতস্তত করেও তাই ডিম দুটো নেয় শ্যামা। ব্যাগে ভরে রাখে। যদি এতে রাস্তা

ছাড়ে নয়ন, যদি শ্যামাকে ছেড়ে দেয়।

ফুলটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল নয়ন। নির্দোষ হাত, শ্যামা সন্দেহ করেনি কিছু। বাড়ানো হাত ফুলসুদ্ধ শ্যামাকে ঘাড় কাৎ করে দেখতে-দেখতে বোধহয় নয়নের ভেতরে কিছু ফুঁসে উঠল। এক পলকে শ্যামার ফুলসুদ্ধ হাত ধরে টেনে নিল সে। শেকড় সমেত উপড়ে গেল শ্যামা। চারদিকটা যেন ঝোড়ো বাতাসে আবছা ধুলোটে হয়ে গেল, কিংবা একটা কুয়াশা ঘিরে ফেলল তাদের—এরকমই মনে হল তার। পরমুহূর্তেই সে নয়নের বিশুষ্ক ঠোঁট তার ঠোঁটে গালে টের পেল। নয়নের গালের দাড়ি ঘষা খেল তার গালে, পরমুহূর্তে ঝুরো চুলওলা নয়নের মাথা তার কাঁধ থেকে গলার কাছে আশ্লেষে ডুব দিতে থাকে। তাড়ির ঝাঁজালো গন্ধ পায় শ্যামা, সেই সঙ্গে বহুকাল ধরে রোদে পোড়া চামড়ার উষ্ণ গন্ধ, জামা-কাপড়ে ঘাম আর ধুলোর সোঁদা গন্ধ। এমনটা এই প্রথম নয়। অন্তত তিন-চার জন পুরুষ তাকে ইতিপূর্বে আক্রমণ করেছে। নয়নও। তবু এই ঝড় ঠেকানোর কৌশল আজও শ্যামা সঠিক জানে না। মেয়েরা বড় অসহায়। তবু দু-হাতে সে নয়নকে প্রাণপণে রুখবার চেষ্টা করে। চেঁচায়। মারে।

নয়ন সহজে থামত না। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলে খুব কাছে থেকেই চেঁচিয়ে বলে ওঠে—বাবা, দ্যাখো—

নয়ন শ্যামাকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায় মারকুটে হিংস্র ভঙ্গীতে। মিথুনের সময়ে বাধাপ্রাপ্ত সাপের মতো। নয়নের সেই সাপের মতো ভঙ্গি দেখে চোখ ফেরাতেই একটা সত্যিকারের সাপ দেখতে পায় শ্যামা।

দৃশ্যটা ভারী অদ্ভুত। ভাঙা, পোড়ো বাড়িটার আগাছার জঙ্গল ভেদ করে দুজন ভাঙা পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন একটা বছর সাত আটেকের বাচ্চা ছেলে, অন্যজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন গ্রাম্য চেহারার লোক। হাবার মতো দাঁড়িয়ে। ছেলেটার চোখের পলক পড়ছিল না। লোকটারও তাই। অদ্ভুত এই যে, লোকটার ডান হাতে লম্বা একটা জ্যান্ত সাপ। সাপের গলার কাছটা মুঠোয় ধরা, সেটা লোকটার হাতে দুটো প্যাঁচ খেয়ে ঝুলছে। আস্ত গোখরো।

শ্যামার বমি পাচ্ছিল হঠাৎ। লজ্জা-লজ্জা! বাচ্চা ছেলেটা ওই কাণ্ড দেখেছে, লোকটাও! মথিত গোলাপটা পড়ে আছে রাস্তায়। এক পলক দেখল শ্যামা। তারপরই গোলাপটাকে লাফিয়ে পার হয়ে ছুটল সে।

নয়নের মাথার ঠিক ছিল না। যে মুহূর্তে সে শ্যামাকে দু-হাতের ভেতরে পেয়েছে সেই মুহূর্তেই এই বাধা। কত কষ্টে তাকে শ্যামার এত কাছাকাছি আসার সুযোগ করে নিতে হয়। তাই প্রথমটায় রাগে তার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। হয়তো ছুটে যেত সে, লোকটাকে লাথি মারত, ছেলেটাকে থাপ্পড়, যা নয়নের স্বভাব। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সে লোকটার হাতে ধরা জ্যান্ত গোখরোটাকে দেখে।

নয়নের ভেতরে একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। যা কিছুর ভেতরে ভয়ংকরতা হিংস্রতা আছে তা সে ভালবাসে। যার মধ্যে বীরত্ব বা বেপরোয়া কিছু আছে সে নয়নকে মুহূর্তের মধ্যে টানে। লোকটার হাতে সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা খুব অনায়াস দক্ষ সাহসীর ভাব ছিল। নয়নের রাগ বাতাসে উড়ে গেল, ফুলের মতো ঝরে গেল। একটু আগে শ্যামার দেহস্পর্শের আগুন নিভে গেল ভেতরে। সে শ্যামার হাত থেকে স্খলিত ফুলটার দিকে চেয়েও দেখল না। যে শ্যামার জন্য সে এত দূর এসে রোদে দাঁড়িয়ে তীব্র পিপাসায় অপেক্ষা করেছে। তার কথা ভুলেই গেল প্রায়। গালের একটা জায়গায় শ্যামার বাঁ-হাতের লম্বা নখের একটা আঁচড় পড়েছে বুঝি! সেই জায়গাটা কেবল জ্বালা করছে।

গালে একবার হাত বুলিয়ে একপা দু-পা করে লোকটার দিকে হেঁটে গেল নয়ন।

লোকটার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা এখনও যায়নি। ছেলেটা এখনও হাঁ করে আছে। কৃতকর্মের জন্য তবু একটুও লজ্জা পায় না নয়ন! কোনও জবাবদিহি করারও চেষ্টা করে না। তার গলার স্বরও ঠিক থাকে।

একটু হেসে সে জিগ্যেস করে—সাপটা ধরলেন?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে—হ্যাঁ।

—কোথায় ছিল?

লোকটা পোড়ো বাড়িটার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে—এখানে। এখনও বিস্তর আছে!

—কামিয়েছেন?

—না। সদ্য ধরলাম তো।

—জাত গোখরো। দেখি—

লোকটা সাপটাকে তুলে দেখায়। নয়ন ঝুঁকে খুব কাছ থেকে দেখে। গভীর শ্বাসের শব্দ করে সাপটা। না এখনও কামানো হয়নি। দুটি সূক্ষ্ম দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে। নয়ন হাসে।

—বিষের থলি মনে হয় ভর-ভরন্ত। নয়ন বলে।

—আজ্ঞে।

—এটাকে নিয়ে কী করবেন?

লোকটা একটু হাসে। ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। নিজের ছেলের দিকে একটু চেয়ে দেখে। তারপর বলে—ছেড়ে দেব।

—না কামিয়ে? বলে ভ্রূ ওপরে তোলে নয়ন।

—না কামিয়ে ছাড়লে ব্যাটা রুখে আসবে। কামিয়েই ছাড়ব। তার আগে ক'ফোঁটা বিষ ঢেলে নেব।

সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র কৌতূহল বোধ করে নয়ন। বলে—দেখি, কী করে নেন।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে বলে—কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাবে না? উনি তো এগিয়ে গেলেন!

—কে? নয়ন বিস্ময়ে জিগ্যেস করে।

লোকটা চোখের পাতা নামিয়ে বলে—এই উনি, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন!

শ্যামার কথা মনে পড়ে নয়নের। বিদ্যুৎচমকের মতো। কিন্তু এতক্ষণ মনেই ছিল না। একটু হাসে নয়ন। তারপর বলে—এগিয়ে যাক না। ঠিক ধরে ফেলব পা চালিয়ে। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবে, বেশি দূর তো নয়।

—ও। মনস্কামনা আছে বুঝি!

—আছে।

লোকটা উদাস গলায় বলে—অনেকে আসে। মোনা ঠাকুরের খুব বাড়বাড়ন্ত এখন।

—চেনেন?

—না চিনবার কী? আমি তো কল্পতরু মন্দিরের পাশেই থাকি।

—কী করেন? সাপ খেলান?

লোকটা হাসে—না সাপ ধরা শিখেছি অনেক কষ্টে। এ আমার শখ। মাঝে মধ্যে বিষ বেচি, ওষুধ কোম্পানিগুলো কেনে। বলে ছেলের দিকে চেয়ে বলে—সুকুল, কৌটো. বাটিটো বের কর।

ছেলেটার কাঁধে একটা ঝোলা। তা থেকে বড় মুখওয়ালা একটা শিশি বের করে আনে। শিশির মুখে পাতলা বেলুন বা ওই জাতীয় কিছুর একটা রাবারের ঢাকনা সুতো দিয়ে টান করে বাঁধা। শিশিটা বাঁ-হাতে ধরে লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হেসে বলে—তেমন কিছু কাণ্ড

না। দেখুন।

সাপটা হাঁ করেই ছিল, মুখের কাছে শিশিটা আনতেই নড়ে উঠল দাঁতের কাছে বিষ ঢালার মতো কিছু একটা সে এখন চায়। রাগে আক্রোশে লেজের ঝাপটা মারে। কী সুন্দর সরু ভয়ংকর দাঁত, কী দক্ষতা তার দাঁতে! পাতলা রবার নিঃশব্দে ভেদ করল দাঁত দুটো। লোকটা শিশি সমেত সাপটাকে উঁচু করে দেখাল। নয়ন দেখে, শিশির মধ্যে হালকা রঙের দুটি ফোঁটা পড়ল। লোকটা শিশিটা ছাড়িয়ে নিয়ে নয়নকে দেখায়। বলে—অয়েল প্রোটিন।

নয়ন ওই শব্দ দুটো শুনে বড় চোখে চায়। বলে—আপনি অনেক জানেন দেখছি।

—কিছুই না। ও সবাই জানে।

লোকটার হাতে ছেলেটা একটা চাকু ধরিয়ে দেয়। যেভাবে ছেলেরা পেন্সিল কাটে সেরকম অনায়াসে মুখের কাছে সাপের মাথাটা তুলে লোকটা দুটো মোচড়ে দাঁত উপড়ে আনে। ছোট্ট দুটি দাঁত, উপড়ে আনার পর কেমন নিরীহ দেখায়। সুকুল নামে ছেলেটি একটা কাগজে দাঁত দুটো সাবধানে মুড়ে ঝোলায় রাখে। সাপটা ছটপট করে। লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে একটু হাসে। বলে—এদের দাঁত ওপড়ালে ব্যথা যেমন পায়, আরামও পায় তেমনি। দাঁত দুটো টনটন করে তো! যত বিষ ওদের দাঁতে। মানুষের কোথায় বলুন তো!

নয়ন উত্তর দেয় না। চেয়ে থাকে।

লোকটা সাপের লেজ আর মাথা দুহাতে চেপে ধরে কী একটু বিড়বিড় করে বলে। তারপর আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে সাপটাকে ঘাসের ওপর ছেড়ে দেয়। প্রাণ পেয়েই যেন বিশাল লকলকে গোখরো ফুঁসে উঠে ঘাসময় তার কিলবিলে ভয়ংকর গতি ছড়িয়ে দিয়ে একবার ফণা তোলে। নয়ন এক লাফে পিছিয়ে আসে। লোকটা সাপটার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। সাপটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা নামিয়ে নেয়, তারপর মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে যায়। স্বচ্ছন্দে পার হয় দেয়াল, লম্বা দূর্বাঘাস আর আগাছার জঙ্গলে ঢেকে যায়।

নিঃসাড়ে সাপটাকে দেখছিল নয়ন। চোখ তুলতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সাপটা হাতে ছিল বলেই এতক্ষণ লোকটাকে ভাল করে দেখা হয়নি। এখন চেয়ে দেখল নয়ন, পরনে মোটা কাপড় খাটো করে পরা, গায়ে হাফ-হাতা শার্ট, খালি পা, মাথার চুল যাত্রাওয়ালাদের মতো ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। মুখখানা চৌকো, ভাঙা কিন্তু তা রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য নয়। যারা শরীর খাটায় তাদের শরীরে একরকম মেদহীন রুক্ষতা থাকে। এ লোকটারও তাই। নয়নের তুলনায় লোকটা লম্বা, ঘাড়টা মোটা, হাত দুখানায় শিরা আর পেশি কিলবিল করছে। চওড়া কাঁধ। কিন্তু চোখ দুখানা বড় নিরীহ, মায়াময়। এতটা স্বাস্থ্য থাকলে মানুষ এমনিতেই একটু মারমুখো হয়। কিন্তু লোকটা তা নয়।

একটুক্ষণ চোখে চেয়ে রইল নয়ন। কবে যেন নয়নের চোখ ছিল সাধারণ, তাতে আগুন খেলা করত না, তাতে ভাবালুতা ছিল, স্বপ্ন দেখা ছিল, সেই চোখে মায়া মমতাভরে চারদিককে দেখার প্রবণতা ছিল তার। কিন্তু সে যেন এক দূর অতীতের কথা। মাত্র চব্বিশ কি তারও কম বয়সে নয়নের কত রূপান্তর হয়ে গেছে। এখন নয়ন জানে, তার চোখে কেউই খুব বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারে না। আয়নায় নিজের মুখ অনেক দেখেছে সে কিন্তু পরিবর্তনটা কিছুতেই কখনও সে ধরতে পারে না। কিন্তু জানে, জেনে গেছে, তার চোখে একটা বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে। তার মনের ছায়া চোখে পড়ে। সেখানে আগুন খেলা করে এখন। লোকটা কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল না। চেয়ে রইল। মনে-মনে নয়ন লোকটাকে বলল—সাবাস! প্রায় বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছ হে বাপু, নয়নের চোখে এতক্ষণ কেউ চোখ রাখে না।

মুখে খুব সাধারণ পথ-চলতি কথার মতো জিগ্যেস করল—কী করেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে—চাষবাস, বললাম তো! আর মাঝে-মাঝে সাপ ধরি। বুনো

পাতা থেকে ওষুধ তৈরি করি নানারকম। আর, ছেলের সঙ্গে খেলা করি। এই যে সুকুল, এ আমার ছেলে।

শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলে লোকটা, যেন ছেলের পরিচয়টা দেওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি। মানুষের নানা দুর্বলতা থাকে। নয়ন বলল—আপনাদের এ জায়গাটা বেশ।

—গাঁ-গঞ্জ জায়গা, ভদ্রলোকের উপযোগী নয়। বেশ আর কী!

—ইলেকট্রিক নেই এদিকে?

—কী যে বলেন!

—অনেক গাঁয়ে আছে।

—এদিকে নেই।

—বিডিও অফিস?

—সে অনেক দূর? তিন মাইল পুবে চকখালি, সেইখানে।

—থানা?

লোকটা নয়নের দিকে একটু চেয়ে থেকে হেসে বলে—সেও দূর।

—এ দিকটায় তবে আছে কী?

—আছে মোনা ঠাকুরের জাগ্রত কালী—যা দেখতে বহু লোক আসে। আর আছি আমরা, জঙ্গল আছে, সাপ আছে, আর কী থাকবে গাঁয়ে-গঞ্জে। চলুন দেখে আসবেন, বেশি দূর নয়। আপনার লোকও তো এগিয়ে গেল।

অন্যমনস্ক নয়ন জবাব দিল—হুঁ।

—কে হয় আপনার?

—কার কথা বলছেন? নয়ন অবাক হয়ে জিগ্যেস করে।

—ওই যে উনি, যিনি সঙ্গে ছিল আপনার!

—হয় কিছু। বলে নয়ন একটু হাসে।

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে লোকটা বলে—উনি ফুলটা ফেলে গেছেন। কুড়িয়ে নেবেন না?

নয়ন রাস্তার ওপর পড়ে থাকা ফুলটাকে একটা লাথি মেরে বলে—ফুলের অভাব নেই দেশে।

লোকটা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—ঠিকই কথা, তা ছাড়া ফুলের তেমন বাসও নেই। লতানে গাছের ফুল তো।

নয়ন গম্ভীর হয়ে বলে—হুঁ।

লোকটা বলে—বর্ষাকালের ফুল-ফল সবই কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে জলঢোপা।

—এদিকটায় থাকার জায়গা পাওয়া যায়?

—যাবে না কেন?

নয়ন মুখ তুলে বলে—ভাবছি থাকলে কেমন হয়।

লোকটা হেসে বলে—আপনারা শহর বন্দরের মানুষ। থাকতে পারবেন না। ওদিকটায় ভদ্রলোকের বাস নেই।

—ভদ্রলোকদের মুখে পেচ্ছাপ করি।

ছেলেটা নয়নের কথা শুনে হিহি করে হেসে ওঠে।

—কী হল সুকুল? লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

—পেচ্ছাপ করবে বলছে। মুখে! হ্যাঁ বাবা! ছেলে হেসে কুটিপাটি।

—তুমি পা চালিয়ে চল তো। আমরা পেছু-পেছু যাচ্ছি! দম ধরে তুমি খানিক দৌড়ও।

লোকটা তার ছেলের পিঠে আলতা চাপড় মেরে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

—আমি তোমাদের কথা শুনব।

—তার চেয়ে দৌড়লে কাজ দেবে। বড়দের সব কথায় কান দিতে নেই।

—মুখে কী করে পেচ্ছাপ করবে বাবা, অ্যাঁ?

নয়ন ছেলেটার দিকে ঝুঁকে বলে—ভদ্রলোকদের মুখে কী করে পেচ্ছাপ করতে হয় তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তার বদলে তোমার বাবা আমাকে সাপ ধরতে শেখাবেন।

তারা খানিক চুপচাপ হাঁটে। লোকটা একবার নয়নকে সতর্ক করে দেওয়ার ইঙ্গিত করে বলে—সুকুল কিন্তু আমার ছেলে। ওর সামনে—

কথাটা লোকটা শেষ করে না। নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে—আমি ভদ্রলোক নই।

—নন?

—না।

—কেন নন?

—পোষায় না।

—কিন্তু আপনি তো ভদ্রলোকের মতোই দেখতে, শহরের বাবুভায়েরা যেমনটি হয়।

—সে পোশাকে। ভেতরে আমি অন্য মানুষ।

—কলকাতা থেকে আসছেন তো?

নয়ন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—আসছি। কিন্তু সে আমার আগের সাকিন। আসলে আমার জীবন কাটে গাঁ-গঞ্জেই। কলকাতার লোক মাত্রই ভদ্রলোক নাকি।

লোকটা একটু ভেবে বলে—তা অবশ্য নয়। কিন্তু ভদ্রলোকেরা যেখানেই থাকুন তাদের জাত যে আলাদা তা দেখলেই বোঝা যায়। সে জাত তো আপনার ঘোচেনি।

—ও হচ্ছে গায়ের ঘেমো গন্ধের মতো, সহজে যায় না।

লোকটা হাসে! ছেলেটা ও খি-খি করে হাসে, বলে—ঘেমো গন্ধ বাবা, কী বলছে দ্যাখো!

—আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেবেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে—শিখে কী করবেন?

—শিখে রাখি। কখনও কাজে লেগে যেতে পারে।

—কিছুই কাজে আসে না। আমি শিখেছি বিস্তর কষ্ট করে। সাপুড়েরা তাদের মন্ত্রগুলি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে। আমি এক ওস্তাদের পিছনে বছরখানেক ঘুরে শিখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা যে অত কষ্টে শিখবার দরকারই নেই।

—কৌশলটা কী?

—সাপ কোথায় থাকে তার আন্দাজ যে করতে পারে তার অর্ধেক শেখা হয়ে গেল। তার পরেরটুকু হচ্ছে সাপ সম্বন্ধে ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে একটু সাহস করা। আর ঠিক জায়গায় হাতের তেলোয় চেপে ধরা। কই মাছ ধরার মতই সোজা। সাপের দাঁত তার মুখে, সারা শরীরে তো নয়।

—আমাকে শেখাবেন?

—শেখাতে পারি।

—আমার কিন্তু পয়সা নেই।

লোকটা হাসে, বলে—আমার খাওয়ার সংস্থান আছে, সবকিছু বেচি না।

—যদি শেখান তো এদিকটায় কদিন থেকে যাই।

—সঙ্গের লোকেরা?

—ওরা আমার কেউ না।

লোকটা একটু থমকে যায়। কী যেন বলি-বলি করেও বলে না। সুকুল চলতে-চলতে অজান্তে নয়নের কাছে ঘেঁষে আসে। নয়ন তার দিকে একবার মিটিমিটি করে চায়। তারপর বাপ-ব্যাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোকিল-ডাক ডেকে ওঠে। কুহুকুহু করে তার অবিকল এবং অবিকল মিষ্টি ডাকটি উঠে উঠে নেমে আসে হঠাৎ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকটা মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—আরে বাঃ। লোকটা বলে।

—আমাকে শিখিয়ে দেবে? ছেলেটা জিগ্যেস করে।

—দেব। তার বদলে তোমরা যদি আমাকে থাকতে দাও।

—দেব। আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা। ছেলেটা লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে ঝুলে পড়ে—অনেক জায়গা, না বাবা?

ওরা বাপ-ব্যাটা সামনে হাঁটছে, নয়ন পিছনে। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে একবার নয়নকে দেখে নিয়ে বলল—এখানে থাকতে চান কেন?

—এমনিই। জায়গাটা ভালো লেগে গেছে।

—কাজকর্ম কিছু করেন না?

—না ডাক্তারি পড়তাম, ছেড়ে দিয়েছি।

—ছাড়লেন কেন?

—পোষাল না।

—এখন তবে কি করে চলে?

—চলে যায়। ওসব নিয়ে ভাবি না।

লোকটা একটু ভেবে বলে—এদিকে এসেছিলেন কেন?

—চলে এলাম।

—ওই মেয়েটা কে?

—ও শ্যামা, আমার বহুকালের চেনা। আগে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন দূরে চলে গেছে ওরা। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

লোকটা তার ছেলের পিঠে হাত রেখে বলে—সুকুল বাবা, তুমি আগে আগে হাঁটো।

সুকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে হাঁটে। লোকটা নয়নের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বলে—তাই জঙ্গলের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন জিগ্যেস করে—মোনা ঠাকুরের ওখানে বশীকরণ-টশীকরণ হয়?

লোকটা হেসে বলে—হয়।

—বশীকরণ করতে কত টাকা লাগে?

—ঠিক জানি না।

নয়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে—বশীকরণে কাজ হয় তো? না হলে কিন্তু মোনা ঠাকুরের মন্দির আমি ভেঙে দিয়ে যাব।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙা যায় না।

—কেন?

—আমি যেমন সাপ ধরি, মোনা ঠাকুর তেমনি মানুষ ধরে। আমি যেমন বিষ নিংড়ে দাঁত ভেঙে ছেড়ে দিই, তেমনি তিনিও মানুষের বিষদাঁত তুলে নেন।

—হিপনোটিজম, না?

—কে জানে।

—আমি নয়ন রায়। মোনা ঠাকুরদের মন্দির ভাঙতেই আমার জন্ম। বলে নয়ন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে।

লোকটা বলে—আর যদি মোনা ঠাকুরের বশীকরণে কাজ হয়, যদি মেয়েটাকে বশ করতে পারেন তো কী করবেন?

—তাহলেও ভাঙব।

—কেন?

নয়ন একটু হেসে বলে—শ্যামাকে বশ করতে যেমন চাই, তেমনি মোনা ঠাকুরদেরও উচ্ছেদ করতে চাই।

লোকটা একটু হেসে বলে—যদি দুনিয়া থেকে সব মোনা ঠাকুরের উচ্ছেদ করে দেন তাহলে আবার কাউকে বশীকরণ করার দরকার হলে মোনা ঠাকুরকে পাবেন কোথায়?

—মোনা ঠাকুররা না থাকলে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হবে না। থাকলেই বরং ক্ষতি।

—তাহলে শ্যামার কী হবে?

—কী হবে?

—শ্যামাকে বশীকরণ করবে কে?

—কেউ করবে না। তার দরকার হবে না। শ্যামাকে কেড়ে নেওয়ার মতো জোর আমার আছে।

—তবে বশীকরণের কথা ভাবছেন কেন?

খুব চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে—ও এমনিই। মোনা ঠাকুরদের ক্ষমতা কতদূর তা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

লোকটা হেসে বলে—কিছু ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই। উনি বান মারেন, মারণ উচাটন জানেন, বশীকরণ জানেন, কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এসে ধুলোয় গড়ায়। মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে জপতপ করেন তিনি। বলে লোকটা নয়নের দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

নয়ন ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তাকুটিল মুখ, খুব অন্যমনস্ক। লোকটার কথা তার কানে গেছে বলে মনে হয় না।

জঙ্গল ক্রমে শেষ হয়ে আসে। আমবাগানের শেষে একটা মাঠ কোণাকুণি পার হয়ে, একটা বন পুরোনো দীঘির কালো জলে নিজের ছায়া ফেলে, উত্তরে কয়েকটা ঢিবি, গড়খাইয়ের মতো জায়গা পেরিয়ে সুপুরি বাগান পায় তারা। সেই বাগান পেরলে একটা শ্যাওলা ধরা পুরোনো মন্দির দেখা যায়।

লোকটা নয়নের দিকে ঝুঁকে বলে—দেখেছেন! ওই হচ্ছে মোনা ঠাকুরের আস্তানা।

নয়ন গম্ভীরভাবে বলে—হুঁ।

লোকে কয় মাটির পুতলা। কালী আমার মাটির পুতলা। ঢ্যাস করে ফেলে দ্যান জলে, ভুস করে ডুবে যাবে। তো সব ঠিক। কিন্তু মায়ের গলার মালাখানা মোর ঘোরে কেন রে? বনবন করে ঘোরে কেন মালাখানা? হ্যাঁ? বলে মোনা ঠাকুর একটু হাসে।

মন্দিরের পাশে চৌকো ঘরখানা। সামনে বাঁধানো চাতাল। সেখানে কয়েক জোড়া ছাড়া জুতো। চাতালের ওপাশে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মতো হিলহিলে শরীরের সুপুরিগাছের সারি। ঘেঁটুবন, আশশ্যাওড়া আর ভাটগাছের জঙ্গল। চারদিক কেমন ঠান্ডা, নিঝুম। শ্যামা আঁচলখানা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসে।

বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির আস্তরণ, তাতে চুনকাম করে ঘরের দেওয়াল তৈরি হয়েছে। ওপরে টিনের চাল, মেঝে বাঁধানো। ছেঁড়াখোড়া শতরঞ্চি পাতা। কয়েকটা পাটির আসন।

শতরঞ্চিতে মোনা ঠাকুর বসে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, বড়-বড় চুল, গালে ছাঁটা দাড়ি, তাতে সাদা ছোপ ধরে এসেছে। মুখখানা লম্বাটে, ভাঙা, কিন্তু তার একটু কমনীয় সৌন্দর্য আছে। হাসলে মোনা ঠাকুরকে খুব সরল মনের লোক মনে হয়, গম্ভীর হলে মনে হয় চিন্তাশীল। খালি গায়ে পৈতেটা খুব সাদা দেখায়। বুকে, হাতে, কাঁধে, কানে, নাকে প্রচুর লোম। শরীরের বাঁধুনি কৃশ, কিন্তু শক্ত। পরনে পরিষ্কার একখানা ধুতি। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল আর দেশলাই। মোনা ঠাকুরের মুখে বিড়ি নেভে না। একটা ফেলেই আর একটা ধরায়।

মোনা ঠাকুরের একেবারে সামনে দুটো পাটিতে বাবা আর মা বসে আছে। আশেপাশে আরও দু-চারজন গাঁইয়া লোক। তাদের মুখ চোখ হাবাগোবা, চোখে ভয় আর ভক্তি।

দরজার পাশে একটা পাটিতে বসেছিল শ্যামা। তার মন ভালো নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়েছিল।

মোনা ঠাকুর একটু দুলে বলে—লোকে বলে মাটির পুতলা। তো তাই। তবু কালী আমার হাঁটে চলে, খায়-দায় চুল ফেরায়, চান করে, আমার কালীর মন খারাপ হয়, কাঁদে হাসে। পাগলি।

বাইরে একটা মেঘের ছায়া পড়েছে। চাপ বাঁধা গাছপালা আর জঙ্গল। দিনের বেলায়ও প্রবল ঝিঁঝি ডাকছে। গাছপালাগুলো অন্ধকার সব ছায়া ফেলেছে। ওই আলো-আঁধারির কোথাও নয়ন লুকিয়ে আছে। সারা রাস্তা যত পাখির ডাক শুনেছে শ্যামা, যত দূরাগত শব্দ শুনেছে তত সে চমকে-চমকে উঠেছে। মনে হয়েছে, পাখি নয় নয়ন। সব শব্দই করছে নয়ন। সেই হরবোলা তার বিচিত্র শব্দ তুলে শ্যামার চারদিকে একটা জাল তৈরি করছে। শ্যামার মন ভালো লাগে না।

মোনা ঠাকুর বাবার দিকে চেয়ে বলে—বাবুমশায়, আপনি কি ছেলের খবরের জন্য এসেছেন?

একটু চমকে ওঠে শ্যামা। লোকটা জানল কী করে? তারা যে দাদার খবরের জন্য এসেছে তা তো বলেনি।

বাবা একটু স্তব্ধ হয়ে তারপর ত্বরা গলায় বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। আপনি তো অন্তর্যামী।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে—অষ্টসিদ্ধির দুটো সিদ্ধি হলেই এসব বলা যায়। কিছু না বাবুমশাই। লোকের চোখে-মুখে সমিস্যের কথা লেখাই থাকে। সেটা পড়ার মতো অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হল। ওই মেয়েটি কি আপনারই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোনা ঠাকুর হেসে বলে—তা মেয়ের মুখ অত ভার কেন? এ জায়গা ভাল লাগছে না মা? ভয় করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে জানায়, না। তারপর একটু হাসে।

—ভয় নেই মা, আমার কালীমায়ের আওতায় বিপদ-আপদ নেই। সাপখোপের মুখে আপনা থেকেই বন্ধন পড়ে যায়, চোর বদমাশরা অসাড় হয়। যাও মা, ঘুরে টুরে জায়গাটা দেখে এসো। পশ্চিমে একটা সুড়ঙ্গ আছে, অনেকটা যাওয়া যায় ভেতরে, দক্ষিণে শিবমন্দির আছে, দাঁড়াও, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। বলে মোনা ঠাকুর ভেতর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে—তারা ওরে তারা—

ডাক শুনে উনিশ বছরের একটা লালপেড়ে শাড়িপরা লাজুক মেয়ে এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়ায়।

—এই মাকে নিয়ে যা তো, সব দেখিয়ে আন, যাও মা ওই আমার মেয়ের সঙ্গে

যাও। কোন ভয় নেই।

শ্যামা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। উঠে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে তার মন থম ধরে আছে। মুখে কতগুলি উষ্ণ স্পর্শ এখনও ফোস্কার মতো লেগে আছে। মন ভালো নেই।

কোথায় একটা বেড়াল কাঁদছে। মেয়েটির সঙ্গে বাইরে যাবে বলে পা বাড়িয়েও থেমে গেল শ্যামা। নয়ন! নয়ন নয় তো? আতঙ্কিত মুখ তুলে জিগ্যেস করল—ওটা কি ডাকছে?

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছিল, হেসে বলল—বেড়াল। আমার বেড়ালটার বাচ্চা হারিয়ে গেছে, কাঁদছে কাল থেকে।

চাতালে পা দিতেই বাতাস লাগল। বাতাসটা হিম। চারদিকে বেশি গাছপালার জন্যই বোধহয়।

শ্যামা বলল—তবে যে শুনলাম, মোনা ঠাকুর বললেন, এখানে কোনও অমঙ্গল হয় না। বেড়ালটার বাচ্চা তাহলে চুরি গেল কেন?

মেয়েটি খুবই সাধারণ। গিন্নি-বান্নির মতো ঢিলে করে ফেরতা ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে। কপালে তেল সিঁদুরের বড় একটা টিপ। সিঁথি সাদা। মুখে সরলতা আর বিস্ময়। শ্যামার সাজগোজ দেখছে বারবার। প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো বড় করে বলে—মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য বাবা অনেক সময় ওরকম সবকথা বলেন। নইলে এখানেও কত ঘটনা হয়। আমারই এক ভাই তো চার বছর আগে কলেরায় মারা গেছে।

—তাহলে কি ওসব মিথ্যে কথা?

মেয়েটা ঠিক-ঠাক জবাব দিতে পারে না। কিন্তু সরল মুখে সে খুব হাসে। তারপর বলে—না, বাবা ঠিক মিথ্যে কথাও বলে না। যার বিশ্বাস আছে তার অমঙ্গল হয় না।

—তবে আপনার ভাই মারা গেল কেন? মোনা ঠাকুরের তো বিশ্বাস আছে।

মেয়েটা হেসেই বলে—ওসব আমি ঠিক বুঝি না। বাবা আমাদের সঙ্গে তো বেশি কথা বলে না। কী করে জানব বলুন৷ আমরা শুধু জানি, বাবার কাছে অনেক লোক আসে, বাবা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

শ্যামা চাতালের সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে—কালীর গলার মালা সত্যিই ঘোরে?

মেয়েটা বলে—আমরা তো ওসব দেখতে পাই না। বাবা যখন পুজো করে তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর।

—যাঃ আমি তো কালো।

—খুব কালো না। তবে ফরসা হলে আপনি ঠিক রানির মতো হতেন। আজকাল কলকাতায় গয়না পরার চল নেই, না?

—কেন?

—আপনি তো পরেননি।

—আমার বেশি গয়নাই নেই। তা ছাড়া দিনকাল তো ভালো না, গয়না পরলে যদি চোর-ডাকাত পিছু নেয়?

—আপনি এটা কী শাড়ি পরেছেন? শিফন?

—না, এটা কমদামি শাড়ি। ব্রাসো।

মেয়েটার হাসি তার চোখেও উপচে পড়ে। সে মিটমিটে হাসিচোখে চেয়ে বলে—আমাদের কিন্তু ওসব জোটে না। পুজোর শাড়িই পরি আমরা। এই দেখুন না পরে আছি, লালপেড়ে। তার ওপর আবার খাটো।

বলে খুব হাসে। শ্যামার তক্ষুনি মেয়েটাকে ভালো লাগতে থাকে। সমবেদনার গলায় জিগ্যেস করে—কেন ভালো শাড়ি আপনার পরতে নেই?

—বাবা পরতে দেয় না, কিনে দেওয়ারও লোক নেই।

—গ্রামদেশে ভালো শাড়ি পাওয়া যায় না?

মেয়েটা মাথা হেলিয়ে বলে—খুব যায়। কলকাতায় নতুন শাড়ি বেরোলে তিনদিনের মধ্যেই এদিকে চলে আসে। গাঁয়ের মেয়েরা সবাই পরে। আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে তো, আমাদেরই জোটে না।

—মন খারাপ লাগে, না?

—লাগবে না? সাজগোজ করার বয়সই তো এটা, নয়?

শ্যামা একটু হেসে বলে—বিয়ে হলে পরবেন, তখন তো আর বাধা থাকবে না।

—বিয়ে কে দিচ্ছে।

—কেন?

—বাবা তার কালী ছাড়া কিছু বোঝেই না। আমি কত বড়টা হয়ে যাচ্ছি কে খেয়াল রাখে! মা ভয়ে বিয়ের কথা তোলে না। এই করেই আমার দিদি একটা বাজে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

শ্যামা একটু থমকে গিয়ে বলে—সে কী!

—সত্যিই।

শ্যামা একটু হেসে বলে—তবে তো মোনা ঠাকুরেরই সমস্যা অনেক।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে—না। বাবার কোনও সমস্যা নেই।

—এগুলোই তো সমস্যা। যার বেড়ালের বাচ্চা মরে যায়, মেয়ে পালিয়ে যায়, সেই তো সত্যিকারের দুঃখী লোক। সে কী করে অন্যের ভালো করবে?

মেয়েটা একটু উদাস গলায় বলে—কিন্তু তবু বাবার কোনও সমস্যা নেই।

—কেন?

মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে—আসলে আমরা তিন বোন, আমার মা, আমাদের মরা ভাইটা, আমাদের বেড়াল—এরা বাবার কেউ না। বাবা হচ্ছেন মোনা ঠাকুর—মস্ত ভক্ত সাধু। আর আমরা, তার পরিবারের লোকেরা হচ্ছি এই আপনাদের মতোই বাইরের লোক, বদ্ধ জীব। বাবার কাছে আপন পর বলে ভেদ নেই। যেদিন আমার ভাই মারা যায় সেদিন বাবার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। বাবা ওই চালাতে বসে লেবুকাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলছিল। দৌড়ে গিয়ে যখন বাবাকে খবর দিলাম তখনও কাঁটা তোলা হয়নি। বাবা খবরটা শুনল, তারপর আস্তে-আস্তে খুঁটে কাঁটা তুলল, তারপর ভেতর বাড়িতে গেল।

শ্যামা বলে—সে কী!

মেয়েটা হাসে, বলে—সত্যি বলছি। বাবার কোনও সমস্যা নেই। আপনাদের সঙ্গে যেমন সুরে কথা বলেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন করেই কথা বলেন। আমরা বাবাকে মোনা ঠাকুর বলেই চিনি, বাবা বলে নয়।

চাতাল পেরিয়ে একটা মঠ মতো। দক্ষিণে দ্বাদশ শিবের মন্দিরের গা ভেদ করে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা।

—এসব মন্দির কি বহুদিনের পুরোনো?

—কয়েকশো বছর বোধহয়। শিব মন্দিরে তক্ষক ডাকে। মেয়েটা হেসেই বলে।

—সুড়ঙ্গটা কোন দিকে?

—পশ্চিম দিকে। দেখবেন? নাকি এমনি বেড়াবেন?

শ্যামা মেয়েটির দিকে চায়। সরল সোজা মুখ, অকপট চোখ। কিছুই বোঝা যায় না কিন্তু টের পাওয়া যায়, এই মন্দির, মোনা ঠাকুর, এ সবের ওপর মেয়েটির কোনও টান

নেই। মেয়েটা এই মন্দিরের দেবতা বা তার পুজারিকে গ্রহণ করেনি।

শ্যামা হঠাৎ জিগ্যেস করে—আপনি আপনার বাবার সবকিছু বিশ্বাস করেন না?

মেয়েটা চোখ বড় করে হেসে বলে—করব না কেন? আপনাদের যেমন বিশ্বাস, আমাদেরও তেমনই বিশ্বাস। তবে—মেয়েটা চুপ করে থাকে।

—তবে কী?

—বলছিলাম, আমার ভাই মরে যাওয়ার দিন ওই যে বাবাকে পায়ের কাঁটা তুলতে দেখেছিলাম ওটা কখনও ভুলতে পারি না। একজন মরে যাচ্ছে, আর বাবা কাঁটা তুলছে, কেমন যেন মনে হয়। ঠিক যেন সংসারের একটা কাঁটা বাবা তুলে ফেলছে। এরকম করে ভাবলে ভয় করে।

শ্যামার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে। সে আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু বাবার মুখ দেখে উনি কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন আমরা কার খোঁজে এসেছি।

মেয়েটা কিন্তু কোনও কৌতূহল দেখায় না। কেবল বলে—বাবা তো সবই ঠিক বলে। আমরা জানি। নইলে লোকে আসবে কেন?

—অনেক লোক আসে?

—অনেক। ছুটির দিন হলে এ সময়টায় লোক গিজগিজ করে। কলকাতা থেকেই বেশি আসে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমার এক দাদা পাঁচ বছর হল হারিয়ে গেছে।

মেয়েটা উত্তর দেয় না। মাথা নীচু করে হাঁটে। শ্যামার তখন মনে পড়ে, এ মেয়েটার ভাই মরে গেছে, একটা মাত্র ভাই। এর দুঃখ আরও বেশি হওয়ার কথা। তার দাদা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। মেয়েটার ভাই নিশ্চিতভাবে মারা গেছে।

শিব মন্দিরের পাশে একটা টিউবওয়েল দেখে শ্যামার তেষ্টা পায়। বলে...একটু জল খাব।

—আমি বাড়ি থেকে এনে দেব?

—না, না। ওই তো টিউবওয়েল!

—আঁজলা করে খেতে অসুবিধে হবে না?

—দূর।

—তবে চলুন আমি কল টিপে দিই। এখানকার জল খুব মিষ্টি।

জল খাওয়ার সময় নীচু হয়ে শ্যামা হঠাৎ শুনতে পেল, কোকিল ডাকছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল তার। মুখ তুলে বলল—কী ডাকছে?

ওমা! কোকিল। মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শ্যামা স্থির হতে পারে না। প্রশ্ন করে—সত্যিকারের কোকিল।

—তা নয় তো কী?

—অনেক সময়ে মানুষ কোকিলের মতো ডাকতে পারে।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে বলে—এখানে কে আবার মানুষ কোকিল ডাকতে আসবে? আমি জন্ম থেকে কোকিলের ডাক শুনছি। এ সত্যিকারের কোকিলের ডাক।

শ্যামা জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলে—আমি একজনকে জানি যে হুবহু কোকিলের মতো ডাকে। ধরা যায় না যে মানুষ ডাকছে।

মেয়েটা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে—কিন্তু এ মানুষের ডাক নয়। ওই শিমুল গাছে কোকিল বসেছে। সারা দিনই ডাকে। আমি চিনি ওই ডাক।

চারদিকে ঝোপঝাড় আর গাছে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হয়। রোদের মুখ থেকে

মেঘ সরে গেছে। তবু এইখানে রোদের ততদূর উজ্জ্বলতা নেই। গাছের ছায়ারা পড়ে আছে। শ্যামা তার মুখে গালে নয়নের স্পর্শ ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

—সুড়ঙ্গটা দেখবেন? মেয়েটা জিগ্যেস করে।

—চলুন, দেখি। কখনও দেখিনি।

—দেখার কিছু নেই। মেয়েটা উদাসভাবে বলে—আমরা তো জন্ম থেকে দেখছি।

—এ সবই কি আপনাদের সম্পত্তি?

—না। দেবত্র। এক জমিদার দেবত্র করেছিল। তার আর বংশ নেই। আমাদের কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে। আমরা এই মন্দিরের চার পুরুষের পুরুত।

—এখানেই জন্মেছেন?

মেয়েটা হেসে বলে—তবে আর কোথায়?

—ভালো লাগে এ জায়গা?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে—একদম না। অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কেউ যদি নিয়ে যেতে চায় চলে যাব।

শ্যামা হেসে ফেলে। বলে—এ জায়গার ওপর আপনার এত রাগ কেন?

মেয়েটা হেসে বলল—আপনার মতো একটা রঙিন সুন্দর শাড়ি পরতে ভীষণ ইচ্ছে হয়, জানেন!

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে। তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁটে।

মেয়েটা বলে—খুব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে। বাসে-ট্রামে মোটর গাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করে, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে।

—এখানে কিছু নেই?

মেয়েটা অন্যমনস্কভাবে বলে—মাঝে-মাঝে অমাবস্যার পুজোয় এই মাঠে সিনেমা দেখানো হয়। যাত্রাওলারা আসে। অনেক বছর আগে একটা সার্কাসও এসেছিল। সেই সার্কাসের একটা লোক খেলা দেখাত, তাকে সিংহ থাবা দেয়। সার্কাসের লোকরা তাকে এইখানেই ফেলে গেল। সে এখনও আছে। ওইদিকে মন্দিরের উত্তরে বাঁশ-ঝাড়টার পিছনে থাকে। বাবা দেখতে পারে না।

—কেন পারে না?

—এই গাঁয়ের সে-ই একমাত্র লোক যে এ মন্দিরে আসে না।

—কেন?

মেয়েটা ম্লান একটু হাসে। বলে—তার একটা ছেলে আছে। তার বউ ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায়। বাবা বলে, ছেলেটা ওই লোকটার নয়! কী ঘেন্নার কথা বলুন! কিন্তু লোকটা বলে যে ছেলেটা তারই। এই নিয়ে ঝগড়া। বলেই মেয়েটা আবার হাসে মুখে আঁচল দিয়ে।

তারপর আবার বলে—-এখানে কিছু নেই। কেবলই মনে হয়, আমাদের একটা আদ্যিকালে পোড়ো অন্ধকার জায়গায় ফেলে রেখে চারদিকে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কত লোক আসে তাদের যত দেখি তত ওই কথা মনে হয়। বাবা তাদের দুঃখের কথা শোনে, আর আমি দেখি তাদের পরনে কত রঙিন কাপড়ের পোশাক, কীরকম ঝলমলে মুখ-চোখ, কেমন দুঃখ মাখানো তাদের চেহারায়!

শ্যামা হাসি চেপে বলে—কিন্তু এ তো কলকাতা থেকে দূর নয়।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—দূর কেন হবে! কত লোক এখানে থেকেও চাকরি করতে যায় রোজ, কিংবা সিনেমা দেখে আসে, কেনাকাটা করতেও যায়। কাছেই একটা দুটো শহরও তো আছে। কিন্তু আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলেই কোথাও যাওয়া হয় না।

মেয়েটা থেমে গিয়ে বলে—ওই হচ্ছে সুড়ঙ্গের রাস্তা।

একটা উঁচু বেদীর মতো বাঁধানো জায়গা! চারটে থাম, ওপরে সুন্দর একটা চুড়োওয়ালা ছাদ। ছাদের নীচে একটা ছোট্ট ঘর, তার দরজাটা খোলা। মেয়েটা সেদিকে চেয়ে বিষাদ মুখে বলে—ওই। যাবেন?

—কতদূর গেছে সুড়ঙ্গটা?

—বেশি দূর নয়। একটু গিয়েই দেখবেন ছাদ ভেঙে পড়েছে, ইটের ডাই, আর আগাছা। বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে এরকম সুড়ঙ্গ আছে, শুনেছি।

—সাপখোপ নেই তো?

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে হেসে বলে—কত কী আছে! আমরা ছেলেবেলায় চোর-চোর খেলতে যেতাম ওর ভেতরে। বড় হয়ে আর যাই না। অনেকে গুপ্তধনের লোভে খুব খোঁড়াখুঁড়ি করত একসময়ে। কেউ কিছু পায়নি।

শ্যামা হেসে বলে—আমরা যদি কিছু পেয়ে যাই?

মেয়েটা হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ে।

ঘরে ঢুকে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই শ্যামা থেমে পড়ে। সামনে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে সিঁড়ি। একটা চামচিকে ডেকে ওঠে।

—অন্ধকার যে!

—কোনও ভয় নেই। আমি আগে যাচ্ছি।

মেয়েটা শ্যামাকে পেরিয়ে আগে নামে। শ্যামা পিছনে। আবার হঠাৎ চামচিকে ডেকে ওঠে। এবার একটু দূর থেকে।

মেয়েটা থমকে মুখ ঘুরিয়ে জিগ্যেস করে—আপনার নাম কী?

—শ্যামা।

—মেয়েটা হাসে, বলে—আমার নাম তারা।

—জানি।

—আমাদের নামের একই অর্থ।

শ্যামা মাথা নাড়ে। হাসে।

—শ্যামার মন্দিরেই আপনি এসেছেন। অন্ধকারকে কি খুব ভয় শ্যামাদি?

শ্যামা অপ্রতিভভাবে হেসে বলে—আমরা তো ভাই শহরের মানুষ, অন্ধকারকে একটা ভয় পাই।

—তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই।

—কেন?

—আমার কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। অনেকদিন নামিনি কি না!

গভীর অন্ধকার তলদেশ থেকে হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

তিন-চার ধাপ সিঁড়ি নেমে গলা পর্যন্ত অন্ধকারে দুজনে একটু দাঁড়িয়ে রইল। সামনে তারা, পিছনে শ্যামা।

তারা একটা শ্বাস ফেলে বলল—আপনার কি নামতে খুব ইচ্ছে করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলল—না। বলে সে উঠতে লাগল।

ওপরে এসে, ফাঁকা জায়গায় এবং আলোতে মেয়েটাকে বিমর্ষ দেখাল। শ্যামার দিকে চেয়ে সে বলল—জানেন, আমার সেই ভাইটা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি কেমন যেন ভয়-ভয় পাই। নির্জনে বা অন্ধকারে থাকতে পারি না, কিছু মনে করলেন না তো শ্যামাদি?

সুড়ঙ্গটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার।

শ্যামা অন্যমনস্ক ছিল। খুব অন্যমনস্ক। আসল ডাক আর নকল ডাকের পার্থক্য বোঝা যে কী মুশকিল! সে তার কথার উত্তর দিল না।

এখনও বেলা আছে। সূর্যের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে। কেবল পশ্চিমের আকাশে একটা ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা ঘুলিয়ে উঠছে। নিবিড় গাছপালার ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ আকাশ দেখা যায়। এই ঋতুতে এরকম হয়। মাটির তাপ ওঠে, কুয়াশা জমে স্থির বাতাসে ধুলো ভেসে থাকে। সেই অস্বচ্ছতার আড়ালে সূর্যকে পরিষ্কার গোল চাঁদের মতো দেখা যায়। উজ্জ্বলতা নেই তার। চারপাশে আকাশের সেই অস্বচ্ছতা একরকম ছায়া ফেলেছে।

মোনা ঠাকুর তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে! মা আঁচলে চোখ মুছছে। বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে। শ্যামা গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল।

—কী হল মা?

মা বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে ধরল তাকে—যদি সত্যি হয় শ্যামা, তবে আমি কালীর সোনার চোখ গড়িয়ে দেব।

—কী হয়েছে বলো না!

মা মোনা ঠাকুরের শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে ধরা গলায় বলে—ও নাকি বেঁচে আছে। হৃষিকেশ বা হরিদ্বারের দিকে আছে। সন্ন্যাসী হয়েছে, মাথার অসুখ নেই।

বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলে—আমি ডেফিনিট হতে পারছি না!

মা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঝেঁঝে উঠে বলে—আমরা কিছু বলার আগেই উনি কি করে বুঝলেন যে আমারা ছেলের কথা জানতে এসেছি। তুমি তোমার ডেফিনিট নিয়ে থাকো গে। আমি হৃষিকেশ যাব।

বাবা মৃদুস্বরে বলে—এসব বিষয়ে সিওর হওয়া যে কী মুশকিল তা তুমি পুরুষ হলে বুঝতে। এত বছর অপেক্ষা করার পর আশা করতে ভরসা পাই না।

মা বলে—তুমি না পাও আমি পাচ্ছি।

বাবা চুপ করে থাকে।

শ্যামার ভেতরটা মুচড়ে ওঠে ব্যাথায়। আবার আনন্দেও। দাদা কি আবার ফিরে আসবে। দাদা কি আর বেঁচে আছে! আবার ফিরে যদি আসে, যদি আবার প্যান্ট শার্ট পরে, আড্ডা মারতে বেরোয়, যদি আবার খাওয়ার পর লুডো বা তাস নিয়ে বসে? কত চাল চুরি করত দাদা, মা দেখেও দেখত না। আবার কি সব হবে ঠিক আগেকার মতো। ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। শ্যামা মনে-মনে ধরেই নিয়েছিল, দাদা নেই। কোন নদীর পাড়ে বা রেললাইনের ধারে, কিংবা বড় মাঠের মধ্যে সেই পাগল মানুষটা শেষ হয়ে পড়ে আছে—এরকমটাই মনে হত তার, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ধক করে কেঁপে উঠত বুক। বাবা প্রায় সময়েই বলত—দ্যাখো গে, কোথাও ভিক্ষে-টিক্ষে করছে বোধহয়। মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। মায়ের কথা, বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে বলেই আসছে না। একদিন ঠিক ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মতো ফিরে আসবে আবার 'মা' বলে ডাকবে, বিয়ে করবে, চাকরি করবে...। শ্যামার ঠিক বিশ্বাস হয় না। এ সব তো সিনেমায় হয়, গল্পে হয়, কিন্তু তার দাদার বেলায় হবে কি?

তাকে কাছে টেনে, আদর করে কপালে চুল সরিয়ে দিয়ে গাঢ় আনন্দের স্বরে মা বলল—শ্যামা, একটু পরেই সন্ধে লেগে যাবে মা, আমরা আরতিটা দেখে যাব।

—দেরি হয়ে যাবে না?

—হোক গে। এ বড় জাগ্রত দেবতার স্থান! একটু থাকি।

বাবা বিড়বিড় করে বলে—দিনকাল ভালো নয়।

মা বড় চোখে বাবার দিকে চায়। বাবা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

উদাস একখানা মাঠ। শেষ বেলার বালিরঙের আলো পড়ে আছে। একখানা টিনের দোচালার দাওয়ায় বসে বাপ-ব্যাটা।

ছেলে মুখ তুলে বলে—বাবা, দাদুবুড়ো কেমন করে হাঁটে।

—দাদুবুড়োর কোমর বাঁকা, কুঁজো হয়ে মাজায় হাত রেখে হাঁটে।

—কামড়ায় না।

—কামড়ায়।

—কেমন লাগে?

—লাগে না। দাদুবুড়োর দাঁত নেই তো, কেবল মাড়ি! কামড়ালে কাতুকুতু লাগে।

সুকুল হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার বাবা হাসতে গিয়ে দেখে, কোণাকুণি মাঠ পার হয়ে নয়ন আসছে। কোকিল ডাক। কোকিলের ডাকই নয়নের বেশি প্রিয়।

সে কাছে আসতেই ছেলের বাপ হাসে, বলে—শ্যামাপাখির ডাক পারেন না? নয়ন খুব গম্ভীর। মাথা নাড়ে। না।

—কী হল ওখানে?

—কিছু না। এখন আরতি হবে।

—বসুন।

নয়ন দাওয়ার একধারে বসে। সুকুল উঠে তার দিকে চায়।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—কল্পতরুর মন্দিরে।

—মোনা ঠাকুর ভীষণ রাগি। কামড়ায়।

নয়ন কেবল মৃদু একটু হাসে।

—তুমি আমাকে কখন পাখির ডাক শেখাবে?

—কাল থেকে শেখাব।

—আমি ঘুমোলে চলে যাবে না তো?

—না।

সুকুল নিশ্চিন্ত মনে তার বাবার দিকে চেয়ে বলে—বাবা, সিংহটা তোমাকে কেমন করে থাবা দিয়ে মেরেছিল বলো।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হাসে। বলে—এই গল্প ও কতবার শুনেছে, তবু রোজ শুনবে!

নয়ন ঝুঁকে বলে—কী গল্প?

—গল্প না। একটা ঘটনা।

—আপনাকে সিংহ থাবা দিয়েছিল?

লোকটা উদাস গলায় বলে—সিংহ কি না কে জানে। আদুবুড়ো বলত, সেটা কেশরী বাঘ!

—সেটা কী?

—সিংহই আসলে। তবে গাউস সাহেবের গরিব সার্কাসে আর কত বড় সিংহ হবে! আদুবুড়ো বলত—আসল সিংহ হয় গহিন জঙ্গলে সেখানে মানুষ যেতে পারে না। গাউস একটা কেশরী বাঘ ধরে এনে সিংহ বলে চালাচ্ছে। আমাদেরও সেই ধারণাই ছিল।

—আপনি সার্কাসে ছিলেন? খেলা দেখাতেন?

—দেখাতাম। প্রথম প্রথম। চুল দিয়ে লোহা তুলতাম, কিলিয়ে পাথর ফাটাতাম। গায়ের জোর ছিল খুব। একদিন তাঁবুর দড়ি খাটাতে গিয়ে পড়ে যাই। মাজা ভেঙে শেষে রয়ে গেলাম। গাউস অবশ্য লোক খারাপ ছিল না। দলে রেখে দিল। ফাই-ফরমাস তামিল করতাম, বাঘ সিংহকে খাবার দিতাম, হাতির জন্য কলাগাছ কেটে আনতাম। এই সামনের মাঠে একবার গাউস সাহেব তাঁবু ফেলল। নির্জন জায়গা বাঘ সিংহের ডাকে কেঁপে উঠল। তা এইখানেই সেই ঘটনাটা ঘটে। দুপুরবেলা খাবার দিতে সিংহের খাঁচায় নেমেছি। বুড়ো আধমরা সিংহ, নাড়াচড়া করত না বড় একটা, খাঁচায় ঢুকলে হাই তুলে নিরীহ চোখে চাইত। দেখেশুনে মনে হত, আদুবুড়োর কথাই ঠিক। এটা সিংহ নয় বটে, কেশরী বাঘই হবে। সেদিন কী খেয়াল হল, মাংসের একটা বড় টুকরো সিংহের নাকের সামনে নেড়ে সরিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখি ব্যাটা করে কী। এইরকম পাঁচ-সাতবার করবার পরও সে ব্যাটা কেবল হাই তুলল, আর চোখ পিট পিট করল। মজা পেয়ে আবার তার নাকের সামনে মাংস দুলিয়ে সরিয়ে নিই। ঠিক বুঝতে পারিনি। হঠাৎ বেমক্কা সব আলসেমি ঝেড়ে ফেলে সিংহটা লাফিয়ে উঠল। সে কী ডাক। ভেতরটা আমার ফেটে গেল যেন। সেই ডাক সামলাবার আগেই উপর্যুপরি কয়েকটা থাবা। তারপর এক ঝটকায় আমাকে পেড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর দাঁড়াল সে। পাঁজরার একটা হাড় গেল মট্ করে ভেঙে। সময়মতো গাউস সাহেব চাবুকের শব্দ না করলে আজ আর আমাকে সুকুলের বাবা হতে হত না। বলে লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসতে থাকে।

সুকুল বলে—দেখি দাগ।

লোকটা জামা সরিয়ে পিঠ দেখায়। নয়ন দেখে, সেখানে গভীর এবং লম্বা ক্ষতের চিহ্ন। সে জিগ্যেস করে—তারপর কী হল?

—কী আবার হবে! একটু দূরে মহকুমার হাসপাতালে মাস চারেক পড়ে রইলাম। ততদিনে গাউস পাততাড়ি গুটোল। আমারও সার্কাস ভালো লাগছিল না বলে পিছু নিলাম না। এই গাঁয়ের একজন লোক তখন আমাকে ধরেছিল তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। বিয়ে করলে বিশ বিঘে জমি দেবে, ঘর দেবে, নগদ বিদায়ও দেবে কিছু। মেয়েটাও মন্দ ছিল না। বিয়ে করে থেকে গেলাম। সেই মেয়েই সুকুলের মা। বেশিদিন বাঁচেনি।

লোকটা চুপ করে মাঠের বালিরঙের আলোর দিকে চেয়ে রইল। একটু অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে বলল—বাবা সুকুল, তুমি বই নিয়ে একটু বসো। আমি রান্না চাপাই। ঘরে অতিথি আছে।

ঘরে সবকিছুই সাজানো। একদিকে বাপ ব্যাটার খাট, অন্যধারে একটা ন্যাংটো চৌকি। চতুর্দিকেই সুকুলের খেলনা। চাল থেকে বেলুন ঝুলছে, দেয়ালে পেরেক লটকানো ঘুড়ি লাটাই, কাচের আলমারি বোঝাই পুতুল, খেলনা-পিস্তল, ভেঁপু লাট্টু, কলের ঘোড়া। আলনায় সুকুলেরই রং-বেরঙের জামাকাপড়। একধারে সুকুলের পড়ার টেবিল, তাতে পড়ার বইয়ের পাশে রাজ্যের ছবির বই। পরিষ্কার করে মোছা একটা ঝকঝকে লণ্ঠন রাখা।

লোকটা নয়নকে ঘরটা দেখিয়ে বলে—এ হচ্ছে সুকুলেরই ঘর। সুকুল যখন বড় হবে, তখন ওর বিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।

সুকুল ঝাঁপিয়ে গিয়ে বাবাকে ধরে, কিল মারে নীরবে।

লোকটা হাসে, ছেলেকে সামলাতে-সামলাতে বলে—আচ্ছা, আচ্ছা, যাব না। তুমি বই খুলে বসো। আমি ভেতরের বারান্দায় বসে রান্না করি।

ভেতরে অন্ধকার উঠোন। তাতে জোনাকি পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয়ন চুপ করে বসে চেয়ে ছিল। দূরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। তার কান সেই দিকে।

লোকটা ভাত চাপিয়ে এসে পাশে বসে বিড়ি ধরায়।

—কিছু হল?

—না।

—সুড়ঙ্গে নেমেছিলেন নাকি? মাথার চুলে ঝুল লেগে আছে।

—নেমেছিলাম। কিন্তু ও নামেনি।

—নামল না কেন?

নয়ন ঠোঁট উলটে বলে—কী জানি! বোধহয় আপনাদের মোনা ঠাকুর আগেভাগে সব জেনে ওকে সাবধান করে দিয়েছে।

—ঠাকুরকে দেখলেন?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে দেখেছি। দূর থেকে।

—কেমন মনে হল?

—যেমন হয়।

—পারবেন?

—কী?

—উচ্ছেদ করতে?

নয়ন একটু হাসে। তারপর আস্তে করে বলে—একটা বোমা মারলেই উড়ে যায়।

লোকটা ধীরে-ধীরে বিড়িটা টানে। তারপর চিন্তা করে বলে—শত্রুকে দুর্বল ভাবতে নেই।

নয়ন একটু নড়ে। গালে একটা মশা মারে ঠাস করে। পায়ের পাতা খসখস করে চুলকোয়। কান খাড়া করে আরতি ঘণ্টা শোনে। হঠাৎ বলে—আপনার টর্চ আছে?

—আছে একটা। আমার নয় সুকুলের। ছোট্ট টর্চ, তেমন জোরালো নয়।

—দিন তো। বলেই উঠে দাঁড়ায়।

—চললেন কোথায়?

—ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

—চিনতে পারবে না?

—না। অন্ধকার আছে। টর্চটা নীচু করে ফেলব।

—গলার স্বর?

নয়ন হেসে বলে—আমি হরবোলা।

লোকটা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট্ট টর্চটা এনে দেয়। নয়ন কয়েকবার চারদিকে আলো ফেলে দেখে নেয়। বলে—চলবে।

ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময়ে সুকুল তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে—এ কী চলে যাচ্ছ?

—না সুকুল। ফিরব।

—কখন?

—তুমি একটু জেগে থাকো। তোমার ঘুমোবার আগেই ফিরব।

—যদি না ফের?

নয়ন টর্চটা উঁচু করে দেখিয়ে বলে—তোমার বাতি নিয়ে যাচ্ছি তো, এটা ফেরত দিতেও ফিরব।

—ফিরো কিন্তু। কাল থেকে ডাক শিখব।

আরতির ঘণ্টা এখনও বাজছে। কোণাকুণি দ্রুত পার হতে থাকে নয়ন। জোনাকি পোকার মতো আলো জ্বালে আর আলো নেভায়।

মোনা ঠাকুরের শরীর ছন্দে দুলে যায়। কী সুন্দর তার শরীরের কারুকাজ। যে-কোনও নর্তকের চেয়ে নমনীয় তার শরীর—বেতের মতো। কখনও পিছনে হেলে, কখনও সামনে ঝুঁকে নাচে। আলোয় দেখা যায়। মোনা ঠাকুরের মুখে এক বিহ্বল হাসি, চোখে জল, দৃষ্টি সম্মোহিতের মতো মোহাচ্ছন্ন। তার প্রকাণ্ড ছায়া দেয়াল জুড়ে, এক অপ্রকৃত ছায়ার সঞ্চার করে। সেই দৃশ্য দেখে শ্যামার ভয় করে! এ যেন এক অন্য জগতে চলে এসেছে সে! ধুনো আর গুগগুলের গন্ধের সঙ্গে ঘষা চন্দন আর ফুলের গন্ধ মিশে গেছে। মন্দিরের বদ্ধ বাতাসে শতাব্দী ধরে সঞ্চিত শীতলতা! এ যেন সেই জগৎ নয়।

মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাবা চোখের জল মোছে। শ্যামার হাত-পা আড়ষ্ট লাগে, পিপাসা পায়। তার মাথা ঝিমঝিম করে। মনে হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় আরতির ঘণ্টার সঙ্গে নাচতে-নাচতে, কেঁদে হেসে মোনা ঠাকুর কালীর সঙ্গে কথা বলছে। বিপুল কালীমূর্তির দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি, লাল জিহ্বার আলো পড়ে ঝিকিয়ে ওঠে হিংস্রতা। ঘাম তেল গড়িয়ে নামছে মুখ বেয়ে। শ্যামা চোখ ফিরিয়ে নেয়। অনেকক্ষণ অসাড় লাগে তার মন। মনে হয়, মোনা ঠাকুরের কথার উত্তরে ওই মূর্তি এক্ষুনি হেসে উঠবে, কথা বলবে।

আরতি শেষ হতে-হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তখনও মোনা ঠাকুর মাটিতে পড়ে আছে। কাঁদছে। তারপর অসাড় হয়ে গেল। মোনা ঠাকুরের রোজ আরতির শেষে ভর হয়।

দৃশ্যটা দেখে বাবা স্তব্ধ হয়ে থাকে। মা শব্দ করে কাঁদে। শ্যামার শরীরে ঘাম দেয়।

ঘোর ঘোর একটা মানসিক অবস্থা বহু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে-সঙ্গে যায়। রওনা হতে-হতে পৌনে আট। রাস্তা অন্ধকার। গাঁয়ের লোকেরা কিছুদূর সঙ্গে-সঙ্গে এল, তারপর তারা তিন জন। আর কেউ নেই। কেউ কথা বলতে পারছে না এখনও।

আমবাগানের সামনে এসে বাবা থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে বলে—এ যে ভীষণ অন্ধকার! কী করে যাবে?

মার এখনও সঠিক জ্ঞান ফেরেনি যেন। মা কাঁদছে এখনও। ধরা গলায় বলে—ভয় কী! চলো ঠিক চলে যাব।

—যেতে তো হবেই। কিন্তু এই অন্ধকারে খুব রিস্কি। বেলাবেলি চলে গেলে কোন ঝামেলা ছিল না।

—তোমার কেবল পিছু টান। কোথাও তোমার সঙ্গে গিয়ে শান্তি নেই। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, সেখানে দু-দণ্ড মনটাকে রাখতে হয়, ঘরের চিন্তা করলে কি চলে?

বাবা বিড়বিড় করে বলে—সাপখোপ কত কী আছে হয়তো।

তবু যেতেই হবে। বাবা শ্যামাকে ডেকে বলে—তোকে নিয়েই আমার দুনিয়ার ভয়। তুই মাঝখানে থাক, সামনে আমি পিছনে তোর মা। বলে বাবা গলা খাঁকরি দেয় দু-তিনবার হাতে তালি বাজিয়ে শব্দ করে।

শ্যামা এই সময়েও ওই কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে। বলে,—ও কী করছ?

—দেশ-গাঁয়ে অন্ধকারে এভাবে শব্দ করে হাঁটতাম। জীবজন্তু সব শব্দ পেয়ে সরে যায়। বাবা বারবার গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁটে। সামনের পথ খুব আবছা। রাস্তা উঁচু-নীচু। বারবার পায়ে ঠক্কর লাগে। কয়েক পা হেঁটেই বাবা বলে—কী করে যাবে? হাঁটাই যাচ্ছে না।

—চলো তো, যা হওয়ার হবে। মা কালী আমাদের দেখবেন। মা ধমকে বলে।

তবু বাবা সাহস পায় না। সাবধানে হাঁটে। পা দিয়ে রাস্তা হাতড়ে। নয়ন কি চলে গেছে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে চারদিককার শব্দ শুনবার চেষ্টা করে। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। এক-আধটা প্যাঁচার ডাক দূরে থেকে শোনা যায়। ওই কি নয়ন? কে জানে।

এদিকে রাতে লোক চলাচল নেই দেখছি, বাবা চিন্তিত গলায় বলে।

মা ঝংকার দিয়ে বলে—তোমার অত ভয় থাকলে তুমি পিছনে এসো। আমি সামনে যাচ্ছি। বাবা একটু রেগে গিয়ে বলে—তুমি বড় সাহসী কি না! মেয়েছেলের এগারো হাতে কাছা হয় না, বড় বড় কথা।

—তোমাদেরই কাছা দেওয়া উচিত নয়। ঘোমটা দাও। তখন থেকে কেবল চোর-ডাকাত সাপ-খোপের কথা বলে যাচ্ছ।

—তোমাদের আর কী? সঙ্গে পুরুষ মানুষ রয়েছে। সব হ্যাপা সে সামলাবে। তোমাদের গা আলগা দিয়ে থাকলেই হল।

কথা বেশিদূর গড়াল না। সামনের অন্ধকারে জোনাকি পোকা জ্বলছিল। তার মধ্যে একটা জোনাকি যেন একটু বড়। একবার অনেকক্ষণ জ্বলে নিভে গেল। লক্ষ করে শ্যামা বাবাকে ডেকে বলে—বাবা, সামনে টর্চ হাতে কেউ যাচ্ছে দ্যাখো।

বাবাও দেখল। বলল—মনে হচ্ছে। তোরা পা চালিয়ে আয় তো! মা ঝংকার দেয়—কী বুদ্ধি! যদি ছেলে-ছোকরা হয় তবে কি আমারা হেঁটে তাকে ধরতে পারব? ডাকো না লোকটাকে, দাঁড়াতে বলো।

বাবা বিড়বিড় করে একবার বলে—কেমন লোক কে জানে! তারপরই গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে—ও মশাই, শুনছেন, এই যে—

সামনের বাতিটা থামে। একটা টর্চের মুখ চকচক করে ওঠে। তারা এগোয়।

লোকটাকে দেখা যায় না। টর্চটা নীচু করে ধরা। একটু মোটা ভাঙা গলায় লোকটা বলে—কিছু বলছিলেন আজ্ঞে?

বাবা বলে—কোন দিকে যাবেন? বড় রাস্তা পর্যন্ত?

—ওদিকেই।

—আমরাও যাব। অন্ধকারে বড় বিপদে পড়েছি।

—চলুন না, আমার সঙ্গে চলুন। কোথায় এসেছিলেন, কল্পতরু মন্দিরে নাকি?

—হ্যাঁ। বড় জাগ্রত দেবতা। যা দেখে গেলাম ভোলবার নয়। আপনি কি এদিককার লোক? বাবা জিগ্যেস করে।

—পাশের গাঁ। মোনা ঠাকুরকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

—কেমন লোক?

—কী আর বলি বলুন। তবে উনি আমাদের এই এলাকার গৌরব।

শ্যামা টর্চের আলোর আভায় প্রথমে প্যান্টের রংটা চিনতে পারে। তারপর হলুদ শার্টটার আভাস পায়। গায়ে কাঁটা দেয় তার। শীত করে। নয়ন আড়ালে থাকলে যত ভয়, কাছে এলে এত ভয় করে না শ্যামার। কিন্তু বাবা-মার সামনে এভাবে আসা ভীষণ বিপদজনক! যদি ধরা পড়ে যায় নয়ন! হাত শিরশির করতে থাকে তার।

তারা হাঁটে। আগে নয়ন, তার পিছনে তারা তিনজন সারিবদ্ধ।

বাবা নানা কথা বলতে থাকে। নয়ন মোটা ভাঙা গলায় উত্তর দেয়।

—এদিকের কোন ডেভেলপমেন্ট হয়নি, না? বাবা বলে।

—কোন দিকটারই বা হয়েছে বলুন?

—রাস্তাঘাট কেমন এখানে?

—যেমন দেখছেন। এইসব রাস্তায় হেঁটেই আমরা বড় হলাম।

—বিপদ আপদ?

—সাপখোপ আছে।

—চোর ডাকাত?

—শুনি না তো বড় একটা।

বাবা একটু গম্ভীর থেকে বলে—চোর ডাকাত না থাক, অভাব তো আছে। অভাবী মানুষ, দুঃখী মানুষ যত বাড়বে ততই অমঙ্গল। সেই সব মানুষই রং পালটে চোর ডাকাত হয় কিনা! তা ছাড়া লাশ-ফেলা পলিটিক্স আছে। কাজেই ভয়ভীতি এখন সর্বত্র।

—তা অবশ্য ঠিক। তবে এদিকে কখনও কিছু হয়নি। তবে হবে।

—কী করে বুঝলেন?

—দেশের অবস্থা দেখে বুঝছি। শিগগিরই দেখবেন, এদিকেও লাশ পড়ছে।

শ্যামা অন্ধকারে আপন মনে একটু হাসে। কোথায় যেন বুনো ফুল ফুটেছে। তার গন্ধ পায় শ্যামা। মনটা চনচন করে ওঠে। ভালো লাগে। ওই তো টর্চ হাতে নয়ন সামনে চলেছে। এখন আর কোনও ভয় নেই। তারা ঠিক বাস-রাস্তায় পৌঁছে যাবে।

একটা আল্ টপকে দিলেই মোনা ঠাকুর ফিনিশ। তার মা কালীর পায়ের তলায় শুয়ে রক্ত-বমি করতে-করতে চোখের পটল ওলটাবে। নয়ন সব জানে। তবে কি না নয়নের সঙ্গে মোনা ঠাকুরের কোনও ঝগড়া নেই। কিন্তু লেগে যাবে একদিন।

মন্দিরের আরতি হয়ে গেছে। শিকের দরজা পড়ে গেছে মন্দিরে। শিকের ফাঁক দিয়ে বিগ্রহ দেখা যায়। কালীমূর্তি বাঙালিমাত্রেরই আজন্ম চেনা। সেই জিভ-বেরকরা আধ-ন্যাংটো নৃমুণ্ডমালিনী। কোনও ভক্ত যেন সোনার চোখ গড়ে দিয়েছিল, সেই সোনালি চোখে প্রদীপের আলো ঝলসাচ্ছে, আর গায়ের ঘাম তেল! নয়নের কোন আগ্রহ ছিল না, কেবলমাত্রে মন্দিরটার কারুকাজ আর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু কৌতূহলবশত সে জুতো ছেড়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এল। ফুল বেলপাতা ধুনো গুগগুল এসব গন্ধ তো আছেই, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে এক-দেড়শো বছরের ছায়ায় ঢাকা শ্যাওলা-পড়া সেঁতসেঁতে গন্ধ। মন্দিরে বারান্দাটা ঠান্ডা হিম। চামচিকে আর কবুতরের শব্দ পাওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। নয়ন ঝুলন্ত ঘণ্টাটায় একবার টং শব্দ করে, তারপর শিকের দরজাটা নেড়ে দেখে তালা দেওয়া বারান্দার দিকে দু-পাট ভারী, লোহার গুল মারা দরজা খোলা রয়েছে, সে দুটো আরও রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে। দুটো শিক দু-হাতে ধরে নয়ন মন্দিরের আধ্অন্ধকার ঘরখানা দেখল। এই ঘরে মোনা ঠাকুরের ভর হয়, দৈববাণীও হয় নাকি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ভূতের গায়ের গন্ধে ম-ম করে চারদিকে। দুটো শিক দু-হাতে চেপে নয়ন কালীর সোনার দুটো চোখের দিকে স্থির চেয়ে রইল একটু ক্ষণ। এই চোখে প্রাণসঞ্চার হতে কেউ-কেউ দেখেছে। নয়ন চেয়ে থাকে। আলো-আঁধারির ভেতর থেকে দু-খানা নিষ্প্রাণ সোনার চোখও চেয়ে থাকে তার দিকে। কালীর গায়ে কিছু খাঁটি, নিরেট সোনার গয়না লক্ষ করে নয়ন। বিগ্রহের বেদি পুরোটা রূপো দিয়ে মোড়া। এই হচ্ছে মোনা ঠাকুরের স্টেজ। সঠিক আলো গন্ধে শব্দে রহস্যময় আবহ, দর্শকরা নিরক্ষর গরিব ভবিষ্যত-ভীরু মানুষ, এই মঞ্চে মোনা ঠাকুর ভর হওয়া রামকৃষ্ণের অভিনয় করে। দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয়। চোখের জল ফেলে। তবু মোনা ঠাকুরের ওপর কোনও আক্রোশ ছিল না নয়নের। কারণ এ অঞ্চলে সে আজই প্রথম এসেছে। এসেছিল শ্যামার পিছু নিয়ে। শ্যামা কোনদিনই পাত্তা দিল না তাকে। নয়ন সবই বোঝে তবু ছাড়তে পারে না। শ্যামা তাকে ভালোবাসে না হয়তো। তাতে নয়নের খুব বেশি কিছু যায় আসে না। হৃদয়ের খেলা পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। এটা প্রয়োজনের যুগ। কাউকে কাউকে কারও প্রয়োজন হয় মাত্র। যেমন, নয়নের প্রয়োজন শ্যামাকে। যদি সারা জীবনের জন্য নাও হয় ক্ষতি নেই, অন্তত কিছু দিনের জন্য শ্যামাকে তার পেতেই হবে।

ঘটনা ঘটেছিল এইভাবে। শ্যামা আজ তার মা বাবার সঙ্গে এইখানে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে আসবে এই খবরটা নয়ন শ্যামাদের বাচ্চা চাকরটার কাছে আজ সকালেই পেয়ে যায়।

সময়টা জানা ছিল না। তবু অনেক সকালেই সে জাতীয় সড়কের ধারে বাস থেকে নেমে গাঁয়ের হাটে অপেক্ষা করছিল। তখনই হাটের লোকজনের কাছে সে মোনা ঠাকুরের সব কাহিনি জেনে নেয়। শ্যামারা এসেছিল হেমন্তের বিকেল যখন মানুষজনের ছায়া দীর্ঘতর করেছে, ধানের রূপসি মুখে কনে দেখা আলো তখন। শ্যামাকে সে একবার দেখেছিল মাত্র, তারপরই ভিড়ে ডুব দেয়। কারণ শ্যামার বাবা মার তাকে দেখলে স্ট্রোক হওয়ার ভয় আছে। নয়ন জানত, শ্যামারা যাবে আমবাগানের ভেতর দিয়ে। সেটা দীর্ঘ পথ। নয়ন হাটের লোকজনের কাছে জেনে নিয়েছিল, মোনা ঠাকুরের কালী মন্দিরে যাওয়ার একটা জঙ্গুলে ছোট পথ আছে। ভাঙা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাওয়া যায়। খানিকটা তাড়ি গিলেছিল সে তারপর। যখন হাঁটা দিয়েছে তখনই মাথাটা এলোমেলো, ঠিক মনে নেই, আবছা মনে পড়ে, একটা ভাঙা বিপজ্জনক সাঁকো বুকে হেঁটে পেরিয়ে জঙ্গল ভেদ করে আমবাগানের ভেতর একটা ভাঙা বাড়িতে শ্যামার পথ চেয়েছিল সে। পেয়েও ছিল শ্যামাকে। কী সব উলটোপালটা কাণ্ড করেছিল যে! শ্যামার বাবা মা একটু-একটু এগিয়ে গেছে তখন, আর শ্যামা পোড়ো বাড়িটার হাতায় ভাঙা ফোয়ারার পাশে একটা লতানে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ তুলছিল। সে সময় নয়ন তাকে আক্রমণ করে। উলটোপালটা কী সব বলেছিল যেন, বিয়ে করতে চেয়েছিল শ্যামাকে। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সবটাই তাড়ির ঘোরে। নইলে অতটা হয়তো করত না। ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বাচ্চা ছেলেকে এক হাতে ধরে, অন্যহাতে একটা জীবন্ত গোখরো সাপ নিয়ে তাদের পথে এসে পড়ে ছিল। ছেলেটা চিৎকার করে ওঠায় তার ওই উন্মত্ত আবেগ কেটে গিয়েছিল।

নয়নের একটা দোষ এই যে কোন ব্যাপারে তার মন বেশিক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। তার মনটা টেলিফোন একসচেঞ্জে সুইচবোর্ডের মতো। মুহুর্মুহু লাইন পালটে কানেকশন নেয়। লোকটার হাতে ওই সাপ দেখে সে শ্যামাকে ভুলে লোকটার পিছু নেয়।

এই জায়গার কিছুই নয়ন চেনে না। শ্যামারা শেষ বাসে চলে গেল। শ্যামার বাবা-মা টের পায়নি যে নয়ন এতদূর এসেছিল। সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন বড় একা লাগছে তার। নিঃসঙ্গ অবসাদগ্রস্থ।

কালীর সোনার চোখের দিকে চেয়ে সে খুব গভীরভাবে শ্বাস নিল। দেড়শো বছরের পুরোনো একটা গন্ধে ভরে গেল বুক। তাড়ির কিছু নেশা এখনও তার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। টলমল করছে মাথা। ঠিকমত চিন্তা শক্তি এখনও ফিরে আসছে না। হরবোলা নয়ন দুটো শিস দিল। অবিকল তিতিরের মতো। তারপর পুরোনো মন্দিরের গাছ শুঁকে শুঁকে বারান্দায় ঘুরে বেড়াল খানিকটা। অন্ধকার চারিদিকে। মোনা ঠাকুরের বাড়ির বাইরের ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যায়। সে শুনেছে আরতির পর ওই ঘরে একটা ধর্মসভা হয়। গাঁয়ের চাষিরা আসে, সাধারণ মানুষেরা আসে, বুড়ো বউ-বাচ্চারা ঘিরে বসে। মোনা ঠাকুর তাদের ধর্মের কথা শোনায়। শ্যামারা এখানে কেন এসেছিল তা ঠিক জানে না নয়ন। তবে আন্দাজ করতে পারে, শ্যামার দাদা বছর পাঁচেক আগে পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়। বহুকাল ধরেই শ্যামাদের পরিবারের ওই একটা দুঃখ। বহু সাধু সন্ন্যাসীর কাছে ওরা যায় পাগল ছেলের খোঁজ পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যামা নিজেই। রঙটাই যা ময়লা শ্যামার, নইলে শ্যামার চটক আছে। ওই কালো রং উপেক্ষা করে পুরুষেরা ওর জন্য পাগল। তাদের কাউকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা শ্যামার নেই। সর্বোপরি রাহুর মতো নয়ন লেগে আছে পিছনে। শ্যামাকে নিয়েও ওদের ভয় কম নয়! কে যে কবে টান দিয়ে শ্যামাকে নিয়ে যায়। কার সঙ্গে কবে শ্যামার বিয়ে হবে এটা জানাও ওদের দরকার। সেই কারণেই মোনা ঠাকুরের কাছে আসা।

মোনা ঠাকুরকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে কি না ঠিক বুঝতে পারে না নয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বী

তার অনেক, প্রতিদিনই এক-আধজন বেড়ে যায়। মন্দিরের ঘন্টায় আর একবার টং করে শব্দ করে সে অন্যমনস্কভাবে। মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘর থেকে একটা লোক লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে দূর থেকেই প্রশ্ন করে—কে?

নয়ন উত্তর দেয় না, লোকটা এগিয়ে আসে, জুবুথুবু বুড়ো একটা লোক। হেমন্তের শীতেই মাথামুখ ঢেকে চাদর জড়িয়েছে। কুঁজো হয়ে মাঠটা পেরিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলে—কে আজ্ঞে?

—কেউ না। মন্দির দেখতে এসেছি। আমাকে চিনবেন না।

লোকটা গলায় কফের শব্দ করে বলে—এত রাতে কোথা থেকে এলেন আজ্ঞে?

—যেখান থেকেই আসি না, আপনার কী?

লোকটা স্তম্ভিত এবং ভীত মুখে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ। নয়ন একটা সিগারেট ধরায়, মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই লোকটা লণ্ঠন তুলে ধরে আছে। নয়ন লোকটার মুখ দেখে। সর্বভারতীয় মুখ একখানা, পথে-ঘাটে বাজারে হাটে গঞ্জে এরকম একইরকম বৈশিষ্ট্যহীন মুখ যে নয়ন কত দেখেছে। এসব মানুষকে একজনের থেকে আর একজনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল।

লোকটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে বলে—দেখুন আজ্ঞে। মন্দির দেখতে বাধা কী? মায়ের মূর্তিখানা বুক ভরে, নয়ন ভরে দেখে নিন। তবে কি না দিনকাল খারাপ।

নয়ন ঝেঁঝে উঠে বলে—কীসের খারাপ?

লোকটা নরম সুরেই বলে—গাঁয়ে অচেনা লোক এলে মানুষের একটু ধন্ধ লাগে। ছেলে-ছোকরারাও সজাগ। গাঁ চৌকি দেয়। আপনি নতুন নাকি আজ্ঞে?

—তা দিয়ে আপনার কী?

—জিগ্যেস করি আর কী! এত রাতে নতুন লোক বলেই বলছি। অচেনা জায়গা।

নয়ন একটু হাসে—তা মায়ের স্থান যখন, ভয় কী?

লোকটা কিছু বলে না। চেয়ে থাকে একটু। তারপর বলে—ঠাকুর তো আসরে বসে গেছেন। যদি যেতে চান তো চলে আসুন।

চকিত একটা লাফ দিয়ে নয়ন উঁচু বারান্দা থেকে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে মাঠে নামে। লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—ঠাকুর কে?

—মোনা ঠাকুর আজ্ঞে আর কে হবেন। মনোময় দেবশর্মা তিন পুরুষে এই মন্দিরের পুজারি। ওঁর ঠাকুরদা নরবলি দিতেন। দু-হাতের দশ আঙুলে ওঁদের যা শক্তি তা দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র এধার ওধার করে দেন। নাম শোনেননি?

তাড়ির নেশাটা এখনও ফিকে হয়ে লেগে আছে। নয়ন নইলে একটা উত্তর দিত ঠিক। দিল না। কেবল একটু হাসল। অবশ্য উত্তর দিলেও লাভ ছিল না। এরা যা একবার বোঝে তা সহজে ভোলে না। সে শুধু বলল—মোনা ঠাকুরের কাছে গেলে বশীকরণ করবে না তো?

—কী বললেন?

—বলি ভেড়া বানিয়ে রাখে না তো?

লোকটা হাসে—ঠাকুর কত কী করে তার আমরা কী জানি! তবে ভয় পাই না। উনি কাউকে ভয় দেখান না বড় একটা। ক্ষতিও করেন না।

—আপনি যান। আমি সময় হলে যাব।

লোকটা বিনীতভাবে বলে—রাতে ঘণ্টার শব্দ করলে মায়ের বিশ্রাম ভেঙে যায়। মায়ের শয়ন হয়ে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। লোকটা তেমনি কোলকুঁজো হয়ে অন্ধকারে ফিরে যায় লণ্ঠন

হাতে।

পকেট থেকে সুকুলের দেওয়া টর্চটা বের করে কুয়াশামাখা অন্ধকারে এধারে ওধারে ফেলে নয়ন। মন্দিরের ওপাশে একটা পুরোনো সুড়ঙ্গ আছে। বেশিদূর যাওয়া যায় না। রাস্তা বুজে গেছে। প্রাচীন কালে মানুষেরা সুড়ঙ্গ তৈরি করত। সব প্রাচীন সুড়ঙ্গই বোধহয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাচীন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। নয়ন তা জানে। একটা আল টপকালে কোথায় যাবে মোনা ঠাকুর!

কিন্তু মোনা ঠাকুরের ওপর তেমন কোনও রাগ নেই তার। বলতে কী একজন মোনা ঠাকুর এখানে আছে বলেই শ্যামারা এইখানে এসেছিল আর এসেছিল বলেই আমবাগানে একপলকের জন্য শ্যামার দেহের স্বাদ পেয়েছিল সে। অবশ্য মোনা ঠাকুরের সঙ্গে একটা লড়াই শেষ পর্যন্ত তাকে লড়তেই হবে। ধর্মকে উচ্ছেদ করাই হবে শেষ কাজ। মন্দির ভেঙে চৌরস করে যাবে রাজপথ, মসজিদ গিরজা ভেঙে তৈরি হবে খেত। তাতে সোনার ধানে ঢেউ খেলবে, কিংবা তৈরি হবে শিশুদের জন্য বাগান, যুবক-যুবতীদের মিলন-ক্ষেত্র। কী যে হবে তা নয়ন জানে না। কিছু একটা হবেই। হয়তো সেই সুদিন দেখার জন্য সে বেঁচে থাকবে না।

নয়ন বারান্দাটায় আবার ওঠে। উঁচু হয়ে বসে সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দেয়। তার আজকাল কেন যেন মনে হয়, আর খুব বেশিদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

উত্তুরে একটা বাতাস এল হঠাৎ। নয়নের শীত করে ওঠে। সে জুবুথুবু হয়ে বসে। চারদিকের নিস্তব্ধ শীতলতা অনুভব করে। আর শ্যামার কথা ভাবে। কালো, সুন্দর এবং দুর্লভ শ্যামার কথা, এই মন্দিরে আজ শ্যামা এইখানে এসেছিল।

থুতু ফেলে নয়ন উঠল। গায়ে পাতলা শার্টটা ভেদ করে বাতাস লাগছে। শ্যামার পিছু-পিছু ফিরে যায়নি নয়ন। যায়নি ওই সাপওলা লোকটার জন্য, হয়তো মোনা ঠাকুরের জন্যও। শ্যামাকে ঠিকই পেয়ে যাবে নয়ন, চিন্তা নেই। আপাতত মোনা ঠাকুব আর সাপওলা লোকটার রহস্য ভেদ করে যাওয়াট ই তার কাছে দরকার।

মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘরে কয়েকটা ঝকঝকে লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকজন লোক এধার ওধার বসে আছে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মোনা ঠাকুর। তেমন কিছু চেহারা নয়। শরীরটা মেদহীন ঝরঝরে, গায়ের রঙ তামাটে, শুধু চোখ খুব উজ্জ্বল। খালি গায়ে একটা সাদা উড়ুনি মাত্র জড়ানো। হাঁটু দুটো বুকের কাছে তোলা। পাশে বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই।

নয়ন খোলা দরজায় দাঁড়াতে মোনা ঠাকুরই তার দিকে প্রথম তাকাল, সেই তাকানোর মধ্যে কোনও বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। প্রতিদিনই বহু মানুষ আসে তার কাছে, সুতরাং মোনা ঠাকুর আর বিস্মিত হয় না। কেবল ঘরের অন্য লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বুড়োটা এসে বোধ হয় তার কথা আগে ভাগে বলে রেখেছে।

—আসতে পারি? নয়ন জিগ্যেস করে।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ল উত্তর দিল না।

নয়ন ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার তাকায়। তার ভাবভঙ্গি সহজ এবং উদ্ধত। এই লোকগুলোর চেয়ে যে সে সব বিষয়ে উন্নত, এরকম একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সে ইচ্ছে করেই ফুটিয়ে তোলে। চারদিকে কয়েকটা ছোট পাটির আসন পাতা; সে একটু পিছনের দিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঘরে কোনও কথা নেই। সবাই চুপ। যেন তার উপস্থিতিই ঘরের আবহাওয়াকে অস্বাভাবিক করে দিয়েছে। কেউ কথা বলছে না, সবাই অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। যেন এক্ষুনি কিছু একটা ঘটাবে নয়ন, কিছু অদ্ভুত কথা বলবে। সবাই তাই অপেক্ষা করছে।

মোনা ঠাকুর আস্ত একটা বিড়ি শেষ করে ফেলল। ততক্ষণ কেউ কথা বলল না। নয়ন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে চেয়ে আছে। আক্রমণ ইচ্ছে করলেই সে করতে পারে, কিন্তু মুড নেই। আপাতত, সে কেবল দেখে নিচ্ছে। হাটে মানুষজনের কাছে সে শুনেছে মোনা ঠাকুর এ অঞ্চলের প্রধান মানুষ। কয়েকটা গাঁ জুড়ে অখণ্ড রাজত্ব। হাত দেখা, কোষ্ঠী বিচার, সাপের বিষ নামানো, মারণ বশীকরণ সবই মোনা ঠাকুরের হাতের পাঁচ। সম্মোহন বিদ্যায় ওস্তাদ। কলকাতা থেকেও ছুটির দিনে বিস্তর মানুষ আসে তার কাছে।

এরকম কোনও মানুষের কথা শুনলেই নয়ন ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাড়ার গুণ্ডা কিংবা রাজনৈতিক নেতা কিংবা যে-কোনও লাইনেই কেউ প্রধান হয়েছে শুনলে নয়নের ভেতর একটা স্বাভাবিক আক্রমণ করার ইচ্ছে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে লোকটাকে তার জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে ধুলোয় পিষে দিতে ইচ্ছে করে। এই পৃথিবীতে তার তুল্য বা তার চেয়ে বড় কেউ আছে, এই চিন্তাটাই সে সহ্য করতে পারে না।

বিড়িটা শেষ করে মোনা ঠাকুর তার দিকে তাকায়। নয়ন একদৃষ্টে চেয়েছিল। চোখাচোখি তাকিয়ে মোনা ঠাকুর নরম গলায় জিগ্যেস করে—বাবুমশাই, জায়গাটা কেমন লাগল?

নয়ন ঘাড়টা পিছনে হেলিয়ে অবহেলায় বলল—খারাপ কী?

—এদিকে কি কদিন থাকার ইচ্ছে?

—থাকতে পারি। ঠিক নেই।

—জায়গাটা ভালোই। তবে কি না আপনারা শহর-গঞ্জের মানুষ।

—আমি শহর-গঞ্জের মানুষ একথা কে বলল?

—নন?

নয়ন একটু হেসে বলে—না। আমি সব জায়গার মানুষ। গ্রামেরও।

মোনা ঠাকুর একটু চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে—আসলে গাঁ আর শহর জুড়েই তো মানুষের জীবন। কোন ঠাঁইয়ে তার বাস তা থেকে বিচার হয় না। তা এখানে উঠেছেন কোথায়?

—সাপওলা একটা লোক আছে, তার বাড়িতে রাতটা থাকব।

সাপওলা লোক শুনে আবার সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে।

মোনা ঠাকুরের মুখে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, সাধারণ গলায় বলে—সাপওলা লোক তো একমাত্র জগদীশ। তা তার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে না কি?

—থাকলেই কী?

—কিছু না। জিগ্যেস করলাম। মানুষজনের পরিচয় জেনে রাখাটা আমাদের অভ্যাস। তাহলে আপনি তার আত্মীয় নন?

নয়ন দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে অবহেলায় বলল—না। আমি একটা মেয়ের পিছু নিয়ে এখানে এসে পড়েছিলাম। পথে সাপওলা জগদীশের সঙ্গে আলাপ।

মেয়ের পিছু নেওয়ার কথা শুনে দু-একজন তার দিকে তাকাল। মোনা ঠাকুরের মুখ তেমনই ভাবলেশহীন। নয়ন গ্রাহ্য করল না।

—থাকবেন?

—দেখি। আমার কিছু ঠিক নেই।

মোনা ঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাতড়ে বিড়ির বাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরায়। তারপর হঠাৎ একটু হাসে। নয়নের দিকে চেয়ে বলে—সে আমাকে দেখতে পারে না।

—কে?

—জগদীশ।

নয়ন চুপ করে থাকে।

মোনা ঠাকুর নিজেই বলে—জগদীশ এ গাঁয়ে আসে সার্কাসওলাদের সঙ্গে। তোমার মনে আছে হরিপদ, সিংহের থাবা খেয়ে জগদীশের সেই যে পাঁজর ভেঙেছিল?

লণ্ঠনওলা লোকটা বোধহয় আফিং খায়। উড়ুনি জড়িয়ে উবু হয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছে। নিজের নাম শুনে মুখটা তুলে গলায় কফের ঘড়ঘড় একটা শব্দ করল মাত্র।

মোনা ঠাকুর নয়নের দিকে চেয়ে বলে—জগদীশ বড় কালীভক্ত ছিল। মায়ের থানে রোজ আসত। আমি একদিন তাকে বলি যে আমি কালীটালী কিছু জানি না। আমি গুরু জানি। আমার পুজো হচ্ছে আসলে গুরুর পুজো। সে তখন উলটে বলল—তাহলে আপনি ভণ্ড, কালী মানেন না তো পুজো করেন কেন? আমি উলটে বললাম—তো রামকৃষ্ণদেব পুজো করত কেন? বেদান্ত মানলে তো মূর্তিপুজো চলে না। রামকৃষ্ণ ঠাকুরও আসলে যার পুজো করত সে দক্ষিণা কালী নয় গো, সে হচ্ছে গুরু। ঠাকুর নিজেই বলেছেন—মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন তাদের বে না হয়। সেই থেকে জগদীশের সঙ্গে আমার বখেরা। তা বাবুমশাই, বলেন তো কোনটা ঠিক। এই মূর্তিপুজো না গুরুপুজো?

নয়ন ঠিকমতো শুনছিল না। শুধু বলল—কে জানে! মানুষের কত বাতিক থাকে!

—আপনি গুরু মানেন না?

—না!

মোনা ঠাকুর একটু, খুব সামান্য মাত্র, একপরদা উত্তেজিত গলায় বলে—আপনি কখন কারও কাছ থেকে কিছু শেখেন নি? এমন কি অ-আ-ক-খ-ও নয়?

নয়ন বিরক্ত হয়ে বলে—শিখব না কেন?

—তবে?

—তবে কি? কারও কাছ থেকে কিছু শিখলেই সে গুরু হয়ে যায় না কি?

—না মানলে হয় না, মানলে হয়।

—তাহলে তো আমার গুরু অনেক। যার কাছে যা শিখেছি, সবই গুরু।

—তাই তো। আপনার চেয়ে যার জ্ঞান-গুণের ওজন বেশি সে-ই গুরু। ওজনওলা লোক চাই, যার যেমন ওজন সে তেমন গুরু। আপনার গুরুদের মধ্যে কার ওজন সবচেয়ে বেশি বাবুমশাই?

নয়ন একটু হাসে! তারপর বলে—কার্লমার্কস।

মোনা ঠাকুর একটুও চমকায় না। বলে—তো সে-ই আপনার সবচেয়ে বড় গুরু।

—আপনি মূর্তি মানেন না? তবে যে হাটে শুনলাম আপনার কালীমূর্তি নড়ে-চড়ে, কথা কয়?

মোনা ঠাকুর নিভন্ত বিড়িটায় আর একবার আগুন দেয়। নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—বাবুমশাই, মেয়েটা কে?

নয়ন উদাস গলায় বলে—ওই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব।

শুনে লোকজন নড়েচড়ে বসে। লণ্ঠনওলা লোকটারও ঝিমুনি চোট খায়।

মোনা ঠাকুর ঠান্ডা গলাতে বলে—ও, তারপর একটু চুপ থাকে, তারপর ধীরে বলে—একটা মেয়ে তার বাপ মার সঙ্গে এসেছিল বটে আজ বিকেলে। শ্যামলা রঙ, মুখে চোখে শ্রী আছে। সে...ই কী?

—সে...ই। ওরা আপনাকে কী বলেছে?

মোনা ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—ওই মেয়েটার

বড় ভাইয়ের কথা জিগ্যেস করেছিল। সে বছর পাঁচেক ধরে নিরুদ্দেশ। মোনা ঠাকুর আবার বিড়ি ধরায়, তারপর বলে—এমনিতে তো সংসারটা সুখেরই হওয়ার কথা ছিল। বুড়ো-বুড়ি, একটা ছেলে, একটা মেয়ে, ঝুট-ঝামেলা কিছু নিই। তবু একটা পড়ে গেল। ভারী দুঃখ ওদের।

নয়ন অধৈর্যের গলায় বলে—শুধু ওদের ছেলের কথা জিগ্যেস করল? আর কিছু না?

মোনা ঠাকুরের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে বলে—আর তো মনে পড়ছে না। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই মোনা ঠাকুর তার দিকে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ, তারপর বলে—তা পাত্রী তো ভালোই বাবুমশাই। লেগে যান।

বিদ্রুপটা ধরতে কষ্ট হয় না তার। ভেতরটা দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তবু বাইরে সে শান্তই থাকে। স্থির ও কঠিন চোখে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে সে বলে—আমাদের বিয়ে কোনও শালা আটকাতে পারবে না।

মোনা ঠাকুর একটু নরম, যেন বা সান্ত্বনার সুরে বলে—আটকানোর কী। করবেন বিয়ে। গরিব-গুর্বো, কুঠে-ভিখিরিও বিয়ে করে। ও আর এমনকী? করলেই হয়।

—তার মানে?

—বললাম বিয়ে তো আখছারই হয়। অঘোন পড়ল তো শানাই ধরল পোঁ। কান ঝালাপালা, বিয়ের মাসে এই মায়ের থানেই কত নতুন বর-বউ আসে। বিয়ে সবাই করতে পারে। কলকাতার ফুটপাতে ভিখিরিদের বিয়ে দেখেননি?

নয়নের ভ্রু কুঁচকে আসে, ভ্রূর তলা দিয়ে সে মোনা ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বলে—বিয়ে যে হয় তা আমিও জানি। কিন্তু বিশেষ একজনের সঙ্গে বিশেষ আর একজনের বিয়ে হয় কি না, সেটাই সমস্যা।

—আপনার বাধা কী?

—আমরা তেলি, ওরা বামুন। ওর বাবা-মা এ বিয়ে চাইছে না।

মোনা ঠাকুর সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলে—আর মেয়েটা?

—সেও চাইছে না। কিন্তু জাতের জন্য নয়, বাবা মার জন্য। কিংবা অন্য কারণ থাকতে পারে।

—তাহলে?

—তাহলেও কিছু যায় আসে না। আমি ওকে জোর করে কেড়ে আনব। কোনও শালা কিছু করতে পারবে না।

—কে কী করবে বাবুমশাই?

নয়ন স্থির দৃষ্টিতে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল—ওরা ওদের ছেলের কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি?

—কী বলবে?

—আমার কথা? বলেনি যে নয়ন নামে একটা লক্কড় ছেলে শ্যামার পিছনে ছায়ার মতো ঘোরে? বলেনি সেই ছেলেটার জ্বালায় ওদের মেয়ে রাস্তায় হাঁটতে পারে না?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে—না।

নয়ন একটু হাসে। হঠাৎ জিগ্যেস করে—আপনি বাণ মারতে পারেন?

মোনা ঠাকুর নয়নের চোখে চায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে—ওসব আমি জানি না।

নয়ন অবাক গলায় বলে—জানেন না? কিন্তু লোকে বলে, আপনার বিজনেস-ই হচ্ছে বাণ মারা। সেই যে মাটিতে ছবি এঁকে ছোরা বসিয়ে দিলে যার ছবি আঁকা হয়েছে সে মুখে রক্ত তুলে, পা ছুড়ে দাপিয়ে মরে যায়? ওরা আপনাকে বলেনি নয়ন রায়কে বাণ মারতে হবে?

মোনা ঠাকুর দুঃখিত মুখ করে বলে—না বাবুমশাই।

নয়ন একটা কৃত্রিম স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে—যাক, বাঁচা গেল।

মোনা ঠাকুর তার দিকে মিটমিট করে চেয়ে থাকে বলে—বাণ মারার চিন্তা করে খুব কি ভয় পেয়েছিলেন বাবুমশাই?

নয়ন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে—ভীষণ।

—আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না।

—কী মনে হয় না?

—যে আপনার ভয়-ডর আছে।

নয়ন একটু হাসে। তারপর শান্ত বিদ্রূপের গলায় বলে—আপনি তো ছবিতে বাণ মারেন! কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারের মানুষটাকেই বাণ মারে, সামনাসামনি। আপনার বাণের চেয়ে এই বাণ আরও বিপজ্জনক। দেখবেন? বলে নয়ন তার শার্টটা কোমরের কাছ থেকে টেনে তোলে, তারপর হাত দিয়ে পেট আর তলপেটের মাঝামাঝি দু-আড়াই ইঞ্চি একটা গভীর ক্ষত দেখায়। কয়েকজন লণ্ঠন তুলে ঝুঁকে পড়ে দেখে। মোনা ঠাকুর উদাস মুখে বসে থাকে।

বছর চল্লিশ বয়সের ধূর্ত চেহারার একটি লোক ঝুঁকে দাগটা দেখে মুখে চুকচুক শব্দ করে বলে—কী হয়েছিল?

—স্ট্যাব। ঠান্ডা গলায বলে নয়ন।

—জোর বেঁচে গেছেন, ছোরা ঠিকমতো টানতে পারেনি! পারলে বাঁচতেন না।

মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে নয়ন বলে—যারা আমাকে হিন্দু হোস্টেলের পাশে গলিতে এক রাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারা আপনার চেয়ে অনেক ভালো বাণ মারতে পারে। তাদের বাণে ভুলচুক হয় না। কলকাতায় এবং অন্য জায়গায় এরকম বিস্তর লোক নয়ন রায়কে বাণ মারার সুযোগ খুঁজছে। ভয় পেলে আমার চলে না মোনা ঠাকুর।

মোনা ঠাকুর উত্তর দেয় না। চিন্তিত মুখে অন্যমনস্ক হাতে হাতড়ে বিড়ির বান্ডিলটা খোঁজে। নয়ন তার চারদিকে চায়। লণ্ঠনওলা বুড়োর ঝিমুনি পুরোপুরি কেটে গেছে, হাঁ করে চেয়ে আছে নয়নের দিকে, গলায় অবিকল কফের শব্দ হচ্ছে ঘড়ঘড়। একজন প্রৌঢ় মানুষ নস্যি রঙের খদ্দরের চাদর গায়ে সামনে বসে আছে, কালো হাতে সাদা একটা ঘড়ি, চোখে চশমা। বোধহয় গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার, নাড়ুগোপালের মতো থলথলে মুখ। লোকটা মোনা ঠাকুরের দিক থেকে ইতিমধ্যেই অর্ধেক ঘুরে বসেছে নয়নের দিকে। মুখে বিস্মিত বোকা হাসি। চল্লিশ বছরের ধূর্ত চেহারার লোকটা নিশ্চিত পঞ্চায়েতের লোক, রোগা হাত-পা, মাথার চুলে প্রচুর তেল, গায়ে বিয়ের শালটা আধময়লা ধুতির ওপর বেমানান। লোকটা অনেকখানি ঘেঁষে নয়নের কাছাকাছি এসে গেছে। তার চোখ-মুখে চঞ্চল কৌতূহল। মোনা ঠাকুরের বাঁ ধারে আরও দুজন লোক বসে আছে। তারা চাষিবাসি শ্রেণি, ভাবলেশহীন এবড়ো-খেবড়ো মুখ। চোখে নির্বুদ্ধিতার নিষ্প্রভতা। তারা নয়ন আর মোনা ঠাকুরের চাপান-উতরটা ঠিকমতো বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ। ছুরি-ছোরার কথায় একটু চাঙ্গা হয়ে চেয়ে দেখছে নয়নকে। খুন-খারাপি যে তারা কিছু না দেখেছে এমন নয়, তবে নয়নের চোটপাটের কথাবার্তা যে তারা পছন্দ করছে না তাদের মুখে সম্ভ্রমের ভাব দেখেই বোঝা যায়। মোনা ঠাকুরের ডান ধারে পুঁটলির মতো তিন-চারজন মেয়েছেলে। তাদের রিঅ্যাকশন নয়ন এই অল্প আলোতে ঠিক বুঝতে পারল না। তবে এটা ঠিক, মোনা ঠাকুরের দিক থেকে সকলের মনোযোগ নিজের দিকে এনে ফেলেছে। সেটা পেরেছে বলে একটু তৃপ্তি বোধ করে নয়ন। এখন ইচ্ছে করলেই সে মোনা ঠাকুরের আসনটিকে একটি ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু তা দেবে না নয়ন। সময়ের অপেক্ষা করা ভালো। তা ছাড়া, মোনা ঠাকুরের ওপর নয়নের যথেষ্ট রাগ হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ বাদে মোনা ঠাকুর একটা শ্বাস ফেলে। নয়নের দিকে চায়। তারপর জিগ্যেস করে—আপনার কি অনেক শত্রু?

নয়ন আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে...অনেক।

—কেন বাবুমশাই?

—সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন হঠাৎ বলে আপনি আমাকে বাবুমশাই-বাবুমশাই বলছেন কেন?

—শহরের মানুষ আপনারা, সয়-সম্মান করা ভালো।

—শহরের মানুষ কি আলাদা কিছু? আমি শহর গ্রাম আলাদা করে বুঝি না। এই যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেমন, আমিও তেমনি।

—তাই কি হয়। জায়গা বুঝে আমারা মানুষ চিনি।

—শহরের মানুষকে আপনারা বেশি সম্মান করেন কেন?

—তারা যে তাই চায়। গাঁয়ের লোকেরা তাদের সমকক্ষ তো নয়।

—ওটা ছেঁদো কথা। আসলে আপনারা নিজেদের খাটো ভাবেন।

—তা হোক বাবুমশাই, তা হোক, লোককে শ্রদ্ধা-সম্মান করার শিক্ষা ভালোই। ওতে ক্ষতি হয় না।

নয়ন ধরতে পারে কথাটার দ্বিতীয় অর্থ আছে, যা তাকেই বলা। নয়ন গায়ে মাখল না। কেবল বলল—আমার—আমার শত্রুর কথা জিগ্যেস করছিলেন না?

—আজ্ঞে।

—ওই যে যেমন আমি ওই মেয়েটিকেই চাই বলে ওর মা-বাপ আমার শত্রু, তেমনি আমি আরও অনেক কিছু চাই বলে আরও অনেকে আমার শত্রু।

মোনা ঠাকুর চুপ করে বিড়িতে টান দেয়। বিড়ি খাওয়ার একটা নিজস্ব ধরন আছে তার। যেন ধোঁয়া তার বুক পর্যন্ত পৌঁছয় না, গলা থেকেই ফিরে আসে। দু-একবার ছোট্ট টান দিয়ে বলে—মেয়েমানুষের ক্ষমতা অনেক। মা হয়ে, বউ হয়ে, মেয়ে হয়ে কত খেলা যে দেখায়। পুরুষের জান লবেজান। তা মেয়েমানুষ বাদে আপনি আর কী চান?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—মেয়েমানুষ চাই বটে, তবে ওই মেয়েটিকেও চাই। ওকে না পেলে আমার খিদে মিটবে না।

কথাটার নির্লজ্জতা সবাইকে স্পর্শ করে। এই নির্লজ্জতারও একটা স্বীকারোক্তি মতো আকুলতা আছে। এর সাহস সবাইকে আকর্ষণও করে। ল্যাংটো কথার জোর বেশি।

নয়ন বলে—আর যা চাই তা হচ্ছে ক্ষমতা মোনা ঠাকুর। এই জায়গায় আপনার যেমন ক্ষমতা, দেশ জুড়ে তেমনি ক্ষমতা চাই। ক্ষমতা পেলে কী করব তার কি কোনও ঠিক আছে? তবে হয়তো আপনাকে আর আপনার মতো লোকদের উচ্ছেদ করব। মন্দির-মসজিদ-গিরজা ভেঙে তৈরি করব রাস্তা, খেত, শিশুদের জন্য বাগান। বড়লোকদের ধরে চাবকাব তারা বড়লোক বলে, গরিবদের ধরে চাবকাব তারা গরিব বলে। অলস আর চোরদের তাড়িয়ে দেব। কত কী প্ল্যান আছে আমার! দেখবেন।

মোনা ঠাকুর একটু হেসে বলে—মেয়েমানুষদের ধরে চাবকাবেন তারা মেয়েমানুষ বলে আর পুরুষদের তারা পুরুষ বলে।

—তা কেন? আমি কি পাগল? মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটো দুরকম প্রাকৃতিক সৃষ্টি। সেটা তাদের দোষ নয়।

—তো গরিব বা বড়লোক হওয়াটা কি দোষের?

—নিশ্চয়ই। যে বড়লোক সে পাঁচজনেরটা একা ভোগ করে বলে দোষী, যে গরিব

সে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে পারে না বলে দোষী।

এটা যুক্তি নয়, নয়ন জানে! কিন্তু কুযুক্তির মধ্যেও জোর প্রকাশ করাটা তার স্বভাব। তাতে কাজ হয়।

সবাই চুপচাপ তার দিকে চেয়ে আছে। অতৃপ্তিতে তার ভেতরটা টলটল করে। নয়ন বাঁ-পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। হেডমাস্টার আর গ্রাম পঞ্চায়েতের লোক দুজন কথা বলছে গুনগুন করে। লণ্ঠনওলা বুড়ো স্খলিত চাদরটা দিয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে। বাইরে অবিরল ঝিঁঝির ডাক। দূরে একঝাঁক শেয়াল চিৎকার করে। কুকুর কাঁদে। জ্যোৎস্না ফুটেছে নাকি! কুয়াশায় মাখা জ্যোৎস্নার দৃশ্য নয়নের বড় প্রিয়। মলিন পৃথিবীর গায়ে কে যেন ছবি এঁকে দেয়! অলৌকিক ছবি।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল নয়ন। ঠিক সেই সময়ে সে মেয়েটিকে দেখল। ভেতরের দরজায় কপাটের আড়ালের ছায়ায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলেও দেখেছিল, শ্যামার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন্দিরের মাঠে। মোনা ঠাকুরের মেয়ে। মুখ চোখ খারাপ না। শরীরটাও ভালোই। ভোগের চাল-কলা খেয়ে দিব্যি আছে। এমনিতে মেয়েটির প্রতি নয়নের কোনও আকর্ষণ বোধ করার কথা নয়। কিন্তু শ্যামা ক্রমশ চলে যাচ্ছে তার নাগালের বাইরে এই চিন্তাটা তার ভেতরে একটা আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। শোধ নিতে ইচ্ছে হয়। ভীষণ খিদে জেগে ওঠে। এই মেয়েটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে এক ধরনের তৃপ্তিকর অবসাদ আসত তার। ভেতরটা তার কখনও জুড়ায় না। কখনও না। কেবল যখনই সে কোনও মেয়েকে আক্রমণ করে, উন্মোচন করে ফেলে তার সবকিছু, নিংড়ে নেয় দেহ, কেবল তখনই একটা অবসাদের প্রলেপ পড়ে ভেতরটায়। নইলে সে জ্বলছে জ্বলছে।

কপাটের ছায়া থেকে মেয়েটির চোখ তারই চোখে পড়ে আছে। সে তা স্পষ্ট অনুভব করে। নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে থাকে। হেডমাস্টার একবার গলা খাঁকারি দেয়, পঞ্চায়েতের লোক নড়ে চড়ে নয়নের আরও কাছে আসে, নয়ন সে সব খেয়ালই করে না। তাকিয়ে থাকে।

মোনা ঠাকুর হয়তো নয়নকে তাকিয়ে থাকতে লক্ষ করেই অনুচ্চস্বরে বলে—কপাটের আড়ালে কে রে? তারা?

মেয়েটি আলোর মধ্যে আসে। হাতে চাবি। বলে—বাবা মন্দিরের কপাটে তালা দেব?

—দে। উদাস গলায় বলে মোনা ঠাকুর।

পরনে পুজোর খাটো কাপড়, খোলা এলো চুল, মাজা পরিষ্কার শরীর, সতেজ দাঁত। সাজগোজ নেই বলে মেয়েটার সুস্বাদ শরীর তাকে আরও আকর্ষণ করে। তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে নয়ন, হাত-পা নিশপিশ করতে থাকে তার। দাঁতে দাঁত চাপে সে। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে মেয়েটা এক ঝলক চোখ তাকে দিয়ে যায়। আত্মবিস্মৃতের মতো মেয়েটার পিছু নেওয়ার জন্য নয়ন উঠে দাঁড়ায়। সে ইঙ্গিত বোঝে, সে নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছে।

—দাদা কি চললেন? বলতে-বলতে পঞ্চায়েতের লোকটা তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, বলে—আমিও জগদীশের বাড়ির দিকেই থাকি, কুমোরপাড়া, চলুন এগিয়ে দিই।

—আমার সঙ্গী দরকার হয় না।

—দু-চারটে কথাও বলব'খন। চলুন না।

—'শুয়োরের বাচ্চা' মনে-মনে গালি দিল নয়ন। তার ভেতরটা ঝিমিয়ে এল।

বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে ঠিকই। কুয়াশার পাতলা আবরণ চারদিকে। একমাত্র এই হেমন্তেই এরকম অপার্থিব ব্যাপারটা দেখা যায়। দরজা থেকে দৃশ্যটা দেখে নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে মোনা ঠাকুরকে বলে—চলি।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে—বাবুমশাই, আজ সারা বিকেল এ অঞ্চলে খুব কোকিল ডেকেছে, তিতির পাখি ডেকেছে, আরও কত কি পাখি। পাখির ভাষা যারা বোঝে তারা জানে ওসব আসল পাখি নয়। নকল।

নয়ন একটু হাসে। তারপর বলে—আপনি পাখির ভাষা জানেন?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে না। মুখে বলে—কিন্তু কেউ কেউ জানে।

লোকজন একটু অবাক হয়ে দুজনকে দেখছিল, সেই হেডমাস্টার লোকটা বলে উঠল—বাস্তবিক ঠাকুরমশাই, আজ কোকিলের ডাক খুব শুনেছি বটে। এ সময়ে এত ডাকে না তো!

নয়ন বা মোনা ঠাকুর কেউ কোন উত্তর দিল না লোকটার কথায়। কেবল নয়ন বলল—মোনা ঠাকুর মনে হচ্ছে আপনি পাখির ভাষা জানেন। নইলে ওটা যে নকল ডাক তা আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি।

মোনা ঠাকুর চুপ করে থাকে।

নয়ন হঠাৎ বলল—কিন্তু মোনা ঠাকুর, মানুষের মানব-কথা যখন পাখির ডাক হয়ে যায় তখন সে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। ওই নকল ডাকেও কিছু কথা বলা ছিল।

মাঠের রাস্তাটা মন্দির ঘুরে নাবালে নেমে গেছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। অক্ষম আক্রোশে দৃশ্যটা দেখল নয়ন। এমন নির্জনে একাকী ব্যাধ ও হরিণ। পঞ্চায়েতের লোকটা ভালুকের মতো তার গায়ে গা ঘষড়াচ্ছে। কিছু বলছে। নয়ন শুনছে না। মেয়েটার পা সিঁড়িতে ধীর হয়ে এল। শেষ দুটো সিঁড়িতে দুটো পা রেখে মেয়েটা জ্যোৎস্নায় চেয়ে আছে তার দিকে। তারই দিকে। এসব সময়ে কোনও ভাষা ব্যবহারের দরকার হয় না, শরীরই তো কথা, শরীর-গন্ধে শরীর চলে আসে কাছে। বৃথা তখন ভাষার ব্যবহার! নয়ন জ্বলে। হাত মুঠো পাকায়।

পঞ্চায়েতের লোকটা বলে—বুঝলেন?

মাঠ ঘুরে তারা নাবালে নেমেছে। মেঠো পথে একটা মাটির ঢেলায় হোঁচট খেয়ে সামলে নয়ন জিগ্যেস করে—কী?

—লোকটা সিদ্ধ পুরুষ।

—কে?

—মোনা ঠাকুব।

—ও।

—তবে ওঁর ঠাকুরদার আরও ক্ষমতা ছিল। শুনেছি তাঁর চোখের দিকে তাকানো যেত না।

—ও।

—জগদীশের সঙ্গে আপনার আগে চেনাশুনা ছিল না?

—না।

—লোকটা বড্ড গোঁয়ার।

নয়ন চুপ করে থাকে। হুঁ-হা কিছুই করে না। তবু লোকটা বলে—কী হয়েছিল জানেন? জগদীশ এসেছিল এক সার্কাসওলার সঙ্গে। খেলা-টেলা দেখাত না বড় একটা, বাঘ-সিংহীকে খাবার' দিত। একদিন খাবার দিতে গিয়ে সিংহ খেপে থাবা মারে। পাঁজর ভেঙে হাসপাতালে পড়ে রইল আট ন মাস। সেই সময়ে তার খুব দেখাশোনা করেছিল হারাধন বারিক। জগদীশকে সেই-ই তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বেশ কয়েক বিঘে জমি, নগদ টাকা এসব পেয়ে বিয়ে করে এই গাঁয়েই জমে গেল জগদীশ। বিয়ের সাত মাস বাদে তার ছেলে হল, বুঝলেন?

বলে লোকটা খিকখিক করে একটু হাসে।

অন্যমনস্ক নয়ন বলে—বুঝেছি।

—কী বুঝলেন।

—বিয়ের পর জগদীশের ছেলে হল তো! সকলেরই হয়।

—দূর মশাই। ছেলে ঠিক সময়ে হলে তো দশ মাস লাগার কথা। এ তো হল সাত মাসে। কিছু বুঝলেন না! আরও দেখুন, জগদীশের চালচুলো নেই, ভিনদেশি, কেউ চেনেও না তাকে, তবু হারাধনদা তার সঙ্গেই বিয়ে দিল কেন! দু-হাজার নগদ, দশবিঘে জমিও তো সোজা কথা নয়! গাঁয়েও সুপাত্রের অভাব ছিল না। সব যোগাযোগ করে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝে যাবেন।

জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! অপার্থিব ছবি মলিন পৃথিবীর গায়ে। এই সময়ে কোন আবর্জনা চোখে পড়ে না নয়নের। সে মুগ্ধ এবং সম্মোহিতের মতো হাঁটতে-হাঁটতে বলে—ও।

—হারাধনদার মেয়েটা ছেলের জন্ম দিয়ে মরে গেল। বেঁচেই গেল বলা যায়। সত্যিকারের বেঁচে থাকলে পাড়াগাঁ দেশে বিস্তর কথা শুনতে হত তাকে।

—হুঁ।

লোকটা খিকখিক করে একটু হেসে বলে—কিন্তু জগদীশের বিশ্বাস ওই ছেলে তারই। বুকের পাঁজর করে রেখেছে। ছেলের কোষ্ঠী করতে এসেছিল মোনা ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরমশাই কোষ্ঠী করলেন বটে, কিন্তু ছেলের বাপের নাম কোষ্ঠীতে লিখলেন না। জগদীশের সঙ্গে ঠাকুরমশাইয়ের ঝগড়া তখন থেকেই। জগদীশ বলে, আমিই ওর বাপ। মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, এর ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম। বুঝলেন মশাই, আমাদের মুখ থেকে এসব কথা বেরোলে তা আন-কথা কান-কথা, লোকে দোষ ধরে, বলে কুচ্ছো গাইছি। কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের কথা তো আর ফেলবার নয়! ও তো বাকসিদ্ধের কথা। মোনা ঠাকুরের মুখ থেকে কথাটা বেরোতেই লোকের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল। গাঁয়ে রটে গেল সব ব্যাপার-স্যাপার, যারা বিশ্বাস করত না তারাও বিশ্বাস করতে লাগল। জগদীশ সেই থেকে নিজে নিজে একঘরে। পাছে ছেলের কানে কথাটা যায় সেই ভয়ে কারও সঙ্গে মেশে না, কারও বাড়ি যায় না, শ্বশুরবাড়ির ছায়াও মাড়ায় না। চাষ-বাস করে, বনে-বাদাড়ে সাপ ধরে বেড়ায়। বলে—আমিই গাঁয়ের লোকদের একঘরে করে দিয়েছি। বুঝুন আস্পদ্দা!

গাছের ছায়ায় জ্যোৎস্নার আঁকিবুকি। কোনও গেরস্থর উঠোন তারা পেরিয়ে যাচ্ছিল। একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। এ দেশের কুকুরগুলো পর্যন্ত কাজের নয়—ভাবল নয়ন। মানুষগুলোর মতোই অপদার্থ। উল্টাবাগে দুটো লোক হেঁটে আসছে, একজন বলে—কে, দিগিন নাকি?

—হয়।

—কাল তো সাক্ষী দিতে সদরে যাচ্ছ!

—যাব।

—আমার ফর্মটা এনো। সঙ্গে কে?

—আনব। ইনি জগদীশের বাড়ি এসেছেন।

লোকটা দাঁড়িয়ে যায়—কোন জগদীশ? সাপওলা?

—হুঁ।

—তার আবার কে এল। তিন কুলে তো আর...

লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে তারা হেঁটে যায়। একটা ভেজা উদ্ভিদের গন্ধ উঠে আসছে আশপাশে থেকে। হাওয়া ঝলক দেয় মাঝে মাঝে। এদিকটায় বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে।

খেজুর গাছের গলায় কলসি। পায়ের পাতা ঘাসে পড়লে টপটপ জল ঝরছে ঘাসের গা বেয়ে। শুকনো পাতা খসছে গাছের। শীতে নাকে জল সরছে। নয়ন দুটো হাত বুকে চেপে ধরে।

—আপনার কথাগুলি কিন্তু বেশ পষ্ট-পষ্ট।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা সতর্ক গলায় জিগ্যেস করে—মশাই কি পলিটিক্স-টলিটিক্স করেন না কি?

—কেন?

—জিগ্যেস করছি। কার্ল মার্কসের কথা বললেন কি না!

—ও এমনিই।

—লাল-ঝাণ্ডার লোক এদিকেও আছে অনেক। তবে গাঁ-দেশের মানুষ তো সব, ঠিক-ঠিক কিছু বোঝে না। আবছা আবছা ধরে নেয় ঠিক বিশ্বাসও করে না।

—কেন?

—সবাই তো গাঁয়ের লোকের ভালোই করতে চায় মশাই, কিন্তু একদলের ভালোর সঙ্গে আর একদলের ভালো যে বনে না। চাষিবাসি গেঁয়ো লোকের মাথাও তো তেমন শার্প নয়, সব দলের ভালো-ভালো কথা তো সেই সব ভোঁতা মাথায় সেঁদোচ্ছে। শেষে মাথার ভেতরে সব ভালো কথা খটাখটি লাগিয়ে তালগোল পাকায়। তখন আবার কথাগুলো ঝেড়ে ফেলতে তারা মায়ের থানে একটা টিপ করে নিয়ে যে যার কাজে লেগে যায়।

বলে লোকটা খিকখিক করে হাসে।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা গতি ধীর করে বলে—আমি বাঁ-ধারে যাব।

—আচ্ছা।

লোকটা গাছের ছায়ায় একটা শুঁড়ি-পথে ঢুকে যায়।

সুকুল জেগেই ছিল। আবজানো দরজা ঠেলে সে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সুকুল মশারি তুলে বাইরে আসে। উত্তেজিত গলায় বলে—তুমি শেয়াল ডাক ডাকছিলে?

—না তো?

—তবে যে শেয়ালের ডাক শুনলাম এইমাত্র!

—সে সত্যিকারের শেয়াল সুকুল।

—সুকুল বলে—একবার ডাকো না।

চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে—এখন শুয়ে পড়ি। কাল সকালে তোমাকে অনেক ডাক শেখাব। ভেতরের বারান্দায় রান্না করছিল জগদীশ। সাড়া পেয়ে ভেতরে এল। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য আর চাষাড়ে চেহারার জগদীশ। কিন্তু তার মুখে নির্বুদ্ধিতা নেই। একটা হয়তো ভালোমানুষি আছে কিন্তু উজ্জ্বল চোখজোড়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় যে চোখ দু-খানা অনেক কিছু লক্ষ করে।

জগদীশ সতর্ক চোখে তাকে লক্ষ করে হঠাৎ চাপা গলায় বলল—অনেক দেরি হল আপনার।

নয়ন জামাটা খুলে কাঠের চেয়ারের পিঠে রেখে বলে—মোনা ঠাকুরের একটা ইন্টারভিউ নিলাম।

—কী মনে হয়?

—কিছু না ফাঁকা আওয়াজ। একটা আল টপকালেই...

জগদীশ মাথা নাড়ল, বলল—মোনা ঠাকুর শক্তিমান লোক।

—কীসের শক্তি?

জগদীশ একটুক্ষণ ভেবে বলে—কারও প্রতি খুব ভালবাসা থাকলে মানুষ একরকমের শক্তি পায়! এই যেমন সুকুলকে ভালোবাসি বলে আমি অনেক কিছু উপেক্ষা করতে পারি, অনেক সইতে পারি। ঠিক সেইরকম। মোনা ঠাকুরের ভালবাসা তার গুরুর ওপর। ওইখানে মোনা ঠাকুরের ফাঁকি বড় একটা নেই। শক্তিও সেখানে। আপনি বিশ্বাস করেন না?

নয়ন অন্যমনস্ক ছিল, তার চোখের সামনে শ্যামার মুখ। সে বলল—করি।

—যদিও মোনা ঠাকুরের সঙ্গে আমার সদ্‌ভাব নেই।

—কেন?

জগদীশ একটু ম্লান হাসে, তারপর বলে—কিছু শোনেননি? গাঁয়ের সবাই তো জানে, আর বলাবলিও করে।

নয়নের খুব খারাপ লাগল হঠাৎ। সুকুল মশারির বাইরে বসে চৌকি থেকে পা দোলাচ্ছে। মুখখানায় শৈশবের সুন্দর হাবলা ভাব। একটু হাঁ-মুখ, চোখে অপার কৌতূহল। মাথার চুল অনেককাল কাটা হয়নি বলে চুলের চালচিত্তির মুখখানাকে ঘিরে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। অবাক চোখে নয়নকে দেখছে সুকুল। ভাবছে, এ লোকটা কী করে অমন পাখির ডাক ডাকে! ইস, ঠিক তো পাখির মতোই!

রাতকানা একটা গুবরে পোকা ভোঁ চক্কর দিচ্ছে। দেওয়ালে-দেওয়ালে ঠোক্কর খাচ্ছে। সুকুল মুখ তুলে পোকাটা দেখে বলে—বাবা, দ্যাখো এরোপ্লেনপোকা।

নয়ন সুকুলের সুন্দর মুখখানা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

জগদীশ বলল—যে যাই বলুক, সুকুল আমারই।

সুকুল তার বাবার দিকে চাইল। বড়-বড় দু-খানা চোখে একটা স্বাভাবিক কাজলটানা ভাব আছে। বিষণ্ণ চোখ। জগদীশের দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গি এমন আকুল যে নয়নের আবার একটা শ্বাসকষ্টের মতো হয়। সে মুখটা ফিরিয়ে জগদীশকে বলে—ওসব আমি পাত্তা দিই না।

গুবরে পোকাটা চক্কর তো দিচ্ছেই। দেওয়ালে-দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নেমে আসছে। সুকুলের মাথা ছুঁয়ে গেল বুঝি! জগদীশ তড়িৎ পায়ে গিয়ে একটা ঝাপটা মারল। কোন কোণে কোথায় ছিটকে পড়ল পোকাটা।

নয়ন বলল—ও পোকা কামড়ায় না।

—জানি। তবু সতর্ক থাকা ভালো।

সতর্কতার কথা শুনে নয়ন একটু হাসে। বলল—আপনি যদি অত সাবধানি, তো ছেলেকে নিয়ে সাপ ধরতে যান কেন?

জগদীশ গিয়ে সুকুলের পাশে বসে। বসতেই ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সুকুল। শুয়ে নয়নের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জগদীশ বলে—ভয়ংকরদের নির্বিষ করার শিক্ষা থাকা ভালো। একদিন তো সুকুলকে নিজে নিজেই চলতে হবে! ওকে তাই তৈরি করে দিচ্ছি।

সুকুল হাই তোলে। জগদীশ আলতো হাতে ওকে চাপড়ায়। মায়ের মতো।

নয়নের দিকে চেয়ে বলে—বারান্দায় বালতিতে জল তোলা আছে হাত-মুখ ধুয়ে নিন।

নয়ন বাধ্য ছেলের মতো ওঠে।

দরজার পাশেই দাড়ির দুটো বেঁটে সাপের ঝাঁপি ঝুলছে। তার পাশে একটা স্ট্যান্ডের ওপর কাচের বাক্স! নয়ন দাঁড়ায়। কাচের বাক্সটার মধ্যে দুটো কেউটে। মাথায় রুইতনের চিহ্ন। শরীর পাক খেয়ে আছে। নিঃসাড়, ঘুমন্ত যেন। ঝুড়ি দুটোর গায়ে একবার হাত রাখল নয়ন। নিস্তব্ধ। একটু হাসল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কোলে আধ-ঘুমন্ত সুকুলের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মৃদুস্বরে গল্প বলছে। বাইরে কুকুর কাঁদছে চাঁদের

দিকে চেয়ে।

হাত-মুখ ধুয়ে নয়ন এসে দেখে সুকুল ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চারধারে যত্নে মশারি গুঁজে দিয়ে জগদীশ একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে কাঠের চেয়ারটায়। দুটো চোখ শূন্য। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় তার আধখানা মুখ আলোকিত, বাকি আধখানা আবছায়। মুখের রেখাগুলো পাথরের মূর্তির মতো স্থির। নয়নের হঠাৎ মনে হয় দুঃখচাপা জগদীশকে যেরকম ভালোমানুষ আর নির্বিষ মনে হয় ততটা সে নয়। খোঁচা খেলে ওর ভেতর থেকে প্রবল হিংস্রতা আর সিংহনাদ বেরিয়ে আসতে পারে।

কাচের বাক্সটার সামনে দাঁড়ায় নয়ন। মৃদু আবছা আলোয় তাদের দেখা যায়। সাপ আর সাপিনী। আবছা সরীসৃপ শরীর দুটো বালুর ওপর অনেক রেখা এঁকেছে। তীব্র আগ্রহে নয়ন দেখে। তার শ্বাস গভীর ও দ্রুত হয়। হাত দুটো নিশপিশ করে। কেমন ফুল তোলার মতো অনায়াসে জগদীশ বন-জঙ্গল থেকে তাদের গোপন শরীর তুলে আনে।

হ্যারিকেনটা তুলে আনে নয়ন। কাচের বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে। কী চমৎকার সতেজ কালচে শরীর! যখন ছোবল তোলে তখন কী মারাত্মক আকর্ষণকারী সেই আক্রমণের ভঙ্গি। বিষ! আর চিন্তাশূন্য আক্রমণ।

বাক্সটার গায়ে ছোট্ট দুটো টোকা দেয় নয়ন। তারপর দুটো জোরে টোকা দেয়।

জগদীশ পিছন থেকে বলে—কী করছেন! ও দুটোর আবার বিষদাঁত উঠেছে, কামাতে হবে।

চলে আসুন।

—আমি দেখব।

—কী?

—ওদের...কথাটা শেষ না করে হাসে নয়ন। বিলোল হাসি।

—কী বলছেন? জগদীশ অবাক হয়ে জিগ্যেস করে।

একটা হতাশার শ্বাস ফেলে নয়ন বলে—কিছু না। চলুন খেয়ে নিই।

জগদীশ বলে—চলুন বলে ওঠে।

রাত খুব বেশি হয়নি। কিন্তু পাড়াগাঁ বলে অনেক রাত মনে হয়।

খেতে বসে জগদীশ হঠাৎ বলে—মানুষ কোনও ব্যাপারে নিয়ম মানে না। কিন্তু জীবজন্তুরও একটা নিয়ম আছে।

—কীরকম!

জগদীশ একটু হেসে বলে—আপনি ওই সাপ দুটোর কী অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন?

নয়নের মুখটা লাল হয়ে যায়, সে তরলভাবে হাসতে থাকে। বলে—ভালোবাসা।

জগদীশ মাথা নেড়ে বলে—বুঝেছি। তাই বলছিলাম যে মানুষ সময় মানে না, দিনক্ষণ মানে না। এ এক আশ্চর্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত সবচেয়ে বেশি প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে। সাপ কুকুর বেড়ালও মানুষের মতো এত নির্লজ্জ নয়। তারা নিয়ম মেনে চলে। একজোড়া সাপ আর সাপিনী এক জায়গায় আছে বলেই যে তারা যা-খুশি করবে এমনটা দেখা যায় না। ঠিক সময়টি এলে, খিদে জাগবে, আর তখনই মাত্র আপনি যা দেখতে চাইছেন দেখতে পাবেন। নইলে শতবার ওই বাক্সটা নাড়ালেও লাভ হবে না।

বলে জগদীশ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলে—মানুষের মতো বেলাজ কেউ নয়। খিদে না পেলেও খাবে! খাওয়া, ভোগ এসবই তা সর্বস্ব।

খেয়ে উঠে জগদীশ সুকুলের বিছানায় শুতে গেল। পাশের ঘরে নয়নের বিছানা সুন্দর পরিপাটি মশারি টাঙানো, জলের গেলাসটি ঢাকা দেওয়া, কোথাও খুঁত নেই। ঠিক যেন মেয়েলি

হাতের কাজ। কার যে কোথায় ভাত মাপা থাকে। নইলে তো আজ বিকেল অবধি লোকটাকে চিনতই না এখনও যে চেনে তা নয়। শুধু জানে লোকটা সাপ ধরে, ছেলেকে (সে নিজের হোক আর অন্যেরই হোক) বড্ড ভালোবাসে। আর জানে, লোকটা গৃহকর্মে নিপুণ।

ছাঁচবেড়ার ঘর। ফুটো ফাটা আছে। হেমন্তের গড়ানে রাত। টেনে বাতাস দিয়েছে একটা। শুকনো পাতার শব্দ পাওয়া যায়। দুদ্দাড় শেয়াল বা কুকুর দৌড়ে গেল উঠোন ভেঙে। বাতাসের শিস শোনা যায় বেড়ার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। এতে কোনও অসুবিধে হয় না তার। গত একবছর তার জীবন এরকমই কেটেছে। সেবার বুড়ি ঝি সুখিয়ার চোখে ছানি পড়লে সে দেশে গেল। বাড়িতে লোক ছিল না। তখন সুন্দরবনের দিকে বান ডেকেছিল বলে কলকাতার ফুটপাত ভরে উঠেছিল জোয়ানমদ্দ মেয়ে পুরুষে। কালো-কালো চেহারার হাবা মানুষ সব দিনমানে ভিক্ষে করে। রাতে চুরি। ফুটপাথে ছেঁড়াকাঁথার সংসার বিছিয়ে ছানাপানা জাবড়া-জাবড়ি করে বসে। ঝাঁকড়া চুলের উকুন মারে, গালাগাল দিয়ে পরস্পর ঝগড়া করে। গা-ছাড়া ভাব। বান হয়েছে তো করব কী এইরকম গা-সওয়া নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকে কলকাতার রাস্তায়। গাছতলায় বেলাশেষে কুড়োনো কাঠ কাগজ ঠেসে ইটের উনুন জ্বেলে মেটে-হাঁড়িতে নাড়ি-ভুঁড়ি, তরকারির খোসা, গরম ভুষি, তুষসেদ্ধ চাপায়। তারই মধ্যে আবার পাথরের টুকরো ফুটপাথে ঘসে মশলা বাটে। সেই সব আধা-মানুষের সমাজ থেকে একটা নোনা মেয়েমানুষ তুলে আনল বড় জামাইবাবু। শাশুড়ি ঠাকুরুণের কষ্ট বুঝে ঝি ঠিক করে দিয়ে গেল। নোনা মেয়েছেলেটার গা-গতর যে ভালো তা দিন সাতেক-খাওয়া দাওয়া করার পরই বোঝা গেল। কোল-পোঁছা একটা ছেলে, স্বামী হাজত খাটছে কার বাজারের থলে টেনে দৌড়েছিল বলে। ঝাড়া হাত-পা সেই মেয়েটিকে নয়ন লক্ষ করেছে কখনও-সখনও। লক্ষ একবার করলে নয়নের দেরি সয় না। সন্ধ্যের ঘোরেই বাড়ি নিঝুম। বাবা উকিল মানুষ, বাইরের ঘরে মক্কেল ঠাসা, দম ফেলার সময় নেই। মা হাই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে সন্ধ্যের পরই মশারির নীচে চলে যায়, হাতপাখা নাড়ে। ঠাকুর রান্নাঘরে। মেয়েছেলেটা সিঁড়ির নীচে ছেলে ঘুম পাড়াতে গেছে। সেই সময়ে নয়ন গিয়ে তাকে ঠেসে ধরে। চালটায় ভুল ছিল। চেঁচানিতে মক্কেল সুদ্ধ বাবা চলে এসেছিল। বেড়ালের মতো ছুটেছিল নয়ন। কিন্তু মক্কেলদের মধ্যে একজন ছিল দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন। সদরে তাকে জাপটে ধরে ফেলল। পরে অবশ্য উকিলবাবুর ছেলে শুনে সে খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেই রাতেই বাবা তাকে বের করে দেয়। সেই মেয়েমানুষটাকেও। সেই থেকে বাইরে বাইরেই কাটে নয়নের। কোন কিছুর ঠিক থাকে না। খাওয়া, শোওয়া এইসব অবশ্য ভাববার ফুরসৎই পায় না সে। তারটা দশজনই ভেবে আসছে একবছর ধরে। নয়ন কেবল শ্যামার কথা ভাবে, বা আর কিছু। বাড়ির সদর বন্ধ হলেও মায়ের জন্য খিড়কিটা এখনও বন্ধ হয়নি। কলকাতায় ফিরলে সে বাড়িতেই থাকে। একটু বেশি রাত করে ঢুকতে হয়, এই যা। বাবা টের পায় হয়তো, দেখি না দেখি না করে এড়িয়ে যায়।

কাজেই এই সুন্দর পরিপাটি বিছানাটিতে তার ঘুম না হওয়ার কারণ নেই। বলতে কী, জগদীশের আশ্রয় না জুটলে হয়ত বা মোনা ঠাকুরের মন্দিরের বারান্দায় পড়ে থাকতে হত। এই শীতে, খোলা হাওয়ায়, গেঞ্জির ওপর একটামাত্র শার্ট সম্বল করে।

ঘুম তবু আসছে না। মাথাটা বড্ড গরম। শরীরও। মোনা ঠাকুরের মন্দিরের কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ সে জেগেই এক মায়া দেখল। কুয়াশায় মাখা সেই অলৌকিক জ্যোৎস্না, মন্দিরের প্রাচীন সাদা সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপে বঙ্কিম সুন্দর ভঙ্গিতে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তার চোখ চেয়ে আছে নয়নের দিকে। বিভ্রম? না। মাথা নাড়ে নয়ন। একথা ঠিক, সে মেয়েদের এখনও চেনে না। চিনবার বয়সও নয়। সে মাত্র চব্বিশ পেরোল।

মেয়েদের বুঝতে বয়সও চাই। সে তো এখনও জানে না কেন শ্যামা খেলা করে তাকে নিয়ে, কেন বা সেই সুন্দরবনের নোনা মেয়েমানুষটি চেঁচিয়ে বলেছিল—হারামির বাচ্চা! মেয়েদের না চিনেও নয়নের মনে হয়, ওই মেয়েটি মন্দিরের শেষ দুটো সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ঘাটের পৈঠায় স্নানের আগে মেয়েরা যেমন দাঁড়িয়ে জলে নিজের ছায়া দেখে, তেমনি ছায়া দেখতে চেয়েছিল নয়নের চোখে।

ঘুম হবে না। নয়ন মশারির মধ্যেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে থেকে একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ায় মশারির ভেতরটা ভরে ওঠে। হ্যারিকেনের গন্ধ পায় সে। উঠে বাইরে আসে। পায়চারি করে। শরীর। শরীরই সব। জগদীশ কী একটা তত্ত্বকথা বলছিল। খিদে, ভোগ এ হচ্ছে মানুষের সর্বস্ব। জীবজন্তুরা মানুষের মতো নির্লজ্জ নয়।

নয়ন একটু থমকে দাঁড়ায়। অথচ আর কেউ পোশাক পরে না। পোশাক পরে কেন? মানুষ কি জানে না যে পোশাকের ভেতরে তার শরীরটা ন্যাংটো! সব মানুষই জানে মেয়েমানুষের শরীরে কি আছে, কিংবা কেমন করে সেই শরীর ব্যবহার করা যায়। তবে কেন মানুষ পোশাক পরে।

নয়ন একটু হাসে আপনমনে। ক্ষমতা হাতে পেলে সে নিয়ম করবে, পোশাক পরা চলবে না। বেহায়া, নির্লজ্জ, সবই তো জানো তোমরা, তবে কেন ওই পোশাক? ছেড়ে ফ্যালো, উদোম হও, লজ্জার কী আছে? পরস্পরের ন্যাংটো শরীর দ্যাখো, লজ্জা জুড়িয়ে যাবে হে!

সাপদুটো এখন কী করছে? এই মায়াবী জ্যোৎস্নার শীত রাত্রিটি, এই তো সময়। এখনও কি নিস্পৃহ দড়ির মতো শুয়ে আছে? যখন একটি মেয়ে-শরীরের অভাবে নয়নের চোখে ঘুম নেই।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে যায়। হ্যারিকেনের পলতে নামানো। মৃদু দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসে জগদীশের বিছানা থেকে। নিঃসাড় ঘুমোলে সুস্থ মানুষের শ্বাস ওরকম দ্রুত হয়। তা ছাড়া গাঁয়ের মানুষ, ঘুমটা গাঢ় হওয়ারই কথা।

নয়ন নিঃশব্দে হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে আলোটা উসকে দিল। আলো হাতে কাচের বাক্সটায় ঝুঁকে দেখল, যেমন দেখেছিল খানিক আগে তেমনি দুটো পড়ে আছে। ন্যাংটো কালো শরীর! শীতল। নিস্পৃহ। খুব মৃদু দুটো টোকা দিল নয়ন। তারা নড়ল না।

এভাবে ওদের উত্তেজিত করা যাবে না। শব্দ করলে জগদীশ জেগে যাবে। নয়ন বাক্সটা ভালো করে দেখে। সাধারণ বাক্স। একটা কবজায় পুঁচকে তালা ঝুলছে। পকেট থেকে ভাঁজ করা ছুরিটা বের করে নয়ন। ফলাটা তালার ভেতর ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতেই আলগা হয়ে গেল। গা-টা একটু শিরশির করে তার। সাপদুটো নড়লও না।

নিঃশব্দে ডালাটা তুলে ফেলল সে। বাক্সের ভেতর থেকে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ নাকে আসে। সম্ভবত ইঁদুর বা ব্যাং খেতে দেওয়া হয়েছিল ওদের, তারই কোন টুকরো-টাকরা পড়ে পচছে। একটু দূর থেকে সাবধানে উঁকি দেয় নয়ন। ভয়ের কিছু নেই। যদি মাথা তোলে ছপ করে ডালাটা ফেলে দিলেই হবে। আপাতত ওদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে দেওয়া দরকার। নয়ন কখনও সাপদের মিলন দেখেনি। না ঘুমোনো সময়টাও কেটে যাবে অন্যমনস্কতায়।

বিছানা ঝাড়ার ঝাঁটাটা ঘরের কোণে। একটা শলা খুলে নয়ন সাবধানে বাক্সের ভেতরে একটা খোঁচা দেয়। গায়ে লাগে না। বালিতে গেঁথে যায়। অনভ্যাসের হাত। আবার খোঁচা দেয়। এবার কোণের বিড়ে-পাকানো সাপটার গায়ে লাগে ঠিকই। কিন্তু সে নড়ে না। কোনটা মাদি, কোনটা মদ্দা তা অবশ্য সে চেনে না। তবু ওটাকে তার মদ্দা বলেই মনে হয়। মেয়েমানুষের রাগ বেশি।

দুটো তিনটে খোঁচা বৃথা গেল। সাপটা কেবল মাথাটা একটু সরিয়ে নিল, শরীর নাড়ল। নয়ন ডালাটা প্রায় বন্ধ করে ধরে রইল। সাপটা আবার ঝিমিয়ে পড়তেই ডালাটা আবার সাবধানে তুলে ফেলল সে। আবার কাঠিটা স্পর্শ করল শরীরে...

কালো-বিদ্যুৎ কখনও দেখেনি নয়ন। দেখল। বিশ্বাস হয় না, এত দ্রুত ঘুম থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে যেতে পারে কেউ। একটা প্রবল শ্বাসের শব্দ হল কেবল। একপলকের মুগ্ধতায় আর একটু হলেই হাতটা সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল সে।

ডালাটা খাড়া তোলা ছিল, কোনদিকে পড়বে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে একটু ক্ষণ খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ডালাটা আর একটু হলে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই একটা মসৃণ ছোবল খেয়ে সাপটা বাক্সের কার্নিশ বেয়ে ঢুলে পড়েছে। কিছু করার নেই।

কালো একটা স্রোতের মতো নেমে আসছে। নেমেই আসছে সরীসৃপ চিকণ শরীরখানা। ডালাটা পড়েছে কিন্তু হালকা ডালাখানা তাকে চেপে রাখতে পারছে না। স্বচ্ছন্দ শরীরটা বেয়ে আসছে সুন্দর মুক্তির দিকে, প্রতিশোধের দিকে।

নয়ন হ্যারিকেনটা ফেলে একলাফে পিছিয়ে আসে। পাগলের মতো চেঁচায়—জগদীশবাবু...জগদীশবাবু...

চোখের পলকে মশারি প্রায় ছিঁড়ে জগদীশ বেরিয়ে আসে। হারিকেনটা কাত হয়ে দপ্‌দপ্ করছে, তেল পড়ছে গড়িয়ে। এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে সব। কালো অন্ধকারে সাপের কালো শরীরটা জগদীশও খুঁজে পাবে না।

—কী? কী? বলে জগদীশ গর্জন করে। ঘুম-লাগা চোখে মাথায় কিছু বুঝতে পারে না। নয়ন কেবল সাপ কথাটা উচ্চারণ করতে পারল।

জগদীশ এক ঝটকায় আগে হ্যারিকেনটা সোজা করল। সেটা নিভল না। কিন্তু আলো ঘুলিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেল। সাপটাকে দেখতে পেল নয়ন। দরজার দিক থেকে ঘুরে মুখটা তুলেছে। চোখে জ্বালা, মুখে শ্বাস।

জগদীশ মুহূর্তের মধ্যে সাপুড়ে হয়ে গেল। কুঁজো হয়ে দুটি সতর্ক জাগ্রত হাত উদ্যত করে এগিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। মুখোমুখি! নয়ন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখে।

মানুষের ছোবল কত সুন্দর হয় তা দেখল নয়ন। এত সুন্দর কিছু সে কখনও দেখেনি। জগদীশ ঢেউ হয়ে গেল যেন। চকিতে শরীর ঝুঁকল। হাত প্রসারিত হল। এত দ্রুত যে বিশ্বাস হয় না। বাঁ-হাতে সাপটাকে ফুলের মতো যেন গাছ থেকে তুলে নিল সে। এত অনায়াসে, যেন যে-কেউ করতে পারে।

ডালাটা খুলে, জগদীশ সাপটাকে ভেতরে ছেড়ে দেয়। সেটা আবার শরীরটাকে পাকে পাকে জড়ায়। মাথা কোলে নিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। জগদীশ নয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলে—এটা কী হল? নয়ন সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—ঘুম আসছিল না।

—কী দেখতে চেয়েছিলেন?

—ওই, সেটা।

দাঁতে দাঁত ঘষল জগদীশ। অস্বাভাবিক ধীর গলায় বলল—এই ঘরে সুকুল আছে, আপনি জানেন না? যদি সুকুলের কিছু হত!

—ওটা বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারিনি!

—কিন্তু যদি বিছানায় যেত সাপটা? ওখানে আমার সুকুল আছে।

নয়ন বুঝতে পারে, তার অনুমানই ঠিক। বাইরে ওই বিষণ্ণ ভালোমানুষির আড়ালে তীব্র হিংস্রতা রয়ে গেছে জগদীশের। রাগে চাপা গলা। সমস্ত শরীরে টান, রগ, শিরা-উপশিরা এই ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছে।

—মজা, না? বলেই জগদীশ আচমকা তার চাষাড়ে হাতে একটা থাপ্পড় কষায়। নয়ন ভাবতেও পারেনি। চড়টা বোমার মতো ফাটল তার কান, গলা, কণ্ঠ জুড়ে। মাথার মধ্যে সাইরেনের শব্দ বেজে উঠল হঠাৎ।

পড়ে গিয়েও টাল সামলে নিল সে। হাত বাড়িয়ে কাঠের চেয়ারটা ধরে দম নিল।

—বেইমান! জগদীশ বলে।

মার কিছু কম খায়নি নয়ন। কিন্তু মার দেখলে সে পালায়ওনি কখনও। এ তার জল-ভাত। যেখানে মার সেখানে উল্টে মার দেওয়ার জন্যই সে জন্মেছে। চড়টা সামলেই দুটো হাত তার আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে গেল।

কিন্তু একটা বিশাল গাছের মতো জগদীশ দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো মাটিতে পোঁতা, দু-খানা চাষাড়ে হাত তাকে বলের মতো ছুড়ে লুফে নিতে পারে।

মুঠো শিথিল করে শরীরের ভর চেয়ারের হাতলে ছেড়ে নয়ন জগদীশকে একটু দেখল, বলল—অতিথি নারায়ণ।

বলে হাসল।

জগদীশ গম্ভীরভাবে বলল—অতিথির ভেক ধরে চোর ডাকাত এলে সে তখন নারায়ণ থাকে না। গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি দরজার বাঠাম দিচ্ছি। ফের কোন বাঁদরামি করলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

নয়ন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। লোকটাকে তার দারুণ ভালো লাগছে এখন। দারুণ।

মসজিদ বাড়ির বাইরের ঘেরা-দেয়ালটায় নোনা ধরেছে। গেটটা পাল্লা হারিয়ে হাঁ করে আছে। ভেতরে একটা চমৎকার মাঠ। নির্জন। মসজিদের গায়ে একটা মোটা লতা উঠেছে, অশ্বত্থ গজিয়েছে। ভেতবে মাঠের একটেরে একটা কাঠচাঁপা গাছ। খুব ফুল এসেছে। তলায় বিছিয়ে আছে ফুল। এই ফুলটার তেমন আদর নেই। কেউ কুড়োয় না, ঘর সাজায় না। ফুলের দোকানে এই ফুল বিক্রি হতেও দেখেনি শ্যামা। কিন্তু হলদেটে সাদা রঙের এই ফুলটার চাপা গন্ধ শ্যামার বড় ভালো লাগে। সে একবার চারধারে দেখল। কেউ নেই রাস্তায়, দু-চারজন সাধারণ চেহারার মানুষ ছাড়া। মসজিদের ভেতরেও লোকজন বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। এই অঞ্চলটায় মুসলমানরা বড় একটা থাকে না এখন। আজানধ্বনি শোনা যায় না। আগে যেত, যখন সে খুব ছোট ছিল। তখন একটা পেয়ারাগাছ ছিল এখানে, আর ছিলেন হাজিসাহেব। বদনার জলে ওজু করতে-করতে তাদের দুই ভাই বোনের গাছে চড়া দেখতেন। নামাজের সময়ে বাচ্চারা ছোটাছুটি করলে অসুবিধে হবে বলে ছোকরা মোল্লা কি বুড়ো মৌলভী তেড়ে এলে তিনি আটকাতেন। তাদের ডেকে বলতেন—শব্দ করো না। পেয়ারা পাড়ো। যতটা খেতে পারো ততটা। নষ্ট কোরো না।

হাজিসাহেব নেই। কেউই নেই। নিস্তব্ধতা আছে। দু-একজন কেয়ারটেকার থাকে হয়তো বা। মানুষ যে কোথায় চলে যায়! বড় হয়ে অবধি বাড়ি থেকে দু-পা দূরে মসজিদের মাঠে কখনও আর আসেনি শ্যামা, ভুলে গিয়েছিল।

আজ বহুকাল বাদে সে নির্জন মাঠটায় ঢুকে পড়ল। সকালের রোদ এখন ইষদুষ্ণ। ভালোই লাগে। বাতাস দিচ্ছে। 'কিরিচ' শব্দ করে চুল ঘেঁষে চড়াই উড়ে যায়। কী সুন্দর নিস্তব্ধতা! আর গাছগাছালির ছায়া!

কাঠচাঁপা ফুল কয়েকটা কুড়োল শ্যামা। স্কার্ফের আঁচলে তুলল। একটু ঘুরে দেখল চারদিকে। মসজিদের চাতাল ঝাঁট দেওয়া। মেঝে পরিষ্কার। বাতাসে ধূপগন্ধ। মেহেদির ঝোপে পাখির হুড়োহুড়ি।

হঠাৎ কোকিল ডাকে। চমকে ওঠে সে। কোকিল! না নয়ন?

স্খলিত আঁচল থেকে দু-একটা ফুল পড়ে যায়।

সেই যে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে যেতে আমবাগানে দেখা হয়েছিল, তারপর আর তাকে দেখেনি সে। ফিরেছে কি নয়ন? কে জানে?

নিমগাছ থেকে একটা সত্যিকারের কোকিল উড়ে গেল। তবে নয়ন নয়, কোকিলটাই ডেকেছিল। শ্যামা নিশ্চিন্তে একটু হাসে। একটা ফুল তুলে গন্ধ শুঁকল। মৃদু গন্ধই তার প্রিয়। বুক ভরে ওঠে না গন্ধে, কেবল স্মৃতির মতো, গত রাত্রির স্বপ্নের রেশের মতো অস্পষ্ট গন্ধ। গত রাতেও দুঃস্বপ্ন দেখেছে। সে প্রায়ই দেখে। সকাল থেকে মনটা ভার হয়ে আছে। বাবার জন্য একটা ফুল-হাতা, উঁচু গলার সোয়েটার বুনতে শুরু করেছিল। পান্নাদির বাড়িতে গিয়েছিল প্যাটার্ন তুলতে। আসলে প্যাটার্ন তোলাটা ছল। ঘরে থাকতে তার ভালো লাগছিল না। হরিদ্বার যাওয়ার গোছগাছ শুরু হয়েছে, মা বাবা যাবেই। মোনা ঠাকুর বলেছে, ওই দিকেই কোথাও দাদা আছে সন্ন্যাসী হয়ে। পূর্বস্মৃতি নেই বলে ফিরতে পারছে না। শ্যামার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আশা হয়।

হরিদ্বার কি কোথাও যেতে শ্যামার ইচ্ছে করছিল না এখন। বাবার শরীর ভালো না। মাঝে-মাঝে প্রেসার দুশো ছাড়িয়ে যায়। বিদেশ-বিভুঁয়ে তারা মা আর মেয়ে বাবাকে নিয়ে কোন আতান্তরে পড়ে কে জানে! কিন্তু মা-বাবাকে ঠেকানো যাচ্ছে না, অনেক বুঝিয়েছে সে, বেশি বোঝাতে গেলে ঝগড়া হয়ে যায়।

বাবা হরিদ্বারে গিয়ে মারা গেছে—এরকমই দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল কাল। সকালটা তাই মনের অন্ধকার নিয়ে কাটছিল। পান্নাদির বাড়িতেও প্যাটার্ন তোলা হল না। আজ ছুটির দিন, ওরা পিকনিকে যাচ্ছে কল্যাণীতে। বলল—চল না, মাসিমাকে বলে তোকে নিয়ে নিই। শ্যামা রাজি হয়নি।

রাজি হয়নি অভিমানে। তার কোন আনন্দ করতে নেই। বাড়িতে অবিরল শোক লেগে আছে গত পাঁচ বছর ধরে। বিরাম নেই। দীর্ঘশ্বাসে বাসার বাতাস ভারী। মাত্র তিনটি প্রাণী তারা। পরিবারটা বড় হলে হয়তো একজনের শোক ভুলে থাকা যেত। মোটে তিনজন বলেই হারিয়ে যাওয়া চতুর্থ জনের কথা ভোলা যায় না। চার পায়া একটা আসবাবের একটা পা ভেঙে গেলে সেই পায়ার দিকেই যেমন ঝুঁকে থাকে আসবাব, তেমনি হারানো দাদার স্মৃতিতে ঝুঁকে আছে তারা। খেতে বসতে কাজ করতে, দাদার কথা এসে পড়ে। মা কাঁদে, বাবা সান্ত্বনা দেয়, তারপর নিজে কাঁদে। শ্যামার চোখে তখন জল আসেই, তাই তাদের আনন্দ নেই। গত পাঁচ বছরে বাবা শ্যামার বিয়ের চেষ্টাই করেনি। প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন—ছেলেটা নেই, ওই মেয়েটা মাত্র আমাদের সম্বল। অন্ধের নড়ি। ও গেলে থাকব কী করে?

তবু গত পাঁচ বছরে দু-তিনটে পাত্রপক্ষ দেখেছে শ্যামাকে, পছন্দ হয়েছে। বিয়ে হয়নি বাবা মার গরজের অভাবে। পাত্রদের মধ্যে একজনকে খুব পছন্দ ছিল শ্যামার। স্নিগ্ধ চেহারার দীর্ঘ ছেলেটি। মুখখানা গম্ভীর। বিলেত ফেরত ডাক্তার। প্র্যাকটিশ যখন সবে জমে উঠেছে সেই সময়ে লোকটাকে হঠাৎ অল্প বয়সেই ধর্মে পায়। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর ছেলেটির একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। দিনক্ষণ সব ঠিক। বিয়ের দিন গায়ে-হলুদের স্নান করতে গিয়ে মেয়েটির কেঁপে জ্বর আসে। ধুম জ্বর উঠতে না উঠতেই গায়ে মায়ের দয়া বেরোয়। ঝেঁপে গুটি উঠেছিল। বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বোকা মেয়েটা যখন বুঝতে পারল যে তার মুখখানার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার প্রাণের চেয়ে শরীরের মায়া বেশি হল, প্রায়ই কাঁদত—ও মা গো, এই মুখে তাঁর ঘর করতে যাব? রোগ সারার মুখে মেয়েটা টিক বিশ খেয়ে বাঙ্গুর হাসপাতালে মারা যায়। ছেলেটি

সেই থেকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াত। কী যে খুঁজত, কাকে যেন। তারপর দেওঘরের এক আশ্রমে থেকে যায়।

আশ্রমবাসী সেই বিলেত ফেরত ডাক্তারের মা-বাবা হাল ছাড়েননি। তাঁরা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে রইলেন। ছেলের গুরুদেব বললেন—বিয়ে করবে না কেন? বিয়ে করো। বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি। বনের সন্ন্যাসী দিয়ে কী হয় রে? কাম দমন করতে চাস না কি? ওসব জোর করে করতে গেলে মাথার দফা শেষ হয়ে যাবে। পরমপিতাই কাম দিয়েছেন, সে তো এমনি নয়, তারও কিছু প্রয়োজন আছে বলেই দিয়েছেন। ওর দমন ওভাবে হয় না, জোর করতে গেলে উলটো বিপত্তি। সুষ্ঠু ব্যবহার করো, স্ত্রীর কামভাবেই কেবল ভাবিত হোয়ো না, তাহলেই হবে।

সেই ডাক্তার নিজেই এসেছিল দেখতে। হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরা, ধুতি, লম্বা, কৃশ কালো চেহারাটি। ভারী ধীর। গম্ভীর। ঘরে ঢুকলে ঘরটা থম থম করে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু ডাক ওঠে। বাবা কথায় কথায় জিগ্যেস করেছিল—তুমি এই অল্প বয়সেই কেন সন্ন্যাসী বাবা?

সে উত্তর দিয়েছিল—সন্ন্যাসী কোথায়? আমি তো সংসারীই। কেবল সংসারের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

—সেটা কেমন?

ছেলেটা একটু ভেবে বলল—আপনার ঘরের পাশে যদি আবর্জনা থাকে তবে মশা মাছি জীবাণুর উৎপাত বাড়ে। বাড়ে না? নিরাপদে থাকতে গেলে তাই আপনার ঘরের মতোই ওই বাইরের ময়লাও পরিষ্কার করা দরকার। তেমনি নিজের পরিবার সংসারের ভালোর জন্যই চারপাশটাকে ভালো রাখা দরকার। এই ভাল রাখতে গেলেই সংসারের পরিধি বেড়ে যায়। কেবল নিজের ভালোর জন্য করলেই ভালো থাকা যায় না।

বাবা উত্তরে বলেছিল—তো তার জন্য আশ্রম কেন? ঘরে থেকেও তো হয়।

—আশ্রম মানে যেখানে শ্রম করে কাজগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। শেখা হলেই সংসারে ফিরে আসা। সেকালের ব্রহ্মচারীরা ভালো গৃহী হওয়ার জন্যই ব্রহ্মচর্য করে মনটাকে উদার, শান্ত ও আনন্দিত ও স্থির করে নিত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বিস্তার, ব্রহ্মচারী মানে বিস্তারে বাস করা। চারপাশটাকে জেনে নেওয়া। এই জানা সংসারে তাকে সাহায্য করে। আমি সংসারবিমুখ নই।

ধীর স্থির কথা। বিনীত এবং অকপট স্বর।

বাবা তবু মনস্থির করতে পারছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল—তুমি কেন গেলে?

ছেলেটা বিষণ্ণ একটু হাসল। কী মায়াময় হাসিটি! অনেকক্ষণ উত্তর দিল না। তারপর আস্তে করে বলল—আর একবার আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তা কি শুনেছেন?

—শুনেছি।

ছেলেটা আবার মাথা নীচু করে চুপ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল—মেয়েটির যখন বসন্ত হয়েছিল তখন আমি মাঝে-মাঝে তাকে দেখতে যেতাম। ডাক্তার হিসেবেই যেতাম। মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনও পূর্বপরিচয় ছিল না, এই যেমন আজ এসেছি আপনার বাড়িতে সেরকমই উপলক্ষে মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে দেখা, সে খুবই সুন্দরী ছিল। বসন্ত হওয়ার পর তার সেই সৌন্দর্য যে কোথায় গেল! একটি সুন্দরী মেয়ের বসন্ত হলে ডাক্তারের খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু রুগী দেখা এক কথা, আর নিজের ভাবী স্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখা আর এক কথা। আমার মন খারাপ হয়ে যেত। তবু মনকে আমি স্থিরই রেখেছিলাম। ওই মেয়েকেই বিয়ে করব। আমি তাকে তাই প্রায়ই দেখতে যেতাম। সে আমার দিক থেকে

মুখ ফিরিয়ে রাখত, কথাবার্তাও বলত না। চুপচাপ তার বিছানার পাশে বসে থেকে চলে আসতাম। একদিন গ্রীষ্মের বিকেলে দেখতে গেছি। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। তাতে নিমডাল বাঁধা, ঘরে আবছা আলো পড়ছে। মেয়েটি শুয়ে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। আমি চেয়ারে বসা। মশারিটা তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে আমি তাকে দেখতে পাই। তিনদিকে মশারি ফেলা, একদিকের মশারি তোলা। ফলে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন থিয়েটারের স্টেজ্‌-এর মত। সে শুয়ে আছে, শরীরের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা লালচে মারাত্মক গোটায় ভরা। গোটা গলে পুঁজ আর রস চাপটা বাঁধছে। এলো চুল বালিশে ছড়ানো, দৃশ্যটা করুণ ভয়ংকর। দেখছিলাম। পশ্চিমের জানলা নিমডালের ফাঁক দিয়ে লালচে আলোর কুচি এসে বিছানায় পড়েছে। চৌখুপি আলো কাঁপছে, দুলছে। কোনওদিন সে যা করে না, সেই সময়ে সে হঠাৎ মুখ ফেরাল। বস্তুত রোগ হওয়ার পর তার মুখ ওরকম স্পষ্টভাবে সে কখনও আমাকে দেখায়নি। মুখখানা ফুলে-টুলে বিশ্রী দেখতে হয়েছে। কিন্তু তাতে চমকাবার কিছু নেই। আমার মন তো প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু হঠাৎ দু-খানা দৃষ্টি দেখে আমার কেমন লাগল। মানুষের খুব অভিমান হলে চোখে যেমন একটা আলগা আলো আসে ঠিক সেরকম কিছু ছিল তার চোখে। জলভরা, লালচে এবং আগুনের মতো যা এসে ছোঁয়। তক্ষুনি মনে হল, একে পাহারায় রাখা দরকার। চোখে-চোখে না রাখলে এ মরবে, এর মরার ইচ্ছে জেগেছে। কিন্তু এরকম মনে হওয়াগুলো কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, আমাদের কত সময়ে কত কিছু মনে হয়। তার ওপর ঘরটার আলো স্পষ্ট নয়, মশারির মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর সেই আলোর চৌখুপিগুলো, সেগুলোর কোনও ছিটেফোঁটা তার চোখে পড়ে ওরকম দেখাচ্ছিল কি না—এ সবই আমি ভাবতে লাগলাম। সেই সময়ে আমি হঠাৎ খেয়াল করি, ঘরে একটা জার্মিসাইডসের চেনা গন্ধ। আর পোকামারা বিষের গন্ধ। সেই গন্ধ আমার নিত্যসঙ্গী। তবু হঠাৎ সেদিন সেই গন্ধ বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে একটা আকুল ইঙ্গিত করছিল। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কেন আমার মন একটা অস্পষ্ট কিছু বলতে চাইছে। উঠে আসবার সময়ে দেখি, কে যেন পোকামারা বিষের শিশিটা ছোট্ট আলমারির মাথায় রেখে গেছে। চলে আসতে গিয়েও থমকে শিশিটা দেখলাম। একবার হাত বাড়িয়ে ধরলামও, ভাবলাম কাউকে বলি শিশিটা সরিয়ে নিতে। তারপর সচেতন মনে ভাবলাম, থাকগে। কী হবে।

ছেলেটা চুপ করে আবার একটু ভাবল। তারপর ম্লান এবং সুন্দর হাসিটি হেসে বলল—এই হচ্ছে গল্প। মেয়েটা মারা গেল। হাসপাতালে নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তার মরার ইচ্ছেটাই ছিল প্রবল। সেটা নিয়ে ভাববার কিছুই নেই। চুকে টুকে গেছে। কিন্তু তারপর থেকেই আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। প্রশ্ন এই—আমি সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম? আর কেন তা উপেক্ষা করেছি? আমি যদি এতই আনাড়ি যে বুঝতে পেরেও সাবধান হতে জানি না তবে তো একদিন আমার অতীত বিদ্যাও সঠিক প্রয়োগ করতে পারব না। সঙ্কট যখন আসে তখন মানুষের সবচেয়ে বড় বিদ্যার পরিচয় হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থিরভাবে জোরের সঙ্গে যে সিদ্ধান্ত নিতে জানে না, কোন সিদ্ধান্ত সঠিক এ বিষয়ে যার দ্বিধা থাকে সে অবিশ্বস্ত। চিন্তা করতে-করতে আমি দেখলাম, মানুষ যত তুচ্ছ ভুলই করুক, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভুলের পিছনে থাকে তার জীবনের যত কাজকর্ম, যত অভ্যাস, যত আচরণ। জল খেয়ে কাচের গেলাসটি টেবিলের ধারে রাখতে গিয়ে ভাবলাম—এখানে রাখছি কারও ধাক্কা লেগে পড়ে ভেঙে যাবে হয়তো। ভাবলাম, তবু আবার রেখেও দিলাম। ভাবলাম—থাকগে, এক্ষুণি ভেতরবাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। তখন পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাঁটু লেগে টেবিলটা নড়ল। গেলাসটা নড়ে উঠে আবার স্থির হল। ভাবলাম—গেলাসটা পড়ে যাবে। টেলিফোন বাজছে, দৌড়ে গিয়ে ধরি। কে একজন ফোন করে একটা ঠিকানা দিল লিখে রাখতে।

টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি এসে ঠিকানাটা লিখে রাখতে যাচ্ছি। ডায়েরিটা খুঁজছি। তখন গেলাসটার কথা ভুলে গেছি। জরুরি ঠিকানাটা লিখে রাখা দরকার, ডায়েরিটা কোথায়? ফাইলের তলায় চাপা ডায়েরিটা পেয়ে 'ইউরেকা' বলে টেনে বার করতে গেছি, তখন হঠাৎ কনুই লেগে ফটাস্ করে পড়ে ভাঙল, ওটা কী? সেই গেলাস।

ছেলেটা বাবার মুখের দিকে ক্লান্ত চোখ দুটো পরিপূর্ণ মেলে দিয়ে বলল—তুচ্ছ একটা ভুল। কিন্তু ভেবে দেখলে এর পিছনে আমার সমস্ত জীবনটাই কাজ করছে। ওই দীর্ঘকালের অভ্যাসজনিত আলস্য। কাজ ফেলে রাখা, অন্যে এসে নিয়ে যাবে—এই পরনির্ভরতা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে উপেক্ষার সর্বনাশা শিথিলতা। জরুরি কাজের সময়ে বিশৃঙ্খলা। সবকিছুকে একযোগে দেখার ক্ষমতা, আর সব মিলিয়ে একটা সাময়িক অন্ধত্ব। যে এরকম ছোট্ট-ছোট্ট ভুল করে তার জন্য বড়-বড় ভুল অপেক্ষা করে থাকে। মেয়েটি মরে যাওয়ার পর নিজের এই অন্ধত্ব এবং সিদ্ধান্তের অভাব আমাকে পাগল করে দিল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল আমি রুগিদের সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারব না, ভুল ওষুধ দেব হয়তো, অপারেশন করতে হাত কাঁপবে এবং কোনও মানুষের মুখ দেখে তার সম্বন্ধে কেবলই উলটোপালটা ভেবে যাব। নিজের সম্পর্কে এই বিশ্বাসের অভাব মানুষের মস্ত এক শত্রু। তখনই ঠিক করি ডাক্তারির চেয়ে বড় কিছু শিক্ষা আমার দরকার। সেই শিক্ষা জীবনযাপনের। ক্ষুদ্র চোখে আমরা যা দেখি তা যথেষ্ট নয়, চাই ব্যাপক দৃষ্টি। কোনও কিছু দেখলে তার সবটা দেখা চাই, কোন কিছু জানলে তার সবটা জানা চাই। কে শেখাবে আমাকে?

ছেলেটি মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে বলল—আমি তখন গুরুর সন্ধানে বেরোই। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নয়, সংসারী হওয়ার জন্যই। কিন্তু এমন সংসারী যার ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিমুক্ত। যে স্থির, আত্মবিশ্বাসী, যে ভুল করে না।

বাবা খুশি হয়েছিল হয়তো! অনেকক্ষণ আলাপ করেছিল ছেলেটির সঙ্গে। ছেলেটি এক পলকমাত্র দেখেছিল শ্যামাকে। দ্বিতীয়বার চোখ তোলেনি। কিছু জিগ্যেস করেনি। তবু শ্যামা জানত, সে শ্যামাকে পছন্দ করেছিল।

বাবা কেবলই দ্বিধা করতে লাগল। সন্ন্যাসী ছেলে, আশ্রমে থাকে, নিরামিষ খায়। শ্যামা কি পারবে? কয়েকবার শ্যামাকে ডেকে ওই কথা জিগ্যেস করেছিল বাবা। শ্যামা উত্তর দেয়নি। মনে-মনে সে উন্মুখ ছিল সেই পুরুষটির জন্য। প্রস্তুত ছিল। তার মনের ভেতরে শাঁখ, উলুধ্বনি বেজেছিল ঠিকই। কেউ শোনেনি।

বাবার উত্তর না পেয়ে তারা আর আসেনি। কী হল সেই ছেলেটির কে জানে! মানুষ যে কোথায় যায়।

নির্জন মসজিদের চত্বরে শ্যামা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। মনে এক অভিমান। কার ওপর কে জানে! হয়তো, দাদার ওপর! কেন তুই পাগল হয়ে চলে গেলি? দ্যাখ তো, আমাদের কী করে রেখে গেছিস! ফিরে আয় লক্ষ্মী দাদা আমার, একটা ঝুঁকে-পড়া দিক তুলে ধর। আমরা চারজন হলে সংসারটার দাঁড়ানো হয়। কেন যে চলে যাস তোরা! কেন যে চলে যায় মানুষ। দূরে যায়! মরে যায়! হারিয়ে যায়! কেন রে! কোথায় গেল মেহদিরঙা দাড়িওলা হাজিসাহেব? কোথায় সেই কাশীর পেয়ারাগাছ? আর সেই মসজিদের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি দোলনচাঁপা? কী সুন্দর গন্ধ তার। কিছু নেই দ্যাখ। কেন রে হারিয়ে যায় মানুষ? গাছপালা!

মাঝেমাঝে তার অভিমান হয় মা বাবার ওপরে! কেন তোমাদের অত শোক? উৎসবের মতো শোক তোমাদের। মন খুঁড়ে তোমরা দুঃখ তুলে আনো রোজ! দুঃখই তোমাদের ভালো লাগে। নইলে কেন ভুলতে পারো না? পাছে ভুলে যাও সেই ভয়ে রাত জেগে তোমরা

ছেলের কথা বলো, অবসর সময়ে বসে ভাবো, ধ্যান করো। কেন? ভালো লাগে বলে? ঘরের বাতাস তোমাদের সেই দুঃখের ভার নিয়ে ভারী হয়ে থাকে। এক কলি গান গাইতে পারি না আমি, মনে হয় বুঝি গান গাইলে বাড়ির ভেতরে দুঃখের পবিত্র মূর্তিটি—যা তোমরা রচনা করেছ, তা বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে! আয়নায় মুখ দেখতে যাই, অমনি মনে হয়— আয়নায় মুখ দেখছিস মুখপুড়ি, তোর না দাদা নেই? যে ছিল তোর খেলার সাথী, প্রিয়জন – সে না নেই!

অভিমান তার নিজের ওপরেও। কেন যে বড় হতে গেলাম। কেন যে বুঝতে শিখলাম, ভাবতে শিখলাম, টের পেতে শিখলাম। কী দরকার ছিল এ সবের? তার চেয়ে জন্মে শিশু হয়ে থাকলাম না কেন? সেই তো ভালো হত সবচেয়ে। অবোধ শিশু হয়ে চেয়ে থাকা! কেবল বিস্ময় আর আনন্দ। খিদে মিটলেই ঘুম। আর আহ্লাদ!

অভিমান আরও অনেক শ্যামার। বুক টৈ-টম্বুর করে। এমনই কপাল তার। দেয়াল টপকে নয়ন এসে চিঠি রেখে যায় ঠিক। ভোরবেলা প্রায়ই চিঠি পায় সে। তাদের বাসার দুটো ঘর। সামনের ঘরে বাবা-মা, পিছনের ঘরে সে। তার শিয়রের জানলার পাশ দিয়ে মেথর বা কয়লাওলা আসার একটা গলিপথ। গলিটা বাড়িরই অংশ, উঁচু দেওয়াল, সামনে দরজা। কড়াক্কড় করে শিয়রের জানলা বন্ধ করে শোয় শ্যামা। তবু সকালে উঠে যখনই জানলা খোলে, ভোরের প্রথম আলোটি, কী শীতের কুয়াশা কিংবা রুপোলি বৃষ্টি দেখে দিনটা সুন্দর লাগে, মনটা ভালো হয়ে যায়, তখনই দেখতে পায়, জানলার খাঁজে নীল খাম, কিংবা ভাঁজ করা চিঠি। সব চিঠিতেই সেই এক কথা—'বিয়ে করো না হলে মরব।' কিংবা—'মেরে ফেলব শ্যামা, জানো তো আমি খুনে।' চিঠি দেখে মনটা ঝাঁৎ করে ডুবে যায়। মা বাবা দেখার আগেই সে চিঠি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, উনুনে দেয়। চোখে জল আসে। বাইরে কোকিল ডাকলে, মাটির বেহালা বাজলে, বউ-কথা কও কথা বললে, শ্যামা চমকে ওঠে। নয়ন নয় তো। কপাল!

ইচ্ছে করলেই পিকনিকে যেতে পারত সে। হই-হুল্লোড় করে কাটিয়ে আসত। কিন্তু সব ঘটনা মিলে-মিশে একটা গভীর অভিমান বুকে থম ধরে থাকে। নিজেকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়। কষ্ট পা শ্যামা, আরও কষ্ট পা। গান গাস নে, কোথাও যাস নে, মুখ দেখিস নে আয়নায়। তোর আনন্দ পেতে নেই।

গাছের ছায়ায় শিশির এখনও শুকোয়নি! পায়ে পায়ে জল ঝরে পড়ছে। হাঁটতে শ্যামার ভালোই লাগে। একা মসজিদ বাড়ির এই পোড়ো ভাবটা তার সঙ্গে মিলে যায়। এখানে সে দাদার সঙ্গে কত খেলেছে। কিছুই ভোলেনি সে। এখানে সে এবাব থেকে আসবে। রোজ বসে থাকবে একা-একা।

অভিমানটা বিকেল পর্যন্ত রইল।

পাঁচটা নাগাদ তার পিসতুতো দিদি কমলা আর তার স্বামী শঙ্কর ট্যাক্সিতে এসে হাজির। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকেই হাঁক-ডাক শুরু করল শঙ্করদা—শ্যামা, শিগগির সাজপোশাক করে নাও, সিনেমায় যাচ্ছি। তোমার টিকিট কাটা আছে।

ওর ওইরকম। আগে থেকে খবর দেবে না, হঠাৎ এসে হুড়ো দেবে।

—বুঝেছি, কারও টিকিট বাড়তি হয়েছে, তাই আমাকে নিতে এসেছেন। শ্যামার গলায় সকালেব অভিমানের রেশ এখনও।

—মাইরি না, তোমার মুখখানা মনে করেই কেটেছি।

—যদি এসে আমাকে না পেতেন?

—তাহলে বেচে দিতাম। হিট ছবি, বেচলে দু-চার আনা বেশিই পেতাম। জলদি করো।

—আমি যাব না।

কমল শ্যামাকে জড়িয়ে ধরে বলে—যাবি না কী? তোর ইচ্ছেয় না কী। পুজোয় যে পিওর সিল্কটা মামা দিয়েছে সেটা পর আজ। কী যে করিস ভালো শাড়িগুলো দিয়ে সব জমিয়ে রাখছিস বাক্সে।

—ইচ্ছে করছে না রে কমলাদি। মন ভালো নেই।

—ওমা। সে আর নতুন কথা কী! তোর আবার কবে মন ভালো থাকে?

—যাঃ কবে মন খারাপ দেখেছ?

শঙ্করদা বলে—ওটা ওর ব্যক্তিত্ব কমলা। অনেক মেয়ে আছে যাদের মন খারাপ থাকলে ভালো দেখায়।

—ইয়ার্কি হচ্ছে? শ্যামা হাসে।

—মাইরি না, তোমার চোখ দু-খানা যা ঢুলুঢুলু, এতে হাসি ছ্যাবলামি ভালো খেলে না। মন খারাপ তোমার থাক শ্যামা, কেবল মাঝে-মাঝে একটু মুখোশ খুলো, বাব্বাঃ, মেয়েরা সুন্দর দেখাবার জন্য যে কত কষ্ট করতে পারে! একটা মেয়ে ছিল যাকে বাঁ-দিক থেকে বেশি সুন্দর দেখাত, সেই থেকে তার অভ্যাসই হয়ে গেল লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে বাঁ-দিকে ফিরে থাকা, ওইভাবে মেয়েটার একটা দোষ দাঁড়িয়ে গেল, সোজা হয়ে কথা বলতে পারে না, তাকাতে পারে না, বাঁ-দিকে কেতরে তাকায়, কথা বলে। ঘাড়ে ক্র্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। কী জ্বালা!

—আমি সেরকম নই মোটেই।

—তোমাদের সেই সন্নিসি ডাক্তার আমাকে বলেছিল—মেয়েটি দুঃখী মনে হয়। দুঃখীরাই ভালো, তারা ঈশ্বর সকাশে তাড়াতাড়ি যেতে পারে।

—কোন সন্নিসি ডাক্তারের কথা বলছ? কমলা জিগ্যেস করে।

—ওই যে। অরিন্দম ব্যানার্জী, এমআরসিপি, দেওঘরের আশ্রমে যে আছে সে-ই। আমি তো ওই একটা সম্বন্ধই এনেছিলাম শ্যামার। সবই ফার্স্ট ক্লাস ছিল, একটু ডিফেক্ট ওই সন্ন্যাসটা। ওটা না হলে...

শ্যামা কথা বলল না, বুকটা একটু চমকাল মাত্র।

ট্যাক্সিতে শ্যামা আর শঙ্কর দুধারে বসেছে, মাঝখানে কমলা। পাড়ার মোড়টা পেরোতে গিয়ে একটা চায়ের স্টল আর রক দেখিয়ে শঙ্করদা বলে—শ্যামা, এ সব অঞ্চলের ছেলে-ছোকরাগুলো গেল কোথায়! দিন-রাত আড্ডা দিত, চুরি-ছিনতাই করত, টিটকিরি দিত। সব হাপিস হয়ে গেল না কি?

—কী জানি! দেখছি না তো! পাড়াতেও ঘোরে না।

জিভ দিয়ে একটা চুকচুক শব্দ করে শঙ্করদা বলে—হাপিসই হয়ে যাচ্ছে শ্যামা। খুব ধরপাকড় হচ্ছে তো! কিছু পুলিশ নিয়ে গেছে, কিছু মরেছে নিজেদের হাতেই, কিছু পালিয়েছে। সব পাড়াতেই ছেলে-ছোকরা কমে যাচ্ছে। আফশোসের কথা।

শ্যামা হাসে—কেন?

—তোমাদের খাঁটি অ্যাডমায়ারার তো এরাই ছিল!

কমলা ধমক দেয়...থামো তো!

—থামবার কী! আমার তো মনে হয় তোমার সবচেয়ে বড় অ্যাডমায়াবার ছিল কাবুল, ভুল বানানে প্রেমপত্র লিখত, কিন্তু কী ভালোবাসা। তোমার বিয়ের পরই কাবুল নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল না।

—ওকে অ্যাডমায়ারার বলে না।

—ওরাই খাঁটি অ্যাডমায়ারার। শ্যামা, তোমারও একজন আছে না? নয়ন না কি যেন

নাম!

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

—সে এখনও বেঁচে বর্তে আছে তো? না কি হাপিস হয়ে গেছে?

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে বলল—শঙ্করদা, ওকে কিছু করতে পারেন না? বড্ড জ্বালায়।

—রিসেন্টলি কিছু করেছে না কি?

—করেছে।

—কী?

—বাবা-মা'র সঙ্গে ক'দিন আগে মন্দিরে গিয়েছিলাম না। সেইখানেও পিছু নিয়েছিল। একটা মস্ত আমবাগান পেরিয়ে যেতে হয়। বাবা মা একটু এগিয়ে গিয়েছিল, আমি বুনো ফুল তুলতে দাঁড়িয়েছি, সেই সময়ে আমার রাস্তা আটকেছিল। সাহস বড় বেড়ে গেছে।

—কাছে আসবার চেষ্টা করেছিল না কি?

—হুঁ!

শঙ্করদা একটু চুপ করে থাকে। কমলা বলে—ভাবিস না। ওরা ওইরকম। কাবুল আমাকে কম জ্বালায়নি।

—ও মাঝে-মাঝে আমাকে খুন করবে বলে শাসায়। শাসানিটা মিথ্যে নয়, ও পারে। বলল শ্যামা।

শঙ্করদা চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকে একটু। বলে—কী করব শ্যামা, এদের মুকাবেলা করতে হলে একটা প্রস্তুতি দরকার। দুঃখের বিষয় আমার তা নেই। ভদ্রলোক হয়েই গেলাম। দেখি যদি কিছু করা যায়।

উদ্বেগ নিয়ে কমলা বলে—তুমি আবার কী করবে? নয়নকে আমি চিনি। রাসবিহারীতে যারা একজন এস-আইকে মেরেছিল ও তাদের দলে ছিল। ওসব এলিমেন্টের সঙ্গে খবরদার লাগতে যেও না। শ্যামার পিছনে ঘুরছে ঘুরুক। শ্যামার একটা বিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সন্ন্যাসীঠাকুরকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমরা ভালো করোনি শ্যামা। মানুষটার মধ্যে একটা ভারী সৎ ব্যাপার ছিল। শঙ্করদা বলে।

শ্যামা মৃদু শ্বাসের স্বরে বলে—আমি কী করব?

কমলাও বলে—ও কী করবে? ওর মতামতের কোনও দাম আছে না কি! মামা আর মামী কেবল ছেলে-ছেলে করে ক্ষেপে থাকলে ওর কোনওদিন বিয়ে হবে না। ওঁদের মতামত ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদেরই কিছু করতে হবে। হ্যাঁরে শ্যামা, নয়ন কি বাড়াবাড়ি করছে খুব? আগে তো কেবল চিঠি-টিঠি দিত, আর কোকিল ডাকতে-ডাকতে যেত?

থমথমে মুখে শ্যামা বলে ও এখনও যায়। আমার কিছু ভালো লাগে না কমলাদি।

কমলা মুখ ফিরিয়ে শঙ্করদার দিকে চেয়ে বলে—তোমার খোঁজে আর ছেলে নেই? কত তো আড্ডা দাও বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে কাউকে পাওনা? আমি কালই একবার উমার বাসায় যাব তো, আই-সি-আই-এর একজন ইঞ্জিনিয়ার ছেলে আছে ওর পাশের ফ্ল্যাটে, দুবাব বিলেত গেছে...

—ওসব বিলেতবাজ পাত্র ছাড়। খাঁটি দিশি ছেলে দ্যাখো।

—আহা, তোমার সন্নিসিঠাকুরও তো বিলেত-ফেরত।

—সে লোকটা বিলেতের গন্ধ মুছে ফেলেছে।

—বিলেতের দোষ কী। তোমার যত...

—কিছুই না। কিন্তু কমলা ইংরেজ আমলেও বিলেত-ফেরতের এত কদর ছিল না এখন

যতটা হয়েছে। বিলেত-ফেরত নিয়ে এখন হাই কম্পিটিশন, সুবিধে হবে না। তার চেয়ে দিশি পাত্র জোগাড় করা সোজা।

—তাই দ্যাখো না। তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। মামা-মামির উদাসীন ভাব আমার ভালো লাগে না। শেষে দেখ আইবুড়ো থেকে থেকে লাবণ্য ঝরে যাবে, গালে মেচেতা ধরবে, তখন যার-তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। শ্যামা, তুই ভাবিস না রে, কাল থেকেই আমি লাগছি।

শ্যামা ম্লান হাসে।

বিকেলটা তবু ভালোই কাটল। সিনেমার পর রেস্টুরেন্টে খুব খাওয়াল শঙ্করদা।

শ্যামার ইচ্ছে হচ্ছিল জিগ্যেস করে, সেই ছেলেটার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তোমরা অন্য পাত্র খুঁজবে কেন। সেই তো বেশ ছিল। কিন্তু শ্যামার বড় লজ্জা করে।

শঙ্করদা হঠাৎ জিগ্যেস করল—শ্যামা, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লে সব মেয়েরই কিছু স্যুটার জোটে। তোমার তেমন কেউ নেই? আমি শুনেছি, তোমার অনেক স্যুটার।

শ্যামা চায়ের কাপে মাথা নীচু করে বলে—ছিল তো!

—তাদের কাউকে পাত্তা দাওনি, না?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলে—না। তারপর হাসতে থাকে।

—তোমার সবই ভালো, কেবল ওই একটাই ডিফেক্ট। তুমি ভারী ভীতু আর আনস্মার্ট।

কমলাদি ঝঙ্কার দিয়ে বলে—আর স্মার্ট হয়ে কাজ নেই। যা আছে বেশ আছে। যারা নিজে বর খুঁজে বিয়ে করেছে তারা কিছু বেশি সুখে নেই।

—তুমি বড্ড সেকেলে। শ্যামা, তোমার মত কী?

—শঙ্করদা, আমি কিছু বুঝি না।

—কেমন পুরুষ তোমার পছন্দ সে সম্পর্কে কখনও কোন আইডিয়া করোনি?

—আইডিয়া কি ধরা-ছোঁয়া যায়? আইডিয়া আইডিয়াই থাকে।

—তবু বলো না।

কমলা রাগ করে বলে—বলে কী হবে। কোনও মেয়েই সেরকম পুরুষ পায় না ঠিক যেমনটি সে চায়, আবার যাকে পায় তাকে নিয়েও তার চলে যায়। ভাবে, আমি এরকমটিই চেয়েছিলাম।

কমলাদি বেশ গম্ভীর মুখে বলছিল। শুনে শঙ্কর এক চোখে হেসে বলে—তা তুমি কেমন চেয়েছিলে?

কপট শ্বাস ফেলে কমলাদি বলে—তার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না।

—যাকে পেয়েছ তাকে নিয়ে চলছে তো?

—নিজে বুঝে দ্যাখো।

—বুঝেছি।

—শ্যামাকে জ্বালিও না। ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ওর তেমন কোনও পছন্দ অপছন্দ নেই। ও সত্যিকারের ভালো মেয়ে।

শঙ্করদা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে—সত্যি? কখনও ভাবী স্বামীর কথা ভাবো না? কখনও না?

শ্যামা একটু হাসে। ম্লান সেই হাসিটি তার। বলে...ভেবেছি।

আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করে শঙ্কর—কেমন?

শ্যামা চোখটা একটু বোজে। শীর্ণ, কালো দীর্ঘ একটি আবছা চেহারা দেখতে পায়। চোখ দু-খানা উজ্জ্বল এবং আবিলতাহীন। আস্তে করে বলে—তেমনি পুরুষ যে খুব ভালোবাসে।

খুব। কখনও দোষ ধরবে না আমার। আর সে নিজে খুব ভালো হবে। আর কিছু না।

শঙ্করদা হতাশ হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বলে—দূর! ও থেকে কিছু কি বোঝা যায়। ভাবলাম কী না জানি সব স্পেসিফিকেশন শুনব। যাঃ এই বেয়ারা বিল!

—হতাশ হলেন?

—হব না? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা স্মার্ট কিংবা সুন্দর—কত কী স্পেসিফিকেশন ছিল। তুমি সত্যিকারের ভালো মানুষ শ্যামা। ভালো মানুষকে আজকাল কী বলে জানো তো?

—কী?

—লেদ্রু। তুমি পারফেক্ট লেদ্রু।

কমলাদি বলে—ও ঠিক বলেছে। মেয়েদের পছন্দসই পুরুষ হওয়া অত সোজা নয়। ন্যাং-ন্যাং করে অনেকেই ঘোরে পেছনে, জোর করে ভালোবাসা আদায় করে। কিন্তু পছন্দসই পুরুষ খুব রেয়ার।

শ্যামা কমলাদিকে ঠেলা দিয়ে বলে—কী যা তা বকছ কমলাদি। শঙ্করদাও তো বলতে পারে পুরুষদের পছন্দসই মেয়েও আমরা কেউ নই।

কমলাদির চোখ মুখ সঙ্গে-সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, স্বামীর দিকে তীব্র চোখে চেয়ে বলে—বলুক না। বলে দেখুক।

সিগারেট মুখে শঙ্করদা হেসে হাতজোড় করে বলে—আমি বলিনি। বলছি না। আমি যেমনটি চেয়েছি তেমনটি পেয়েছি। শ্যামা, তোমার কমলাদিকে যৌবনের কাননদেবীর মতো দেখতে নয়?

—আমি তো দেখিনি। তবে অনেকটা সেই রকমই মনে হয়। বলে হাসে শ্যামা।

—দ্যাখোনি! বলে ভারী অবাক হয় শঙ্করদা—দ্যাখোনি কাননদেবীর ছবি?

—কী করে দেখব? আমাদের সময়ে সে সব ছবি তো দেখানো হয় না।

একটু গুম হয়ে থেকে শঙ্করদা বলে বাস্তবিক আমাদের কত বয়স হয়ে গেল। আমরা কৈশোরকালে কাননদেবীর গান গাইতাম, ছবি দেখতাম। তোমাদের সঙ্গে আমাদের জেনারেশন গ্যাপ বোধহয় এটাই। আমাদের সময়কার ক্রেজ্‌ তোমাদের সময়কার বিস্মৃতি! আরে বাঃ!

কমলাদি বলে—ওঠ, আর কথা বাড়াতে হবে না। আমি আমার মতো দেখতে। কারও কৈশোরের হিরোইন হতে চাই না, আমি যেমন ঠিক তেমনি।

—সবাই তাই কমলা। কিন্তু শ্যামা, তোমাকে ঠিক বোঝা গেল না। কমলাদির সামনে লজ্জা পাচ্ছ বলতে, বুঝতে পারছি। একদিন না হয় আমাকে গোপনে তোমার স্পেসিফিকেশনটা জানিয়ে দিও।

ফেরার সময়ে ট্যাক্সিতেও একবার শ্যামার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই লোকটা এখন কোথায়! জিগ্যেস করল না।

শঙ্করদা কমলাদির ওপাশ থেকে ঝুঁকে বলল—শ্যামা তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হব। তোমার স্পেসিফিকেশন থাকলে বলো, বিশেষ কাউকে পছন্দ থাকলেও তাও বলো, নেগেশিয়েট করব।

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে কেবল। বলে—বিয়ের চেয়েও আমার একটা চাকরি বেশি দরকার।

—কেন?

—বাবার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর একটাও বোধহয় শিগগিরই হবে, দাদার জন্য এত উদ্বেগ ইদানীং, মোনা ঠাকুর বলেছে হরিদ্বার বা হৃষিকেশ কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে দাদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আমরাও চললাম বুনো মোষ তাড়াতে। এই শরীরে বাবার ওইসব দূর

দেশে, পাহাড়ে-টাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে কী যে হবে। আমার সব সময়ে বাবার জন্য ভয়। কাল রাতেও স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্রী স্বপ্ন।

—ভেব না শ্যামা।

—ভাবনা কি কারও পোষ মানে? ভাবি, বাবার যদি কিছু হয় তবে আমাদের কী হবে।

একটা চাকরি থাকলে তবু ভরসা থাকে।

কমলাদি মাথা নেড়ে বলে—চাকরি দিয়ে কি হবে রে মুখপুড়ি! মামার টাকা কিছু কম নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির অ্যাতো টাকা রয়েছে ব্যাঙ্কে, বাড়িটাও তো অনেকটা হয়ে গেছে। তোর চিন্তা কী?

—আমার বিয়ে দিতেও তো খরচ আছে।

—ওমা! খরচ তো ওই একটাই। মামা-মামির মতো এমন লাইট ফ্যামিলি কটা আছে! চাকরির চিন্তা ছাড়, তোর বিয়ে দিয়েও মামার অনেক থাকবে। মামা খুব কেপ্পন ছিল, জমিয়েছে অনেক।

—যাঃ!

—যাঃ বলিস না শ্যামা। মামার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় খরচ ছিল খাওয়ার। খাওয়া-খাওয়া করে চিরকাল পাগল। আমকাতলা, চিতলপেটি, ইলিশ ভাপে, মুড়োর ডাল—এইসব নিয়ে সারাটা জীবন খরচ করল, মামীর গায়ে একটা গয়না বা দামি শাড়ি দেখলুম না। কেপ্পন বলব না তো কী? তোর বিয়েটাই বা মামা দেব-দিচ্ছি করে দিল না কেন? কত ভালো সব সম্বন্ধ এসেছিল! খরচের ভয় না তো কি?

—কী সব বলছ? বলে ধমক দেয় শঙ্করদা।

—ঠিকই বলছি। পাগলের কি চিকিৎসা নেই? দিলীপ তেমন পাগল তো ছিল না! একটু আনব্যালান্সড্ ছিল, তা রাঁচি বা লুম্বিনিতে রাখলে ভালো হয়ে যেত না? মামা গেল কবিরাজি আর হোমিওপ্যাথি করতে! মামি কত দুঃখ করেছে। শ্যামা, কিছু মনে করিস না, দিলীপকে খুঁজে পেতে এখন যে খরচ হবে তার অর্ধেক খরচে দিলীপের চিকিৎসা করে ওকে ভালো করা যেত। খাওয়ার খরচ ছাড়া মামা আর কোন খরচটা করেছে! নইলে বাড়িটা...

শঙ্করদা ব্যাগ্রভাবে প্রসঙ্গটা ঘোরায়—খাওয়া ছাড়া বাঙালি যে কিছু বোঝেই না। রোজ ট্রামে-বাসে রাস্তায়-অফিসে যত আলোচনা শুনি সবটাই খাওয়ার। পলিটিক্সের কথা, দর্শনের কথা, সব কথার মধ্যেই বাঙালি ঠিক খাওয়ার কথা তুলে ফেলবে। বাঙালি খাওয়ার চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, খাওয়ার কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমোতে যায়। মামার দোষ কী?

—কথা ঘুরিও না। আমার রাগ হয়।

শঙ্করদা সতর্ক গলায় জিগ্যেস করে—কার ওপর?

—পুরুষ জাতটার ওপর। ভারী নিমকহারাম। আর স্বার্থপর।

শঙ্করদা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

ওদের বিয়েটা ভালোবাসার নয় কিন্তু ভালোবাসাটা ক্রমে জন্ম নিচ্ছে। ওদের কাছে গেলে সেই চাপা স্রোতস্বিনীর কুলুকুলু শব্দ পাওয়া যায়। ওরা গতিময়, বহমান। শ্যামার মন চনমন করে। অলোকলতার শরীরে যখন আঁকশি জন্মায়, ছোট্ট-ছোট্ট কোঁকড়ানো বাহুর মতো শূন্যে প্রসারিত হয় অবলম্বন ধরতে চায়। তেমনি শূন্যতার মধ্যে শ্যামা একজনকে খোঁজে। প্রকাণ্ড গাছের মতো সে ঝড়ে ঝাপটায় স্থির।

দিনটা ভালোই কেটে গেল শ্যামার। আবার কাটলও না। সারাটা রাত বুকের এক ধারটা, মনের এক ধারটা ফাঁকা লাগল। আজ রাতে সে স্বপ্ন দেখল না, কিন্তু ঘুমটাও তেমন

হল না গভীর। সকালে খানিকটা বেলায় উঠে তার ক্লান্তি লাগল খুব। শিয়রের জানলা খুলতেই দেখল রোদ আজ বড় তেজি। ফটফটে। জানলার খাঁজ শূন্য। নয়ন বেশ কিছু দিন হল চিঠি রেখে যাচ্ছে না। নয়নের হল কী?

কাকভোর। পাখির ডাক সদ্য শোনা যায়। শিশির ভেজা মাটির গন্ধ এখন বাইরে। উঠোনে হলুদ-গাঁদা আলো করে ফুটেছে। শিউলি জমেছে গাছের তলায়। দিনের আলো সব মানুষকেই বাইরে ডাকে।

অবিকল মুরগির ডাক শুনে সুকুলের ঘুম ভাঙল। তড়বড় করে উঠে বসে সে! বাবাকে নেড়ে উত্তেজিত গলায় বলে—বাবা ঘরের ভেতরে মুরগি ডাকছে গো।

জগদীশ পাশ ফিরে ঘুমচোখে সুকুলের দিকে চায়। সুকুলের চোখে-মুখে সব সময়ে একটা অবাক ভাব। নতুন মেলায় গেলে কচি-কাচাদের যেমন হয়। যতই দেখে মেলার বাহার ততই বাক্য হরে চেয়ে থাকে, তেমনই সুকুলের চার ধারে দুনিয়ার মেলা লেগেই আছে। তার বিস্ময় ফুরোয় না। ছেলেটি জগদীশেরই। আর কার? যারা বলে যে তা নয়, তারা মিথ্যেবাদী। এই ভোরে বন্ধ ঘরের ভেতরে আবছায়ায় সুকুলের সরল মুখশ্রী দেখলে বুকের ভেতরে যেন ধূপগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আর সব ভুল পড়ে যায়।

জগদীশ মৃদু গলায় বলে—মুরগি নয় বাবা, ও নয়নখুড়ো।

সুকুলের গালের এক ধারে এঁড়ানির দাগ, চোখ ফোলা ফোলা। চুল হামলে পড়েছে কপালে, কিছু উঁচিয়ে আছে, ভেঙে পড়েছে কান ঢেকে। সব মিলিয়ে এক যশোদাদুলালের ছবি।

—নয়নখুড়ো? দেখি তো!

বলে মশারি তুলে লাফিয়ে নামে সুকুল!

এই ভোরে নয়নের ওঠার কথা নয়। বহুকাল ধরেই ঘুমহীনতার রোগ তার। মাঝে-মধ্যে সে ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। তার প্রিয় বড়ি সোনেরিল। ক্রমশ বড়ির মাত্রা বেড়ে এখন একসঙ্গে তিনটে-চারটে খায়, কখনও বা তারও বেশি। তারপর এক ধরনের আচ্ছন্নতা নিয়ে পড়ে থাকে। খুব দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেও হিজিবিজি চিন্তা করে। কখনও সে ডাক্তার দেখায়নি।

জগদীশ সেই রাতের ঘটনার পর মাঝখানের দরজা বন্ধ রাখে। কেউটে দুটোর বিষদাঁতও কামিয়ে ফেলেছে। কিছু দেখার নেই। সারা রাত বিছানায় শুয়ে বসে, ঘরে পায়চারি করে আর সিগারেট খেয়ে কাটায় সে। মাথা অসম্ভব গরম হয়ে ওঠে, মাঝে-মাঝে। তখন দরজা খুলে উঠোনে যায়। তারা-ভরা আকাশ থেকে হিম ঝরে পড়ে, টুপটাপ পাতা খসার শব্দ। গাছেরা অলক্ষ্যে নিস্পত্র হয়ে যাচ্ছে। আজকাল দু-তিনটে দমকা বাতাসে গাছ ন্যাড়া হয়ে যায়। গভীর রাতে তারের যন্ত্রর মতো ডাকে ঝিঁ-ঝিঁ, কাঁদে শেয়াল-কুকুর, বাদুড় ডানা ঝাপটায়। জ্যোৎস্নায় ভোরের স্বপ্ন দেখে ভুল করে জাগবার জাক দিয়ে কঁকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে পাখি। তখন আকাশে পশ্চিম প্রান্তসীমায় চাঁদ নেমে ঝুলে আছে। নিস্পত্র গাছের শেষ হলুদ পাতাটির মতো দুলদুল করছে ক্ষয়া ভাঙা চাঁদ, ভোরের প্রথম বাতাসেই খসে পড়ে যাবে। নিঃঝুম দৃশ্যটির দিকে চেয়ে থেকে নয়নের আচমকা মনে হয়—এখানে কেন পড়ে আছি? কী চাই আমি?

উত্তর তার জানা নেই। সে এমন অনেক কাজ করে যা কেন করে তা তার জানা থাকে না। এক রকম নেশারু ঘোরের মধ্যে সে চলে। রেগে যায়, উত্তেজিত হয়। কামুক হয়ে পড়ে। এক সময়ে মনে হয় শ্যামাকে ছাড়া সে আর একদিনও বাঁচবে না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, শ্যামাকে দিয়ে কী হবে? তার কাছে চারদিক সব সময়েই আলো আঁধারি। যেন

বা তার জীবনযাত্রা কেবলই এক বনভূমির ছায়ার ঢাকা আবছায়া পথটি বেয়ে। দিনের আলো আছে, আবার নেইও। কিছুই স্পষ্ট নয় সেখানে। এই অনন্ত বনভূমিটি কোনদিন ফুরোবে না, মনে হয়।

ভোরের প্রথম পাখিটি যখন ডাকল তখন পুবের আকাশ ছাই রঙা। একা ভূতের মতো নয়ন উঠোনে দাঁড়িয়ে স্থির ও একাকী। পাখিরা ক্রমে তার চারধারে ডাকতে থাকে। তারপর ওড়ে। দূরে ব্রাহ্মসময় ঘোষণা করে মুরগির ডাক। সারা ভোর জুড়ে নানা শব্দের আজান ধ্বনিত হয়। তখন হিমে ভিজে গেছে নয়নের চুল, তার গা বরফ, চোখে শীতের অশ্রুবিন্দু। শরীরের বোধ তাই নেই। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নির্ঘুম, জ্বালা-ধরা চোখ সে একবার হাতের পিঠে মুছে নেয়।

ভোরে এই যে চতুর্দিকে জেগে ওঠা এটা টের পেয়ে নয়নের বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধক্ করে নড়ে যায়। যার ঘুম নেই, তার জেগে ওঠাও নেই। এই সুন্দর ভোরবেলাটির সঙ্গে নয়নের নিজস্ব চেয়ে থাকার কোন মিল নেই। ভারী একা লাগে তার। ভয় করে সে কেন ঘুমোয় না?

ঘরে এসে নয়ন তার পার্সটা আর একবার খোঁজে। কোণায় কি খাঁজে যদি এক আধটা বড়িও খুঁজে পাওয়া যায়। নেই। সে জানে। কাল রাতেও খুঁজেছে। হতাশ নয়ন আবার পায়চারি করে কিছুক্ষণ।

বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ায় নয়ন, র‍্যাপারের মতো। দরজা টেনে শিকলি দিয়ে বেরোবার আগে অবিকল মুরগির মতো একবার দুবার ডাক দেয়। পাশের ঘরে সুকুলের গলার স্বর পায়। বাবাকে ডেকে কী যেন জিগ্যেস করছে সুকুল। জগদীশ উত্তর দিল।

উঠোনটা পার হয়ে সে রাস্তা ধরে। ঝোপঝাড়ের পাশে রাস্তাটা আঁকাবাঁকা কেমন পড়ে আছে। সাদা হাড়ের মতো রং। আবছায়া এখনও। পুবে কেবল ফ্যাকাশে রঙের ওপর লাল একটা ছোপ ধরেছে। গাছপালায় ঝুলে আছে অন্ধকার। পরিষ্কার ঠান্ডা বাতাস শ্বাসে ঢুকে বুক চিরে দিচ্ছে।

কোথাও যাওয়ার নেই। তার পথ সবদিকে খোলা। দূর থেকেই মোনা ঠাকুরের পুরোনো মন্দিরের ওপর জাপানি ছবির মতো একটা অশ্বত্থ চারাকে আকাশের গায়ে আঁকা দেখা যায়। পৃথিবীর সব মন্দিরের গায়েই বোধহয় অলক্ষ্যের অশ্বত্থচারা জন্মেছে এখন। গভীর শিকড় নেমে যাচ্ছে মন্দিরের অভ্যন্তরে নালী ঘায়ের মতো। মোনা ঠাকুরদের দিনকাল শেষ হয়ে এল। খামোখা আল টপকাবার পরিশ্রম। দরকার নেই। অশ্বত্থের চারাটি মুখ উঁচিয়ে তো বলেই দিচ্ছে, শেষ শুরু হয়ে গেছে। দেরি নেই।

নয়ন নাবাল মাঠটি থেকে মন্দিরের চত্বরে উঠে আসে। নির্জন। কেবল পাখির ডাক, আর পতনশীল পাতার শব্দ। একবার সে মন্দিরটার মুখোমুখি দাঁড়ায়। লোহার গুল বসানো ভারী দুটো কাঠের পাল্লা বন্ধ। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

মাটিতে পড়া ফুলে পুজো হয় না। রাতে তাই শিউলিতলায় কাপড় বিছিয়ে রাখে তারা। সকালে কুড়িয়ে নেয় রাশি ফুল। শিউলিতেই ভরে যায় সাজি। তারপর স্থলপদ্ম আর জবা।

স্থলপদ্ম এ সময়টায় রাশি-রাশি ফোটে। নীচু ডালগুলো শেষ করে তারা আঁকশি দিয়ে উঁচু একটা ডাল নুইয়ে আনছে। ফুলটা এসেও গেছে আঙুলের ছোঁয়ায়! আর একটু...একটু...। টুপ করে একফোঁটা হিম শিশিরের জল তার গালে পড়ল। হাসল তারা। ডালটা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে গাল মুছল। শীত করে. তার। বড্ড শীত করে। পদ্মটা পাড়ল না তারা। থাক একটা দুটো পদ্ম। গাছের ফুল গাছে থাক।

কুয়োর পাড়ে জবাগাছটা ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে। ঝুপসী ফুল তুলবার আগে তারা এই

আবছায়া ভোরের আলোতে কুয়োয় ঝুঁকে জল দেখল। জল নীচে নেমে গেছে অনেক। সেই কোন পাতালে একটা গোল আয়না বসানো, তাতে ফিকে ফিরোজা রঙ। স্থির জলে তারা নিজের ছায়া দেখল। কিছু বোঝা যায় না। না রং, না মুখ-চোখ। একটা ভূত যেন সে। এই ভোরবেলা ঘুম থেকে সদ্য উঠে তাকে কেমন দেখাচ্ছে? কে জানে। তাদের ঘরে একটা বড় আয়নাও নেই যে দেখবে। কাঠের আয়না, তাতে আবার ঝাঁপ ফেলার বন্দোবস্ত আছে। সেই ঢাকনার ওপর ফুল পাতা পাখি আঁকা, লেখা—সুখে থাক। মরি-মরি, কে যে আয়নাটা কিনে এনেছিল। সেই সুখের আয়নার ঢাকনা খুললে ঢেউখেলানো কাচে নিজের মুখখানা দেখে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। আজ পর্যন্ত কম দিনই সে নিজের কোমর পর্যন্ত প্রতিবিম্ব দেখেছে। যদি কখনও দিন পায় সে, একটা বড় আয়না কিনবে। নিজের দিকে চেয়ে বসে থাকবে। নিজের কত কী দেখার থাকে, কেউ বোঝে না।

সবার আগে বাবার গুরুপুজো, চক্রের দিকে চেয়ে ধ্যান, জপ তারপর বিনতি প্রার্থনা। ততক্ষণ বাবা এদিকে আসবে না। তারা নিশ্চিন্তে আবছায়াটির দিকে চেয়ে থাকে। ছায়ার পিছনে আকাশ কী উঁচুতে! সে কি খুব রোগা? ছিপছিপে, না রোগা? কোনটা বলরে তাকে মানুষ? কালো, না শ্যামবর্ণ? মুখখানা কেমন তার?

অনেক পাখি-পক্ষী আর মুরগির ডাক সে শুনছিল এতক্ষণ। এ সময়ে ওরা তো ডাকবেই। চমকায়নি। হঠাৎ শুনতে পেল মন্দিরের চাতালে, কি বারান্দায়, কোথায় যেন খুব কাছেই একটা মোরগ ডাকছে।

ডাকার কথা নয়। কাছাকাছি মোরগ পোষে না কেউ। পুষলেও মন্দিরে আসতে পারে বলে ছাড়ে না, বাবা শুনলে...

তারা দুই হাতে তালি দিয়ে বলল—হুশ।

আবার মুরগি ডাকল। পরিষ্কার ডাক। মন্দিরের বারান্দাতেই উঠে এল বুঝি! তারা গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল। ফুলকপি উঁকি মারছে সদ্য, ক্ষেতের ঢিবিগুলো পেরিয়ে বেড়ার ধারে এল। বলল—হুশ।

দেখা গেল না। মন্দিরের চাতাল ফাঁকা, বারান্দা শূন্য।

আড়াল থেকে আবার মুরগি ডাকে। আনন্দিত ডাক।

তারা বেড়াটা টপকে পার হয়। পাখির মতো উড়ে আসে মন্দিরের বারান্দায়। হাততালি দিয়ে 'হুশ-হুশ' শব্দ করে ছোটে। প্রথমটায় দেখতে পায় না কিছু। কিন্তু মনে হয় গোল বারান্দাটা দিয়ে একটা পায়ের শব্দ মন্দিরের দেওয়ালের আড়ালে আড়ালে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা হলুদ জামার অংশ চকিতে দেখা গেল। মিলিয়ে গেল দেয়ালের ওপাশে।

তারা দাঁড়িয়ে সতর্ক গলায় বলে—কে?

উত্তর নেই।

—আমি কিন্তু লোক ডাকব।

নয়ন বারান্দাটা থেকে লাফ দিয়ে ঘাসে নামে। অন্ধকার আর নেই। উঁচু গাছের মগডালে প্রথম আলোর লাল কণাটি এসে পড়েছে। আলো ফুটবার সময়টি বড় সুন্দর। ফুল যেমন ফোটে। তারপর থেকে শুরু হয় দিন। দিন তারার ভালো লাগে না। মানুষ জেগে উঠলেই পৃথিবীটা নোংরা হয়ে যায়।

নয়ন উঁচু বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। মেয়েটার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। শ্বাসের শব্দ। নয়ন অপেক্ষা করে। পিছনে তাকায় না। উদাস চোখে পুব দিকে চেয়ে থাকে। তার শরীরে ঘুমহীনতার জ্বালা। শরীর বুঝি বা একটু ক্লান্ত। তার খোলা শরীরের ওপর দিয়ে শীত গ্রীষ্ম চলে যায়, চলে যায় দিন রাত। তবু একটুও ঘুম আসে না।

সোনেরিল ফুরিয়ে গেছে। আনা হয়নি। ধ্যুৎ তেরী!

মেয়েটা এগিয়ে আসে। থমকায়।

একটু চুপ। নয়ন ফিরে তাকায় না।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

সিগারেটের একটা গোল ধোঁয়া জট খুলতে-খুলতে নিথর বাতাস বেয়ে উঠে আসে। তারা ভয় পায়। কে?

নয়ন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল। তেলহীন মুখচোখ তার, রাতে ঘুমোয়নি বলে শরীরের রস টেনে গেছে। হাসতে গিয়ে নীচের ঠোঁটটা চড়াৎ করে ফেটে গেল। জিভে রক্তের নোনা স্বাদ পায় নয়ন। তার চুল রুক্ষ, চোখের কোলে কালি। মেয়েটার ভয় পাওয়ারই কথা।

সে বলে—আমি নয়ন রায় সুকুলদের বাড়িতে—

—ও! তা এখানে কেন?

—মায়ের স্থান। আসতে তো বাধা নেই।

তারা কি বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলে—একটি মুরগি ডাকছিল এদিকে, সে কি আপনি?

নয়ন মাথা নাড়ে।

—কেন ডাকছিলেন ওরকম? অবাক হয়ে জিগ্যেস করে তারা।

—এমনিই। খেয়াল হল।

তারা একটু চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ আঁচল মুখে তুলে 'খুক' করে হেসে ফেলে। সামলে বলে—কাল সুকুল বলছিল বটে একজন হরবোলা এসেছে তাদের বাড়িতে। এতক্ষণে বুঝলাম সে আপনিই তবে।

—আমিই।

সকালের আলোতে মেয়েটাকে সাদাসিধে দেখাচ্ছে। তেমন কিছু দেখার নেই! তবে কিনা যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। তাই মেয়েটির শরীর লাউডগার মতো ডাঁটো, চামড়ায় ঘামতেলের মত চিকচিক। সবচেয়ে সুন্দর তার দীর্ঘ চুল। মস্ত একটা এলোখোঁপায় বেঁধে রেখেছে। নয়ন উর্ধ্বমুখে মেয়েটিকে ক্ষুধার্ত চোখে একটু দেখল, বলল—আমি অনেক ডাক ডাকতে পারি।

তারা শ্বাস ফেলল। বলল, ওসব ডেকে কী হয়।

—মানুষ চমকে যায়। এই কথা বলে, একটু অর্থপূর্ণ হাসে।

তারা অস্বস্তি বোধ করে বলে—বাবা এক্ষুনি আসবে।

—আসুক না।

তারা আবার কথা হারিয়ে ফেলে। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে একটু। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে—ফুলের সাজি কুয়োপাড়ে ফেলে এসেছি। ওই যাঃ যদি কাকপক্ষী ছুঁয়ে দেয়!

বলে আবার পাখির মতো উড়ে যায় সে। পালায়।

নয়ন বারান্দায় তেমনি ঠেস দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে। বাগানে মেয়েটি এখন একা। চারদিকে ঝোপ ঝাড়, নির্জনতা। ইচ্ছে করলেই পিছু নিতে পারে নয়ন। কেউ লক্ষ করবে না। লক্ষ করলেই বা কী? নয়ন গ্রাহ্য করে না। শীতের সুন্দর বাগানে মেয়েটিকে জ্বালানো যেত। কিন্তু আজ তার সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই। কোনদিন ঘুমের জন্য দুঃখ করে না সে। না ঘুমোনো তার অভ্যাস। কিন্তু আজ হঠাৎ? একটু ঘুমের জন্য তার বড় তেষ্টা পায়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে ঘুমের কথা ভাবে। তার কেন ঘুম নেই?

লোকটা চাষা না ভদ্রলোক বোঝা যায়। না মাল দিয়ে কাপড় পরে খালি গায়ে কেমন মাটি কোপাচ্ছে দ্যাখো। কী তেজ শরীরে, বাঁট পর্যন্ত কোদাল গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে। হুবহু

চাষার মতো মুখে-নাকে হুমুস শব্দে শ্বাস ছেড়ে উলটে দিচ্ছে গভীর চাপড়া। রোদ এখন তেজি। শরীরটার থাকে থাকে পেশি সেই রোদে ঝলসায়। উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া ছেড়েছে, বেলা বাড়ল। লোকটার গায়ে ঘাম, থুতনির কাছে একটা ফোঁটা দুলদুল করছে। মাটির চাপড়াগুলো রোগা হাতে একটা খুরপি দিয়ে ঠুকঠুক করে ভাঙছে সুকুল। তার গায়ে পুরোহাতা হলুদ সোয়েটার।

মেহেদির নীচু বেড়াটা ডিঙিয়ে নয়ন জমিতে নেমে আসে। একটু দূর থেকে দেখে। সুকুলের রঙ ফরসা, নরম-সরম গা, মুখখানা লম্বাটে ছাঁদের, চোখ দুটো দীঘল। জগদীশের সঙ্গে কোনও মিল নেই। জগদীশের শরীর চৌকো, মুখ চৌকো, চোখ গর্তে, গায়ের রং কালোই, তবে মিশমিশে নয়। সুকুল হয়তো তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। যদি পেয়ে থাকে তবে বলতে হবে ওর মা সুন্দরীই ছিল।

নয়নের দীর্ঘ ছায়াটা সুকুলের গা ছুঁতেই সুকুল মুখ ফিরিয়ে চেঁচাল নয়নখুড়ো।

—উম্।

—সকালে তুমি মুরগির ডাক ডেকেছিলে?

—হু!

—আমাকে শিখিয়ে দাও।

—দেব।

—বেড়ালের ঝগড়াটা শিখিয়ে দাও নি কিন্তু। ওই যে দুটো বেড়ালে যখন ঝগড়া হয়, যখন গায়ে জলের ছিটে দিলে একজন আর একজনকে বলে—তুই আমার গায়ে মুতলি, অন্যটা বলে তুই আমার গায়ে মুতলি, কীরকম করে বলে যেন? ফ্যাঁ-ও-ফ্যাঁ-অ্যা-ফ্যাঁস ফ্যাঁস-বলো না।

জগদীশ একবার তাকিয়ে তার কাজ করে যায়। কথা বলে না। কেবল সুকুলকে ধমক দেয় একটা—আমার কোপানো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, তোমার চাপড়া ভাঙা পড়ে রইছে। থাক তবে তোমার পালা রোয়া হবে না--

সুকুল তাড়াতাড়ি চাপড়া ভাঙতে-ভাঙতে হিহি করে হাসে। বলে—পোড়েলদের বুড়ো কাল বলছিল—কী কাণ্ড বাবু, এই দিনে এমন কোকিল ডাকে কেন রে? এত কোকিলের মচ্ছব কেন। কী জানি বাবু, কোন অলক্ষুনে ব্যাপার। জানে না তো, যে তুমি ডাকো।

জামগাছটার গোড়ায় কিছু ঘাস। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নয়ন। একটু অন্যমনস্ক। রোদে পাথুরে লোকটা মাটি উলটে দিচ্ছে। ও রাতে কী নিঃসাড় ঘুমোয়! তবে কি পরিশ্রমই ঘুমের ওষুধ? না কি পুত্রস্নেহ? স্বাস্থ্য নয় তো? একটা শ্বাস ফেলে নয়ন। কী ভাবছে আবোল তাবোল। সবাই-ই তো ঘুমোয়। ঘুম আসে বলে। তার আসে না।

পলকের মধ্যে কাঠা দেড়েক খেত কুপিয়ে ফেলে জগদীশ। এখন খেতের শেষে দাঁড়িয়ে গামছায় ঘাম মুছছে। পায়ের কাছে দাঁড়ানো কোদালখানা। হেসে বলল—হেরে গেলি সুকুল! ঠুকঠুক করে এখন সারাদিন লেগে যাবে তোর।

গামছায় গা মুছতে-মুছতে জগদীশ এসে পাশে বসল। কোমর থেকে বিড়ির বান্ডিল বের করল। আর লাইটার। বলল—কোথায় গিছিলেন?

—ঘুরে এলাম।

—আলায় বালায় ঘুরলেন তো অনেক। কী খুঁজছেন আসলে?

নয়ন বলল—আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেওয়ার কথা ছিল আপনার!

জগদীশ চুপ করে থাকে। সে রাতে নয়নকে চড় মারার পর থেকেই বোধ হয় তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। নয়নের সব কথার উত্তর সে দিচ্ছে না দুদিন। বিড়িটা ধরিয়ে খুব আরামে দীর্ঘ টান দিয়ে ঘন ধোঁয়া আস্তে ছেড়ে দিল। আরামের কাশি কাশল খুক্‌খুক্ করে।

—শিখবেন?

—নিশ্চয়ই।

—তবে গুরু বলে মানুন।

নয়ন একটু তাকায়—মানে?

জগদীশ হাসে—এসব গুপ্তবিদ্যা, কাউকে শেখানো যায় না অমনি। যদি শিষ্য হয় তবে শেখানো চলে।

নয়ন একটু হেসে বলে—আপনারা সবাই এত গুরু গুরু করেন কেন? মোনা ঠাকুরও গুচ্ছের গুরুতর কথা বলে গেল সেদিন। ব্যাপারটা কী।

জগদীশ দূরের দিকে চেয়ে বিড়িটা শেষ করে। তারপর হঠাৎ একটা শ্বাস ফেলে বলে—শহরের মানুষ গুরুর মর্ম কমই বোঝে। সেখানে সবাই গুরু। গাঁ গঞ্জের লোকেরা গুরু মানে, কারণ তারা প্রকৃতির নিয়ম জানে। নিয়মই বলে, গুরু ছাড়া কিছু হয় না। উটকো লোককে কেউ কিছু শেখায় না। একটা আধবুড়ো নোংরা অশিক্ষিত লোককে গুরু মেনে, একবছর তার পদসেবা করে তবে আমি শিখেছিলাম। সে ভারী কষ্ট। লোকটাকে ঘেন্নাও হত। হেগে কাপড় ছাড়ত না, দাঁত মাজত না, গায়ে চিমসে গন্ধ, চোখে কেতুর, কথায়-কথায় মেজাজ নিত, জাতেও জলচল না। তবু লোকটার পিছনে ঘুরতাম নেশাখোরের মতো। মাঠে-ঘাটে ছিল তার সাপের বাগান, যেতে-যেতে ফুল তোলার মতো বিষধরদের টুকটাক তুলে নিত ঝাঁপিতে। না-কামানো সাপ বের করে সকাল বিকেল একা একা খেলত। তার সেই কাণ্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হ্যাঁ, গুরু বটে। লোকটার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তবু আমি মাঝে-মাঝে পাথরঘাটায় তার কবরের কাছে যাই সুকুলকে নিয়ে। বসে থাকি কবরটার পাশে। বেশ লাগে।

নয়ন চুপ করে থাকে।

জগদীশ একটু হেসে বলল—গুরু মানতে বলায় রাগ করলেন?

নয়ন মাথা নেড়ে বলল—না তবে আমার গুরু ফুরুতে বিশ্বাস নেই।

জগদীশ বলে—তাহলে শেখানো চলে না।

—কেন?

—গুরু না মানলে বিদ্যেটা একদিন অবিদ্যে হয়ে দাঁড়াবে। গুরু যেন রক্ষাকবচ, সে না থাকলে একদিন বিষধরই খাবে আপনাকে। গুরুর দেওয়া নিষেধ বারণ আছে, সেসবও শ্রদ্ধার সঙ্গে মানতে হবে। নইলে বিদ্যে কিছু না। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি নিয়ম ভাঙতেই জন্মেছেন। আপনি বিদ্যে নিয়ে বিপদ করবেন।

নয়ন একটু হাসে। বলে—তাহলে শেখাবেন না?

জগদীশ মাথা নাড়ে—না। বললাম তো আপনাকে কিছু শেখানো বড় বিপদ। রাতবিরেতে উঠে যদি সাপ-সাপিনীর হরগৌরী দেখতে চান তাহলেই হয়ে গেল।

নয়ন একটা ঢিল ছুঁড়ে বলে—ঠিক আছে। আমি নিজেই শিখে নেব।

জগদীশ অবাক হয়ে—নিজে শিখবেন। কী করে!

নয়ন হাসে—কায়দা খানিকটা বুঝে গেছি। একটু প্র্যাকটিস দরকার। ও হয়ে যাবে। জগদীশ গম্ভীর গলায় সতর্ক করে দেয়—ও কাজও করতে যাবেন না। ও বড় হীন জীব। ওস্তাদ ছাড়া আর সবাই তার বধ্য। এ কেবল একটা দুটো কায়দা নয়, এ হচ্ছে একটা শাস্ত্র। সর্পচরিত্র জানা কি শুধু একটা দুটো সাপ ধরতে দেখেই হয়ে যায়?

—দেখা যাক।

জগদীশ মাথা নাড়ে—ও হয় না। আপনি না শিখে ধরতে গেলে হয় নিজে মরবেন, নয়তো সাপকে মারবেন। দুটোই খারাপ।

—আপনি সাপ মারেন না?

—উরেব্বাশ রে! মারতে পারি?

—কেন মারলে কী হয়?

—যারা শাস্ত্র জানে তারাই জানে মারতে নাই কেন? প্রকৃতির কোনও জীব ফেলনা নয়। মারতে শুরু করলে তো সবই মেরে ফেলতে পারি, তখন মাথায় রক্তক্ষরণের ওষুধ আসবে কোত্থেকে?

—ওটা যুক্তি নয়। সংস্কার।

—তা হবে। আমি অত ভাবি না। গুরুর নিষেধ আছে, তাই যথেষ্ট। জলে ডাঙায় অন্তরীক্ষে জীব চলে-ফিরে বেড়ায় গুরুর দয়ায়। বেড়াক।

—তবে ধরেন কেন?

—ধরি তাকে জানবার জন্য। চেনা জানা কি পাপ? যেমন মানুষ চিনি, তেমনি সাপও চিনি, পাখি-পক্ষীও চিনি। কত কী জানার আছে পৃথিবীতে। সুকুলবাবা, তোমার কি হাত ব্যথা করছে?

চিকন গলায় সুকুল উত্তর দেয়—না তো।

—চলে এসো বরং, বাকিটা বিকেলে কোরো। তোমার তো নরম-সরম হাত পা, সইবে না। রোদটাও তেজালো।

সুকুলের সুন্দর মুখখানা তেতে লাল, মুখে হাসি, হাতের চেটোয় রোদ থেকে চোখ আড়াল করে চেয়ে বলল—দাঁড়াও না, কামিনী গাছটা অবধি করি, তারপর এসে নয়নখুড়োর কাছে ডাক শিখব।

জগদীশ মুখটা ফিরিয়ে নয়নকে বলে—শুনছেন?

—কী?

—ও ডাক শিখবার জন্য আপনাকে গুরু বলে মেনেছে। আপনি কিন্তু সাপ ধরতে শেখার জন্য গুরু মানছেন না।

নয়ন হালকা গলায় বলে—কাউকে গুরু মানা আমার গুরুর নিষেধ।

—কে গুরু?

—কার্ল মার্কস।

জগদীশ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলে—নামটা চেনা-চেনা লাগছে। শহরে যখন বসত ছিল এক সময়ে তখন শুনতাম বটে নামটা। অনেকদিন শুনিনি।

ঠাট্টা কি না ধরবার জন্য নয়ন জগদীশের মুখটা দেখল। তার ভাঙা চৌকো মুখে কোনও ভাব প্রকাশ পায় না। একটা ভালোমানুষি বা বোকামি সেখানে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে বলল—তাঁর চেলা একসময়ে আমিও ছিলাম। বঙ্গবাসীতে ছাত্র ফেডারেশন করতে বছরখানেক তাঁরও চেলা ছিলাম। তারপর শরীর ডাক দিল। তখন কোঁৎ পেড়ে বিশাল ওজন তুলতাম, বানরের মতো রিঙ-এ ঘুরতাম, অনায়াসে করতাম গ্রেট সার্কেল, উঁচু-নীচু প্যারালাল বার, রোমান রিঙ, ভল্টিং বক্স কত কী করতাম! ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন লাহিড়ীদা। গুরু। তিনি ডেকে বললেন—তোমার হবে হে। সব ছেড়ে-ছুড়ে লেগে পড়ো। কাছের গুরু দূরের গুরুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল আমাকে। নইলে মার্কস সাহেবকে নিয়ে একটা তোলপাড় করার ইচ্ছে ছিল আমার।

নয়ন শান্ত গলায় বলে—আমার ইচ্ছেটা এখনও আছে।

—ভালো। বিশ্বাস থাকলেই ইচ্ছে জোর পায়। লেগে থাকুন। সাপখোপ নিয়ে ভাববেন না। নয়ন ঠান্ডা কৌতুকের গলায় বলে—আপনি আমাকে ভয় পান!

জগদীশ অবাক গলায় বলে—ভয় পাই?

নয়ন আস্তে হাত বাড়িয়ে জগদীশের মাংসল প্রকাণ্ড কাঁধে রাখে, পেশিবহুল হাতখানায় হাত বুলিয়ে বলে—এই বিশাল শরীর, শাবলের মতো হাত, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন? সেই রাতে চড় কষালেন, আমি জবাবি কিছু করিনি, চড়টা মেনেই নিয়েছি। আপনিও জানেন আমাকে ওই দু-হাতে পিষে মেরে ফেলা যায়, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন?

প্রকাণ্ড চেহারার জগদীশ কথাটা শুনে কেমন একটু কুঁকড়ে যায়, তার চোখে মুখে অস্বস্তি স্পষ্ট লক্ষ করা গেল। বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে বলল—কীসে বুঝলেন?

নয়ন এক ধরনের ঠান্ডা হাসি হাসে। বলে—জগদীশবাবু, আপনিও জানেন, আমিও জানি আপনি চড়টা মারলেও ভয়টা আপনার উড়ে যায়নি।

জগদীশের বিড়িটা ধরেনি। দু-একবার টিপে-টুপে সেটা ফেলে দিল সে। বলল—ঘরের দরজা বন্ধ রাখি বলে বলছেন? তা আপনার বিদঘুটে কাণ্ড-কারখানাকে ভয় পেতেই হয়। পাগুলে কাণ্ডকে কে না ভয় করে?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে—আর কোনও ভয় নেই?

—আবার ভয় কীসের?

—ভয় যে কীসের তা কি আমি জানি? তবে লোকে ভয় পায় দেখেছি।

—ওটা বাড়িয়ে বলছেন।

—হবে। নয়ন উদাস গলায় বলে। তারপর হঠাৎ জগদীশের দিকে চেয়ে বলে—আপনার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে?

—না। কেন?

—আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কতদিন যে ঘুমোইনি!

—ঘুমোননি কেন?

—ঘুম আসে না। এদিকে তো কোথাও সোনেরিল বড়িও পাওয়া যাবে না।

—বকখালিতে ওষুধের বড় দোকান আছে। দেড় ক্রোশ। ওষুধ ছাড়া ঘুম আসে না?

—না। ঘুমোতে পারি না। ইচ্ছে করে পড়ে কাঠ হয়ে ঘুমোই। স্বপ্ন দেখব না, চিন্তা করব না, একবার ওরকম ঘুম ঘুমোতে পারলে একটানা কয়েকদিন পড়ে থাকতাম।

জগদীশ একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, তারপর বলে—ঘুমোন না বটে। তাই সারারাত পাশের ঘরে মাঝে-মধ্যে পায়ের শব্দ শুনি। জেগে থেকে করেন কী? শরীরে আবিল্য আসে না?

—আসে। সারা রাত কী যে যন্ত্রণা! বড় একা লাগে। একটা ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করে। রেগে যাই। তাড়ি, বাংলা, সব খেয়ে দেখেছি। ঝিমুনি আসে। কিন্তু সে সঠিক ঘুম না।

—আমার কাছে মোদক আছে। খেয়ে দেখবেন?

—দেখেছি। যত নেশা সব করেছি। কিন্তু নেশা তো ঘুম নয়।

—ভারী মুশকিল দেখছি।

—আগে কষ্ট হত না। আজকাল হয়।

দুপুরে অনেকক্ষণ ডাক শিখল সুকুল। বারান্দায় বসে। ক্লান্তিকর, তবু অনেক রকম ডাক ডাকল নয়ন। কুকুর শেয়াল বেড়াল পক্ষী। নানাজনের গলার স্বর নকল করল। সুকুলের চোখ চকচক করল, মুখে চোখে ভীষণ কৌতূহল।

—আরও ডাকো। সে বলল।

—সুকুল, একদিনে সব শিখতে নেই।

সুকুল জেদ ধরে—ডাকো না, শুনি।

—এ সব শিখে কী হয়?

—আমি শিখব। আমি হরবোলা হয়ে যাব।

—কেন?

—রাস্তা দিয়ে অনেক ডাক ডাকতে-ডাকতে যাব, তুমি যেমন যাও। লোক বুঝতেই পারবে না যে সুকুল যাচ্ছে। চমকে উঠবে।

—লোকে চমকাতে ভালোবাসে না সুকুল। দেখ, আমাকেও কেউ ওই জন্যই ভালবাসে না।

—আমি বাসি। খু-উ-ব।

নয়ন হাসে। হাসতে তার কষ্ট হয়। ঠোঁটে রক্ত জমে আছে। চোখে জ্বালা। সকালে একহাঁড়ি খেজুর রস নামিয়ে ছিল জগদীশ। অনেকটা খেয়েছে সে। শরীর ঠান্ডা হয়নি। জ্বরের মতো লাগে। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সে একটু চোখ বোজে।

—এই নয়নখুড়ো, ঘুমোচ্ছ যে! চোখ খোল—বলে সুকুল তার চোখে আঙুল ঢোকাতে চেষ্টা করে। চোখের পাতা ধরে টানে।

নয়নের চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। বাইরে একটা সাদা চাদরের মত রোদ আজ। চেয়ে থাকলে চোখ জলে ভরে আসতে চায়।

'সুকুল' বলে বেড়ার আগলের ধার থেকে কে ডাকল। মেয়ে গলা। সুকুল টপ করে উঠে দুদ্দাড় দৌড়ে গেল।

বেড়ার ওপাশে তারা দাঁড়িয়ে। হাতে কলাপাতায় ঢাকা একটা কাঁসার বাটি। স্নানের পর এখন চুল এলো। পরনে একটা লাল টুকটুকে শাড়ি। মোম মাজা শরীর। বোধহয় কোথাও কোন ব্রণ বা গোটা নেই। দাঁতগুলো বড় ঝকঝকে। কপালে একটা তেলসিঁদুরের বড় টিপ। চোখে কাজল দিয়ে থাকতে পারে, চোখ দুটো বড় ডাগর দেখাচ্ছে দূর থেকেও।

তারা দাঁড়াল না। সুকুলের হাতে বাটিটা দিয়ে বলল—একসময়ে চুপ করে যেয়ে বাটিটা দিয়ে আসিস।

চলে যাওয়ার আগে একবার সজল বিদ্যুৎ হেনে গেল নয়নের দিকে। এক পলক মাত্র। তারপরই পিছন ফিরে বাঁশঝাড়ের আড়াল হয়ে গেল।

—কী সুকুল? নয়ন জিগ্যেস করে।

সুকুল বাটিটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ নেয়।

—নতুন গুড় গো! দ্যাখো, এখনও গরম। জ্বাল দিচ্ছিল সকাল থেকে। খাবে?

—না, তুমি খাও। মেয়েটা মোনা ঠাকুরের মেয়ে না?

সুকুল মাথা নাড়ে...তারা-মা।

—মা কেন?

—আমি মা ডাকি। তারা-মা ডাকতে শিখিয়েছে। সকলের সামনে ডাকি না তো, আড়ালে ডাকি।

—কেন মা ডাকতে শিখিয়েছে সুকুল?

—ইচ্ছে। দ্যাখো, তারা-মা কাল পিঠে পায়েস দিয়ে যাবে। যা হয় ওদের সব দিয়ে যায় চুপিচুপি।

—কেন?

—আমাকে ভালোবাসে তো! পাঁচজনের সামনে দিলে নিন্দে হবে।

—নিন্দে হবে কেন?

—কী জানি। লোকে বলে বাবা নাকি তারা-মাকে বিয়ে করবে। ধ্যাৎ, বাজে কথা। বাবা বিয়ে করবেই না।

নয়ন একটু হাসে। অন্ধি-সন্ধি একটু-আধটু বুঝতে পারে সে। কোথাও একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে। যেখানে মানুষ সেখানেই ঘোঁট।

ভুঁইচাষ বড় প্রিয় জগদীশের। এ সময়টা রবিশস্যের চাষ। তা থেকেও কিছু আয় হয়।

চক্ষুলজ্জা বড় জিনিস। সে চাষা নয়, জমির মালিক। আধা ভদ্রলোক। কাজেই, অতএব বর্গাদার রাখতে হয়েছে। ছাতা মাথায় পিছু-পিছু ঘুরছে সে।

চাষিটা রোগা-ভোগা বটে। ফাল তেমন গভীরে ঢুকছে না। এই যে ওপরের মাটি এ হল গে একশো বছরের পুরোনো। ওপরে হাত-তিনেক পুরু জমি উলটেপালটে আবহমান চাষ চলে আসছে। এই পুরু আস্তর সরালে নীচে আছে সেই কুমারী। ওপরের এই বুড়ি-বিয়োনি জমি দিয়ে আর কতকাল চলবে! অনাবাদী ফেলে রেখে আর কেমিক্যাল সারে এ জমি পানসে হয়ে আসছে। ফসলের ঢল নেই। গভীর গর্ত খুঁড়ে সেই অনূঢ়া ভুঁইয়ের রূপ দেখতে ইচ্ছে করে তার। উঠে এসো গো কুমারী, দেখি তোমার কালচে সোনা রং, লাঙলের ফালে-ফালে ঘুচে যাক লজ্জা, ঢল দাও ফসলের। তার ইচ্ছে করে পৃথিবীর ওপর থেকে ওই পুরু বুড়ি-বিয়োনি আস্তরটা তুলে ফেলে। কিন্তু তা হয় না। তত জোর লাঙলের ফালে নেই।

চাষিটা মারকুটে শরীর ভর দিয়ে ঠিকমতো গাঁথতে পারছে না। চাঙড় উপড়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে না।

—তামাক খাও গে। বুঝলে! জিরিয়ে ঠান্ডা হও। আমি দেখছি। বলে হাঁক দেয় সে। গায়ের পিরাণটা খুলে ফেলে মাল দিয়ে কাপড়টা পরে নেয়, গামছা বাঁধে কপালে। জমিতে নেমে যায়।

জিনিসটা বড় ভালো লাগে তার। লাঙলটা যখন সে মাটিতে গাঁথে তখনই সে মাটির গভীর নরম মায়া টের পায়। ঠিক যেন মেয়েমানুষের শরীর। পায়ের আঙুলে উঠে দুখানা লোহা-হাতে সে চেপে ধরে হাতল। রি-রি করে কেঁপে ওঠে মাটি। আনন্দে, যন্ত্রণায়। উপড়ে আসে গভীর শীতল কালচে-সোনা মাটি। ভারী একরকমের তৃপ্তি পায় সে। 'অ-ড়-ড়-ড়' করে বলদ দুটোকে তাড়া করে। তার হুহুঙ্কারে বলদ দুটো নিষ্পেষিত ঘাড়ে ছোটে।

—মেল ছেড়েছে গো! রোগা-ভোগা চাষিটা গাছতলা থেকে হেঁকে বলে। হাসে খুব। জগদীশের গায়ে জোর এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

ঘাম ফুটে উঠতে থাকে। শরীরে ছলাৎ ছল রক্তের শব্দ। দাঁতে দাঁত। লড়াই। উঠে এস গো কুমারী মা, উঠে এসো। মাটি ওলটায়, তবু জগদীশের মন ভরে না। গভীর, আরও গভীর মাটি চাই, যে মাটিতে মানুষের হাল পড়েনি কখনও। গুপ্তধনের মতো সেই মাটি কোথায় কোন পাতালে এখন? ভারী লাঙলটা একবার তোল্লা দিয়ে ঝাঁকিয়ে বসায় সে। র-য়ে র-য়ে ফেটে যাচ্ছে ভুঁই, চৌচির হয়ে যাচ্ছে, নানা ঢঙের ঢেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ে মাটির স্বাদ, দু-হাতে মাটির কাঁপন উঠে আসে লাঙল বেয়ে। সুখ। তার সুখ এরকমই। চাষাড়ে।

দূরে মাথা তোলা দিয়ে আছে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের চূড়োর কলস। তার ওপর একটা লাল নিশেন ছিল, এখন নেই। নিশেনের বদলে গজিয়েছে দুরন্ত অশ্বত্থ। বহুদূর থেকেই দেখা যায়। উত্তর দিকে চষবার সময়ে মন্দিরটা চোখে পড়ে। উলটে বাগে ঘুরলে দেখা যায় পৃথিবীর সীমা। সেখানে ছায়ার মতো গাছপালা, শিমুলের বীজ কেটে তুলো যেমন ওড়ে তেমনই উড়ে যাচ্ছে হালকা আঁশমেঘ। ঘুরলে আবার মোনা ঠাকুরের মন্দির। বাঁশবন আর আমবাগানেব মাথার ওপর উঁচিয়ে আছে। মোনা ঠাকুর নিজেও ওরকমই ওঁচানো। সবার ওপর মাথা তুলতে চায়।

মাথাটা নামিয়ে নিয়ে মাটির গভীর খালগুলো দেখে জগদীশ। বিড়বিড় করে কথা বলে—সুকুল আমার ছেলে নয়, সে কি আমি জানি না? হয় গো, এসব তো বাচ্ছা ছেলেও বুঝতে পারে। বউটার ওপর রাগ করতাম। সে পা চেপে ধরত। সুকুলের বাপের নাম সে কখনও বলেনি। কী বলব। পেলে তার বুকে এমনি লাঙল চেপে দু-ভাগ করে দিতাম না।

গভীর গভীরতর ডুবে যেতে থাকে লাঙল। অবিশ্বাস্য চাষ দেখে আধবুড়ো চাষি চেঁচিয়ে বলে—মাটিকে যে জল করে ফেলা হল। আরে বাঃ বসুন্ধরা গলে যায় যে বাঃ বাঃ।

চাষের বাহার সে বোঝে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

মাটির গভীর খাঁজে খাঁজে অন্ধকার। জগদীশ চেয়ে থাকে। নোনা ঘাম নেমে আসে ভ্রূ বেয়ে, চোখের কোণ বেয়ে। থুতনি বেয়ে। বিড়বিড় করে বলে সে—বাপ কে? অ্যাঁ! কে বাপ তবে আমার সুকুলের? এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুল আমার, বাপ ভিন্ন। অ্যাঁ আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুলের জাত কী বলো তো ঠাকুর! পারবে না। কে জানে! কত খুঁজেছি আড়ালে-আবডালে! যে-ই হোক। ছেলে আমার। খবরদার কোন শালা যদি ফের কথা তোলে! সুকুল বড় হচ্ছে বুঝতে শিখছে। বড় ভয়। যদি জানতে পারে? কী লজ্জা! খবরদার তোমরা সব, খবরদার, ওর কানে তোলে যদি কেউ চোয়াল খসিয়ে দেব, জিভ উপড়ে দেব সকলের। সার্কাসে আমি পাঁচ মণ লোহা তুলতাম, মনে থাকে যেন!

লেবুকাঁটা দিয়ে চমৎকার একখানা টিপ পরে তারা। সস্তা কুমকুম বড্ড জেবড়ে যায়। লেবুকাঁটা দিয়ে পরলে বড় টিপটার চারধারে ফুটকিগুলো ভারী বাহার দেয়। ঢাকনা-খোলা আয়নাটা একটু দূরে ধরল তারা। আয়নার ছায়ায় ঢেউ খেলছে। খেলুক। তবু বোঝা যায়, এ মেয়ের এখন যৌবনকাল। পোকামাকড় ভিড় করবার সময়। মুখ টিপে সে হাসে। পরমুহূর্তেই এক দুঃখ খেলা করে যায় বুকে। পাউডার নেই, ঠোঁটের রঙ না, কিছু না। প্রদীপের শিষে কাজললতা উলটে কালি ফেলে একটু কাজল চোখে দেওয়া, তাও চুরি করে দিতে হয়। বাবা দেখলে ঠান্ডা গলায় বলে—কালি কি সাজ! চোখে লোভ আসে। উত্তেজক।

ঢাকনায় লেখা—সুখে থাকো! মরি মরি! কী বা লেখার ছিরি সুখে থাক বললেই সুখে থাকে লোক? তারার সুখ নেই। রঙিন শাড়ি, ভালো আয়না, সাজগোজ, সিনেমা-থিয়েটার, রেডিওর গান, পুরুষ সঙ্গী...কত কী চায় মেয়েরা।

পশ্চিমের জানালায় রোদ সরে এল। নিমগাছের ছায়াটা উঁকি দিচ্ছে মেঝেয়। ওই ছায়াটা হুশ করে অন্ধকার হয়ে যায়। শীতের বেলা বড্ড তাড়াতাড়ি যায়।

সুকুলের বাবা আজ চাষে গেছে। এই তার ফেরার সময়। নাবাল মাঠটা হন্ হন্ করে হেঁটে আসে বিশাল মূর্তি, মাঠের মাঝখানটিতে একবার থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে কালীমায়ের মন্দিরের দিকে একবার হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে চলে যায়। মন্দিরে আসে না। তারার বাবা সুকুলের কোষ্ঠীতে বাপের নামের জায়গাটা খালি রেখেছিল। সেই থেকে রাগ।

কামিনী গাছটার ঝুপসী ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে জগদীশকে প্রায়ই দেখে নেয় তারা। জগদীশ তা জানে। এক-আধদিন দেখাও হয়ে যায় এধারে ওধারে। জগদীশ গা করে না। তারা কি সুন্দর নয়? নাই হল, সুন্দরী ছাড়া কারও দিকে তাকাতে নেই? তারার কিছুই কি দেখার নেই জগদীশের? পাথর! পাথর! ছেলের জন্য এত ভালোবাসা কোথা থেকে আসে? ওই বুকটা থেকেই তো! একই বুক একজনের জন্য গলে ঘি, অন্যজনের বেলায় পাথর! ভারী আশ্চর্য!

শোনো সবাই, তারা ঠিক করে রেখেছে একদিন গলায় দড়ি দেবে। সেদিন খুব খাবে তারা। মাছের মুড়ো, পাঁঠার ঠ্যাং, পিঠে পায়েস। চালতার অম্বল। সাজবে খুব। যে বাসন্তী রঙে চকরা বকরা শাড়িটা দিদি লুকিয়ে দিয়ে গেছে, সেইটে পরবে সেদিন। খোঁপায় ফুল

গুঁজবে। চন্দনের ফোঁটা পরবে মুখে। বিয়ের কনেটি সেজে অনেকক্ষণ আয়নায় দেখবে মুখ। সেদিন খুব জ্যোৎস্না ফুটবে। ঋতুটি হবে বসন্ত। দক্ষিণের পেয়ারা গাছটা ডালে ঝুলন ঝোলাবে সে। একা-একা রাধা। কৃষ্ণবিরহনী। সেদিন বিরহই তার মিতা। মরার সময়ে লোকে চিঠি লিখে রেখে যায়, বলে যায়, সে নিজেই মরছে। তারা লিখবে না কিছু। হঠাৎ মরে যাবে। এবার তোমরা খুঁজে বের করো—কেন তারা মরেছে। জগদীশ, সুকুলের বাপ কে এটা খুঁজে-খুঁজে হয়রান! তোমাকে আর একটি হয়রানি দিয়ে যাব জন্মের শোধ। তারা কেন মরল! খুঁজে খুঁজে বের কর সারা জীবন ধরে। বেশ হবে! জন্মের শোধ।

কামানোর পর সাপদুটো ঝিমিয়ে গেছে। কাল ওদের দুটো ব্যাঙ দিয়েছিল জগদীশ। গিলেছে। দুটোরই পেট ফুলে আছে। ঢিপির মতো একটা জায়গায়। নিম-খোরাকি! একবার খেলে বহুদিন আর কিছু খায় না। ঝিম মেরে পড়ে থাকে। নয়ন কাচের ভেতর দিয়ে উগ্র চোখে চেয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখে। কিন্তু না, ওদের পরস্পরের শরীরের প্রতি বড় নিস্পৃহতা। এ বড় অদ্ভুত। এরকম একটা বাক্‌সে নয়ন আর শ্যামা থাকলে?

নয়ন একটু হাসে।

এ জীবনে নয়ন আর কোনদিন ঘুমোবে কি? আশ্চর্য, ঘুমের জন্য তার কোন চিন্তা ছিল না, কোনওদিন। হঠাৎ আজকাল মাঝে-মাঝে ঘুমের কথা তার মনে হয় কেন? এক দেড় প্যাকেট সিগারেট, দু-এক ঢোঁক বাংলা, আর চিন্তা—এই নিয়েইতো দিব্যি রাত কেটে যেত! আজ কেন ঘুমের চিন্তা? কে তাকে ঘুম পাড়াবে? শ্যামা? শ্যামা! চোখ জ্বলে যায় তার।

দুটো ঝাঁপি দড়িতে ঝোলানো। ওপরেরটায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে নয়ন। ভেতর থেকে একটা শ্বাসের শব্দ আসে। এই ঝাঁপি দুটোয় দুজন গোখরো আছে। ঠান্ডা মেজাজ। চট করে কামড়ায় না। কামানো নিরাপদ। ঢাকনা খুললে যখন তারা মাথা তুলবে তখন পারবে কি নয়ন সাহস রাখতে? তেমন শক্ত নয়। জগদীশকে দেখেছে মুখের সামনে হাত নেড়ে সরিয়ে নেয়।

মাথাটা তখন একটু নীচে ঝুঁকে পড়ে। জগদীশের বাঁ-হাত তখন টপ করে পিছন দিক থেকে ধরে মাথাটা। অনেক সময়ে লেজ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ফেলে। নীচু মাথা আর তুলতে পারে না। শক্ত নয়। পারবে নয়ন।

ভেবে দেখলে শ্যামাকে তার কিছুই দেখানোর নেই। কত কিছু দেখাতে সাধ যায়! কী ভালোবাস শ্যামা? মানুষ খুন? সুন্দর পোশাক? বিনীত ব্যবহার? নাকি গান শুনতে চাও? উপহার ভালোবাসা? অপহৃত হতে চাও? কি শ্যামা? তোমার জন্য আমি ফুটবল খেলোয়াড়ও হতে পারি। কিংবা গায়ক। অভিনেতা। যা চাও তাই হব।

ঝাঁপিটার গায়ে আর একবার আলতো হাতে চাপড় দেয় সে। ভেতরে এবার দুটো দ্রুত তীক্ষ্ণ শ্বাসের শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোনো শ্যামা, কীরকম শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোনো শ্যামা, কীরকম শব্দ! ঝাঁপি খুললেই কপিশ বিদ্যুৎ চমকে উঠে দাঁড়াবে। বিদ্রোহী। মুক্তিকামী। কী ভয়ংকর! সম্মোহনের হাত বাড়িয়ে আমি ধরে নেব তাকে। কত খেলা দেখাব। দ্যাখো।

সুকুল জামতলায় খেলছে। অনেক সঙ্গী জুটেছে তার। জগদীশ একঘরে, কিন্তু সুকুল নয়। গাদীর কোট পড়েছে মাঠে। সুকুল পাকা ঘুঁটি। চেঁচিয়ে বলছে—আমার কোটে আসিস না, আমি পাকা। দান কেটে যাবে।

খেলা খুব জমে গেছে। সুকুল এখন আসবে না।

ওপরের ঝাঁপিটা সাবধানে দড়ির দোলনা থেকে তুলে আনে নয়ন। বেশ ভারী। সাপ যে এত ভারী হয় তা জানত না। বয়ে নিতে কষ্ট হবে। হোক।

বিছানার পাতলা চাদরটা দিয়ে ঝাঁপিটাকে বাঁধে সে। একটা ঝোলার মতো করে নেয়। ঝাঁপির ভেতর অবিরাম পাক খোলা আর শ্বাসের শব্দ নেই। নয়ন দাঁত টিপে হাসে। না সাপ, না শ্যামা, কাউকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু কী করে তাদের ধরতে হয় তা শিখে যাবে নয়ন।

ঝোলা হাতে নয়ন নিঃসাড়ে মেহেদির বেড়া ডিঙিয়ে জঙ্গুলে জায়গায় ঢুকে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যাবে না। গাছের আড়ালে-আবডালে গেলেও সে ঠিক পৌঁছবে। জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ শরীর আছড়ে সাপটা এখন নিশ্চুপ। বোঝাটা হাত বদল করে বাঁশঝাড় পেরিয়ে বুকসমান কসাড় জঙ্গল ভেদ করে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের পিছনটায় উঠে আসে। মোনা ঠাকুরের বাগান। এটা ঘুরে সে আমবাগানে গিয়ে পড়বে! বাগানের বেড়া ঘেঁষে সে হাঁটে।

মন্দিরটার ডগায় অশ্বত্থচারাটি চোখ তুলে দেখে নয়ন! হোঁচট খায়। গরুর দড়ি বাঁধার খুঁটি কে যেন উপড়ে নেয়নি! বোঝাটা আবার হাতবদল করে নেয় সে!

নাবাল মাঠটায় আলো ফিকে। পশ্চিমে একটা কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে। সূর্যটা ঘোলাটে। জগদীশ এখুনি ফিরবে। সে ফিরবে মাঠ দিয়ে, ততক্ষণে আমবাগানে ঢুকে যাবে নয়ন। দেখা হবে না। নয়ন একটা শিস্ দিল। অবিকল দোয়েলের মতো। বড় মিষ্টি ডাক পাখিটার। পরমুহূর্তে শ্বাস আটকে আটকে, পেটে খাঁজ ফেলে, কুঁজো হয়ে সে একবার দুবার কোকিল ডাকল। তার বড় প্রিয় ডাক।

মোনা ঠাকুরের বাগানের শেষে একটা ঝুপসী কামিনী গাছ ঝুঁকে তার ছায়া ফেলেছে নীচের নাবাল মাটিটিতে। ছায়াটি অনেক লম্বা হয়ে গেছে।

ওই মাঠ পেরিয়ে সেই আশ্চর্য চাষাটি আসবে। কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে রোজই তাকে দেখে তারা। তারা যে দেখে তা কি ও জানে না? জানে। জেনেও পাথর। পুরুষ নও নাকি? শরীরে তো মাংসের বাহার, মন কোথা? বাসনা কোথা? পুরুষ হবে পুরুষের মতো, গনগনে আঁচ থাকবে, থাকবে কামনা। তা নয়, এ হচ্ছে গিয়ে মুক্তপুরুষ। ছেলে থাকলে আর জমি থাকলেই কি হল? মেয়েমানুষই চাই না? বাপু, তুমি হচ্ছ হিজড়ে।

একটু আগেই আজ এসে পড়েছে তারা। বেলা আছে। পশ্চিমে একটু ঘোলাটে ভাব বলে বেলা আন্দাজ পায়নি। কামিনী ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখে। ডাঁস, মশা আর আলোর পোকা উড়ে যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে পিন্‌পিন্ করে মশা মাথার ওপরে। কূয়ো থেকে কে জল তুলছে। ভরা বালতি থেকে ছলাৎ করে জল উপচে জলে পড়ল। পিছনে গাছের আড়াল আছে। তবু একটু সেঁটে দাঁড়ায় সে। বুকটা একটু কাঁপে। কিশোরীর হৃদয় কাঁপবেই। মুখে একটু শোষভাব। কণ্ঠমনি ওঠানামা করছে। এই উত্তেজনাটুকু তার ভালোই লাগে। নাবালের মাঠ দিয়ে মাটিমাখা প্রকাণ্ড মানুষটা রোজ যায়। হাত দশেক তফাত থাকে তারার শরীর থেকে। সেই দশহাত শূন্যতা জুড়ে কত ইচ্ছার ঢেউ তারা বইয়ে দেয় রোজ। সে কখনও ফিরেও দেখে না।

দোয়েলের একটা শিস্। তারা চমকায়। এত জোর ডাকল, কাছেই! পরমুহূর্তে তার কানের পরদা ফাটিয়ে একটা কোকিল কাঁদে। ডাক নয়, যেন কান্না। বড্ড বুক ভাঙা ডাক। মিতা বুঝি উড়ে গেছে কোথা!

ঝোপের ভেতর থেকে আস্তে মুখ বাড়ায় তারা।

লাফ দিয়ে একটা খন্দ পেরিয়ে হলুদ জামা পরা ছোকরাটা সামনে এল! লুকোবার সময় পেল না তারা। মুখটা টেনে নিল আড়ালে, কিন্তু ও দেখছে ঠিক। দাঁড়িয়ে গেল।

বোঝাটা হাতবদল করে ঝোপের ওপাশে একটু দাঁড়াল। তারার বুক ঢিপঢিপ করে! একটা শ্বাস ফেলল ছেলেটা। তারপর চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে

এল। বলল—দেখে ফেলেছি।

তারা চুপ।

—কী হচ্ছে এখানে?

—কিছু না! বাগানে দাঁড়িয়ে আছি! তারা অস্ফুট স্বরে বলে।

ছোকরাটা হাসে! বিচ্ছিরি হাসি ওর! বোঝাটা মাটিতে রেখে হালকা পায়ে বেড়ার কাছে আসে। তারা শ্বাস বন্ধ করে থাকে।

—বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা, না আর কিছু?

—আর কী!

আচমকা ছেলেটা লাফ দিয়ে বেড়াটা পার হয়ে আসে! চেঁচাতে গিয়েও চেঁচাল না তারা। কী সাহস ওর।

ছেলেটার পায়ের শব্দ হয় না! বাতাসের ওপর চলে-ফেরে যেন! ঝোপটা ঘুরে মুখোমুখি চলে এল! মুখখানা দেখে আপনা থেকেই একটা ভয়ের চিৎকার গলায় উঠে আসছিল! সেটা সামলাল তারা! পেটের ভেতরটা গুর-গুর করে উঠল!

ছোকরাটার পিঙলে চুল বাতাসে উড়ো-খুড়ো হয়ে আছে। চোখের নীচে বসা কালি, কাটা ফাটা ঠোঁট, ভাঙা চোয়ালে রগ ফুটে আছে। চোখ দুটো লালচে, জ্বলজ্বলে। ওপরের পাতাটা আধবোজা। হঠাৎ বুক চমকে ওঠে দেখলে।

তারা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে—কী চান আপনি?

—সুকুল তোমাকে মা ডাকে কেন?

তারা ঢোঁক গিলল। কারও জানার কথা নয়। কেবল সুকুল জানে আর সে নিজে। আড়ালে সুকুলকে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে সে। বোকা ছেলেটা, পেটে কথা রাখতে পারেনি।

তারা বলল...কই না তো!

ছোকরাটা ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলে—তোমরা মেয়েরা মিথ্যেবাদী। তুমি সুকুলকে মা ডাকতে শিখিয়েছ কেন?

—শেখাইনি, ও নিজেই ডাকে। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে বলে।

—মিথ্যেবাদী। চাপা স্বরে বলে ছোকরাটা।

—না।

বাবা শুনলে হেঁটোকাঁটা ওপরকাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলবে। তারা তাই কেবল বাতাস গিলল। ছেলেটার পিঙলে চুল ফণা ধরে আছে। মুখে না খেতে পাওয়া ভাব। শরীরটার তামাটে রং থেকে রাগের তাপ আসছে।

—সেজেগুজে কার জন্য দাঁড়িয়ে আছ? জগদীশ?

তারা মাথা নাড়ে। কানের পুঁতির ঝুমকো দুটো গালে এসে ঝাপটা মারে। সে মাথা নেড়ে জানায়—না।

ছোকরাটা একটু হাসে। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে—আমি জানি।

—কী জানেন?

—সব। যদি মোনা ঠাকুরকে বলে দিই তবে জগদীশ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

—যা জানেন তা ঠিক নয়।

—তোমরা মিথ্যেবাদী। মোনা ঠাকুর যখন বাণ মারে তখন কী হয় জানো তো? মুখে রক্ত তুলে, দাপিয়ে মরে যায় তরতাজা মানুষ। জানো?

তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে।

—জগদীশেরও তাই হবে। ছোকরাটা হালকা স্বরে বলে।

—না।

—কী না? বলে এগিয়ে আসে ছোকরাটা।

বড়দি পালিয়ে গিয়েছিল একটা চামচিকের সঙ্গে। মোনা ঠাকুর হই-চই করেনি, পুলিশে খবর দেয়নি, খোঁজেনি। বিয়ের দু-মাসের মাথায় মুখে রক্ত উঠে সেই চামচিকেটা মরেছিল। সবাই বলে, মোনা ঠাকুর বাণ মেরেছে। সেটা মিথ্যেও নয়। বাবা ঠিক বাবা নয় তারার কাছে। অন্য সকলের কাছে যেমন 'মোনা ঠাকুর' তার কাছেও তেমনি। রহস্যময় এক শক্তির অধিকারী ভয়ংকর পুরোহিত। চতুর্দিকে বিস্তৃত তার সম্মোহন আকাশে বাতাসে জাল ছড়িয়ে রেখেছে। অদৃশ্য চক্ষু লক্ষ রাখছে সব দিকে। তারা নিথর হয়ে চেয়ে থাকে। বুকটা জ্বলে যায়। কোনওদিকে পথ খোলা নেই।

ছোকরাটার শ্বাস মুখে পড়তেই চকিতে চটকা ভেঙে মুখ তোলে তারা। কত কাছে এসে গেছে দ্যাখো! মাগো! তারা পিছোতে যাবে ছেলেটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল।

—পালাচ্ছ?

—এটা কী? ছাড়ুন। তারা ছটফট করে।

—আমি মোনা ঠাকুরকে বলে দেব।

—না।

ছোকরাটা হাসে। তারার হাতখানা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকে বলে তোমার গা পরিষ্কার, কোনও গোটা নেই, মোলায়েম!

ঝটকা দেয় তারা। কিন্তু হাত ঘসে না। সাঁড়াশির মতো ধরে রেখেছে।

ছোকরাটা আপন মনে বলে—প্রচুর ক্লোরোফিল তোমার শরীরে। তাজা ভিটামিন, আর ক্যালসিয়াম। দুরন্ত লিভার, আর হার্ট। তোমার কোনও অসুখ নেই।

—ছাড়ুন। আমি চেঁচাব।

—না চেঁচাবে না। খুন করে ফেলব। বলতেই তার চোখ ঝলসে ওঠে। স্তিমিত গলায় আবার বলে—তোমাকেও। জগদীশকেও! মোনা ঠাকুরের বাণে অনেক সময় কাজ হয় না। কিন্তু আমার বাণে হয়। আমি মানুষ মেরেছি তারা।

তারার চোখে পলক পড়ে না। দুরন্ত মুহূর্তগুলি কেটে যাচ্ছে। শরীরে একটা রক্তের হলকা বয়ে যাচ্ছে।

ছোকরাটা হাতখানার গন্ধ আর একবার শুঁকল। তারপর বলল—তোমাকে আজ আমার একটা গোপন কথা বলে দিলাম। মানুষ মারার কথা। আজ অবধি আর কাউকে বলিনি।

পশ্চিম দিগন্তে একটা মলিন সূর্য ঝুলে আছে। ডুবে যাচ্ছে না। বাতাস বন্ধ। পৃথিবীতে সময় থেমে গেছে হঠাৎ। ছোকরাটা মুখ নামিয়ে আনে কাছে, চাপা গলায় বলে—যাকে একবার গোপন কথা বলে দেওয়া যায় তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না। তোমাকে বিশ্বাস করি না আর। বুঝেছ?

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছোকরাটা। কাঁধে ঝাঁকি দেয়। কাঁপনটা নিজের শরীরেও টের পেল তারা।

—আমি আবার আসব। হঠাৎ আসব। তোমাকে পাহারা দিতে। আমার গোপন কথাটা কাউকে বলেছ কি না দেখতে আসব। বারবার। তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমি একবার যার পিছু নিই তার শান্তি থাকে না। বলে সে হাসে।

তারা অনেক কষ্টে অস্ফুট গলায় বলে—কী সব বলছেন!

সে কথায় কান না দিয়ে ছেলেটা পৃথিবীর রাজার মতো গলায় বলে—আবার যখন আসব তখন তোমার কাছে একটা জিনিস চাই।

কী? ভয়ার্ত তারা জিগ্যেস করে।

ক্লোরোফিল, কিংবা ক্যালসিয়াম, ভিটামিন কিছু একটা। ঠিক জানি না। অনেকদিন আগে আমি ডাক্তারি পড়তাম, সেকেন্ড ইয়ারে ছেড়ে দিই। সব ভুলে গেছি। কিছু একটা চাই যা আমাকে ঘুম পাড়াবে। বুঝেছ?

তারা কিছু বোঝে নি। তবু ছাড়া পাওয়ার জন্য মাথা নাড়ল।

—আজ আর সময় নেই। বলে হঠাৎ নিস্পৃহভাবে তারার হাতটা ছেড়ে দিল নয়ন। বলল—জগদীশ আমাকে চড় মেরেছিল একদিন, বুঝলে। আমাকে চড় মেরেছিল। যে আমাকে মারে তার ছাড় নেই! আমি ফিরব! বুঝলে! ফিরব।

ছোকরাটা ঘুরে চটপটে পায়ে আবার বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। ঝোলাটা তুলে নিল হাতে। একবারও ফিরে না তাকিয়ে জঙ্গল ভেঙে মিলিয়ে গেল।

তারা নিঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার নরম হাতখানায় পাঁচ আঙুল বসে যাওয়ার লালচে দাগ। ব্যথা করছে। চোখ ভরে টলটলে জল এল তার। তারপর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দরগার পিছনের ঢিবিটা পেরোলে একটা বাঁশঝাড়। সেটা ডাইনে রেখে দু-কদম হাঁটলেই নাবাল মাঠটা দেখা যায়। বাঁয় উঁচুতে মোনা ঠাকুরের মন্দির। মাঠের শেষে রাস্তাটা ঘুরে গেছে।

দূর থেকেই দেখা যায়, রাস্তার বাঁকটাতে সুকুল দাঁড়িয়ে। এত বড় মাঠটা সামনে বলে সুকুলটাকে যে কী ছোট্ট আর একা দেখায়। শেষবেলার আলোয় এখন কুয়াশার ভাব। মাটি থেকে ধুলোটে অস্বচ্ছতা উঠে আসে। বড় আবছা চারদিক। বড় মায়াময়। এ সময়টা আলো ক্ষয়ে গিয়ে পৃথিবীর ওপর একটা স্বপ্নের সর পড়ে। সত্যি নয় কিছু। আলো ক্ষয় হয় এ সময়ে! দূর থেকে সুকুল মনে হয় মাঠের ওপর একটা দাগ মাত্র। বুকটা ফাঁকা লাগে জগদীশের।

মাঠের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে রোজ জগদীশ মন্দিরের দিকে হাতজোড় করে একটা প্রণাম ছুড়ে দিয়ে যায়। আজ দূর থেকে সুকুলকে দেখে বুকটা কেমন করল। মাঠখানা বুকে নিয়ে ছোট্ট সুকুল দাঁড়িয়ে একা। বাবার জন্য চেয়ে আছে। মিথ্যে। বাবা কোথায় সুকুলের? তবে কি সবাই এরকম? সাঁঝবেলায় সন্ধের ঝুঁঝকো আঁধার যেমন স্বপ্নের সর তেমনি? বুকটা কেমন করল। জগদীশ আজ মাঠের মাঝখানে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল—কাছে যাই না মা, দোষ নিও না। তোমার মন্দিরের চারধারে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া। আমার যা হোক তা হোক, সুকুলকে দেখো। দ্যাখো না, অভাগা ছেলেটা পৃথিবীতে কীরকম একা। মাঠ বুকে করে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ওর কেউ না জানে না তাই। এই মোহ চিরকাল রেখো মা। জগৎসংসারে মোহ ছাড়া মায়া বাঁধে না।

কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে সাজপরা একখানা মুখ রোজই চেয়ে থাকে। লক্ষ্য করেছে জগদীশ। আজও করল। দেখি না দেখি না করে রোজ পেরিয়ে যায় জায়গাটা। যেমন পোড়ো জায়গা রামনাম করতে-করতে পেরোয় ভীতু মানুষেরা। জগদীশও পেরোয়। বন্ধনকে তার বড় ভয়। বাঁধা বাউণ্ডুলে ছিল সে। গাউস সাহেবের দলের সঙ্গে উজেন ভাঁটেন বয়ে যেত দেশ-দেশান্তরে। সেই জগদীশ এখন শিকড় ছেড়েছে মাটিতে ভুঁই, ঘর, ছেলে। তবু কিছুই তার নয়, সে জানে। সুকুল একটু বড় হোক, হাত-পা ঝেড়ে আবার সে বেরিয়ে পড়বে। সংসারে তার এই স্থিতি বড় অদ্ভুত। ভাবলে রাতের ঘুম চটে যায়। চোখে জল আসে। জগদীশ এই স্থিতি চায় না। সংসারে থিতোবার লোক আছে, সে সেই লোক নয়।

পেরিয়েই যেত জগদীশ। কিন্তু বাগড়া দিল কান্নার শব্দটা। তারা কাঁদছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে। সুকুলকে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে মেয়েটা। বোঝে জগদীশ সবই।

কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল জগদীশ। কান্না ব্যাপারটা ভালো না। বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

ঝোপের পাশে অবিরল ফোঁপানি। হেঁচকির মতো শব্দ হচ্ছে।

জগদীশ আস্তে করে বলল—ঠাকুর এসব দেখলে বড় রাগ করে। এ ভালো নয়।

ওপাশটা চুপ। ভীতু খসখসে একটা শব্দ হয়। শ্বাস চাপবার চেষ্টা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ ছোট্ট একটা প্রশ্ন উড়ে আসে—কেন?

জগদীশ বলে—মন চাইলেই কি সব হয়?

—কেন হয় না? আবার প্রশ্ন উড়ে আসে।

জগদীশ বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বলে—হয় না। মোনাঠাকুরকে জিগ্যেস করো, তিনিই বলবেন—হয় না।

ওপাশটা একটু চুপ করে থাকে, কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ ভারী ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে—আপনি ব্রাহ্মণ না?

জগদীশ হাসে—বামুন ঠিকই। হালদার বংশ। উপনয়নও হয়েছিল। শরীর খেলাতে গিয়ে সেই যে পৈতে ছেড়েছি, আর নেওয়া হয়নি।

—তবে বাধা কী?

জগদীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—বাধা অনেক। নীচু জাতে বিয়ে করেছিলাম বলে ব্রাত্যদোষ। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কী?

—সুকুলের বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। সতর্ক এবং বেদনার গলায় বলে জগদীশ। স্বরটা খুব নীচে নেমে আসে। তারপর মুখ তুলে বলে—ওই সন্দেহ নিয়ে যে-ই আমার ঘর করতে আসুক, আমি তাকে সইতে পারব না।

—আমি কিছু ভাবি না।

জগদীশ তবু মাথা নাড়ে—গাঁয়ে পাঁচটা কথা উঠবে। লোকে ঘোঁট পাকাবে। গোলমাল হবে। মোনা ঠাকুর খুশি হবে না—

—আপনি বাবাকে ভয় পান?

জগদীশ শ্বাস ছাড়ে, বলে—কে না পায়?

—তবে কী উপায় হবে?

—উপায় দেখছি না। বেঁচে থাকতে গেলে কিছু ছেড়ে কেটেই থাকতে হয়। অবস্থাটা মেনে নেওয়াই ভালো।

—যদি কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া যায়?

—উরেব্বাস!

—কেন, সর্বনাশ হয়ে যাবে নাকি?

—হবে। মাটির গন্ধ না পেলে আমি থাকতে পারব না। মাটির বড় মায়া।

—আপনার আবার মায়া-দয়া!

একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে আসে।

সুকুল এতক্ষণে বাপকে নিরিখ করছে। কোণাকুণি ছুটে আসছে ইঞ্জিনের মতো। জগদীশ বলল—যাই।

—আচ্ছা।

—এরকমভাবে থেকো না। লোকে দেখলে কী বলবে?

—আমি থাকব। রোজ। আমার ইচ্ছে।

জগদীশ মাঠের শূন্যতায় এগিয়ে গেল। দু-হাত বাড়ানো শূন্যতাকে ভরে দিয়ে সুকুল আসছে। আসছে।

ভারী সাপটাকে বয়ে আনতে কষ্ট গেছে খুব। পাকা সাপ, থলথলে চর্বি বোধহয় গায়ে, নয়ন ঝাঁপি খুলে দেখেনি। কিন্তু মাঝে-মাঝে ঝাঁকুনি দিয়েছে। অমনি ভেতর থেকে প্রবল শ্বাসের শব্দ পেয়েছে। দাঁতে দাঁত টিপে এক ধরনের হাসি হেসেছে সে। ভীতু একটা জ্বালাময় আনন্দ।

সন্ধ্যের বাসটা পেল নয়ন। পায়ের কাছে সারাক্ষণ ঝাঁপিটা সতর্ক পাহারা দিল, যেন পাহারা না দিলে মূল্যবান ঝাঁপিটা কেউ চুরি করে নেবে। মাঝে-মাঝে ঝুড়িটায় লাথি মারল। শ্বাসের শব্দ পেল। পাশে বসা একটা মানুষ একবার জিগ্যেস করল—কী আছে ওটাতে? নির্বিকার গলায় নয়ন জবাব দিল—একটা গোখরো সাপ।

—সাপ! লোকটা চমকে উঠে পড়ে, বলে—কী সাংঘাতিক!

মানুষজন তার দিকে কৌতূহলে তাকায়। ঝুড়িটা অনেকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

দূর-পাল্লার বাস বলে সিগারেট ধরালে কেউ কিছু বলে না। নয়ন কাউকে গ্রাহ্য না করে বাইরের দিকে চেয়ে সিগারেট ধরায়। তারপর একমনে সিগারেট টেনে যায়। বাইরে ভেতরে একটা তীব্র ছটফটানি তার। হাত-পা একভাবে রাখতে পারে না। এপাশ ওপাশ হয়। বিড়বিড় করে নিজেকে বলে—সব প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেলে ঘুম আসবে। ঠিক ঘুম আসবে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। সদর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কোন বাধা নয়। সদর দিয়ে সে কদাচিৎ বাড়িতে ঢোকে। আজও ঢুকল না। গলির দরজা টপকে ঢুকল। ঝাঁপিটার জন্য কষ্ট হল খুব। ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যাটা ভেতরে গজরাচ্ছে। কর্কশ দেওয়ালের ঘষাটায় কনুইটা ছড়ে গেল অনেকটা। কিছুই গ্রাহ্য করল না সে। ভেতরের দরজা খুলে দিল রাঁধুনি লোকটা। দরজা খুলে তাকে দেখেই সন্ত্রস্তভাবে সরে গেল। গলাখাঁকারি দিয়ে বলল—বাবুর বড় অসুখ।

—কার?

—বড়বাবুর।

—ও। বলে নির্বিকার ভাবে নিজের ঘরে গেল সে। সে থাক বা না-থাক তার বিছানা পরিপাটি পাতা থাকে রোজ। খাওয়ার ঘরে খাবার ঢাকা থাকে। এই নিয়ম করে রেখেছে মা। বেশি রাতে ফিরলেও কোনও অসুবিধে হয় না।

ঘরে ঢুকে ঝাঁপিটা যত্নে খাটের তলায় রেখে জামাটা খুলে শুয়ে সে সিগারেট ধরাল। কার অসুখ যেন বলছিল লোকটা!

উঠে আবার খাওয়ার ঘরে এল। বারান্দায় জল আর ঝাঁটার শব্দ!

—কার অসুখ বললে?

—বড়বাবুর।

—কী হয়েছে?

—কী জানি! অজ্ঞান মতো হয়ে আছেন কাল থেকে। মা বলেছে আপনি এলেই খবর দিতে।

দোতলায় সিঁড়ির তলায় একবার দাঁড়াল নয়ন। সিঁড়ির বাতি নেভানো। ওপরটা নিস্তব্ধ। সিঁড়ি ভাঙতে তার ইচ্ছে করছিল না। বাবার জন্য তেমন কিছু উদ্বেগও বোধ করল না সে। কোন দিনই করে না।

সিঁড়িতে গোটা দুই বেড়াল শুয়ে। একটুক্ষণ বেড়ালের ঘুম দেখল সে। বাবা এই রাতে মারা গেলে শ্মশান-ফশানে যাওয়ার ঝামেলা অনেক। ভেবে সে একটু বিরক্ত হল। মরেফরে যাওয়াটা যে সংসারে কেন আছে! এগুলো উঠে গেলেই ভালো।

আবার ঘরে এসে সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে জেগে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে বাতিটা জ্বেলে ঝাঁপিটা বের করে।

একটা কপিশ শরীর পাকে পাক জড়িয়ে আছে। দেখলে গা শিরশির করে। নিঝুম হয়ে পড়ে আছে সাপটা। হাতটা একবার বাড়াল নয়ন, তার হাতের ছায়া পড়ল সাপটার মুখে। সাহস পেল না সে, হাতটা আবার সরিয়ে আনল।

একটা স্কুটার ছিল নয়নের। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল বলে বাবা কিনে দিয়েছিল। সেই স্কুটারটা নয়ন চালাত ঝড়ের মতো। হালকা জিনিস, চিৎপুরে একবার রাস্তার গর্তে ঝাঁকুনি খেয়ে নিয়ে ওলটায়। দ্বিতীয়বার একটা ট্রামকে টপকে যেতে গিয়ে ভবানীপুরে একটা স্টেটবাসের পিছনে ভিড়িয়ে দেয় নয়ন। তিনবারের বার বর্ষাকালের জলে-ডোবা লাইব্রেরি রোডে সেটা পড়ে যায় আধখোলা ম্যানহোলের ভেতরে। জখমটা গুরুতর হয়েছিল। কালীঘাটের একটা গ্যারেজে দিয়েছিল, সেখানে আজও পড়ে আছে। আনা হয়নি। স্কুটার আর ভালো লাগে না নয়নের। যদি কখনও কেনে একটা স্পোর্টস কারই কিনবে নয়ন। বাবা মরে গেলে কিনতে কোন ঝামেলা হবে না। একটা সেকেন্ড হ্যান্ড এমজি স্পোর্টস্ কার দেখেও রেখেছে নয়ন।

স্কুটার যখন চালাত তখনকার একজোড়া চামড়ার দস্তানা আর গগলস্ আলমারিতে পড়ে আছে। নয়ন উঠে গিয়ে আলমারি খুলে দস্তানা জোড়া বের করে আনল। দস্তানাটা পুরু, দু-পাল্লা চামড়ার মাঝখানে তুলোর গজ ভরা। সে দুটো হাতে পরে নিল। তারপর সাপের ঝুড়িটার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। তেমনি নিঝুম পড়ে আছে সাপটা। মাথাটা ছোট্ট দেখাচ্ছে। কী করে ফণাটা মুহূর্তের মধ্যে অতটা চওড়া করে ফেলে।

নয়ন হাতটা বাড়াল। মাথাটার এক বিঘৎ দূরে হাতটা নিয়ে গেল সে। হাতের ছায়াটা নাড়তে লাগল সাপের মুখের ওপর। তারপর চকিতে আঙুল বাড়িয়ে একটা খোঁচা দিল সে। সাপটা নড়ল না। নড়লে কী হবে তা নয়ন ভাবে না। কাছাকাছি জগদীশ নেই, সে একা। তবু নয়ন আবার আঙুলের খোঁচা দিল। আবার।

চমকে মুখ তোলে সাপ। ছোট্ট মাথাটার দুপাশ ছড়িয়ে যায় হাতের পাতার মতো ফণা! শেকড়ের মতো ছোট্ট জিবটা বেরিয়ে আসে। বারবার, ঘন শ্বাসের শব্দ। একটু দোলে। ছোবল দেবে নাকি?

সাপটার উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটা দেখে নয়ন। চোখ ভরে দেখে। যা কিছুটা ভয়ংকর তা-ই তার প্রিয়। দস্তানা পরা হাতটা সন্তর্পণে বাড়ায় সে। কিছু বুঝবার আগেই সাপটা চাবুকের মতো মুখটা আছড়ে ফেলে নয়নের হাতের ওপর। দস্তানা পরা হাত, তাই কিছুই টের পেল না নয়ন। কিন্তু খুব চমকে গেল। সাপ যে কতটা গতিময়, কী মারাত্মক তার চকিত আক্রমণ তা টের পায়, এই গতিটাই নয়নকে ভারী অবাক করে। জগদীশ এব চেয়েও দ্রুতবেগে হাত বাড়ায়, এবং হাত সরিয়ে নেয়। নয়নকে শিখতেই হবে।

কিন্তু সাপটা আর ছোবল দেয় না। সে হয়তো নিজের বিষদাঁতহীন অক্ষমতা বুঝতে পারে। তাই মাথাটা নামিয়ে শরীরটাকে জলধারা মতো স্বচ্ছন্দে ঝুড়ির কানার ওপর দিয়ে টেনে মেঝের ওপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে চলতে থাকে। সাপটা যে কত বড় তা এই প্রথম বুঝতে পারে নয়ন, ফলে তার গায়ে কাঁটা দেয়।

সাপটা নয়নের দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রথমে আলনার তলা, তারপর আবার ঘুরে খাটের নীচের অন্ধকারে যেতে থাকে। নয়ন একটু স্তব্ধ থাকে। তারপরই দাঁতে দাঁত টিপে নিজের কাঁপা শরীরকে সামলে হাত বাড়িয়ে খাটের তলার অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। সাপটা আবার পাকে পাকে শরীর জড়াচ্ছে। সন্তর্পণে নয়ন হাত বাড়ায়। সাপটা মুখ তোলে, শ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে নয়নকে সতর্ক করে দেয়। নয়ন থেমে যায়। ওর দ্রুতবেগটাকেই নয়নের ভয়।

উদ্যত হাতটা বাড়িয়ে রেখেই নয়ন খর চোখে সাপটাকে দেখে। সাদা বুকটা তুলে, ফণা মেলে সাপটাও দেখে নয়নকে। নয়ন হাসে। তারপর নয়নের হাতটাই সাপটাকে অবিকল সাপের মতো ছোবল দেয়। গলার নীচে চেপে ধরে সাপটাকে হিঁচড়ে নিয়ে আসে সে। ছটফট করে সাপটা, সমস্ত শরীর আছড়ায়। নয়নের হাতটা পাকে পাকে জড়াতে থাকে।

হঠাৎ সমস্ত বুক পেটে জুড়ে একটা বমির ভাব আসে নয়নের। ঘেন্নায় শরীর রি-রি করে। সাপের ঠান্ডা শরীরের স্পর্শ তার হাতটাকে হিম করে দেয়। পাগলের মতো হাত ছুড়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দেয় ওটাকে, তারপর হাঁফাতে থাকে।

সাপটা মেঝেময় ছড়িয়ে কিলবিল করে। তারপর আবার ঝাঁপটার পাশ দিয়ে খাটের তলায় চলে যেতে থাকে।

নয়ন দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, দস্তানা খুলে গলায় আঙুল দেয়। বেসিনে উপুড় হয়ে হড়হড় করে বমি করে। টক-তেতো স্বাদ, শরীরটা কাঁপতে থাকে।

মুখে চোখে জল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে টের পেল, মাথায় ভয়ংকর যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। শরীরটা যেন বাতাস দিয়ে তৈরি, এমন হালকা লাগে।

দেয়াল ধরে ধরে ঘরে এল নয়ন। টেবিল হাতড়ে সোনেরিলের কৌটোটা বের করল। একসঙ্গে তিনটে কি চারটে—না গুণে মুখে নিয়ে জল দিয়ে গিলল। সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খেল।

একটা ঝিমুনির ভাব আসছে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। এক আধবার সাপটার কথা মনে হয় নয়নের। ভাবে উঠে গিয়ে ওটাকে ঝুড়িতে ভরে রাখা উচিত। কিন্তু শ্লেটের ওপর লেখা যেমন মুছে যায় তেমনি নানা হিজিবিজি চিন্তা স্বপ্নের মতো চোখের সামনে এসে যায়। সাপটার কথা খেয়াল থাকে না। হাতটা বিছানার বাইরে এলিয়ে পড়ে আছে, দু-আঙুলে ধরা সিগারেটটার ছাই লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, মাথা ভরতি স্বপ্ন, চোখ জুড়ে আসছে...

ঘুমিয়েই পড়ত নয়ন। দরজার মৃদু শব্দ শুনে চোখ কষ্টে খোলে সে।

—কে রে?

নতুন চাকরটা ঘরে উঁকি দেয়—দাদাবাবু বড়বাবুর অবস্থা খারাপ। মা আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

নয়ন প্রথমটায় বুঝতে পারে না, জিগ্যেস করে—কার অবস্থা খারাপ বলছিস?

—বড়বাবুর, আপনার বাবা মশাইয়ের।

—ও, মাথাটা একটু ঝাঁকায় নয়ন। তারপর উঠে বসে বলে—কী হয়েছে?

—কী জানি, অবস্থা কাল থেকেই খারাপ যাচ্ছে। খুব অসুখ। নয়ন উঠল।

খুবই ক্লান্ত লাগছে তার। সোনেরিল খাওয়ার পর শরীরটা একরকম নেশায় ভরে ওঠে। নড়া-চড়া ভালো লাগে না। তবু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে বাবার ঘরে এল সে।

খুব মৃদু নীল ঘুম-আলো জ্বলছে ঘরে। প্রকাণ্ড মেহগিনির পালঙ্কের ধারে টেবিল, তাতে ওষুধপত্র রাখা! পালঙ্কের নীচে সাদা বেডপ্যান, জলের বালতি। ঘরে ওষুধের গন্ধ। উঁচু বালিশে মাথা রেখে নয়নের বাবা শুয়ে। শরীরটা স্থির নয়। ডান পাটা ক্রমাগত নড়ছে, ডান হাতটা কপালের কাছে উঠে যাচ্ছে বারবার।

নয়ন দরজা থেকে তিন-চার পা হেঁটে বাবার বিছানার কাছে দাঁড়াল। শিয়রের কাছে মা বসে আছে। মা জিগ্যেস করল খেয়েছিস?

গলাটা ভাঙা, বোধহয় খুব কেঁদেছে মা, নয় তো ঠান্ডা লাগিয়েছে, মার কথার জবাব না দিয়ে নয়ন জিগ্যেস করে—কী হয়েছে?

—কী জানি, পরশু রাতে খাওয়ার আগে বাথরুমে গিয়েছিল, হঠাৎ দৌড়ে ফিরে এল,

কী যেন সব আবোল তাবোল বলল, শুয়ে পড়ল হঠাৎ। ডাক্তাররা তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না। তবে শিরা থেকে রক্ত নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে।

নয়ন বলল—জ্ঞান নেই?

—না তো। কোনও সাড়া দিচ্ছে না।

—নয়ন ভীত চোখ চেয়ে বলে—তবে ডান পাটা নড়ছে কেন?

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—কে জানে! ক্রমাগত নড়ছে। দিনরাত কামাই নেই। কী যে হবে। তুই খাসনি?

—না।

—খেয়ে নে।

—নিচ্ছি, রাতে তুমি জাগবে নাকি।

—না, নার্স রাখা হয়েছে। এক্ষুনি এসে পড়বে। তুই খেয়ে নে যা। ঘুম থেকে উঠে কোথাও যাস না সকালে, কখন কী হয়।

নয়ন বাবার দিকে একটু চেয়ে রইল। জ্ঞান নেই, সাড়া নেই, তবু দুটো অঙ্গ নড়ছে। ডান পা, ডান হাত, লক্ষণটা একটু চেনে নয়ন।

হঠাৎ জিগ্যেস করল—পিত্তের বমি হয়েছিল?

মা একটু থমকে গিয়ে বলে—হয়েছিল।

—কখন?

—একটু আগে। কেন?

নয়ন মার দিকে একটু চেয়ে রইল। আবছা আলোয় ভালো দেখা যায় না। শিয়রের কাছে খাটের বাজুতে পিছনে হেলে বসে আছে মা। শরীরটা মোটা, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তার ওপর মোটা, ভারী সব গয়না, আঁচলে আধকেজি ওজনের এক থোলা চাবি। এসব নিয়েই একটু পরে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে হবে। পরনে চওড়া পাড়ের শাড়ি, সিঁথেয় সিঁদুরের দাগে ঘা...নয়ন বাবার দিকে চেয়ে মনে মনে বলল—গুডবাই স্যার, আর দেখা হচ্ছে না তাহলে!

—যাচ্ছি।

মা জিগ্যেস করে—ওই বমি হলে কী হয়?

—কী আবার হবে?

—তবে জিগ্যেস করলি কেন?

—এমনিই।

—তুই তো ডাক্তারি একটু শিখেছিলি, বুঝিস না অবস্থাটা?

—আমার বোঝাবুঝি দিয়ে কী হবে, বড় ডাক্তার দেখছে যখন!

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে—যা খেয়ে নে।

নয়ন নেমে আসে। রাঁধুনি খাওয়ার ঘরে অপেক্ষা করছে। খাওয়ার টেবিলে আরও একজন বসে খাচ্ছে। কালোমতো একটি মেয়ে খুব সাধারণ চেহারা, রোগা, না তাকালে কিছু এসে যায় না। মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে শেষ কয়েকটি গ্রাস খাচ্ছিল।

নয়ন মুখোমুখি বসল। বলল—ব্যস্ত হবেন না, আস্তে খান।

মেয়েটা মুখ তুলে অপ্রতিভ গলায় বলে—আমি গেলে আপনার মা শুতে যাবেন। ওঁরও শরীরটা...

নয়ন একটু হাসে—শুয়ে আর কী হবে? রাত পোয়াবে না। নার্স মেয়েটা চুপ করে থাকে।

—খান।

মেয়েটা খায়।

রাঁধুনি প্লেটে খাবার সাজিয়ে আনে নয়নের জন্য। নয়ন একটু নাড়াচাড়া করে। দু-এক গ্রাস খায়, মেয়েটা উঠে যাওয়ার আগে একবার সন্তর্পণে নয়নের দিকে তাকাল। নয়ন একটু হাসল। বন্ধুত্বের হাসি!

আঁচিয়ে ঘরে এসে আরও দুটো সোনেরিল গেলে নয়ন। সিগারেট ধরায়। বিছানার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ তার সাপটার কথা মনে পড়ে। নীচু হয়ে খাটের তলাটা দেখে সে। নিঝুম হয়ে খাটের নীচের আবছায়ায় পড়ে আছে লক্ষ্মীছেলের মতো। নড়েনি।

নয়ন একটা হাই সামলায়! দস্তানা জোড়া খুঁজে হাতে পরে নেয়। তারপর খাটের তলায় হাত বাড়ায়।

বিরক্ত হয়ে ছিটকে ওঠে সাপটা। কিন্তু নির্বিষ অক্ষম তার আক্রোশ। মুহুর্মুহু কয়েকবার সে নয়নের হাতে মাথা কোটে। চুম্বনের মতো তা নয়নের হাত ছুঁয়ে যায়। নয়ন আর ভয় পায় না দ্বিধা বোধ করে না। হিংস্রতায় দুটি হাতে সে গলা টিপে সাপটাকে টেনে এনে মেঝেতে ছেড়ে দেয়।

সাপটা তার ফণা তোলে। নয়নের কোমর সমান সমান বা তার চেয়েও উঁচুতে। নয়ন সেই উদ্যত মুখে ঠাস করে চড় মারে। সাপটা ঢলে পড়ে আবার চিতিয়ে ওঠে। আক্রোশে রাগে হিংস্রতায় তাকে পরপর কয়েকটা চড় দেয় নয়ন। বলে শুয়োরের বাচ্চা, ঢোক্ ঝাঁপিতে, ঢোক্...তোর বাবা ঢুকবে...

বলে মাথাটা চেপে ধরে নয়ন মেঝেতে ঠুকে দেয়, লেজ ধরে তুলে প্রায় আছাড় মারে। কেন যে এই আক্রোশ তা বুঝতে পারে না সে, কিন্তু তীব্র জ্বালাময় আনন্দ বোধ করে। সাপটা কী বোঝে কে জানে! অবশেষে তাকে ঝাঁপিতে পাকিয়ে রাখে নয়ন। তার শ্বাস, জিব, চোখ—কোনও কিছুকেই গ্রাহ্য করে না।

ঝাঁপিটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তারপর খাটের তলায় সেটা ঠেলে দিয়ে বিছানায় বসে। সিগারেটটা আড় করে খাটের রেলিঙে রেখে দিয়েছিল। সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে কাঠ ধরে ফেলেছে। রেলিঙের কাঠ জ্বলে অনেকখানি, ধোঁয়াচ্ছে। সিগারেটটা তুলে নিয়ে খাটের পোড়া জায়গাটায় একবার আঙুল ঘষল নয়ন। আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানতে লাগল। শরীর জুড়ে ক্লান্তি নেমে আসছে অন্ধকারের মতো।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে নয়নের চোখে স্বপ্ন ভেসে বেড়ায়। সে জগদীশকে দেখতে পায়। একটা প্রকাণ্ড বাগানে ফুল তুলছে। বাঁ-হাতে একটা সাজি। ফুল তুলে সাজিতে রাখছে জগদীশ। কিন্তু সাজিতে রাখা ফুল সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে সাপ। সাজি থেকে অজস্র সাপের ফণা উঁচু হয়ে আছে। দেখতে-দেখতে অন্ধকারটা চলে এল। সোনেরিলের ঘুম।

বিকেলে বেরোবার মুখে শ্যামার বাবা ধুতি পাঞ্জাবির ওপর শালটা ঘাড়ে নিয়ে, হাতে চমৎকার লাঠিগাছটা একবার নামিয়ে বেরোতে যাচ্ছে সেই সময়ে কাণ্ডটা ঘটল।

বাইরের সিঁড়িতে পা রেখেছে মাত্র, সেই সময়ে দেখা গেল একটা লোক সিঁড়ির মুখেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে হাফশার্ট আর পরনে খাকি প্যান্ট, পায়ে কেডস। চোখমুখ ফোলা-ফোলা, চোখ লাল, মাথাটা জুতোমারা মাথার মতো উলোঝুলো। ধুলোটে। চুর-চুর মাতাল লোকটা শ্যামার কাকা তড়িৎ চৌধুরী। বংশের কুলাঙ্গার। পরিবারে এমন কেউ নেই যে তাকে না সমঝে চলে।

শ্যামার বাবা ভূত দেখার মতো চমকে সিঁড়ি থেকে পা তুলে নিল। মাতাল অবস্থায় না থাকলে তড়িৎ চৌধুরীকে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু এই অবস্থায় তার ভেতরকার সব জমে থাকা কথা ওগরায়। শ্যামার বাবা বুঝল তার ভাই এখন ওগড়াবে। সিঁড়ি থেকে পা তুলে

ভেতর চলে এল, সদরটা বন্ধ করতে-করতে টের পেল, তার হাত কাঁপছে, বুকে বেড়ে যাচ্ছে রক্তচাপ, মাথা ঝিমঝিম। দরজা বন্ধ করতে-করতেই শুনল মাতাল হারামজাদা চেঁচিয়ে বলছে—ওই যে শালা সরিৎ চৌধুরী দরজা দিচ্ছে, ওই যে শালা বেওয়া বিধবার জমি খাস দখল করেছে যে ব্যাটা...

চেঁচামেচিটা শুনতে পেল শ্যামাও। সোয়েটারটার শেষ কয়েকটা কাঁটা বোনা এখন বাকি। দিনরাত ক'দিন ধরে বুনছে শ্যামা। ফুলহাতা সোয়েটার, উঁচু গলা, তার ওপর প্যাটার্নটাও গোলমেলে—বড্ড পরিশ্রম গেছে। পিঠ টনটন করে, চোখে ঝাপসা দেখে, মাথা টিপটিপ ব্যাথা করে। তবু শেষ হয়ে আসছে বলে হাত থামায়নি শ্যামা। আজ রাতে বাবাকে পরিয়ে দেখবে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজের বিছানায় বসে সে বুনতে-বুনতে হঠাৎ চিৎকারটা শুনতে পেল। হাত কেঁপে একটা ঘর গেল পড়ে। কাকার গলা। দু-মাসে এক-একদিন কাকা এরকম মাতাল হয়ে আসে, বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, রাস্তার লোক পাড়ার লোক জড়ো করে গালমন্দ পাড়ে। সেইসব গালমন্দের কোনও মানে হয় না। কাকা লোকটা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে। বাঁধা মাইনে নয়। ফোলিওর ওপর কমিশন পায়। তার বউ থাকে বাপের বাড়িতে, কাকার বিধবা শাশুড়ি মেয়েকে নিজের বাড়িতে একখানা বারান্দা সমেত ঘর লিখে দিয়েছেন, পাছে সেটা ভাইরা বেহাত করে সেই ভয়ে। তা ছাড়া কাকার সঙ্গেও বনিবনা নেই, সেই বৌ স্কুলে চাকরি করে দুটো ছেলেমেয়েকে খাওয়ায়। কাকা গলা পর্যন্ত মদ গিলে যখন দুঃখবোধ করে তখন দাদার বাড়ির সামনে বা শ্বশুর বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচায়; শ্যামার বাবার অপরাধ টালিগঞ্জে যে জমিটায় বাড়ি তুলছে সেটা কাকার শাশুড়ির কাছ থেকে সস্তায় কেনা। খাটাল ছিল, সেটা তুলে দিয়েছে শ্যামার বাবা। কাকার বিশ্বাস জমিটা বাবা না কিনলে শাশুড়ি সেটা কাকার নামে লিখে দিত। এক সময়ে কাকার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে থাকত শ্যামারা, নয়নদের পাড়ায়। সে সময়ে কাকার সঙ্গে নয়নের খুব ভাব ছিল। আজও আছে কি না কে জানে। শ্যামা পরিষ্কার শুনতে পায় কাকা চিৎকার করে বলছে—আমার বউকে কানমন্তর দিয়ে ভেন্ন করেছে কোন শালা। ওই সরিৎ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করুন আপনারা। বুকে হাত দিয়ে বলুক ওই ব্যাটা আমার বৌকে বলেছে কি না—বউমা, মাতালটার ঘর কোরো না তুমি! বলেছে কি না...! পাপ করেছে বলেই ওর ছেলে পাগল হয়ে বেরিয়ে গেছে, ওর শান্তি আছে? শালা সাধুতান্ত্রিকের পেছনে পয়সা ঢালে, মায়ের পেটের ভাই আমি পেটে আলসার, হাতে বাত নিয়ে নুলো হয়ে যাচ্ছি, আমাকে একটা পয়সাও ছোঁয়ায় না...

পড়ে-যাওয়া ঘরটা সাবধানে কাঁটায় ফের তুলল শ্যামা। এখন আর বোনাটা এগোবে না। কাঁটা মুড়ে রেখে ওঠে শ্যামা। বাইরের ঘরে বাবা চেয়ারে বসে ঘামছে, পাশে দাঁড়িয়ে মা। পাখাটা পুরো জোরে ঘুরছে। রক্তচাপটা বিপজ্জনক সীমানাতেই ঘোরাফেরা করে বাবার। কখন যে সীমাটা ছাড়িয়ে যায় শ্যামার সেই ভয়!

শ্যামা একটু হেসে বলে—বাবা, অমন করছ কেন? কাল তো আমরা মুরগি খাচ্ছিই।

কাকা যেদিন গালমন্দ করে তার পরদিন সকালে মুরগি হাতে এসে বাবার পায়ে পড়ে। তারপর কেটে কুটে বাড়ির পাশের গলিটায় স্টোভ জ্বেলে নিজেই রান্না করে। নুন ছাড়া খানিকটা তুলে রাখে বাবার জন্য! মা খায় না, বাকিটা কাকা আর শ্যামা খায়। ওটাও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কাকা গাল দিলে পরদিন মুরগি হবেই।

—আর মুরগি! বাবা, অসহায়ভাবে মুখখানা তুলে বলে। শ্বাস ছেড়ে বলে—কী পাপে যে ওর শাশুড়িব জমিটা কিনেছিলাম!

মা ঝাঁঝ দিয়ে বলে—কেন কিনে দোষটা কী করেছ শুনি! ঠাকুরপোর শাশুড়ি জমিটা তো বেচতই।

বাবা লালচে মুখখানা তুলে বলে—বেচত তো বেচত! আমি নিমিত্তের ভাগী না হোলেই হত। ভেবে দ্যাখো, আমার বাড়ি করার তো কোনও অর্থ নেই। আমরা বুড়োবুড়ি চোখ বুজলে ও বাড়িতে থাকবে কে?

মা হঠাৎ চুপ করে বাবার দিকে সোজা একটু চেয়ে থাকে, তারপর জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে চোখ, খ্যাপাটে গলায় বলে—বাড়িতে থাকবে কে! কেন আমার টোকন ফিরবে না ভেবেছ? তোমার ধারণা কি যে আমার টোকন নেই? অ্যাঁ!

বাবা ইতস্তত করে বলে—সে কথা বলিনি। আঃ তুমি বড্ড কথা ঘোরাও, বলছিলাম কি—

—তোমার কথা আমি সব বুঝি।

শ্যামা নিঃশব্দে গিয়ে সদরের ছিটকিনিটা খুলল। মা বাবা ঝগড়া করছে, তাই লক্ষ করল না।

রাস্তায় বিকেলের ভরভরন্ত আলো। কাকা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, তার চারধারে লোক জমেছে। ও ধারের পার্কে খেলা হচ্ছিল। খেলা ভেঙে এসেছে কয়েকটা ছেলে, জুটেছে কিছু ভবঘুরে, কিছু ঝি-চাকর শ্রেণির লোক। কাকা শ্রোতা পেয়ে ডিঙ মেরে যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলছে—শালা আমার বউকে যেমন ভেন্ন করেছে তেমনি ওর বউ-মেয়েও ভেন্ন হবে। আমার শাশুড়িকে ভজিয়ে যে জমি দখল করে বাড়ি তুলেছে সেখানে ইঁদুর বাদুড় ঘুরবে, শকুন পড়বে...

কাকা যখন এরকম অবস্থায় এসে চেঁচায় তখন শ্যামাদের বাড়ির কেউই বাইরে বেরোয় না। তাদের ভয় করে। তবু বাবার প্রেসারের কথা ভেবে ক্ষণেকের জন্য শ্যামা ভয় ভুলে গেল। বারান্দায় রেলিঙ থেকে ঝুঁকে ডাকল—কাকা।

কাকা তখন স্বরচিত একটা ছড়ার মতো অনর্গল বকে যাচ্ছে—এই, আমি তড়িৎ চৌধুরী ওই শালার মায়ের পেটের ভাই, কিন্তু আমার শালা গো—ভাগাড়ে ঠাঁই। আই হ্যাভ এ পুওর বেলি, মনের দুঃখে মদ গিলি। মশাইরা...বলতে-বলতে শ্যামার ডাক শুনে তড়িৎ চৌধুরী ব্রেক কষে তাকাল। তাকিয়েই রইল শ্যামার দিকে, মুখখানা একটু হাঁ করে। তারপর বলল—কী বলছিস?

—ভেতরে এসো।

—না।

—না কেন? যা বলার বাবাকে মুখোমুখি বলো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

আলবাৎ চেঁচাব। তোর বাবাকে বেরিয়ে আসতে বল। বলে তড়িৎ চৌধুরী শ্যামার দিকে পিছন ফিরে আবার চেঁচাতে শুরু করে—মশাইরা শুনুন...ওই যে আমার ভাইঝি শ্যামা ও নয়ন নামে একটা ছেলেকে ভালোবাসে...ডিপ লাভ, ভেরি ডিপ লাভ...কিন্তু চামার সরিৎ চৌধুরী তবু বিয়ে দেবে না। কারণ কী জানেন? ছেলেটা তেলি...হাহা...তেলি! তেলি আবার কী মশাইরা, অ্যাঁ! মানুষ মানুষ, তার আবার তেলি বামুন কিছু আছে নাকি আজকাল? মেয়েটা ভেতরে-ভেতরে শুকিয়ে একদিন মরবে, ছেলেটা আত্মহত্যা করবে দেখবেন। ওই যে আমার ভাইঝি, ওই শ্যামা, ওটার বিয়ে হবে না...

রাস্তার লোকেরা শ্যামার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে শ্যামা সেটা বুঝতে পারে। লজ্জায় অপমানে ঝাঁ-ঝাঁ করে তার মুখ। দেওয়ালের আড়ালে সরে আসে শ্যামা। মুখ লুকিয়ে পালিয়ে আসে ঘরে। থরথর করে তার শরীর কাঁপে।

আধঘণ্টাটাক চেঁচিয়ে কাকা চলে গেল। নিঃঝুম হয়ে গেল বাড়িটা। রাতে তারা কেউ ভালো করে খেতে পারল না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বাবা জিগ্যেস করে—

তড়িৎ নয়নের কথা কী বলছিল রে?

শ্যামা মাথা নত করে বলে—কী জানি।

বাবা চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে—নয়ন ওকে মদ টদ খাওয়াচ্ছে হয়তো। শ্যামা, খুব সাবধানে থাকিস। আমি শিগগিরই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

মা ঝংকার দেয়, পাত্র কোথায় যে বিয়ে দেবে?

—আমি সেই ডাক্তার ছেলেটার কথা ভাবছিলাম। বাবা বলে—ছেলেটা বড় ভালো ছিল। আশায় আনন্দে হঠাৎ ভেতরে-ভেতরে শিউরে ওঠে শ্যামা। মা মুখখানা পাথরের মতো করে বলে—সন্নিসি-টন্নিসির সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। শ্যামার বুকটা অন্ধকার হয়ে যায়।

বাবা মিনমিন করে বলে—নয়ন যদি তড়িৎকে হাত করে থাকে তবে বড় ভয়ের কথা। তড়িৎ মদ খেলে তো যা তা বলে, শ্যামার নামেও বলবে এরপর থেকে। তাই ভাবছি—

—তাই বলে যার তার হাতে মেয়ে গছিয়ে দিতে হবে নাকি।

—যে সে তো নয়! বিলেতফেরত বড় ডাক্তার, মতি ফিরলে একদিন লাখ টাকা কামাবে—

—কামাক। তবু বলব, ও ছেলে অপয়া। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক ছিল সে মেয়েটা দুম করে মরে গেল, সেটা ভুলো না। তার ওপর ভাবের পাগল লোক, ওদের কি বিশ্বাস আছে?

—তবে তুমি কী করতে বলো?

মা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে—কী বলব? আমার কি মাথার ঠিক আছে। এ সময়ে টোকনটা কাছে থাকলে আমি এত ভাবতাম না। বলে মা চোখে একটু আঁচল চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর বলে—যার তার হাতেই যদি মেয়ে দেবে তো বরং নয়নের হাতেই দাও না কেন!

—কী বলছ এ সব?

—ঠিকই বলছি। অনেক ভেবে দেখেছি। জাতে ছোট তাতে আর আজকাল তো কিছু আটকায় না। মেয়ে নিজে থেকে ছোট জাতে রেজিস্ট্রী করে এলে কী করতে? ফেলে দিতে? তাই বলছি, নয়ন তো উকিল বাবুর ছেলে, বিস্তর টাকা পয়সা। ছেলেটা শ্যামার জন্যই কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে গেল, নইলে সেও তো ছাত্র ভালোই ছিল, ডাক্তারি সেও পড়ত। বিয়ে না দিলে সে ছেলে হাঙ্গামা করবে না? হয়তো কি ছোরা মারবে, কি আরও কত কাণ্ড করতে পারে—তাই বলছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে চল আমরা নিশ্চিন্তে টোকনকে খুঁজতে—

শ্যামা পাত ছেড়ে উঠে যায়।

মায়ের কাছে টোকনই সব, শ্যামা কেউ না—এই সত্যটা ভাবতে-ভাবতে শ্যামা রাতে বিছানায় অন্ধকার মশারির বাইরের মশার শব্দ শুনতে-শুনতে খানিকক্ষণ জেগে রইল। খুব দূরের একজন মানুষ শ্যামার স্মৃতিতে ক্রমে আবছা হয়ে আসছে। সেই মানুষটির জন্য এক উন্মুখ পিপাসা আজও আছে। থাকবে কি?

শ্যামা পাশ ফিরে শোয়। ফাঁকা বিছানার একটা ধারে একদিন একজন মানুষ জায়গা নেবে। কে সে? নয়ন? নয়নের কথা ভাবতেই শ্যামার শরীরটা কেমন কুঁকড়ে যায় অনিচ্ছায়। তবু যদি নয়নই হয়? হায় ঈশ্বর! শ্যামার ভেতরে এক প্রকৃতিদত্ত প্রতিরোধ আর অনিচ্ছা নয়নের প্রতি ফণা তুলে আছে। মায়ের কথাটা ভাবে শ্যামা। অভিমানে চোখে জল চলে আসে।

ভোর রাতে শ্যামা শুনতে পায়, বাইরে একটা ময়না পাখি ডাকছে। চমৎকার কথা বলে পাখিটা। প্রথমে 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ' বলে ডাকল, তারপর বলল, 'ওঠ, ওঠ, চোর এসেছে',

আধঘুমের মধ্যে আলস্যভরে শুনছিল শ্যামা। চমৎকার ডাক শিখেছে পাখিটা। তারপরই ভয়ঙ্কর চমকে ওঠে সে। শুনতে পায়। পাখিটা তার জানলার কাছ ঘেঁষে ডাকছে—'শ্যামা, শ্যামা তোমার চিঠি, তোমার চিঠি...তারপর পাখিটা চুপ করে যায়।

নয়নপাখি!

শ্যামা উঠল না, কিন্তু সম্পূর্ণ জেগে শুয়ে রইল।

সকালবেলায় শ্যামা নয়নের চিঠিটা পেল শিয়রের জানালা খুলে। জানালার বাইরের খাঁজে সাদা খামের চিঠিটা পড়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামা চিঠিটা হাতে নিল। নয়ন যতক্ষণ বেঁচে আছে, মুক্তি নেই।

চিঠিতে লেখা—চৌরাস্তায় একবার এসো। না এলে সারাদিন বসে থাকব। মনে রেখো। সারাদিন।

শ্যামা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল।

সময় নিল শ্যামা। অনেকক্ষণ। ভাবল খানিক। তারপর বেলা বাড়লে তাঁতের সাদা খোলের একটা শাড়ি পরে, চুলটা আঁচড়ে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

চৌরাস্তায় গাছতলার পশ্চিমের চায়ের দোকানটার পাশে নয়ন দাঁড়িয়ে হাতে চায়ের ভাঁড়। শ্যামাকে দেখে ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে হাসল দূর থেকেই।

ওর ঝাকড়-মাকড় চুলে একটা সবুজ পাতা খসে পড়েছে। আটকে আছে পাতাটা। অদ্‌ভুত দেখাচ্ছে নয়নকে। তীব্র, তীক্ষ্ণ জ্বালাধরা চেহারা। সুন্দর নয়, কিন্তু ওর দিকে দুবার তাকাতে হয়। চলন্ত রাস্তা ওর পিছনে, মানুষজন ব্যস্তভাবে যাচ্ছে, একটা ট্যাক্সি উড়ে গেল, বাস দাঁড়াল সেই চলন্ত দৃশ্যকে পিছনে রেখে নয়ন দাঁড়িয়ে, চুলে সবুজ একটা পাতা। গা-টা শিরশির করে শ্যামার। ভয়? হবেও বা।

—কী চাও নয়ন?

নয়ন মাটিতে রাখা একটা ঝোলা বাঁহাতে তুলে নিল। বলল—ওদিকে একটা কবরখানা আছে না?

—মসজিদ।

—মসজিদই হবে। সেখানে মাঠটা নির্জন। চলো।

—কেন?

—কথা আছে।

—কথা শেষ হয়ে গেছে নয়ন।

নয়ন অকপট হাসি হাসে। বলে—দূর, কথা কি শেষ হয়? শোনো শ্যামা, আমার খুব একটা সময় নেই। বাবা বোধহয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে। মারা গেলে অনেক ঝামেলা। আমাকে দেরি করিও না। বলে নিই। চলো।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নয়ন হাঁটতে থাকে।

শ্যামা তার পিছনে।

মাঠটা আজও ফাঁকা। রোদ পড়ে আছে।

—তোমার বাবার কী হয়েছে নয়ন?

—সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিস। আশা নেই।

—তাহলে তুমি এখানে কেন? এখন তো তোমার বাড়িতে থাকা উচিত।

—উচিত! ঠিকই তো। কিন্তু তোমার জন্য একটা জিনিস বয়ে এনেছি অতদূর থেকে, না দেখিয়ে যাই কী করে? তা ছাড়া লাভ কী? বাবার জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলেও আমাকে তার কিছু বলার ছিল না, বা আমার কিছু শোনার ছিল না। আমরা এক বাড়িতে থাকতাম,

এই মাত্র।

—তবু তুমি যাও। তোমার মায়েরও তো একজন সহায় চাই এ সময়ে!

—তুমি আমাকে যা হোক বলে তাড়াতে চাইছ শ্যামা। আমি তো বলছি, কাজ হলে যাব। আমার বাবার জন্য দুঃখ পেও না শ্যামা, আমি পাই না। যারা মরবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকে তারা কাউকে মরতে দেখলেও স্থির থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যায়।

শ্যামা শ্বাস ফেলে বলে—এ তো যে কেউ নয়। তোমার বাবা।

নয়ন একটু বিরক্ত হয়ে বলে—তুমি বড় সেকেলে শ্যামা। বাবা বাবা বাবা! বাবা তো কী? বাবা তো একটা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক চিহ্নিতকরণের অভিধা মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। তাই কেউ বাবা তুলে গাল দিলে আমার কোন রি-অ্যাকশন হয় না।

নয়ন নীচু হয়ে চাদরের গিঁঠ খুলল। ঝাঁপিটা বের করে ঘাসের ওপর রাখল সযত্নে! শ্যামার দিকে চেয়ে হাসল।

শ্যামা ঝাঁপিটা দেখে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। নয়ন পকেট থেকে চামড়ার দস্তানা বের করে দু-হাতে পরে নিল।

—ওটাতে কী আছে নয়ন?

নয়ন খুব খুশির হাসি হাসল—সাপ। একটা গোখরো সাপ শ্যামা।

বলেই চকিতে ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে নিল।

কপিশ একটা শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। গায়ের ঝকঝকে আঁশে রোদ চলকে ওঠে।

শ্যামা দু-পা পিছিয়ে আসে—নয়ন। বলে আর্তস্বরে ডাকে।

—ভয় নেই শ্যামা।

শ্যামা এক অদ্ভুদ চোখে নয়নের দিকে তাকায়। পরমুহূর্তে সাপটার দিকে।

—তুমি পাগল।

সাপটা একটু অনড় রইল। তারপর আস্তে তার পিচ্ছিল শরীর পাক ছাড়তে থাকে। ঝাঁপির কাণার ওপর দিয়ে মুখ বের করে। তারপর হড়হড় করে নেমে আসতে থাকে ঘাসে, মাটিতে। আসছে তো আসছেই, শরীরের যেন তার শেষ নেই।

শ্যামা একটা চাপা চিৎকার করে প্রথমটায় মুখ ঢাকল, তারপর হঠাৎ ঘুরে দৌড়তে লাগল। কিন্তু পারল না। অভ্যেস নেই তার ওপর শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে।

নয়ন দৌড়ে এসে তার বাঁ-হাত চেপে ধরে বলে—দোহাই, ভয় পেও না। আমি তো আছি। দ্যাখো—

বলে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নয়ন দৌড়ে ফিরে গেল। সাপটা ততক্ষণে সর সর করে দেওয়ালের ইটের খাঁজের দিকে অনেকটা চলে গেছে। নয়ন দৌড়ে গিয়ে দস্তানা পরা আনাড়ি হাতে সাপটার ঘাড় চেপে তুলে আনল। লকলকে সাপটা মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে ছোবল দিতে চেষ্টা করে। একটুর জন্য পারল না। নয়ন ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে নির্জীব করে দিয়েছে।

শ্যামার দিকে চেয়ে নয়ন হাসে—বিষদাঁত নেই।

শ্যামা বিশাল চোখে চেয়ে থাকে।

আর সেই চোখ দু-খানা মুগ্ধ হয়ে দেখে নয়ন। ঠিক এরকমটাই সে চেয়ে এসেছে এতকাল। এরকম বিস্ময় মাখানো মুগ্ধ চোখে শ্যামা তাকে চেয়ে দেখবে।

ঝাঁপির ভেতরে মুখটা ঢোকাতেই সাপটা আপনা থেকেই অভ্যস্থ পাকে জড়িয়ে নিঃঝুম হয়ে যায়। ঝাঁপিটার ঢাকনা বন্ধ করে দিল নয়ন।

—কাল সারা রাত ধরে ওটাকে নিয়ে প্র্যাকটিশ করেছি। শিখে যাব শ্যামা।

শ্যামা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর জিগ্যেস করে—কী শিখে যাবে?

—ধরা। কিছু না। জগদীশ খুব চাল নিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা একদম সোজা।

—জগদীশ কে?

—একজন। সাপ ধরে। ওস্তাদ লোক, কিন্তু শেখাতে চায় না।

—তুমি সাপ ধরতে শিখেছ? কেন?

—তোমার জন্য।

শ্যামা বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলে—আমার জন্যে?

—তোমার জন্যই। তোমাকে চমকে দেব বলে। দিইনি।

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলল—দিয়েছ। অনেকদিন আমি এমন চমকাইনি।

শিশুর মতো খুশিতে হাসে নয়ন। ওর রগ-ওঠা, চোখ-বসা মুখখানা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তার মাথার চুলে এখনও সবুজ পাতাটা লেগে আছে। সে আস্তে করে বলে—শ্যামা, আমি সব পারি। সব।

—নয়ন, তুমি বাড়ি যাও।

—কেন?

—তোমার বাবার কাছে যাও।

নয়ন একটু চমকে বলে—ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম। যাচ্ছি শ্যামা। বলে তাড়াতাড়ি চাদরটা দিয়ে ঝাঁপি বাঁধে নয়ন। বাঁধতে-বাঁধতেই মুখটা তুলে বলে—শ্যামা, তুমি ঠিক যেমন চাও আমি ঠিক তেমনটি হব। দেখে নিও। আমাকে সময় দাও শুধু।

শ্যামার একটু মায়া হয়। আবার ভয়ও। সেই পুরোনো কথা নয়ন আজও বলে যাচ্ছে।

—সাপটাকে কোথাও ছেড়ে দিও নয়ন।

নয়ন একটু হাসে—কেন শ্যামা? আমার জন্য ভয় পাচ্ছ?

—পাচ্ছি।

—ওটার বিষদাঁত নেই।

—গজাবে।

নয়ন একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবে, তারপর বলে—তখন দেখা যাবে।

শ্যামা আস্তে করে বলে—নয়ন, এরকম পাগলামি করছ কেন? আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য এতটা করার কোনও মানে হয় না।

নয়ন হি-হি করে হাসে—এবার যদি আমাকে বিয়ে না করো শ্যামা, তবে একদিন তোমার ঘরে এটা চুপ করে ছেড়ে দিয়ে আসব।

—তা হয় না নয়ন।

—কী হয় না?

—তোমার সঙ্গে বিয়ে।

—কেন?

—আমি তোমাকে ভালোবাসি না।

—সে কথা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু তোমাকে বাসতেই হবে।

—কাঙালপনা করতে তোমার ঘেন্না হয় না?

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামা মনস্থির করে বলে—নয়ন, আমি আর একজনকে ভালোবাসি।

নয়ন চমকে যায়। চেয়ে থাকে। শ্যামা অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়।

নয়ন অবাক গলায় বলে—শ্যামা, এরকম কথা আগে কখনও বলোনি। তোমার অনেক

ফ্যান, বহু ছেলে ঘুরেছে তোমার পিছনে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে।

—নয়ন, আমি সত্যি বলছি।

—লোকটা কে?

—তুমি চিনবে না, সে দূরের লোক।

—তবু শুনি। কী করে সে?

—ডাক্তার।

—ডাক্তার? নয়ন শুকনো জিব ঠোঁট দিয়ে চাটে। তারপর আকুল গলায় বলে—কয়েকটা বছর সময় আমাকে দাও শ্যামা, আমি ডাক্তারি পাস করব। দিনরাত পড়ব।

—আমি ডাক্তারটাকে ভালোবাসি না। মানুষটাকে।

—সে কেমন মানুষ বলো। আমি হুবহু তার মতো হব।

শ্যামা ম্লান একটা হাসে। বলে—বাড়ি যাও নয়ন। বাবার কাছে যাও। সাপের ঝাঁপিটা হাতে নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, দৃশ্যটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শ্যামা। তারপর ঝাঁপিটার ভেতর মৃদু একটা শ্বাসের শব্দ হয়।

উকিলবাবুর জ্ঞান আর ফেরেনি।

সাপের ঝুড়ি ঝোলায় নিয়ে যখন ফিরল নয়ন তখন বেলা এগারোটা। বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফুল এবং মালা হাতে কয়েকজনকে দেখা গেল। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ। কেবল ওপরতলায় মা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে একরকম কান্না শব্দ বের করছে মাঝে-মাঝে।

নয়ন শান্তভাবে তার ঘরে চলে গেল। সাপের ঝুড়িটা সাবধানে রাখল খাটের নীচে, একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে রইল একটুক্ষণ। কিছুক্ষণ সে তার বাবার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। পারল না। হাল ছেড়ে সে শ্যামার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, তাও পরিষ্কার মনে পড়ল না। শ্যামার বদলে নার্স মেয়েটির মুখখানা ভেসে উঠল চোখে। একটু হাসে নয়ন। ঘুমহীন চোখজোড়া জ্বালা করে। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসে চোখে। চোখ বোজে। তারপর ক্লান্তিহর ঘুমের কথা ভাবে কাঙাল নয়ন। সে কবে একটু ঘুমোবে সোনেরিল না খেয়ে?

চাকরবাকররা উঁকি দিচ্ছে। ডাকতে সাহস পায় না কেউ। নয়ন আধবোজা চোখে দরজার পরদার কয়েকটা ছায়ার আনাগোনা দেখল। তারপর উঠল ধীরে-সুস্থে। একবার ওপরে যাওয়া দরকার! শ্মশানেও যেতে হবে। এ সময়টায় সে কলকাতায় ন' থাকলেই ভালো হত।

ঠাকুরটা ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে। খবরটা নয়নকে দেওয়ার জন্য চোখমুখ উদগ্রীব। সব মানুষেরই এই একটা দুর্বলতা থাকে, খবরটা ভালো হোক বা মন্দ হোক, সবার আগে সে খবরটা পৌঁছে দিয়ে সে একধরনের তৃপ্তি বোধ করে। যেন একটা কম্পিটিশনে জিতে গেছে। ঠাকুরটার মুখে চোখেও সেই রকম উত্তেজিত ভাব। নয়ন বেরোতেই সে কাছে এসে বলে—বাবু, বড়বাবু নেই—

নয়ন একটু বিস্ময়ের ভান করে বলে—নেই? কোথায় বেরিয়েছে? এত বেলায়?

চাকরটা খাওয়ার টেবিলে ন্যাতা বোলাচ্ছিল। আসলে ন্যাতা বোলানোটা কাজ নয়, নিজেকে মোতায়েন রেখেছে ওইখানে, নয়ন বেরোলে খবরটা দেবে, কিন্তু নয়নের কথা শুনে চালাক চাকরটা ফিক করে একটু হেসে সামলে গেল, বলল বেরোননি। মারা গেলেন একটু আগে।

নয়ন গম্ভীর চোখে চাকরটাকে একটু দেখল। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল চাকরটা।

নয়ন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিল—আমার ঘরে এর মধ্যে কেউ যেন ঝাঁট ফাঁট দিতে

না যায়, দেখিস। ঘরে আমি একটা গোখরো সাপ পুষছি। কেউ যদি ঢোকে টের পাই তবে জুতিয়ে কিন্তু বাড়ি থেকে বের কবে দেব।

ঠাকুরটা সভয়ে ঘাড় নাড়ে।

নয়ন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। অনেক লোক জমেছে ওপরতলায়। বার লাইব্রেরি থেকে তার বাবার বন্ধুরা এসেছে, মক্কেল এসেছে, আর আত্মীয়-স্বজন। ফুল আর ধূপকাঠির গন্ধে টেঁকা যায় না। নয়নকে দেখে মা আর একবার শ্বাসকষ্ট চেপে কাঁদবার চেষ্টা করে। কিন্তু তেমন কোনও শব্দ হয় না। দু-একজন বুড়ো বয়স্ক আত্মীয় নয়নকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে অনিচ্ছার সঙ্গে। তারা নয়নকে চেনে। দু-একটা কথা বলে তারা চুপ করে যায়, বৃথা জেনে।

কিন্তু নয়নের মুখে একটা বিষাদের ভাব ফুটে ছিল ঠিকই, সে তার ক্লান্তির জন্য। ঘুমহীন জ্বালাধরা চোখের কোলে কালি, ভাঙা মুখে শিরা-উপশিরা, পিঙ্গল এলোমেলো ধুলোটে চুল। নার্স মেয়েটা খাটে শোয়ানো দেহটার মাথা এবং বুক জুড়ে বার লাইব্রেরি থেকে পাঠানো একটা প্রকাণ্ড ফুলের মালা সাজিয়ে রেখে নয়নের কাছে এগিয়ে এল। বলল—আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন।

নয়ন একটু হাসতে গিয়ে হাসল না। বলল—মাথাটা বড্ড ধরেছে। আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ওইরকম কিছু আছে?

—না। আমি ওসব রাখি না।

—তবে কী আছে?

মেয়েটা একটু ইতস্তত করে বলে—কী চাই বলুন, কাউকে ডেকে আনিয়ে দিই।

নয়ন একঘর লোকের চোখের সামনেই মেয়েটির দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলল—অ্যাসপিরিন না থাকে, ক্লোরোফিল বা ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন, কিছু নেই? নাথিং?

মেয়েটা বোবার মতো ঘাড় নাড়ে।

নয়ন দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলে—শ্মশান পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে।

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন নির্ভাবনায় বলে—কেন কষ্ট হবে জানেন? শ্মশানে যাওয়ার সময়ে কেউ আজ কথা বলবে না। একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার তো। কিন্তু অতদূর রাস্তা চুপ করে মুখবুজে যাওয়া ভারী কষ্টের। আমি এখন অনেক কথা বলতে চাই।

মেয়েটার চোখে মুখে ক্রমশ ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। নয়ন তা লক্ষ করে। আস্তে করে বলে—আপনি যাবেন না শ্মশানে?

—আমি! আমি কেন যাব?

—গেলে দোষ কী? আমি বরং একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করি। ডেডবডি নিয়ে শ্মশানে বন্ধুরা যাবে। আমরা ঘুর পথে অন্য রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাব। শ্মশানে যাচ্ছি বলে মনেও হবে না, গল্প করতে-করতে যাওয়া যাবে। চলুন না।

—না। মেয়েটা মাথা নাড়ল। তারপর খাটের কাছে ফিরে গেল আবার।

ফ্ল্যাশলাইট লাগানো ক্যামেরা হাতে দুজন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে নয়ন বারান্দায় বেরিয়ে এল। মরেই গেছে লোকটা, তবু তার ছবি কেন যে তুলে রাখে মানুষ! মরা মানুষের ছবিতে মানুষটা চিরকাল মৃতই থেকে যাবে।

বারান্দায় বাতাস আর রোদ খেলা করছে। রেলিঙে দুটো চড়াই। 'কিচিক কিচিক' শব্দ করে লাফিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আসছে। খেলছে। অন্যমনেই নয়ন আপনা থেকেই শব্দটা গলায় তুলে আনল। ডাকতে লাগল '—কিচিক্—চি-র্-র্-র্—কিচিক্—'

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল। নয়ন স্নান করেনি। আদিগঙ্গার এক হাঁটু কাদায় নেমে এক কোষ ময়লা জল তুলে মাথায় চাপিয়েছিল। ফেরার সময়ে ইচ্ছে করেই দলছুট হয়ে একা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ চা আর গোটা কয় সিঙারা খেল। তাতেই বুক জুড়ে অম্বল উঠল ঠেলে। শরীরটায় একটা জ্বালাভাব। সারাটা দিনের রোদ, চিতার আঁচ, ধোঁয়া—সব মিলিয়ে চড়চড় করছে গায়ের চামড়া।

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে ঠান্ডা জলে স্নান করে নয়ন। কোরা কাপড় পরে খাওয়ার ঘরে এসে দেখে নার্স মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ। চুল আঁচড়ানো, পায়ে চটি।

—চলে যাচ্ছেন? নয়ন জিগ্যেস করে।

মেয়েটি সামান্য একটু হাসে, বলে—যাচ্ছি। তবে আপনার মায়েরও নার্সিং দরকার তাই কাল সকালে আবার আসব।

নয়ন হাই তুলে বলে—রাতে নার্সিংয়ের দরকার হয় না বুঝি?

—হবে না কেন? রাতের শিফটের নার্স এসে গেছে। বলে মেয়েটি হাসল, তারপর নয়নকে ভীষণ চমকে দিয়ে বলল—এই নার্সটি কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে।

নয়ন একটু বোকা বনে গিয়েছিল। এতটা আশা করেনি। একটু থমকে গিয়ে বলে—আচ্ছা!

মেয়েটা চলে যায়।

ঘরে এসে নয়ন কয়েকটা ঘুমের বড়ি গিলে পড়ে থাকে।

তার বাবা কত টাকা রেখে গেছে তার হিসেব নয়ন রাখে না। তবে অনেক টাকা, অনেক। নয়নের বাকি জীবনটা কিছু না করলেও এসে যাবে না। তার বাবা ছিলেন উকিল মানুষ। আয়কর ফাঁকি দিতে ওস্তাদ লোক। ব্যাঙ্কের লকার, মায়ের গয়না, লুকানো টাকা—সব কিছুর হিসেব নয়ন বোধহয় কোনদিনই বের করতে পারবে না। কলকাতায় আরও একটা বাড়ি আছে তাদের, হাজারখানেক টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাবা মাঝে-মাঝে শাসিয়ে বলত বটে, সব সম্পত্তি উইল করে ভারত সেবাশ্রম সঙঘকে দিয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবিক সেটা করার মতো যথেষ্ট মানসিক জোর তার ছিল না। নয়ন জানে, তার বাবা তাকেই সব দিয়ে গেছে। তার এক দাদা আছে। দীর্ঘকাল আগে সেই দাদা আপন পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিল ভালবেসে। বাবা তাই তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছিল। সেই দাদা বাইরে ভালো চাকরি করে। তাকেও শেষ পর্যন্ত বাবা কিছু দিয়ে গেছে কি না কে জানে। সেই দাদা হয়তো কিছু দাবি-দাওয়া করতে পারে। করুক, নয়নের তাতে কিছু যায় আসে না, সে যে নিজে বেশ কিছু টাকা পয়সা হাতে পাবে। এই খবরটা যথেষ্ট।

ভাবতে-ভাবতে সোনেরিলের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায় নয়ন। তারপর স্বপ্ন দেখে। মোনা ঠাকুরের কালীমূর্তি জ্যান্ত হয়ে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে। জগদীশকেও দেখা যায়, মাফলারের বদলে গলায় এক সাদা সাপ জড়িয়ে খুব কাশছে। এমনি পাগলাটে খ্যাপাটে সব স্বপ্ন।

সোনেরিলের ঘুম নয়নের বেশিক্ষণ থাকে না। ওষুধটা তাকে আজকাল আর তেমন ধরছে না। রোজ খায় বলেই বোধ হয়। মাঝরাতে নয়নের ঘুম ভাঙল। ঘরের বাতিটা জ্বলছে, পায়ের দিককার জানালা খোলা। ভীষণ ঠান্ডা আসছে। বিছানার চাদর তুলে নয়ন মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট খেল। রাতটাই অসহ্য, কিছু করার থাকে না।

জানলাটা বন্ধ করে নয়ন সাপের ঝুড়িটা বের করে। দুহাতে চামড়ার দস্তানা পরে ঢাকনাটা খোলে। সাপটা ঘুমোচ্ছে। দেখে নয়ন ভারী হিংসা বোধ করে। সাপটাকে খোঁচাতে আঙুল উঁচিয়েছিল নয়ন। তারপর আবার সাবধানে ঢাকনা চাপা দিয়ে ঝুড়িটা খাটের তলায়

ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পায়চারি। তারপর একঘেয়ে এই জেগে থাকা থেকে মুক্তি পেতে সোনারিলের কৌটোটা টেবিলের ওপর খুঁজতে লাগল। আর হঠাৎ তখনই মনে পড়ল নার্স মেয়েটি বলে গিয়েছিল, রাতের শিফটে নার্স দেখতে সুন্দর। মনে পড়তেই নয়ন আপনমনে একটু হাসে!

সিঁড়ি বেয়ে বেড়ালের মতোই নিঃশব্দে উঠে আসে নয়ন। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। সে মৃদু টোকা দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে মিহি মেয়ে গলার প্রশ্ন আসে—কে?

দরজাটা খুলুন।

পায়ের শব্দ ভেতরে দরজার কাছে আসে। নয়ন উত্তেজনা বোধ করে।

—আপনি কে? প্রশ্ন আসে।

—আমি নয়ন।

—নয়ন কে, আমি চিনি না।

—এ বাড়ির ছেলে। আমার মাকে দেখতে এসেছি।

—ও।

পরমুহূর্তেই ছিটকিনির শব্দ। দরজা খুলে যায়।

সুন্দর! না, মোটেই না। ভারী হতাশ হয় নয়ন। বড্ড রোগা মেয়েটি। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে। দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েলি রোগে ভোগে। ম্যালনিউট্রিশন। ক্যালোরি খায় না। প্রোটিন নেই। ভিটামিন সি-এর অভাব। তবু মেয়ে।

মেয়েটি দরজা ছেড়ে দিয়ে বলে—উনি ঘুমোচ্ছেন।

—কে? নয়ন বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করে।

—আপনার মা। আপনি তো মাকে দেখতেই এসেছেন।

—ওঃ, হ্যাঁ। থাক ঘুমোচ্ছে যখন ঘুমোক।

—চিন্তা নেই। উনি সামলে উঠেছেন।

নয়ন হাসল। বলল—আসলে আমার বাবা আর মার মধ্যে রিলেশনটা তেমন ভালো ছিল না। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না।

মেয়েটা কথা বলল না। অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে রইল।

নয়ন জিগ্যেস করে—আপনি কী করছেন?

—তেমন কিছু না। অ্যালার্ট থাকছি, যদি কিছু দরকার হয়।

—বোরিং লাগছে না?

—আমার অভ্যাস আছে।

—তা তো আছেই। তবু বড় একঘেয়ে। আমারও ভীষণ ইনসোম্‌নিয়া। একা জেগে থাকতে যে কী কষ্ট।

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন বলে—চা খাবেন?

—চা?

—চা। আমি নিজে করব, তারপর দুজনে গল্প করতে-করতে খাব। আসুন না নীচের খাওয়ার ঘরে।

মেয়েটা ইতস্তত করে।

নয়ন মৃদুস্বরে বলে—মা নিশ্চয়ই ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোচ্ছে?

—না। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।

—তবে জাগবে না। নিশ্চিন্তে আসুন।

নয়ন পিছু ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চটপট সিঁড়ি ভেঙে নীচে আসে। চায়ের সরঞ্জাম সাজানোই থাকে খাওয়ার ঘরে নয়নের জন্য। ঘুমহীন রাতে সে উঠে কখনও কখনও চা করে খায়। দুকাপ জল চাপিয়ে নয়ন খাওয়ার টেবিলে এসে বসতে না বসতেই মেয়েটি এল। মায়ের ঘরের অল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যায়নি। এখন দেখল নয়ন, মেয়েটির মুখশ্রী খুব খারাপ নয়। দাঁতগুলো একটু উঁচু, নাক ভোঁতা, তবে চোখ দু-খানা ভালোই। সিঁথিটায় সিঁদুর থাকতে পারে। নয়ন সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মেয়েটি অবাক চোখে নয়নকে দেখছে। হয়তো ভয়ও পাচ্ছে। যে লোকটার বাবা আজ সকালে মারা গেছে তার এমন সহজ ভাব দেখেই হয়তো বিস্ময়।

নয়ন চায়ে চামচ নাড়তে-নাড়তে মেয়েটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসে, বলে—বাবার সঙ্গে আমার রিলেশনও ভালো ছিল না। উই ওয়্যার মিউচুয়াল এনিমিজ।

মেয়েটা চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে ঠিক করতে পারে না।

নয়ন বলে—কিন্তু তবু বাবার কয়েক লাখ টাকা আমিই পাব।

মেয়েটা ভ্রূ তুলে সামান্য কৌতূহলের গলায় বলে—কয় লাখ? নয়ন ঠোঁট ওলটায়—কে জানে। বিশ-ত্রিশ লাখ হতে পারে! দশ-বারো লাখও হতে পারে। বাবার অঢেল ব্ল্যাক মানি ছিল।

—টাকাটা পেয়ে কী করবেন? নয়ন চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসতেই মেয়েটি জিগ্যেস করল।

—কী করব! কী আবার, ওড়াব।

—ওড়াবেন মানে? ওড়াবেন কেন?

—এত টাকা নিয়ে আর কী করা যায়। চাকরি করব না, ব্যাবসা করব না, কিছু করার দরকার হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বেকার সমস্যা নেই। আমার সমস্যা সময় নিয়ে। আয়ুর লম্বা সময় জেগে থেকে কাটিয়ে দিতে হলে টাকা ওড়ানো ছাড়া কী করা যাবে।

মেয়েটা ঠিক বুঝল না, একটু সময় নিয়ে বলল—জেগে থেকে কেন বলছেন?

—আমার ইনসোম্‌নিয়া। বড্ড কষ্ট। ঘুম হয় না। সেই নির্ঘুম সময়টায় আমি চলে যাব রাতের ক্লাবে—যেখানে সারা রাত নাচ-গান হয়, একটা গাড়ি কিনে সারা রাত ধরে চালাব রাস্তায়-রাস্তায়। মাইনে করা লোক রাখব যারা সারা রাত আমার সঙ্গে জেগে থেকে তাস, দাবা খেলবে, গল্প করবে। একটা প্রোজেক্ট মেশিন কিনে সারা রাত ফিল্‌ম ঘুরিয়ে ছবি দেখব।

সোনেরিলে আজকাল আর ঘুম তেমন হয় না। সব ওষুধেরই ইম্‌মিউনিটি আছে ভয় হয়, এরপর আর ঘুমের ওষুধে কাজই হবে না। সারাটা জীবন জেগে থাকতে হবে।

মেয়েটা ডান গালে একটা আঙুল ছুঁইয়ে বসে তাকিয়ে আছে। খুব অবাক দৃষ্টি। একটুও ঠাট্টার ভাব নেই মুখে। সিরিয়াস ধরনের মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে বলল—অনেক সময় সেরেও যায়।

—কীরকম? নয়ন কৃত্রিম আগ্রহ দেখায়।

—একটা মেয়েকে চিনতাম যে ঘুমোত না বলে তার স্বামী তাকে সেতার কিনে দেয়। সারা রাত ধরে মেয়েটা আলাদা একটা ঘরে বসে সেতার বাজিয়ে সময় কাটাত। প্রথমে টুং টাং করতে-করতে আস্তে-আস্তে সে সুর বুঝতে শেখে। সেতারের প্রাণটাও সে একদিন ধরতে পারে। সারা রাত ধরে সে সেতারে ডুবে থাকতে শিখল। এইভাবে ক্রমে সে সেতারের শব্দ পার হয়ে সুরের নিস্তব্ধ জগতে পৌঁছে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে সেতার থামিয়ে চুপ করে ঝুম হয়ে বসে থাকত। সে আমাকে বলছিল, ওইভাবে বসে থেকে সে এক নিস্তব্ধতার সুর

শুনতে পেত। শুনতে-শুনতে সে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নয়ন হাসল—এ তো গল্প।

—গল্প নয়। তবে গল্পের মতোই! মেয়েটা সেরে গেছে।

—সত্যি?

—সত্যি।

টেবিলের ওপরের মসৃণ খয়েরি সানমাইকায় ধীর গতিতে নয়নের হাতটা এগিয়ে যায়। নয়ন লোল হেসে বলে—আমি যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে আমার একটা শর্ত হবে।

—কী শর্ত?

—সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হবে। দিনের বেলায় সে যত খুশি ঘুমিয়ে নিক, কিন্তু রাতে, রোজ রাতে আমাদের বাসর জাগা। কেউ বোধহয় রাজি হবে না, না?

—হতে পারে।

—কে হবে! আমি জানি মেয়েরা রাত বারোটার বেশি জাগতে ভালোবাসে না। তারা বড় ঘুমকাতুরে।

বলতে-বলতে নয়ন হাত বাড়ায়। মেয়েটা একটা হাতে মাথার ভর রেখে হেলে বসেছে। নয়ন ভঙ্গিটা দেখল। চওড়া টেবিল প্রায় অতিক্রম করেছে তার হাত। সে হাতখানা তোলে ফণার মতো।

—আপনি পারবেন না?

—কী? মেয়েটা চমকে উঠে বলে।

ঝপ করে ছোবল দেয় নয়নের হাত। উত্তপ্ত ব্যাকুল হাতে মুঠোর একরাশ বকুলের নরম করতল। পিষে ফেলে নির্যাস নিংড়ে নিতে-নিতে বিকৃত ভয়াল গলায় বলে—আমার সঙ্গে জেগে থাকতে। রোজ। পারবেন না?

লক্ষপতির সঙ্গে জেগে থাকতে কোন মেয়ে রাজি নয়? এ মেয়েটিও হয়তো রাজি হত। কিন্তু নয়নেরই দোষ। সে যা চায় তার জন্য সময় দেয় না। মেয়েটা 'ছাড়ুন ছাড়ুন' বলে চাপা গলায় চিৎকার করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। হাঁপায়। চেয়ার টেবিলের ঘোর শব্দ ওঠে নিশুত রাতে। চাকর বাকর জেগে যাবে। তাই নয়ন আর চেষ্টা করে না। মেয়েটা দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।

নয়ন ঘরে গিয়ে সাপের ঝুড়িটা টেনে আনে। ঝাঁপি খুলে দস্তানা পরা হাত এগিয়ে টেনে তোলে সাপটাকে। মুখোমুখি ভয়ঙ্কর দুজন দুজনের দিকে তাকায়। তারপর শুরু হয় আক্রমণ। এবং প্রতি আক্রমণ। রাত ভোর হয়ে আসে।

দিনের বেলায় আবার চমৎকার বোধ করে নয়ন। ঘুমের জন্য তার একটুও দুঃখ হয় না। শরীরটা হালকা লাগে। চায়ের সঙ্গে গোটা দুই অ্যাসপিরিন গিলবার পনেরো মিনিট পর আধকপালে মাথা ধরাটাও ছেড়ে গেল।

খবরের কাগজ অনেকদিন দেখা হয়নি। আজ খাওয়ার টেবিলের ওপর কাগজটা পড়ে আছে দেখে তুলে নিল। বরাবর সে খেলার পাতাটা আগে দেখে। খুলে দেখল, দিলীপ ট্রফির একটা আঞ্চলিক খেলা চলছে ইডেনে আজ দ্বিতীয় দিন।

কিছু না ভেবেই নয়ন পোশাক পালটাল। জলপাই রঙের প্যান্ট, লাল জামা, গলায় রঙিন সিল্কের মাফলার, চওড়া বেল্ট, চোখে রোদ-চশমা। বেরিয়ে সে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনল। দোকানের আয়নায় নিজের ধারাল চেহারাটা দেখল একটু। দেখতে-দেখতে শিস দিল। দু-হাতে চুলগুলো চেপে ঠিক করে নিচ্ছিল, সে সময়ে লক্ষ করল দোকানদার মহাদেব তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মহাদেব বলল—বাবু, কাল তো

বড়বাবু মারা গেলেন।

—হ্যাঁ মহাদেব। আপশোশের ব্যাপার। নয়ন গলায় যথেষ্ট দুঃখ ফোটাতে চেষ্টা করে।

—তো ইটা আপনার কী পোশাক হল? ই সময়ে কেউ প্যান্ট পরে? নোত্তুন কাপড় পরে তো!

ঝাঁৎ করে ভুলটা ধরতে পারে নয়ন। কখন যে বে-খেয়ালে কোরা কাপড়টা ছেড়ে অভ্যাসবশত রোজকার মতো প্যান্ট শার্ট পরেছে তা বুঝতেই পারেনি। ভুল হয়ে গেছে বড়। পাড়ার চেনা লোকেরা অবশ্যই দেখেছে এই পোশাকে! নয়ন জিভ কাটল।

ভুলটা শোধরাতে নয়ন তাড়াতাড়ি পাড়ার রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আসে। অচেনা মানুষজনের মধ্যে এসে স্বস্তি বোধ করে। ট্যাক্সি ধরে বড় রাস্তায়। শোকের পোশাকটা ভুল করে ছেড়ে ফেলেছে ঠিকই। তবু ট্যাক্সিতে বসে ভুলটার জন্য আবার ভালোই বোধ করতে থাকে সে। একজনের মৃত্যুর ঘটনা আর একজনের পোশাকে বিজ্ঞাপনের মতো ঝুলিয়ে রাখার মানে হয় না। নয়নের মুখে তো লেখা নেই যে গতকাল তার বাবা মারা গেছে! স্বাভাবিক পোশাকে সে বরং বেশ সহজ বোধ করতে থাকে।

মাঠে সে সাইট স্ক্রিনের পাশে গ্যালারিতে উঠে বসে। বেশ ভিড়। ভিড়ে কেউ কারও চেনা নয়। নয়ন অলস ভঙ্গিতে বসে খেলা দেখে।

ইস্ট জোন্-এর সাত নম্বর খেলোয়াড় সেঞ্চুরি করবে বলে কেউ ভাবেনি।—কিন্তু সারাটা সকাল ঠুকে ঠুকে খেলে ছেলেটা নব্বুইয়ে যখন পৌঁছে গেল তখন প্রথম খেলাটায় কিছু উত্তেজনা বোধ করে নয়ন। একটু ঝুঁকে বসে। ছেলেটা একটা ওভার মেডেন দিল। তারপর পরপর দুটো চার মেরে এবং একটা রান নিয়ে পৌঁছোল নিরানব্বইয়ে। সারা মাঠে উত্তেজনা, চিৎকার। শক্ত পাল্লার সাউথ জোনের সঙ্গে এমন হাড্ডাহাড্ডি ব্যাটিং কেউ আশা করেনি। নয়ন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল—রান—ওঃ একটা রান—

—বসে পড়ুন—পেছন থেকে কে চেঁচাল। তারপর জামা ধরে টানল নয়নের। নয়ন শুধু গায়ে পড়া আরশোলা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে পিছনে হাত নিয়ে অচেনা হাতটা ঝেড়ে ফেলল।

লাঞ্চের আগে শেষ ওভার। পাঁচটা বল পাঁচটা বোমার মতো। সাত নম্বর ব্যাটসম্যান মাঠের চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গেছে। স্কোরবোর্ডটা দেখে নিয়ে পরপর পাঁচটা বল ঠেকিয়ে দিল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। খেলছে না। পারছে না।

—ওঃ একটা রান! নয়ন চেঁচায়। তার দেখাদেখি আশপাশের হাজার হাজার জন গ্যালারিতে উঠে দাঁড়াতে থাকে। 'বসে পড়ুন' চিৎকার করতে করতে বসা লোকেরা দাঁড়িয়ে ওঠে। মাঠের মাঝখানে একটা রানের জন্য প্রার্থনারত ছেলেটা ছয় নম্বর বলটা খেলতে পারল না। বোল্ড।

—খানকির বাচ্চা! শালা! পাগলের মতো চেঁচাল নয়ন মাথার চুল চেপে ধরে। তারপর আবার চেঁচাল—'ইয়ে' করগে বাঞ্চোৎ...

বাচ্চা একটা ছেলেকে নিয়ে এক বাবা সামনের বেঞ্চে বসে। ভদ্রলোক নয়নের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকায়। নয়ন সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার চোখে তার নিজের চোখ ফেরত দেয়। লোকটা আস্তে-আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তার টিফিনের বাক্স খোলে।

লাঞ্চ।

নয়ন গ্যালারি থেকে অনেকটা নীচুতে চ্যানেলে লাফ দিয়ে নামে। আধকপালে মাথাধরাটা আবার শুরু হয়েছে। সারাক্ষণ মুখে রোদ, মাথায় উত্তেজনা, নাকে ধুলো। মাথা ধরতেই পারে।

গ্যালারির নীচে ছায়া বাঁশের বেড়া দেওয়া খাবারের দোকানে ভিড়। এক কাপ চায়ের

জন্যে নয়ন একটু ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু শান্তভাবে, ঠেলাঠেলি না করেও কোথাও চা পাওয়ার উপায় নেই। খিদে-তেষ্টায় পাগল হয়ে মানুষেরা হামলে পড়ছে।

কিন্তু নয়নের একটু চা বড় দরকার।

বাঁশের চৌখুপি ঘেরা দোকানটার কাছে গেল নয়ন। গায়ে-গায়ে লোক দাঁড়িয়ে। হাজারটা হাত দোকানির দিকে বাড়ানো। 'এই আমারটা—আমার এক কাপ চা, দুটো কাটলেট' এইসব চিৎকারে একটা দাঙ্গার মতো ভাব। মানুষেরা খেপে আছে। তপ্ত, শুষ্ক মানুষ। এক্ষুনি ফাটবে। বাইরের দোকানের চেয়ে দ্বিগুণ দামের খাবার। আর চা-পয়সা বাড়িয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। তিনটে পশ্চিমা দোকানদার নাজেহাল হচ্ছে। দিশেহারার মতো সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

নয়ন শান্তভাবে কনুই দিয়ে একটা মাড়োয়ারিকে সরিয়ে বাঁশের বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। উঁচু কিন্তু ঠান্ডা গলায় বলল—এক ভাঁড় চা—

কথাটা কোথাও পৌঁছল না, যে লোকটা প্রকাণ্ড কেটলি থেকে চা ঢালছে সে নয়নের কাছ থেকে দু-বিঘৎ দূরে মাত্র। নয়ন আবার আগের মতোই চেঁচিয়ে বলল—চা—

লোকটা শুনল না। পিছন থেকে মাড়োয়ারিটা নয়নকে সরানোর চেষ্টা করছে শরীরটা ঠেলে সামনে এগিয়ে দিয়ে। নয়নের গলার স্বর ডুবে যাচ্ছে চারদিকের চিৎকারে।

নয়ন তৃতীয়বার বলল—চা—আ—আ—

তার বাড়ানো হাত শূন্যে রইল। মাথা ধরাটা ফিরে আসছে। বাড়ছে। মাথার ভেতরে চমকে উঠেছে রগ।

অনেক দিন আগে শিয়ালদার বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ছাত্র ধরা পড়েছিল। সেই থেকে একটা ছাত্র হাঙ্গামার সূত্রপাত। নয়ন তখন হিন্দু স্কুলে শেষ ক্লাসে পড়ে হাঙ্গামা শুনে বেরিয়ে এসেছিল। শিয়ালদার কাছে ছাত্ররা রাস্তা আটকে ট্রামে-বাসে আগুন দিচ্ছে তখন। পুলিশ ছিল না। নয়ন তখন একদল ছাত্রের সঙ্গে ভিড়ে গেল। এগারোটা ট্রাম সরাসরি দাঁড়িয়ে। তার শেষ দুটোতে আগুন দিয়েছিল নয়ন। একাই লাফিয়ে উঠেছিল ট্রামে, যাত্রীদের শাসিয়ে নেমে যেতে বলেছিল। একভিড় লোক মেড়ার মতো সুড়সুড় করে নেমে গেল। আর নয়ন ব্লেড দিয়ে সিটের খোসা ছাড়িয়ে ছোবড়া বের করে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেনেটোলা লেনের মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—শিয়ালদার আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাচ্ছে এগারোটা ট্রামগাড়ি।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ দেখতে পেল নয়ন।

আর একবার একটা ফিলমের রিলিজের দিন ভারতীতে হাউসফুল। লবিতে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে টিকিট না পেয়ে। যদি কেউ বাড়তি টিকিট বিক্রি করে এই আশায়। সেই সময় একটি চশমাপরা ভালমানুষ মেয়ে টিকিট ফেরত দিতে এলে একরাশ লোক মেয়েটাকে ছেঁকে ধরে। প্রায় ত্রিশজনের ভিড়ের মধ্যে দুটো টিকিট মুঠোয় ধরে কান চেপে দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে চেয়েছিল। কাকে টিকিট দেবে ঠিক করা তখন তার পক্ষে অসম্ভব। বহুলোক পাঁচ-দশ টাকার নোট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চিৎকার করছিল—'আমি দশ দেব', 'আমি পাঁচ দেব', আমি আগে ওকে ধরেছি। নয়ন দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে এগিয়ে যায়। দু-চারজনকে হিঁচড়ে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। তারপর একপলক চিন্তা না করে বিনা দ্বিধায় মেয়েটির কনুই চেপে ধরে একটু জোরের সঙ্গে ভিড়টা কেটে বেরিয়ে আসে। বিশ-ত্রিশজন বোকার মতো চেয়ে দেখে। নয়ন লবির এক কোণে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে যথার্থ দামে টিকিট দুটো নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিল। কেউ একটিও কথা বলেনি। বরং দু-একজন শ্রদ্ধা প্রশংসার চোখে তার দিকে চেয়ে দেখেছিল।

নয়ন আর চেঁচাল না। চেঁচিয়ে লাভ নেই। চা-ওলা লোকটা এই ভিড়ে নয়নকে আলাদা

করে চিনবে না। চেনাতে হলে কিছু করতে হবে। ভিড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নয়ন জানে।

বাঁশের বেড়াটা কেউ ডিঙোয়নি ভদ্রতাবশত। নয়ন এক পলকও দ্বিধা না করে বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। চোখের নিমেষে চা-ওলার হাত থেকে কেটলিটা কেড়ে নিল। ঝুড়ি থেকে একটা ভাঁড় তুলে চা ঢালতে লাগল।

বাইরে লোকেরা একটু সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বুঝল, অরাজকতার ইঙ্গিত, লুটের গন্ধ। পরমুহূর্তেই হাজারটা মানুষ পার হয়ে আসতে লাগল বাঁশের বেড়া। মড়মড় করে বাঁশের বেড়া ভেঙে পড়ার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ, লাফিয়ে পড়ার শব্দ। ইতর একপাল ছেলে কাটলেটের থালাটা কয়েকটা থাবায় উড়িয়ে নিল, চপের ঝুড়ি থেকে কে একমুঠো ছুড়ে দিল শূন্যে। কেকের বয়ামটার দিকে বাড়ানো হাতগুলো খাবলা মেরে দলা পাকানো কেক তুলে নিচ্ছে মুঠো ভরে। কে একজন চেঁচিয়ে বলছে, 'শালা হারামিরা তিনগুণ দাম নেয়। লোট্ শালাদের মেরে তক্তা করে দে।' তিনটে পশ্চিমা বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর লুট আর লুট।

নয়ন ভিড় ছেড়ে কষ্টে বাইরে এল। এক ভাঁড় চায়ের অর্ধেক তখনও তার হাতে ধরা। একটু দূর থেকে সে লুটের দৃশ্যটা দেখল দাঁড়িয়ে। তারপর ভাঁড়টা ছুড়ে ফেলে গ্যালারির ছায়া পার হয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। খেলা দেখতে আর ইচ্ছে করছিল না তার।

কাকা মুরগি নিয়ে এল ঠিকই, পরদিন নয়। এল দিন পনেরো পর। হাতে প্রকাণ্ড পা-বাঁধা লালমুরগি, অন্তত এক কেজি মাংস হবে। অন্যহাতে মিষ্টির বড় বাক্স। সঙ্গে ঝাঁকামুটের মাথায় প্রকাণ্ড ঝুড়িতে আনাজপাতি। মহার্ঘ নতুন ফুলকপি, বড় বেগুন থেকে শুরু করে ঘিয়ের কৌটো পর্যন্ত। কাকার পরনে ফিনফিনে ধুতি। পাঞ্জাবি। একেবারে বরকর্তা। মুখে অপরাধী হাসি।

বাইরের ঘরে শ্যামার বাবা বসেছিল। রবিবারের সকাল দশটা। শ্যামার বাবার হাতে খবরের কাগজ, পাশে চা। ছোটভাইকে ঢুকতে দেখে একটু তাকাল। জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে একবার বলল—এত সব! কী ব্যাপার? আর কোনও কথা হল না। কোনদিনই কথাবার্তা তেমন হয় না। হলেও কাকার মাতলামি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় বাবা। আজও ব্যাপার দেখে আবার খবরের কাগজে চোখ নামিয়ে নিল।

জিনিসপত্র রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে কাকা মাকে বলল—বউদি, একটা কথা আছে।

—কী কথা?

—বলছি। বলে কাকা এসে শ্যামার ঘরে উঁকি মারে।

মুখ বাড়িয়ে বলে—উনুনটা ধরা তো শ্যামা।

ঘর গোছাচ্ছিল শ্যামা, মুখ ফিরিয়ে কাকাকে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—কেন?

—তুই ধরা তো। কেন, সে খাওয়ার সময়ে বুঝবি।

শ্যামা মুখখানা ভার রেখেই বলল—এত সব কিনে এনেছ কেন? এমনিতে তো বলো তোমার পয়সা নেই।

কাকা একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলে—নেই তো নেই তা বলে মাঝেমধ্যে একটু খাওয়া দাওয়া করব না! গরিবেরা তো খেয়েই মরে।

শ্যামা একটু খর গলায় বলে—পয়সা পাও কোথায়?

কাকা একটু থমকে যায়। সকলেই জানে, শ্যামা নরম মেয়ে, তার গলায় ঝাঁক খুব কম শোনা যায়।

কাকা থমকে থাকে একটু, তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে—যেখান থেকেই পাই তাতে তোর কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

—কোথা থেকে পয়সা পাও সেটা আগে বলো নইলে ওসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমরা খাব না।

—তুই না খাস খাওয়ার লোক আছে। চেঁচাস না।

—আমি চেঁচাব। ওসব এ বাড়িতে কেউ খাবে না, তোমার লজ্জা করে না, নিজের দাদা ভাইঝি সবাইকে জড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়ার লোকের কাছে যা তা বলে যাও! নিজেকে কী ভাব তুমি? তোমাকে বাবা মা ভয় পেতে পারে, আমি পাইনা। তুমি ওসব নিয়ে চলে যাও।

—কী বললি! বলে কাকা তড়পাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তড়িৎ চৌধুরী মুখটা তেমন খোলে না। কথা হারিয়ে যায়। মদ খেলে হুড়-হুড় করে কথা আসে। তবু কাকা তোতলাতে-তোতলাতে বলে—তোর বাড়ি যে বের করে দিবি? আমার দাদার বাড়ি—

রান্নাঘর থেকে মা উঠে এসে দুজনের মাঝখানে পড়ে। তড়িৎ চৌধুরীর পিঠে হাত রেখে বলে—এস ঠাকুরপো, আমি তোলা উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। শ্যামা, তোর না আজ কমলাদের বাসায় যাওয়ার কথা! যা, ঘুরে আয়।

—যখন সময় হবে যাব। তুমি কাকাকে চলে যেতে বলো।

—ছিঃ কী সব বলছিস!

তড়িৎ চৌধুরী স্তিমিত গলায় বলে—শুনছেন বউদি, শ্যামার কথা! সেই ছোট্ট নরম-সরম শ্যামা আর নেই। আজকাল ভোটটোট দেয়, বয়স্থা হয়েছে—বলে একটু ম্লান হাসবার চেষ্টা করে কাকা।

—হয়েছিই তো। বেঁচে থাকলে সকলেরই বয়স হয়। একমাত্র তোমারই বয়সবুদ্ধি হয় না। কোন আক্কেলে তুমি রাস্তার লোকের কাছে নয়নের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কথা বললে? আমি তোমার ভাইঝি না? ও বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে, কে বলেছে তোমাকে যে নয়নের সঙ্গে আমার ভাব?

—চুপ কর শ্যামা! মা ধমক দেয়।

কিন্তু শ্যামার চুপ করার মতো অবস্থা নয়। তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে। জ্বলজ্বলে চোখে সে মার দিকে চেয়ে বলে—তুমি জানো না, এ সবই নয়নের কারসাজি। এত জিনিসপত্র এ সবই নয়ন পাঠিয়েছে। জিগ্যেস করো।

—নয়ন। ভারী অবাক হয় কাকা—নয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? কী যা তা বলছিস!

—ঠিকই বলছি। তুমি চলে যাও।

মা কাকার পিঠে হাত রেখে ঠেলে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে-যেতে বলে—ও পাগল মেয়ে! তুমি চলো তো ঠাকুরপো, কী কথা বলবে বলছিলে যে!

একা ঘরে শ্যামা দাঁড়িয়ে থাকে। নিঃঝুম।

গোলমাল শুনে বাবা উঠে এসেছিল। আবার ফিরে গিয়ে একটা প্রেসারের ট্যাবলেট খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। বাড়িটা আবার চুপচাপ হয়ে যায়। যেন কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে।

শ্যামার জানলার পাশেই বাড়িতে মেথর আসবার গলি। সেইখানে বসে কাকা মুরগি কাটল। ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে গামছা পরে নিয়েছে। মুরগিটার 'ক-কঁ' ডাক, তারপরই ডানা ঝাপটানোর শব্দ পায় শ্যামা।

গলিমুখো রান্নাঘরের জানলা দিয়ে মা কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

—শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে তো দেরি আছে? মা জিগ্যেস করে।

—দেরি কী! আজকাল একমাস অশৌচ আর কে মানছে? গতকালই শ্রাদ্ধ চুকে গেল। পনেরো দিনে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—তা উকিলবাবু রেখে-টেখে গেল কেমন?

—পাঁচ-সাত লাখ তো শুনছি সাদা টাকাই। পাঁচটা ইন্সিওরেন্স থেকে আরও লাখ দুই পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কে লকার-টকার তো এখনও খোলাই হয়নি, বাড়িতে স্টিলের আলমারিতেও না হোক আরও দু-আড়াই লাখ পড়ে আছে। দুঁদে উকিল ছিল, দু-হাতে লুটেছে। দু-খানা বাড়ি—

এরপর মার গলার স্বরটা হঠাৎ নেমে যায়।

চোখে জ্বালা। বুকে একটা ভয় বেড়ালের থাবার মতো আলতো বসে আছে। শ্যামা সামান্য সেজে বেরিয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকা বাবাকে কেবল বলে গেল—বাবা, কমলাদির বাড়ি যাচ্ছি। এবেলা ফিরব না।

—হুঁ

বাইরে আজ শীতের বাতাস দিচ্ছে। তার সঙ্গে নরম রোদ পার্কটা হেঁটে পার হতে ভারী ভালো লাগছিল শ্যামার। বড় রাস্তায় এসে ফাঁকা ট্রামে উঠে বসল।

কমলাদি দরজা খুলেই বলে—কত দেরি করলি। সকালে আসার কথা ছিল। তোর শঙ্করদা তোর জন্য বসে থেকে থেকে এইমাত্র আড্ডা দিতে বেরোল। আয়।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে চাপানো প্রেসার কুকার। মাংসের গন্ধে ভুর-ভুর করছে চারদিক। ঘরের মধ্যে একটু ঘুরে-ঘুরে দেখে শ্যামা। খাট পালং, আলমারি, টেলিফোন সব সুন্দর সাজানো। বেশ আছে ওরা! বাড়িটা শান্ত, ভালোবাসার চিহ্নগুলি চারদিকে ছড়ানো।

—শ্যামা, মাংসটা চেখে যা। কমলাদি ডাকে।

—যাই।

রান্নাঘরের দরজায় মোড়া পেতে বসে শ্যামা। টুকটাক নানা কথা হতে থাকে।

—ঝাল বড্ড কম দিয়েছ। পানসে!

—তোমাদের বড্ড সাহেবি রান্না!

ওর তো এরকমই পছন্দ, সেদ্ধ, নির্ঝাল। আমি মাঝে-মাঝে আলাদা ঝাল গড়গড়ে করে রেঁধে নিই। কিন্তু রোজ তো ইচ্ছে করে না, তাই আমারও কেমন এইসব বিস্বাদ রান্নাই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করলে পার্সোনালিটি থাকে না, জানিস। কর বিয়ে বুঝবি।

শ্যামা ঠোঁট ওলটায়—বয়ে গেছে বিয়ে করতে। চাকরি খুঁজছি।

—খোঁজ। চাকরি করলে আরও ভালো বিয়ে হবে। আজকাল সবাই চাকুরে মেয়ে চায়।

—ইস, বিয়ে করলে চাকরি করতে বয়ে গেছে।

—ও কথা বলিস না। আজকাল একজনের রোজগারে সংসার চলে নাকি। চললেও শখ-শৌখিনতা কিছু করা যায় না। আমারই মাঝে-মাঝে চাকরি করতে ইচ্ছে করে।

—আমার ভালো লাগে না। বিয়ে করলে হাত-পা ছড়িয়ে সংসার করব—সেই ভালো। বউকে সুখে রাখতে পারে না যে মানুষ, তাকে বিয়েই করব না।

কমলাদি কপির ডাঁটার চচ্চড়ি বসিয়ে বলে—ভাগ্যিস তোর তবে সেই ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। শুনেছি লোকের দানে তার দিন চলে। কী অবস্থা হত তোর।

শ্যামার বুকের ভেতর কোথায় যেন যন্ত্রপাতি নড়াচড়া শুরু করে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, ভারী ঝামেলা। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না সে। উঠে গিয়ে বেসিনে হাত-মুখ ধোয়।

শঙ্করদা দুপুর পার করে ফিরল। হাসি ঠাট্টায় খাওয়ার পাট চুকতে গড়িয়ে গেল বেলা। তিন জনে ফিস খেলল খানিকক্ষণ। তারপর গড়াল। খাটে কমলাদি আর শ্যামা, ইজিচেয়ারে

শঙ্করদা।

—শ্যামা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। সেই অবস্থাতেই বলে—শঙ্করদা।

—উঁ।

—আমার একটা চাকরি দরকার।

—কেন?

—খুব দরকার।

—সিগারেটের প্যাকেটের ওপর একটা সিগারেট লম্বালম্বি ঠুকতে-ঠুকতে শঙ্করদা বলে—বিয়ের পর চাকরি কোরো, ডগমাস্টারি।

—বিয়ে করব না।

—কে বলল করবে না।

—আমিই বলছি।

—কিন্তু তোমার জন্য একটা পাত্র যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি, আজকালের মধ্যেই কথাটা পাড়তে তোমাদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা।

শ্যামা একটু হাসে, চোখ দুটো দুই আঙুলে চেপে রেখে বলে—এক পাত্রপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে সকালেই কাকা এসেছে।

—পাত্র কী করে?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে—কিছু করে না, বাপ বড়লোক ছিল, মরেছে, ফলে ছেলে এখন বড়লোক হয়েছে। বয়েসে ছোট, জাতও এক নয়।

—সে কী। শঙ্করদা চমকে বলে, এ কেমন বিয়ের প্রস্তাব তোমার কাকা আনলেন?

কমলাদি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পিঠের তলা থেকে নিজের আঁচলটা ছাড়িয়ে এনে শ্যামা পাশ ফিরে বলে—আপনার পাত্রটি কেমন শুনি!

শঙ্করদা শ্যামার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, বলে—এ পাত্র ভালোই। আমাদের বন্ধুর মতো, তবে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ইঞ্জিনিয়ার। মুশকিল হচ্ছে কিছু দাবি-দাওয়া করবে। হাজার তিনেক নগদ।

শ্যামা চোখ বুজে নিঃঝুম পড়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর বলে—তার চেয়ে চাকরিটাই ভালো লাগবে আমার, বিয়েটা থাক।

শঙ্করদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, মাথা হেলিয়ে শ্যামার দিকে চেয়ে। তারপর বলে—শ্যামা।

—উঁ।

—একটা সত্যি কথা বলবে?

—কী?

—তুমি কাউকে ভালোবাস?

—দূর।

—বাসো, কিন্তু কোন কারণে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না। হয়তো সে তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে। সত্যি কি না বলো।

—না।

—তবে ফ্যাক্টটা কী?

—কিছু না।

—সেই সন্ন্যাসী ডাক্তারকেই তোমার পছন্দ নয় তো শ্যামা? ভেবে দ্যাখো।

আবার সেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া। তার শরীরের ভেতরে একটা লিভার ওঠে নামে,

হুইল ঘোরে, ঘক-ঘক করে স্টার্ট দেয় ইঞ্জিন। শ্যামা তার কেঁপে-ওঠা হাত আঁচলে ঢাকে, বালিশে মুখ লুকোয়।

—কী হল?

—কিছু না।

শঙ্করদা নীরবে সিগারেট খায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে—আমি এর মধ্যে আরও ভালো করে খোঁজ নিয়েছি শ্যামা। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তুমি সেই সন্ন্যাসীর ঘর করতে পারবে না সত্যিই।

শ্যামা চুপ করে থাকে।

শঙ্করদা বলে—তার বাঁধা মাইনের চাকরি নয়। লোকের দেওয়া জিনিসে তার সংসার চলবে, তার ধারণা লোকের সেবা করে মানুষের অযাচিত দান পাওয়াই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ব্রাহ্মণোচিত। সে তোমাকে সুখে রাখার চেষ্টাও করবে না। প্রতিদিন তোমার রাত ভোর হবে হাঁড়ির চিন্তায়, ভিক্ষায় চলবে পেট। স্বামীর সঙ্গও পাবে না তুমি। সে লোকটা উদয়াস্ত যাজন করে বেড়ায়। ছ'মাস ন'মাস বাইরে-বাইরে ঘোরে। বউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখবে একটু—এমন স্বভাব নয়। তার জীবনে উন্নতি নেই, প্রমোশন নেই, ইন্সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, ব্ল্যাকমানি কিছু নেই। তার কাছ থেকে উপহারও কোনওদিন পাবে কি না সন্দেহ। ফুল্লরার বারোমাসের গীত হবে তোমার শ্লোগান। পারবে শ্যামা? শ্যামার চোখ ভরে জল আসে। কিছু বলে না।

শঙ্করদা মাথা নেড়ে বলে—পারবে না। ওরকম জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নেবে কে? যার গতি হয় না সে হয়তো নেবে, কিন্তু তুমি নেবে কেন? আজকালকার মেয়ে তুমি, তোমার এতটা সেন্টিমেন্ট থাকার কথা নয়। থাকলে বুঝব তুমি বোকা।

হৃৎপিণ্ড একটা পাম্প মেশিনের মতো ঝলকে ঝলকে জল তুলে আনছে চোখে। বুকটা ব্যথা করে। আস্তে আস্তে কান্নায় শরীরটা কেঁপে ওঠে। পারবে না শ্যামা। জানে, পারবে না। ওই জীবন তার নয়। তবু সেই দূরবর্তী মানুষটার ছবি কেন ছুঁয়ে থাকে তাকে।

শঙ্করদা মৃদু গলায় বলে—আমি অনেক ভেবেছি। মানুষটাকে আমারও বড় ভালো লাগে শ্যামা। লোকটা আমাকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে আমি এক সময়ে এর ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতেও রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কমলা দিল না। বলল—যদি ওর মতোই তোমারও অবস্থা হয়, সেটা অবশ্য হত না। ওদের আশ্রমের অনেক লোকই ভালো কাজকর্ম করে, বড় চাকরি করে, সংসারও করে। দীক্ষা নিতে ভয় পেলাম। তুমি কেঁদো না, সব শুনে যদি রাজি থাকো, তবে বলো ওর সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।

শ্যামা সময় নিয়ে সামলে উঠে বসল। তারপর মাথা নেড়ে বলে—না শঙ্করদা! ওই জীবন আমি পারব না।

—আমিও তাই বলি। তাহলে ইঞ্জিনিয়ারের এ সম্বন্ধটা করব কী শ্যামা? তুমি মত দিলে সামনের রবিবার তোমাকে ওরা দেখতে যাবে।

শ্যামা নিজের কোলে মুখ নামিয়ে বসে রইল।

বিকেলের দিকে কমলাদিকে ঠেলে তোলে শঙ্করদা—এই, চা করবে না?

—আমি করছি। বলে শ্যামা উঠে গেল রান্নাঘরে। চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল যখন তখনই টেলিফোনের রিং শুনতে পেল। সারাদিন আজ টেলিফোনটা বাজেনি। শব্দটা তাই নতুন লাগল শ্যামার কাছে। হঠাৎ দমকলের আওয়াজের মতো। নিশুতরাতে বুক কেঁপে ওঠে। শঙ্করদা চেঁচিয়ে বলে—শ্যামা, তোমার ফোন।

একটু চমকায় শ্যামা। নয়ন নয় তো।

নয়নই। টেলিফোন তুলেই শ্যামা মিষ্টি একটা পাখির ডাক শোনে। তারপরই নয়ন

বলে—শ্যামা।

—বলছি।

—কী করছ?

—কিছু না।

একটা জিনিস শোনো।

—কী?

—শোনো না। কান পেতে থাকো।

শ্যামা কান পাতল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারল না। তারপর একটা শ্বাস ছাড়ার মতো বাতাসের শব্দ হয়।

—শুনেছ?

—কীসের শব্দ?

—সেই সাপটা!

—শ্যামা!

—বলো।

—সাপটার দাঁত উঠেছে। আজ সকালে দেখলাম, ছোট্ট হুলের মতো দেখা যাচ্ছে।

শ্যামা নিশ্বাস ফেলে বলে—সেটা আমাকে বলে কী হবে?

—ইনফর্মেশন দিয়ে রাখলাম।

—আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি—

—ছেড়ো না। তাহলে আবার ফোন করব। তোমার দিদি জামাইবাবুর কাছে তোমার তাহলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

—কী বলতে চাও বলো।

—আমার বাঁ-হাতে টেলিফোন, ডান হাতে সাপের গলা ধরে আছি। ওটা বিড়ে পাকিয়ে আমার কোলে পড়ে আছে। খুব রেগে আছে ইদানীং। দিনরাত আমি ঘুম থেকে টেনে তুলি। খেলা করি। কাজেই সুযোগ পাওয়ামাত্র ও আমাকে কামড়াবে। এক্ষুনি কামড়াতে পারে। পাকা ম্যাচিওরড্ গোখরো। বিষের থলি ভরভরন্ত—বুঝলে?

শ্যামার হাত কাঁপতে থাকে। বলে—বুঝেছি।

নয়ন বলল—তোমার কাকা একটা খবর দিয়ে গেল এই মাত্র।

—কী খবর?

—তোমার মা-বাবা রাজি। কাকা রাজি করিয়েছে। তাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম।

শ্যামা আস্তে করে বলে—তাতে কী হল?

—কিছুই না শ্যামা, তুমি রাজি না হলে কিছুই না। আমি জানি। তবে তোমার বাবার মত পাওয়া গেছে—সেটাও কম কথা নয়। তুমি ভয় পেয়েছিলে।

—আমি রাজি নই।

—তোমাকে রাজি করানোর জন্যই টেলিফোন। শ্যামা, তুমি রাজি না হলে আমি আমার ডান হাতের মুঠোটা আলগা করে দেব। সাপটা তৈরি আছে। এখন ভেবেচিন্তে বল। আমি ইয়ার্কি করছি না।

—নয়ন! আত্মবিস্মৃতের মতো নামটা উচ্চারণ করে শ্যামা। এতক্ষণ নামটা উচ্চারণ করেনি পাছে কমলাদি আর শঙ্করদা জেনে ফেলে।

নয়ন ধীর গলায় বলে—বলো শ্যামা, শুনছি।

—তুমি কি পাগল?

—হতেও পারি। আমি যে কী তা ভেবে পাই না। তবে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি এত তাড়াহুড়ো করতাম না শ্যামা, অপেক্ষা করতাম। কিন্তু তুমি সেদিন একজন ডাক্তারের কথা বলেছিলে, সেই থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি এক্ষুনি জানতে চাই। বলো।

—তা হয় না।

—তবে ছেড়ে দিই?

—আঃ নয়ন।

ওপাশে একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। তারপর রিসিভার পড়ে যাওয়ার শব্দ। শ্যামা খুব সাবধানে টেলিফোনটা রাখল। তারপর টেবিলটায় ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

—কী হয়েছে রে? বিছানা ছেড়ে কমলাদি উঠে আসে।

—ওকে বোধহয় সাপে কামড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে শ্যামা।

—কাকে?

—নয়নকে।

—সে কী! কী বলছিস যা তা?

—কী জানি। শ্যামা মাথা ঠিক রাখতে না পেরে চারদিকে টালমাল চেয়ে বলে—ইয়ার্কিও হতে পারে।

—তুই এদিকে আয়তো, বিছানায় বোস। ওগো, তুমি পাখাটা আস্তে করে ছেড়ে দাও তো।

ইয়ার্কিই।

সাপের শব্দটা টেলিফোনে হুবহু নকল করেছিল নয়ন। শ্যামাকে টেলিফোন করার সময়ে সাপটা তার কাছে ছিলই না।

গতরাতে নয়ন দশটা সোনেরিল খেয়েছিল গুনে-গুনে। ঘুম আসেনি। ইম্‌মিউনিটি এসে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। পৃথিবীর সব ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন অবিরল জেগে থাকবে নয়ন, একটা অস্পষ্ট ভয় বুকের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে।

কাল রাতে একটা ব্যাঙকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জে ছুঁচের খোঁচায় আধমরা করে সাপটাকে খেতে দিয়েছিল নয়ন। খুব খিদে ছিল ওটার। যখন মুখটা তুলে ব্যাঙটাকে ধরল, তখনই নয়ন লক্ষ করে সাপটার সামনের দুটো দাঁত হুলের মতো জেগে উঠেছে। আগে লক্ষ করেনি সে। লক্ষ করে গাটা একটু শিরশির করছিল তার! নয়নের সব অত্যাচারের কথা ও কি মনে রেখেছে? কে জানে! ঝাঁপিটা সাবধানে আবার চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে সে। খোলেনি।

শ্যামা রাজি হল না। হবে না। জানত নয়ন। দিন আর রাতের দুজন নার্স মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখে নয়ন। উপহার দেয়, সুন্দর সব কথা বলে। ভাড়াটে মেয়েদের কাছেও ঘুরে এসেছে সে এর মধ্যে কয়েকবার। কিন্তু জুড়োয় না কিছুতেই জুড়োয় না নয়ন। শরীরের মধ্যে কী একটা তার নেই। সে কি ক্লোরোফিল? ভিটামিন? ক্যালসিয়াম? ফেলে-রাখা মেটেরিয়া মেডিকা, অ্যানাটমির বই খুলে-খুলে রাত জেগে দেখে সে। কিছু বুঝতে পারে না।

মাঝে-মাঝে ভাবে, সে আমেরিকা, ফ্রান্স বা মোনাকোতে চলে যাবে। সেখানে সারারাত ফুর্তি করার অঢেল জায়গা। মদ খাবে, নাচবে, জুয়া খেলবে, মেয়েছেলে পালটে দেখবে রোজ। বিদেশে সারারাত শহর জেগে থাকে। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারে না সে।

কয়েক দিন বাইরে ঘুরে আসে সে। তার ঘরে এসে এক গভীর রাতে সাপের ঝুড়ির ঢাকনা খোলে।

প্রস্তুত ছিল না নয়ন। অপ্রত্যাশিত সাপটা ঝাঁপির ঢাকনা খোলা মাত্র লকলক করে

জেগে ওঠে। ও বুঝতে পেরেছে কি যে ও এখন সশস্ত্র। একটা চকিত লাফে সরে যায় নয়ন। সাপটা শরীর ক্রমশ উঁচু থেকে উঁচুতে তুলে ধরতে থাকে। নয়নের বুক সমান উঁচু তার তীব্র ফণা। মিটমিটে চোখে নয়নের চোখ আটকে রাখে মায়াবী সম্মোহনে কিছুক্ষণ। তার শিকরের মতো চেরা জিভ দ্রুত নড়তে থাকে। অসম্ভব ফোঁসফোঁসানিতে ভরে যায় ঘর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নয়ন। তারপর ধীরে-ধীরে সাহসভরে অভ্যাসবশত সে তার দস্তানা পরা হাতটা এগিয়ে দেয়।

আক্রমণ। প্রতি আক্রমণ। নয়নই জেতে। একসময়ে ছোবল দেওয়ার মুখে ধরে ফেলে ঘাড়। তারপর হাঁফাতে-হাঁফাতে হাসে। ধীরে-ধীরে ঝাঁপির ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় সাপটাকে। দস্তানা খুলে সিগারেট ধরায়। বিছানায় বসে থাকে জেগে। সারা রাত। কখনও বা মুঠো-মুঠো সোনেরিল খেয়ে দেখে বৃথা।

একদিন শ্যামার কাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল—নয়ন, শ্যামার বিয়ের কথা চলছে।

নয়ন উদাস গলায় বলে—কার সঙ্গে?

—খবর পাইনি। তবে এক পার্টি ওকে পছন্দ করে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। কিছু একটা করা উচিত, তার মনে হয়। কিন্তু বড় গভীর ক্লান্তি তার আজকাল। মাঝে-মাঝে এমন হয়। পুরোনো ব্র্যান্ডের সিগারেটটা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। তখন মানুষ বিরক্ত হয়ে ব্র্যান্ডটা পালটে নেয়। তেমনই কিছু একটা ভাবল নয়ন। ব্র্যান্ডটা পালটে নেবে কি না। তারপর আর সেই ভাবনাটাও রইল না। সম্পূর্ণ শূন্য মাথায় সে বসে রইল।

সে বুঝতে পারে, শ্যামা নয়, কিছু নয়, একটু ঘুম ছাড়া সে আর কিছু চায় না।

সাপটাকে জগদীশের কাছে দিয়ে আসবে, ভেবেছিল। কিন্তু দিল না নয়ন। রেখে দিল। থাক। সে আজকাল ইঞ্জেকশন নেয় নিজে-নিজে। তারপর ঘুমোয়।

একদিন যখন ইঞ্জেকশনের ক্রিয়াও কমে আসবে তখন ভয়ংকর ওই দাঁতওলা সাপটাকেই জাগাবে সে।

কে জানে ওর দাঁতেই শেষ ঘুমের ওষুধটা রয়ে গেছে কি না!

# দেশান্তরী

অফিসের পয়সায় প্লেনে চড়ার একটা বাড়তি সুখ আছে। নইলে সিধুর যা আয় তাতে প্লেনে চড়ার স্বপ্নও সে দেখতে পারে না। চাকরিটা পাওয়ার পর থেকে সে যে বাড়তি জিনিসগুলো লাভ করেছে তার মধ্যে আছে একখানা ফাইবার গ্লাসের কম্বিনেশন লকওয়ালা ব্রিফকেস, তাতে চেন লাগানো, প্রয়োজনমতো ছিনতাই ঠেকাতে যা কবজির সঙ্গে হাতকড়ার মতো লাগিয়ে নেওয়া যায়। পেয়েছে টু পিস একটি স্যুট, টাই সমেত। আর পাচ্ছে মাঝে মাঝে দিল্লি বোম্বাইয়ের হাওয়াই যাত্রার সুযোগ।

এই যে দিল্লি-কলকাতা সান্ধ্য ফ্লাইটের বিমানে উঠে সে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পড়বার চেষ্টা করছে এটাই তার জীবনের চরম বাবুয়ানি।

তবে অস্বস্তিও আছে। প্রথম অস্বস্তি, ওভারহেড লকারে রাখা তার ব্রিফকেসে দেড় লাখ নগদ টাকা। দ্বিতীয় অস্বস্তি, এই ফাঁকা প্লেনে তার পাশের সিটে একজন বুড়োমতো সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষ এসে বসেছেন, সামনে পিছনে বহু সিট থাকা সত্ত্বেও। তৃতীয় অস্বস্তি, প্লেনটা যথেষ্ট লেট করছে, কলকাতায় পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে এবং অফিসে খবর দেওয়া নেই বলে এয়ারপোর্টে গাড়িও থাকবে না।

দিল্লি-কলকাতা ফ্লাইট ফাঁকা যাওয়ার কথা নয়। তবে এটা স্বাভাবিক ফ্লাইট নয়। সপ্তাহে একদিন এয়ার ইন্ডিয়ার নিউইয়র্ক-লন্ডন-দিল্লি-কলকাতা একটা ডাইরেক্ট ফ্লাইট আছে। হতভাগিনী অবহেলিতা কলকাতার প্রতি সেটাই একছিটে করুণার প্রকাশ। তা বলে জাম্বো জেটটি কলকাতা যায় না। সকাল দশটা নাগাদ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের খালাস করে জাম্বো গুরুতর কাজে অন্যত্র যায়। কলকাতার যাত্রীরা তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে। বিকেলে এই এয়ারবাস তাদের কলকাতায় পৌঁছে দেয়। নামে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট হলেও এ বিমানে অন্তর্দেশীয় যাত্রীদের যেতে বাধা নেই। তবে রেগুলার ফ্লাইট নয় বলে যাত্রীরা খুব একটা এর খবর রাখে না। তার ওপর ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক হাওয়াই আড্ডাটিও তো আর নাকের ডগায় নয়। এই ফ্লাইটটির সন্ধান সিধুকে দিয়েছিল অমৃত জয়সওয়াল।

গোটা বিমানটির অভ্যন্তরে জনা পঞ্চাশেকের বেশি যাত্রী নেই। অধিকাংশ আসনই হাঁ-হাঁ করছে ফাঁকা, তবু এই স্যুট পরা সম্ভ্রান্ত চেহারার প্রবীণ মানুষটি যেন খানিকটা বেছেগুছেই এসে কেন যেন তার পাশে বসলেন তা বুঝতে পারছে না সিধু। সে উইন্ডো সিটে বসেছে। ভদ্রলোক আইল-এ। ওভারহেড লকারে সিধুর ব্রিফকেস থাকায় ভদ্রলোক নিজের অত্যন্ত দামি ব্রিফকেসটি সামনের সিটের ওপরকার লকারে রাখলেন, কিন্তু বসলেন এসে সিধুর পাশেই। সিধু আড়চোখে লক্ষ করল, ভদ্রলোকের বয়স সত্তরের ওপরে হবে। বেশ রোগা এবং অসুখী চেহারা। হয়তো অসুস্থও। বাঁ-হাতে ঝলমলে একটা বড় পাথর বসানো আংটি। বোধহয় হিরে। পরনে ঘন নীল রঙা স্যুট। টাই নেই। ওই পোশাক, ওই আংটি সবই যেন ভদ্রলোকের বিবর্ণ মুখশ্রীর সঙ্গে বেমানান।

প্লেন ছাড়তে এখনও একটু দেরি আছে। বাইরে রোদ্দুর পড়ে আসছে। প্লেন যখন কলকাতা পৌঁছবে তখন পূর্বাঞ্চলে বেশ ঘন অন্ধকার। প্লেন ছাড়তে আরও বেশি দেরি করলে সিধুর টেনশন বাড়বে। সে ছাপোষা ঘরের ছেলে, এখনও লাখ-লাখ নগদ টাকা নিয়ে চলাফেরায় তেমন অভ্যস্ত হয়নি। সবসময়ে ভয়-ভয় ভাবটা থেকেই যায়।

কাগজটা পড়ছিল না সিধু, দেখছিল মাত্র। হঠাৎ ভদ্রলোক তার দিকে চেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে

বললেন, বাঙালি?

সিধু একটু তটস্থ হয়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী নাম?

সিদ্ধেশ্বর মিত্র।

ভদ্রলোক জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলব?

সিধু ফের একটু অস্বস্তি বোধ করে বলে, বলুন।

ভদ্রলোক দুর্বল শীর্ণ হাতখানা কোটের পকেটে পুরে একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে সিধুর হাতে দিয়ে খানিকটা হাঁফধরা গলায় বললেন, আমি অনেক দূরে থাকি। টরোন্টোয়। এই লম্বা পাড়ি আমার পক্ষে ভারী ক্লান্তিকর। টরোন্টো থেকে নিউইয়র্ক যেতে হয়েছিল। তারপর টানা এতক্ষণ ধরে ওড়ার ধকল বড্ড বেশি এই বয়সে। কিন্তু না এসেও উপায় নেই। আপনাকে একটা অনুরোধ করবো?

বলুন না, কোনও সাহায্য করতে পারলে নিশ্চয়ই করব।

ভিজিটিং কার্ডখানা দয়া করে ফেলে দেবেন না।

না, না ফেলব কেন? বলে কার্ডখানা পকেটে রেখে দেয় সিধু। ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম সামু ঘোষ।

সামু! এরকম নাম রাখার রেওয়াজ ইদানীং হয়েছে বটে, কিন্তু এর যা বয়স এঁদের আমলে এরকম নাম রাখা হত না তো।

সামু ঘোষ তাঁর ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললেন, আমি খুব অসুস্থ। কার্ডিয়াক পেশেন্ট।

আপনার কি মেডিক্যাল হেল্প দরকার? তাহলে—

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, না। আমি নিজে ডাক্তার। ওষুধপত্র আমার সঙ্গেই আছে। কিন্তু কোনও লাভ নেই। যদি আমার হার্ট অ্যাটাক হয় তাহলে বোধহয় কারও কিছু করার থাকবে না। সেটাই হয়েছে সমস্যা।

দিল্লিতে কিন্তু খুব ভালো হাসপাতাল ছিল।

জানি, মেডিক্যাল হেল্প আমার দরকার নেই। আমার শুধু দরকার কলকাতায় পৌঁছনো এবং একটি কর্তব্য সম্পন্ন করা। তারপর যা ইচ্ছে হোক। কিন্তু -

ভদ্রলোক বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। আরও চাপা গলায় বললেন, জীবন বড়ই অনিশ্চিত—তাই না?

সিধু গম্ভীর হয়ে বলে, তা তো বটেই।

সামু ঘোষ এই প্রথম একটু হাসলেন। ক্ষীণ হাসি। বিবর্ণ মুখে হাসিটা ভাল ফুটলও না। একটু কাশলেন; ধপধপে সাদা একটা রুমালে মুখ মুছলেন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বের করে মুখের ভেতরে কোনও ওষুধ স্প্রে করলেন। কৌটোটা পকেটে রেখে চুপচাপ কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর বললেন, এয়ারপোর্টে আমি আপনাকে লক্ষ করেছি। কেন জানি না মনে হল, আপনি ডিপেন্ডেবল। যদি পথে আমার কিছু হয় তাহলে আপনি আমার হয়ে একটা কাজ হয়তো করে দিতে পারবেন।

আপনার কিছু হবে এটা ভাবছেন কেন?

সামু হাসলেন, যদি হয়, তাই সাবধান হচ্ছি, কাজটা জরুরি। সমাধা না হলে মরাটা আমার নিতান্তই মরা হবে, ডিসগ্রেসফুল।

কাজটা কি শক্ত?

সামু মাথা নাড়লেন, খুবই সহজ কাজ। কিন্তু নির্ভর করতে পারি এমন লোক পাওয়া

তো সহজ নয়। আপনাকে দেখে—

আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আপনার কিছু হবেও না। তবু কাজটা যদি করতে বলেন করে দেব। ঝুঁকি না থাকলে।

ঝুঁকির কথা কেন যে আপনার মনে হল।

সিধু লজ্জা পেয়ে বলে, না এমনিই।

সামু ঘোষ একটু চুপ মারলেন, কারণ এয়ার হোস্টেস লজেন্স ইত্যাদির ট্রে নিয়ে এসেছে। প্রথা। সামু কিছুই স্পর্শ করলেন না। সিধু চারটে লজেন্স তুলে নিল। প্রতিবারই নেয়। তার ভাইপো আর ভাইঝি আছে, দুজনকে দুটি করে দেবে। নিয়ম।

বিমান সেবিকা চলে যাওয়ার পর সামু বললেন, কথাটা হল, ঝুঁকির ব্যাপারটা আপনার অকারণে মনে হয়নি।

সিধু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, তার মানে?

সামু একটু ভাবলেন তারপর বললেন, খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে আপনি নিজেই ঝুঁকির কথাটা বলে ফেলেছেন মিস্টার মিত্র। এমনিতে কোনও রিস্ক ছিল না। কিন্তু আমার যদি কিছু হয়, তাহলে একধরনের রিস্ক দেখা দিতেও পারে। আমার শরীর ভালো নয়। আপনি কখনও পাড় ভাঙা নদীর ধারে বাস করেছেন?

না।

নদীর পাড় ভেঙে পড়ার আগে মাটির নীচে এক ধরনের গুড় গুড় শব্দ হয়।

আমি আমার শরীরের মধ্যে ঠিক ওরকম একটা ব্যাপার টের পাচ্ছি। কিছু একটা ঘটবে হয়তো শিগগিরই।

অত ভাবছেন কেন?

বয়স হয়েছে। মরার জন্যে তাই ভাবনা নেই। ভাবনা এই, সময়মতো পৌঁছতে পারব কি না। বড্ড দেরি করে ফেলেছি।

কিছুই বুঝতে পারছিল না সিধু। কেবল একটা রহস্যের আভাস পাচ্ছিল। তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

প্লেনের দরজা অবশেষে বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হওয়ার আগে, একেবারে শেষ মুহূর্তে দুজন লোক উঠল। তারা বসল সিধুদের কয়েক সারি সামনের দুটি পাশাপাশি আসনে। সামু ঘোষ সামনের দিকে চেয়ে ছিলেন। একটু বাদে মুখ ফিরিয়ে সিধুর দিকে চেয়ে বললেন, মিস্টার মিত্র, আমার মনে হচ্ছে, কাজটায় ঝুঁকি আছে। আপনার ওপর যদি আমি নির্ভর করতে না পারি তাহলে আমার এত পরিশ্রম বৃথা যাবে।

সিধু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলে, কিন্তু কাজটা কী?

কার্ডটা ভালো করে দেখবেন। আর আমার ব্রিফকেসটা ওই লকারে রয়েছে।

সেটা আমি দেখেছি!

ওটা আপনি আপনার সঙ্গে নেবেন। প্লিজ, এক জায়গায় ওটা পৌঁছে দিতে হবে। পারবেন না?

শুনতে তো কাজটা সোজাই মনে হচ্ছে। রিস্কটা তাহলে কোথায়?

সামু মাথা নেড়ে বললেন, বলতে পারব না। তবে কাজটা সাবধানে করবেন। চিন্তিত সিধু বলল, আপনি অকারণে চিন্তা করছেন।

প্লেনটা গোঁ-গোঁ করে ডকিং ছেড়ে রানওয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। এ সময়টা কথা বলার সময় নয়। রানওয়েতে পৌঁছে প্লেন বিপুল বেগে ছুটলো, তারপর আকাশের দিকে দিল তার পেল্লায় লাফ।

এ সময়টা সিধু খুব উপভোগ করে। উপভোগ করে গগনবিহার। তার চাকরিটা সামান্যই কিন্তু চাকরির সুবাদে সে যে মাঝে মাঝে এভাবে আকাশে উড়তে পায় এটাই এক মস্ত লাভ। জানলা দিয়ে সে বিমানের গগন-যাত্রার মসৃণ কাণ্ডটি মন দিয়ে লক্ষ করছিল। কান বন্ধ হয়ে গেল ফট করে। ঢোঁক গিললেই খুলে যায় অবশ্য।

ভয় করে কি তার? বিমান দুর্ঘটনার ভয়? হাইজ্যাকারদের ভয়? না, মোটেই না। ক্ষুদ্র ও মলিন পৃথিবীর মাটি ছেড়ে বিশাল আকাশে যখন উঠে আসে তখন সে সব ভয় ভুলে সম্মোহিত হয়ে চেয়ে থাকে বাইরে। নিজের ক্ষুদ্রতা বা তুচ্ছতার কথাও তার মনে থাকে না। প্রথম প্রথম হয়তো এরকমই হয়। ধীরে ধীরে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে বিমানযাত্রায় তখন অন্য সব যাত্রীর মতোই সেও হয়তো বিজনেস টক করবে বিমানে বসে, খাবার-দাবার নিয়ে কথা তুলবে বা ওইরকম সব মেঠো ব্যাপারে মন দেবে। এখনও অবধি তা হয়নি, এখনও সে আকাশে ওড়ার রোমাঞ্চ সর্বাঙ্গ দিয়ে উপভোগ করে।

প্রয়োজনীয় উচ্চতায় উঠে শূন্যে স্থিরবৎ ভারসাম্যে থিতু হল বিমান। নীচে মেঘস্তর আছে, তবে হালকা। ওপরে এখনও ঝলমলে রোদ।

খাবার আসবে। প্লেনের খাবারটাও সিধু খুব উপভোগ করে। গরিব ঘরের ছেলে সে। এখনও তার যথেষ্ট খিদে পায় এবং তেমন কিছু বাছাবাছিও নেই।

সামু ঘোষ চোখ বুজে বসে আছেন। চেহারাটা বিবর্ণ বটে, কিন্তু এখনই মারা-টারা যাবেন বলে মনে হচ্ছে না সিধুর। তবে সে আড়চোখে তাকিয়ে মাঝে-মধ্যে লক্ষ রাখতে লাগল।

ঠিক এ ধরনের মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে সিধুর পরিচয় ঘটবার কথাই নয়। দেখলেই বোঝা যায় ইনি বেশ সম্পন্ন নন-রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান। সংক্ষেপে এঁরাই এন আর আই। দেশের অর্থনীতি বিদেশি লগ্নির জন্য ইদানীং এঁদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। ভদ্রলোক ডাক্তার, বড় ডাক্তারই হবেন। আর বিদেশে ডাক্তারদের কাঁচা পয়সা।

পয়সার নিরিখে দুনিয়াটাকে বিচার করা উচিত নয়, এটা সিধু বোঝে। কিন্তু কার্যকালে পয়সার বিচারটাই যেন কেন এসে পড়ে। তার নিজের তেমন পয়সাকড়ি নেই বলেই কি এরকমটা হয়? এই যে খুব ফান্ডা মেরে সে প্লেনে চড়ছে এসব নিতান্তই বারফাট্টাই। জি কে ইঞ্জিনিয়ারিং নামক যে কোম্পানিতে সে কাজ করে সেটাও তেমন উঁচু দরের কোম্পানি নয়। তবে উঠতি বাঙালি আর ইউ পি-ওয়ালা দুজনের যৌথ কোম্পানি। লেনদেনে দু-নম্বরি ব্যাপার আছে। সেসব ব্যাপার অবশ্য সিধু জানে না। তবে তাকে মাঝেমধ্যে এরকম বেশ কিছু মোটা নগদ টাকা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। চাকরিটাও তার হয়েছিল একটিই যোগ্যতার জন্য। বিশ্বাসযোগ্যতা। তার এক বন্ধুর বাবা চাকরিটা করে দিয়েছিলেন।

তার একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল। সেটা ভারী মজার। কোম্পানির অন্যতম মালিক হল জরি মিঞা। বিশাল চেহারা, টকটকে ফরসা রং, বাবরি চুল, চোখে সুরমা, গায়ে ভুরভুরে আতরের গন্ধ। বাঙালি মালিক সিধুকে চিনতেন বলে প্রশ্ন করেননি। শুধু জরি মিঞা তাকে একটু জরিপ করে নিয়ে একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিল, রূপেয়া লে কে ভাগোগে তো নেহি?

সিধু কাঠ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়েছিল শুধু। ভাগবার ইচ্ছেও তার নেই, উপায়ও নেই।

জরি মিঞা তার বাঙালি পার্টনারের দিকে চেয়ে তক্ষুণি বলল, ইসকো লে লেও। লড়কা ঠিক হ্যায়।

চাকরি হল। কিন্তু মাইনে মাত্র আটশো টাকা। এই লাখো বেকারের দেশে সেটাই অনেক বলে মনে হয়েছিল সিধুর।

অফিসে তাকে অনেক কাজ করতে হয়। হাড়ভাঙা খাটুনি। ছুটিটুটি বিশেষ নেই। তবে

জরি মিএগ্রার নির্দেশে তাকেই দিল্লি, ভুবনেশ্বর, পাটনা আর গৌহাটি যেতে হয় পেমেন্ট আনতে। বেশিরভাগই নগদ টাকা। কাজটা বিপজ্জনক।

তবু এই সুবাদে সিধুর দেশভ্রমণটা হয়ে যাচ্ছে। জীবনে সে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ডিঙোবার সুযোগ পায়নি। চাকরির সুবাদে সেটা হচ্ছে। তার তুচ্ছ চাকরিটার এই একমাত্র উজ্জ্বল দিক।

কিন্তু আলোর পাশে অন্ধকারও আছে। এই যে দিল্লিতে সে পেমেন্টের জন্য দিন-দিন হাঁ করে বসে রইল এতে তার থাকা-খাওয়ার কিছু খরচ আছে। কোম্পানি সে-বাবদে মোটে দৈনিক সত্তর টাকা করে দিয়ে খালাস। হোটেলে থাকতে হলে, তা সে যত ওঁচা হোটেলই হোক, সত্তর টাকায় থাকা-খাওয়া সাপটে ওঠা দিল্লির আক্রা বাজারে সম্ভব নয়। ভাগ্যের কথা চিত্তরঞ্জন পার্কে তার এক মাসি থাকে। মান্তুমাসির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম ছিলই না তাদের। বছরে এক-আধবার নববর্ষে বা বিজয়ায় মায়ের সঙ্গে পত্র-বিনিময় ঘটতো। তাও সব বছর নয়। দিল্লিতে এসে প্রাণের দায়ে মান্তুমাসিকে খুঁজে বের করতে হয়েছে সিধুকে। তাতে লাভই হয়েছে অবশ্য। মান্তুমাসি ভারী হাসিখুশি মানুষ, মোটেই কুচুটে টাইপের নয়। মেসো বড় অফিসার ছিলেন। সম্প্রতি অবসর নিয়ে বাগান আর সামাজিক কাজকর্মে মন দিয়েছেন। যথেষ্ট পয়সা। বিশাল বাড়ি। মাসি বা মেসো সিধুকে একটুও হ্যাটা করেননি। বরং আদরই করেন। মাসির একটিই ছেলে, সৌদি আরবে থাকে। বাড়ি সুতরাং ফাঁকা। সেই বাড়িতে সিধু গেলে মাসি-মেসোর সময়টা বোধহয় ভালোই কাটে। নইলে দুটো পোষা কুকুর আর আপ্পু নামের একটা চাকর মাত্র অতো বড় বাড়িটায় তাদের সম্বল। এই নিয়ে বার চারেক সিধু মান্তুমাসির বাড়িতে থাকল। মাসি আর মেসোর সঙ্গে এখন নতুন পরিচয়ের আড়ভাবটা নেই। বেশ গল্পসল্প হয়।

তবে মুশকিল হল, তার বাহারি অ্যাটাচি কেস দেখে এবং সে প্লেনে যাতায়াত করে জেনে মেসো আর মাসি ধরেই নিয়েছেন, তার চাকরিটাও শাঁসালো। সিধুও ভুলটা ভাঙেনি। কিন্তু এখন বিপদ হয়েছে, মাসি তার জন্য পাত্রী খুঁজতে লেগে গেছেন। কয়েকটা পাত্রীর খবর ফটোসহ তাঁর হাতে এসে গেছে। ওভারহেড লকারে সিধুর অ্যাটাচি কেসে দুটি ফটো রয়েছে, কলকাতায় গিয়ে মা-বাবাকে দেখাতে হবে। বিয়ে করার উপায় যে সিধুর নেই এ কথা কী করে যে বোঝাবে তা ভেবে পায় না সিধু। জরি মিএগ্রা আর কৌস্তুভ চৌধুরী আটশো টাকা দিয়েই তার মাথাটা কিনে রেখেছেন। এর বেশি আশা করতেও ভয় পায় সিধু।

সিদ্ধেশ্বরবাবু!

উঁ, বলে সিধু মুখ ফেরাল। সামু ঘোষ তার দিকে চেয়ে আছেন।

কিছু বলেছেন আমাকে?

কলকাতা শহরটা কি খুব পালটে গেছে? আমি গত পনেরো বছর কলকাতা শহর দেখিনি।

পালটে গেছে। অনেক পালটে গেছে।

রাস্তাঘাট চিনতে পারব না?

সিধু একটু হেসে বলে, তা পারবেন।

আচমকা সামু ঘোষ জিগ্যেস করেন, আপনার বয়স কত?

সিধু একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, তেইশ-চব্বিশ হবে।

চাকরি করেন নাকি?

হ্যাঁ, সামান্য একটা।

কীরকম চাকরি?

সিধু দোনামোনা করে বলে, একটা প্রাইভেট ফার্মে। সামান্য চাকরি।

সামান্য চাকরি? দিল্লিতে?

না। কলকাতায়। অফিসের কাজে দিল্লি আসতে হয়েছিল।

ও। বলে সামু ঘোষ একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, এদেশে অনেক বেকার, তাই না?

—অনেক। লক্ষ লক্ষ।

সামু ঘোষ একটা সাদা ধবধবে রুমালে নাকটা খানিকক্ষণ চেপে রইলেন। তারপর হাঁফধরা গলায় বললেন, ইচ্ছে ছিল এদেশে একটা স্কিম চালু করব। অনেক বেকার চাকরি পেত তা হলে। হল না। টাকা রোজগার করা ছাড়া আর কিছুই হল না।

এ কথার জবাব হয় না, কারণ এ হল স্বগতোক্তি। তাই চুপ করে রইল সিধু।

সামু ঘোষ হঠাৎ একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বললেন, বড্ড ঠান্ডা লাগছে। উদ্বিগ্ন সিধু বলে, এয়ার হোস্টেসকে ডাকব?

না, দরকার নেই। বলে সামু ঘোষ তাঁর পকেট থেকে একটি খুদে ধাতব শিশি বের করে, বোধহয় সামান্য একটু হুইস্কি বা ব্র্যান্ডি খেয়ে নিলেন।

একটু বাদেই এয়ার হোস্টেস খাবারের বাক্স বয়ে আনল। সামু হাত নেড়ে খাবার ফিরিয়ে দিলেন। সিধু সাগ্রহে নিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ, স্যান্ডউইচ, সন্দেশের মধ্যে ডুবে গেল সে।

সামু ঘোষ ঝুম হয়ে বসে আছেন। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে আছে। চোখ বোজা।

পৌনে দু-ঘণ্টার যাত্রাপথ। এখন চল্লিশ মিনিট হয়েছে। বাকি পথটুকু সামু ঘোষ নিরাপদেই পার হবেন বলে মনে হচ্ছে সিধুর। ভদ্রলোক তাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। সেটা পালন করতে না হলেই ভালো।

সিধু ফের আনমনে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আধুনিক জেট বিমান এত উচ্চতা দিয়ে যায় যে, নীচের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার, শহর-গ্রাম সব একাকার হয়ে যায়। তা ছাড়া একটু মেঘলা ভাবও আছে। কিছুই দেখার নেই। তবে সিধু স্থির চোখে চেয়ে থাকে। আকাশটা অনেক বড় দেখা যায়। এত বড় আকাশ নীচে থেকে দেখা যায় না কখনও।

সামু ঘোষ কি অস্ফুট কোনও শব্দ করলেন? সিধু ফিরে তাকাল। যা দেখল তাতে হিম হয়ে গেল সে। সামু একটু কেৎরে রয়েছেন, ঠোঁটের কষে সামান্য ফেনার মতো। একটা গোঙানির শব্দ হচ্ছে।

সিধু কলিং বেল টিপে তাড়াতাড়ি সামু ঘোষকে ধরে সোজা করে বসানোর চেষ্টা করল। ওঁর ঠোঁট দুটো কেমন নীলচে লাগছে।

উনি খুব কষ্টে যেন সিধুর দিকে চাইলেন। খুব কষ্টে ফিসফিস করে বললেন, সামথিং টেরিবিল রং।

কী হয়েছে আপনার? বুকে ব্যথা?

সিংকিং।...যা বলেছি...মনে রাখবেন...

বিমানসেবিকা এসেই তাড়াতাড়ি অক্সিজেন মাস্ক নামিয়ে নাকে ধরল।

সিধুর দিকে চেয়ে বলল, ইনি আপনার বাবা তো! ওষুধপত্র কিছু সঙ্গে নেই?

সিধু বললে ওঁর পকেটে একটা স্প্রে আছে।

স্প্রে! কীসের স্প্রে?

হাঁপানির।

কার্ডিয়াক অ্যাজমা নাকি?

সিধু বলল, আসলে আমি ঠিক...

আর একজন বিমানসেবিকাও এসে গেল।

হার্ট পেশেন্ট? আইল সিটে শুইয়ে দিলে কেমন হয়?

তাই হল। দুজন বিমানসেবিকা মাঝখানের সিটগুলোর হাতল তুলে শোওয়ার জায়গা করে ফেলল। সিধু আর বিমানসেবিকারা ধরাধরি করে শুইয়ে দিল সামু ঘোষকে।

দ্বিতীয় বিমানসেবিকাটি সিধুকে ইংরেজিতে বলল, আপনার বাবা হার্ট পেশেন্ট এটা কি জানতেন? হার্ট পেশেন্টের বেশি ফ্লাই করা উচিত নয়। আপনারা বোধহয় নিউইয়র্ক থেকে আসছেন, তাই না?

সিধু কিছু বলল না। সামু ঘোষের দায়িত্ব কি শেষ অবধি তার ওপরেই বর্তাল?

সামু ঘোষ বুকে হাত চেপে শুয়ে আছেন। বিমানসেবিকারা খবর দেওয়ায় একজন পুরুষ স্টুয়ার্ড এসে নাড়ী দেখে বললেন, ভেরি থিক পালস। কলকাতা এয়ারপোর্টে অ্যাম্বুলেন্স রেডি রাখতে বলে দাও। আর অক্সিজেনটা ধরে থাকো।

যাত্রীদের মধ্যে কোনও ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। একজন বিমানসেবিকা সিধুকে বলল, আপনি আপনার বাবার মুখে মাস্কটা ধরে বসে থাকুন। কলকাতায় পৌঁছেই আমরা ওঁকে নার্সিং হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

এরপর সবাই যে যার সরে গেল। অক্সিজেন মাস্কটা কম্পিত হাতে সামু ঘোষের মুখের ওপর ধরে বসে রইল সিধু। লোকটা কি মরে যাবে? তাহলে কী হবে?

সিধু প্যাসেজের ওপর উঁচু হয়ে বসে মাস্কটা ধরে আছে। সামু ঘোষের মুখটা তার মুখের কাছেই। সামু হঠাৎ তার দিকে চেয়ে কী একটু যেন ইঙ্গিত করার চেষ্টা করলেন। সিধু মাস্কটা একটু আলগা করল।

সামু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—মনে আছে তো!

আপনার হঠাৎ কি হল? আপনি তো ডাক্তার, কিছু করতে পারেন না।

সামু ক্ষীণতর কণ্ঠে বললেন, কিছু করার সাধ্য নেই। কোনও ডাক্তার থাকলে অ্যাডভাইস করতে পারতাম। শোনো সিদ্ধেশ্বর, তুমি করে বলছি তোমাকে।

বলুন না।

আমি ঠিক হার্ট পেশেন্ট নই। কী হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। মে বি এ সর্ট অফ পয়জনিং।

সর্বনাশ!

নইলে এরকম হওয়ার কথা নয়।

কী করে পয়জনিংটা ঘটল?

তা জানি না। লাকি দ্যাট, ইট ওয়ার্কস স্লোলি।

তা হলে তো কলকাতার পুলিশকেও খবর দেওয়া দরকার।

না, পুলিশ খবর এমনিতেও পাবে। শোনো...

সামু ঘোষ এতক্ষণ কথা বলার ধকল সামলাতে চোখ বুজে একটা যন্ত্রণা সহ্য করলেন। তারপর বললেন, এরা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবে। ভেরি গুড। কিন্তু তুমি...

হ্যাঁ বলুন।

তুমি অ্যাম্বুলেন্সে যেও না।

তা হলে।

তুমি আমার অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে চলে যেও। শোনো...

আবার কিছুক্ষণ বিরতি।

শোনো, আমার একটা লাগেজ আছে। কোটের ডান পকেটে হাত দাও। লাগেজ কুপনটা পাবে। লাগেজটা আমার সঙ্গে হাসপাতালে যাবে। মনে থাকবে?

থাকবে। আপনি কোন নার্সিং হোমে যাবেন?

জানি না। যেটা ভালো হয়। বেলভিউ না কি যেন...অক্সিজেনটা দাও, আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

বাদবাকি যাত্রাপথটা সামু আর কথা বললেন না।

## ॥ দুই ॥

টারম্যাকেই অপেক্ষা করছিল অ্যাম্বুলেন্স। বিমানে সিঁড়ি লাগাতে না লাগাতেই দু'জন মজবুত চেহারার লোক স্ট্রেচার নিয়ে উঠে এল।

গত আধঘণ্টায় উদ্বেগে আর উৎকণ্ঠায় ঘামছিল সিধু। এবার হাঁফ ছাড়ল। সামু ঘোষকে স্ট্রেচারে ওঠানো হচ্ছে।

একজন বিমানসেবিকা কাছে এগিয়ে এসে সিধুকে বললেন, আপনাদের পাসপোর্ট রেডি রাখবেন। দেখাতে হতে পারে।

পাসপোর্ট! বলে সিধু ঢোক গিলল। তাঁর পাসপোর্ট নেই, থাকার কথাও নয়। তবু সে ঘাড় নাড়ল যন্ত্রের মতো।

সামু ঘোষকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সিধু লকার থেকে অ্যাটাচি কেসটা বের করল। তারপর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পাশের লকার থেকে সামু ঘোষের অ্যাটাচি কেসটাও।

একজন লোক উঠে এল বিমানে। উৎকণ্ঠ গলায় বলল, কই, কোথায় পেশেন্টের ছেলে?

একজন বিমানসেবিকা তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে ওই যে, ওই।

লোকটা এগিয়ে এসে বলল, তাড়াতাড়ি করুন স্যার, অ্যাম্বুলেন্স আপনার জন্য ওয়েট করছে।

সিধু অবাক হয়ে বলে আমার জন্য? কেন বলুন তো।

আপনি আপনার বাবার সঙ্গে হাসপাতালে যাবেন তো!

দেখুন—বলে সিধু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে গিয়েও থামল। বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। তত সময় নেই। শুধু আর একবার ঢোঁক গিলে বলল, আমার ইমিগ্রেশন আছে, লাগেজ আছে, আপনারা বেলভিউতে ওঁকে নেবেন তো। আমি ট্যাক্সিতে চলে যাব।

লোকটা অকারণ একটা সেলাম ঠুকে নেমে গেল।

সিধু নেমে এল ধীর পায়ে। কলকাতায় এখন বেশ গাঢ় রাত। আটটা বেজে গেছে। তার ইমিগ্রেশন নেই বটে, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্যারিয়ার পেরোতে হবে টিকিট দেখিয়ে।

একজন বিমানসেবিকা সমবেদনাবশত তার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বলল, সরি স্যার, উই ওয়্যার নট অফ মাচ হেলপ।

সিধু বলল, ইট ওয়াজ ওকে।

উইশ হিজ কুইক রিকভারি।

থ্যাঙ্ক ইউ।

সিধু টার্মিনালে ঢুকে বেড়া পার হয়ে প্রিপেইড ট্যাক্সি ধরল। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা এখনও তেমন খুনে, গুণ্ডা, ছিনতাইবাজ হয়ে ওঠেনি। প্রিপেইড ট্যাক্সিতে ভয় আরও কম। তবু এতগুলো টাকা আর সামু ঘোষের অ্যাটাচি কেসটা সঙ্গে থাকায় তার ভয়-ভয় করছে।

এই ভয় ভয় ভাবটাই তাকে চারিদিকে চোখ রাখতে বাধ্য করল। উৎকণ্ঠ দৃষ্টিতে সে বারবার আগুপিছু দেখে নিচ্ছিল। কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভেনিউতে ঢুকবার মিনিট তিনেক বাদেই হঠাৎ সে দেখতে পেল, সামনে একটা অ্যাম্বুলেন্সের পথ আটকে একটা জিপ দাঁড়ানো। কিছু একটা হচ্ছে।

কোন অ্যাম্বুলেন্স ওটা? একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে চেষ্টা করে সিধু! জিপটার জন্য রাস্তা ছোট হয়ে যাওয়ায় ট্যাক্সিটা এবং সামনের গোটা তিনেক গাড়ি ধীর হয়ে গেছে। একটা জ্যাম। সিধু দেখতে পেল, চারটে লোক অ্যাম্বুলেন্স থেকে ড্রাইভার এবং অন্যদের টেনে হিঁচড়ে নামাচ্ছে।

সিধু হঠাৎ 'রোকখে' বলে চেঁচিয়ে দরজার হাতল ঘোরাচ্ছিল।

কী করছেন স্যার? বলে ট্যাক্সিয়ালা একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বলে, চুপ করে বসে থাকুন। দুটো ছোকরার হাতে পিস্তল আছে দেখছেন না?

পিস্তল শুনে ঠান্ডা মেরে গেল সিধু। উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, কিন্তু ওখানে কী হচ্ছে?

এ হল কলকাতা। কত কী হয়! জড়িয়ে না পড়াই ভালো।

পাশের সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে সামনের তিনটে গাড়ি তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল। এবার সিধুর ট্যাক্সি পরিসরটিতে ঢুকতেই সিধু দেখতে পেল, যে লোকটা তাকে ডাকতে প্লেনে উঠেছিল তাকে টেনে নামিয়ে দুটো ছোকরা রদ্দা মারছে আর বলছে, বল শালা, অ্যাটাচি কেসটা কোথায় রেখেছিস...

সিধু ভয়ে চোখ বুজে ফেলল, তার ট্যাক্সি খুব ধীরে সংকীর্ণ জায়গাটা পেরিয়ে আবার স্পিড নিল, সিধুর ফাঁড়া কাটল বটে, কিন্তু বড্ড অবসন্নবোধ করতে লাগল সে। এরা কারা? কোন ধরনের ঝুঁকির কথা বলছিলেন সামু ঘোষ? সত্যিই কি সামু ঘোষকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে?

মাথার মধ্যে নানারকম উলটোপালটা চিন্তাভাবনা ঘূর্ণিঝড়ের মতো পাক খেতে লাগল। তার কি উচিত ছিল সামু ঘোষকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে যাওয়া? কিন্তু সে একা এবং নিরস্ত্র, কী করতে পারত সে?

ড্রাইভার আচমকা জিগ্যেস করল, বাইপাস দিয়ে যাবেন তো স্যার?

হ্যাঁ-হ্যাঁ বাইপাস দিয়ে।

বাঘা যতীন স্টেশনের কাছ বরাবর তার বাড়ি। বাড়িটা খুবই দীনদরিদ্র চেহারার। তার গরিব বাবা অতি কষ্টে তিল তিল করে দেড় কাঠা জমির ওপর দু-ঘরের এই বাড়িখানা করেছেন। খুবই ছোট এবং এখনও অসম্পূর্ণ। বাইরের দেওয়ালে পলেস্তারা দেওয়া যায়নি এখনও। জলছাদ হয়নি। তবু এই হতশ্রী বাড়ির প্রতি একটা গভীর মায়ার টান হয়ে গেছে। আসলে, নিজেদের বাড়ি—এই বোধটাই তো সাংঘাতিক। এ বাড়িতে সিধুর মা-বাবা আর দুটো ছোট বোন থাকে। আলাদা থাকবে বলে ছাদের ওপর একখানা এক ইটের দেয়ালওলা ঘর করে নিয়েছে সিধু, ছাউনি অ্যাসবেস্টসের। সিঁড়ি নেই, একখানা বাঁশের মই বেয়ে ওঠানামা করতে হয়।

রাত ন'টা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছল সিধু।

সিধু আজকাল টুরে যায় প্লেনে চড়ে, এসব তার বাড়ির লোকের কাছে একটা বেশ গুরুতর ব্যাপার। তার ছোট বোন দুটো এতকাল তার সঙ্গে খুব ইয়ার্কি ঠাট্টা করত, আজকাল যেন একটু-আধটু সমীহ করতে শুরু করেছে। বাবা অবধি তেমন হ্যাটা করেন না। তা ছাড়া, তিনি জীবনে কখনও প্লেনে চড়েন নি বলে ছেলের কাছে মর্যাদার লড়াইতে একটু পিছিয়ে আছেন। তবে ছেলের তথাকথিত উন্নতিতে তিনিও যথেষ্ট খুশি। আর মা! মা তো সিদ্ধেশ্বর যা করে তাই দেখেই মুগ্ধ।

এই পরিবারের বন্ধনীর মধ্যে ফিরে এলে সিধু যেন বুক ভরে দম নেয়, বেঁচে থাকা যে কী ভালো তা উপলব্ধি করে।

দরজা খুললেন বাবা।

সিধুর মুখে আতঙ্ক আর উদ্বেগটা ভালোই ফুটেছে বোধহয়। কারণ বাবা তাকে দেখেই বলে উঠলেন, কীরে তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

সিধু মাথা নেড়ে বলে, ও কিছু নয়। একটু টায়ার্ড।

হাতে দুটো অ্যাটাচি কেসও সন্দেহজনক। তবে তা নিয়ে কথা উঠল না। সিধু খানিকটা যান্ত্রিকভাবেই ঘরোয়া পোশাক পরল, মায়ের কথার জবাব দিল, বোনদের সঙ্গে কথা বলল, খেল এবং তারপর দুটো অ্যাটাচি কেস বয়ে নিয়ে মই বেয়ে ছাদে উঠল। ছাদে ওঠার পর মইটা তুলে ছাদে রাখতে হয়, নইলে চোরের জো।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বেলে সে বিছানার ওপর সামু ঘোষের অ্যাটাচিটা নিয়ে বসল, কম্বিনেশন লক, সুতরাং সহজ উপায়ে খুলবে না। সামুর দেওয়া কার্ডখানা নাড়ানাড়ি করতে গিয়ে উল্টো পিঠে দেখল, ডট পেন দিয়ে তিনটে নম্বর লেখা, দুই শূণ্য তিন।

নম্বরটা মেলাতেই ডালা আলগা হল। ভেতরে নানা জিনিসপত্র, কিন্তু সবার ওপরে একটা খাম। খামের ওপরে ডট পেন দিয়ে লেখা, ফর ইউ।

সিধু চিঠিটা খুলল, সাদা কাগজে খুব দ্রুত হাতে ইংরেজিতে লেখা একটা চিঠি ঃ প্রিয় অচেনা মানুষ, দিল্লি বিমানবন্দরের এত মানুষের মধ্যে আমি তোমাকেই চিহ্নিত করে রেখেছি, আশা করছি তুমি কলকাতাগামী বিমানেই উঠবে। তোমাকে চিহ্নিত করছি, কারণ তোমার মুখে একটি সরল বিশ্বস্ত ভালো মানুষের ছাপ আছে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি তা না হয়ে থাকো তবে আমার আর কিছুই করার নেই। শোনো যুবক, আমি বিদেশে প্রবাসী এক বৃদ্ধ। শরীরও ভালো নয়। জীবনে আমি কিছু ভুল ভ্রান্তি করেছি, যেমনটি সবাই করে। আমার অপরাধের মাত্রা কতটা তা এতকাল বিচার করিনি। আজ মনে হচ্ছে, অপরাধ ভয়াবহ।

তোমাকে আজ সবই বলছি, কারণ, আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। রাখঢাক করার মতো মনোভাবও নেই। আমি ত্রিশ বছর আগে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিই। তার আগে আমি এদেশেই বিয়ে করেছি। বউ এবং ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাইনি।

আমাকে অনেক দেশ ঘুরতে হয়েছে জীবিকার জন্য। আমি ডাক্তার, বেশ ভালো ডাক্তার। সুতরাং আমার কাজের অভাব হয়নি। অবশেষে কানাডায় গিয়ে থিতু হলাম। বেশি বলে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। মানুষের নানা দুর্বলতা থাকে। সেইরকমই এক দুর্বলতাবশে কানাডায় আমি আবার একটা বিয়ে করি এক বিদেশিনীকেই। আবার আমার ছেলেমেয়ে হয়।

খবরটা চাপা থাকেনি এদেশে আমার স্ত্রীর কাছে। ঘৃণায় তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক একরকম ছেদ করেন। চিঠি দিতেন না। আমার প্রেরিত টাকা অবধি নিতেন না।

আমিও কালক্রমে এই সম্পর্কহীনতা মেনে নিই।

একরকম চলছিল। তোমাকে বাস্তবিক বলছি, এ কাজের জন্য আমার যথেষ্ট মনোস্তাপ এবং পাপবোধ ছিল। কিন্তু কিছু করার ছিল না।

কয়েক বছর বাদে আমি এদেশে এসেছিলাম আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে চোখের দেখা দেখব বলে। এসে শুনলাম তারা কলকাতার বাস তুলে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। খোঁজ করে যে তাদের বের করব সে সময় আমার ছিল না।

অনেক বছর বাদে, এই বৃদ্ধবয়সে আমার হঠাৎ মনে হল, আমি ভীষণ অন্যায় করেছি। এই অন্যায়ের একটা প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে।

কিন্তু ইচ্ছা এক, হয় আর এক। বিয়ের দশ বছর বাদে আমার বিদেশিনী স্ত্রীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং সেই মামলায় ক্ষতিপূরণ বাবদ আমাকে যা দিতে হয় তাতে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ি। মনোবিকারে আমি প্রচণ্ড মদ খেতে শুরু করি, প্র্যাকটিস প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আমার মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্র্যাকটিসের ওপর স্থগিতাদেশও জারি হয়। ফলে আমি এক অদ্ভুত সংকটের মধ্যে পড়ে যাই। স্বাভাবিক নিয়মে সে সময়ে আমার আত্মহত্যাই করার কথা।

কিন্তু জীবনকে আমি বড় ভালোবাসি। মৃত্যু কখনও কারও অভিপ্রেত হতে পারে না। কিন্তু বেঁচে থাকাও তখন কী যে কঠিন!

ঠিক সেই সময়ে, আমার জীবনের চরম সংকটে একজন নারীর আবির্ভাব ঘটল। যথেষ্ট সুন্দরী, তার চেয়েও বড় কথা, তরুণী। আমার তখন যে অবস্থা তাতে অস্তিত্বের ভগ্নাবশেষ মাত্র বলা যায়। একটি পানশালায় সে ছিল সেবিকা তথা পতিতা। তবে বিদেশে এরাও খুব ফেলনা নয়। আমার শরীরের চাহিদা বিশেষ ছিল না, মানসিক বিপর্যয় ঘটলে তা থাকেও না। মেয়েটি আমাকে ওই পানশালায় আলাদা করে বেছে নিয়েছিল, বিশেষ রকমের মনোযোগ দিত এবং অবসর সময়ে আমাকে সাহচর্য দিত। এইভাবেই একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল।

দৃষ্টি স্বচ্ছ ও বুদ্ধি ক্রিয়াশীল হলে আমি তার মতলব অনেক আগেই বুঝতে পারতাম। তা পারিনি। তবে আমার তো হারাবারও কিছু ছিল না কাজেই ভয় কীসের? কিছুদিন মেলামেশার পর সে একদিন আমাকে টরোন্টোর একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেল, চাকরির লোভ দেখিয়ে। তখন আমার চাকরির দরকারও ছিল, যেমন টাকার জন্য, তেমনি মর্যাদার জন্যও।

কিন্তু চাকরিতে ঢুকবার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমি একটি অত্যন্ত জটিল জালে জড়িয়ে পড়ছি। ক্লিনিকটি খুব ধনী কিছু ব্যক্তির নানা মতলব হাসিল করার একটি মাধ্যম। ক্লিনিকটি খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, ফলে ধনবান ছাড়া এখানে কেউ আসতে পারে না। পৃথিবীর নানা দেশ থেকেই রোগীরা আসে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যবস্থা খুবই ভালো, ফাইভ স্টার হোটেলকেও লজ্জা দেবে। এখানে আরবের শেখ, ভারতীয় শিল্পপতি, জাপানি ধনকুবের বা ইউরোপ, আমেরিকার টাকার কুমিরেরাই ভরতি হয়। আর এদের মধ্যে উজবুক, আত্মীয়-পরিজনহীন এবং নেশাখোর শোকার্ত যারা তাদেরই বেছে বেছে নানারকম নেশা ধরিয়ে দেওয়া, ব্ল্যাকমেল করা, রোগজীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অতি কূটকৌশলে করা হত।

তোমাকে বেশি বলব না। তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট, এই ক্লিনিকের পাপপঙ্কিল অন্ধকার গর্ভগৃহে আমি শয়তানের দোসর হয়ে উঠলাম। বলে রাখি, ক্লিনিকটির সবটুকুই কিন্তু ওরকম নয়। একদিকে অতি উঁচু শ্রেণীর ডাক্তার, অত্যাধুনিক চিকিৎসা, অসাধারণ পরিচর্যারও একটা দিক ছিল। রোগীরা আসে, আরোগ্য হয়, ফিরে যায়। অভাগা কিছু রোগীই হয় বাঘের মুখের শিকার।

কী বলব তোমাকে, রোগী ভরতি হলেই ক্লিনিকের নিজস্ব গোয়েন্দা ও তথ্যবিভাগ তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে একটি বিশেষ কমপিউটারে ভরে দিত। আমরা সেইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের ধনী অতিথিদের দুর্বলতাগুলো খুঁজতাম, পেয়েও যেতাম। আর সেইসব অতিথিদের ঘিরে জাল বিছিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যেত।

ব্ল্যাকমেল করাটা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ধনীদের অর্থনৈতিক অপরাধ ও দুর্নীতি থাকবেই। এগুলিকে খুব সহজেই কাজে লাগানো হত। আর, এ ব্যাপারে আমাকে অগ্রদূতের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। লক্ষ করতাম এখানে সবাই রোগ নিরাময়ের জন্যই শুধু আসে না, ফূর্তি করতেও আসে। সুতরাং ফূর্তির ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। উত্তম মদ্য, সুস্বাদু খাদ্য, সুন্দরী অঙ্গ সংবাহক এবং কামকলানিপুণ শয্যাসঙ্গিনী—কিছুরই অভাব ছিল না। বিকৃত যৌন-অভ্যাস যাদের, তাদের জন্যও ব্যবস্থা ছিল। ড্রাগ আসক্তদের সরবরাহ করা হত অধিক মূল্যে হেরোইন থেকে চরস পর্যন্ত।

অত্যন্ত সংগঠিত এই ক্লিনিকটির জাল কেটে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় আমার ছিল না। পেশাদার খুনিরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের।

তবে হ্যাঁ, টাকাপয়সার ব্যাপারে আমার কপাল আবার খুলে গেল। আমি প্রচুর টাকা পেতে লাগলাম। এমনকী, সৎ একজন ডাক্তার হিসেবে আগে যা রোজগার করতাম তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা আমার হাতে আসতে লাগল। প্রথম প্রথম আমার ক্ষীণ সততা ও আত্মমর্যাদায় একটু বাধোবাধো ঠেকত, কিন্তু সেসব বাধা টাকার প্রবল স্রোতে ভেসে গেল।

এই হেলথ রিসোর্সটির মালিক কে বা কারা তা আমি আজ অবধি জানতে পারিনি। শুধু এটুকু জানি এদের নজর পৃথিবীর সর্বত্র, সব দেশে। বিশ্বময় এদের নানা-শাখা প্রশাখা আছে। এদের পিছনে আছে প্রভাবশালী মানুষেরা।

কোনওও প্রশ্ন করার উপায় ছিল না, কিছু জানবার চেষ্টা করা ছিল বিপজ্জনক। জিনা নামে সেই মেয়েটি এ ব্যাপারে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। আমিও তাই বিনা বাক্যব্যয়ে কাজ করে যেতাম। এখন আমার নীতিবোধ নষ্ট হয়ে গেছে, আমি যান্ত্রিক হয়ে গেছি। ওদেরও এরকমই লোক দরকার, যার নীতিবোধ নেই অথচ নিজের কাজে দক্ষ।

আমার পাপের ইতিহাস তোমাকে জানানোর সময় নেই, ইচ্ছেও নেই। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি তুমি এক সরল যুবা। সংক্ষেপে বলি, আমি যে কাজে নিযুক্ত ছিলাম তার ঝুঁকিও ছিল অনেক। সে ঝুঁকি কতটা এবং কীরকম তা বুঝলাম হঠাৎ একদিন জিনা অসুস্থ হয়ে পড়বার পর। বাইশ বছর বয়সি একটি তরতাজা যুবতীর হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আপাতগ্রাহ্য কারণ নেই। যন্ত্রণাকাতর জিনাকে যখন ক্লিনিকেরই একটি টেবিলে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন সে ফিসফিস করে আমাকে বলেছিল তার হার্ট অ্যাটাক স্বাভাবিক ঘটনা নয়, আকস্মিকও নয়। ওটা ঘটানো হয়েছে।

কী অসাধারণ এদের মানুষকে খুন করার পদ্ধতি! খুনের কোনও প্রমাণই থাকে না। জিনা কী অপরাধ করেছিল আমি জানি না। তবে কানাঘুষো শুনেছি সে তার প্রেমিকদের কারও কাছে বেসামাল মুহূর্তে কিছু একটা বলে ফেলেছিল। এখানে এ ধরনের ভুলের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যু-কিন্তু তা কীভাবে ঘটবে কেউ জানে না। তবে কখনই তা খুন বলে মনে হবে না।

জিনার মৃত্যুর পর আমি ভারী একা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। জিনা ভালো মেয়ে ছিল না ঠিকই এবং সেই-ই আমাকে এই বিপজ্জনক কাজে টেনে এনেছিল। তবু তার কাছ থেকে আমি উষ্ণ সাহচর্য পেতাম। পৃথিবীটা খারাপ ও ভালো দুরকম নিয়েই তৈরি। কাউকে বাদ দেওয়া যায় কি? আর খারাপও সবসময় শতকরা একশো ভাগই খারাপ নয়, ভালোও নয় একশো ভাগ ভালো। জিনার মধ্যে এক উষ্ণ প্রাণচঞ্চল ব্যাপার ছিল সে বেশ্যা এবং দালাল হওয়া সত্ত্বেও। আমি তার প্রেমে পড়িনি ঠিকই, সেরকম মানসিক অবস্থাও আমার ছিল না, কিন্তু তার মৃত্যুর পর এক শূন্যতা আমাকে ঘিরে ধরল। আবার মদের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মদের নেশা তো চিরস্থায়ী নয়।

জিনার মৃত্যুর কিছুদিন পর একটি কিশোর ছেলে হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে হাজির। তার মুখখানায় জিনার মুখের আদল আছে। তাই সে যখন নিজেকে জিনার ভাই বলে পরিচয় দিল তখন অবিশ্বাস হল না। সে মা-বাবার সঙ্গে ওটাওয়ায় থাকে। জিনার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না আর। তবে কিছুদিন আগে তাদের কাছে জিনার একটি চিঠি যায়। শক প্রুফ খামের মধ্যে। চিঠির সঙ্গে একটি অডিও ক্যাসেট ছিল। জিনা তার বাবার কাছে অনুরোধ করেছিল, যদি কোনও কারণে তার ভালোমন্দ কিছু হয় তাহলে যেন ক্যাসেটটা আমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তার বাবা। জিনার এই অনুরোধ রক্ষা করার কোনও ইচ্ছে বা তাগিদ তাঁদের ছিল না। কিন্তু ঘটনার অদ্ভুত যোগাযোগ। কোনও এক সময়ে, জিনার সঙ্গে পরিচয়েরও অনেক আগে, জিনার মা ইউটেরাসের ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য আমার কাছে এসেছিলেন। আমি অপারেশন করে তাঁকে বাঁচিয়ে দিই। জিনার চিঠিতে আমার নাম দেখে তাঁরা ব্যাপারটি উপেক্ষা করতে চাননি, তাই ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

জিনার ভাই বিদায় নেওয়ার পর আমি ক্যাসেটটা চালিয়ে শুনি। কী এমন ব্যাপার যে জিনা এত রহস্যময়ভাবে ক্যাসেটটা আমার কাছে পাঠিয়েছে? আমাকে হাতে হাতে দেয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের মৃত্যুও সে অনুমান করেছে এবং তার মৃত্যুর পরই যাতে আমি ক্যাসেটটা পাই

সে ব্যবস্থা করেছে।

সত্যি কথা বলতে কি ক্যাসেটটা প্রথমবার শুনে আমি কিছু বুঝতে পারিনি, খানিকটা গানের টুকরো, একটু কবিতার লাইন, কোনও বই থেকে কিছুটা পাঠ এইসব। জিনারই কণ্ঠস্বর। সন্দেহ হল এইসব একটা সাংকেতিক বার্তা।

ভয়েস রেকর্ডিংকে কম্পিউটার ডিসকে চালান দেওয়ার একটা জটিল পদ্ধতি আছে, সেটা তুমি বুঝবে না। জিনার সংকেত উদ্ধার করার জন্য আমি বেশ পরিশ্রম করে এ কাজ করি। তারপর কম্পিউটার মারফৎ ডিকোড করতে সক্ষম হই।

যা আমার হাতে এলো তা এক কথায় মারাত্মক। ওই ক্লিনিকের অতিশয় গোপন তথ্যাবলি, নামধাম ঠিকানা সমেত তার অংশীদারদের পরিচয়। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এধরনের ক্লিনিকের ঠিকানা, এদের দালাল ও গোয়েন্দাদের পরিচয় এসবই কোনওভাবে জিনা জানতে পেরেছিল। সেগুলো কোথায় আছে এবং কীভাবে ধৈর্য সহকারে চেষ্টা করলে উদ্ধার করা যাবে জিনা তাই জানিয়ে দিয়ে গেছে।

ক্যাসেটটা আমি নষ্ট করে ফেলি। তবে সংকেতবার্তাটি আমার কণ্ঠস্থ ছিল। আমার স্মৃতিশক্তিও চমৎকার।

আগেই বলেছি, মানুষ হিসেবে আমি এখন এক ধ্বংসস্তূপ। আমার দ্বারা কিছুই হওয়ার নয়।

তাই আমি জিনার সংকেত অনুযায়ী ও কাজে নামিনি। কী দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে? টাকা তো পাচ্ছি। জীবনটাও কেটে যাবে। দুনিয়ার এই অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার দেখছি না।

এসবই অনেকদিন আগের কথা। কম করেও দশ বছর কেটে গেছে।

হঠাৎ একদিন একটি বাঙালি যুবকের আবির্ভাব ঘটল। খুবই আকস্মিকভাবে। সে একদিন সোজা আমার বাড়িতে চড়াও হল এক সকালে। বলল, আমি আপনার ছেলে।

আমি অবাক। ছেলে।

সে বলল, আপনি আমাদের প্রতি ঘোর অন্যায় করেছিলেন।

ছেলেটার হাবভাব বেশ উগ্র এবং অহঙ্কারী। আমার স্ত্রীর স্বভাব এরকমই ছিল। আমি তার কথাবার্তা শুনে দীর্ঘদিন পর ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও আনন্দবোধ করলাম না। তার ঔদ্ধত্যের সামনে নিজেকে অসহায় লাগল। কথাটা তো মিথ্যে নয় যে, আমি তাদের প্রতি ঘোর অন্যায় করেছি।

আমি তাকে বললুম, তোমার কথার জবাব দেওয়ার আগে আমি তোমার পাসপোর্ট দেখতে চাই।

সে একটু বক্র হাসি হেসে বলল, কেন, আমিই যে মনীশ ঘোষ সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না?

সে পাসপোর্ট বের করে দেখাল, খুব খুঁটিয়ে আমি তার পাসপোর্ট দেখলাম। পাসপোর্ট যদি সত্যি কথা বলে তাহলে এ আমারই ছেলে। পাসপোর্টে অজস্র এন্ট্রি, দুনিয়ার কোনও দেশ বাকি নেই। চিন জাপান থেকে শুরু করে গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকা। অতিরিক্ত কাগজ যোগ করতে হয়েছে পাসপোর্টে। দেখলাম কানাডাতেও সে এর আগে চারবার এসেছে।

জিগ্যেস করলাম, তুমি কী কাজ করো যাতে তোমাকে এত দেশ ঘুরতে হয়?

সে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, আমার ব্যাবসা আছে।

কীসের ব্যাবসা?

সে আছে। অনেকরকম।

বুঝলাম সে কথাটার স্পষ্ট জবাব দিতে চায় না। আমি যথাসম্ভব মোলায়েম গলায় বললাম,

এর আগেও তুমি কয়েকবার কানাডায় এসেছ, কখনও তো আমার সঙ্গে দেখা করোনি! কেন?

আপনি কি আমাকে জেরা করছেন?

না। তবে জানবার কৌতূহল হচ্ছে।

আপনার সঙ্গে দেখা করার কোনও ইচ্ছে হয়নি, তাই আসিনি।

ও, তাই বুঝি! বলে আমি চুপ করে গেলাম।

কিছুক্ষণ আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বলল, এবারও আসবার ইচ্ছে ছিল না, বিপদে পড়েই এসেছি।

সত্যি কথা বলতে কি, বিপদের কোনও ছাপ তার মুখে চোখে ছিল না। বললাম, কী বিপদ?

আমার মায়ের হার্ট ভালো নয়। তাঁকে অবিলম্বে ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য আমেরিকায় নিয়ে আসা দরকার। তার জন্য অনেক টাকা লাগবে।

আমি নিজে ডাক্তার, তাই জিগ্যেস করলাম, হার্টের কী অসুখ তা জানো?

হার্ট ব্লক। মেডিকেল রিপোর্ট আমি সঙ্গেই এনেছি। দেখবেন?

দেখি।

দেখুন। বলে সে এক্সরে প্লেট ও নানারকম টেস্ট-এর রিপোর্ট আমাকে বের করে দিল। তারপর বলল, কিন্তু মা আপনার হাতে চিকিৎসা করাতে রাজি নন।

মাথা নেড়ে বললাম স্বাভাবিক। তবে আমি হার্টের সার্জারি করিও না। আমার স্পেশালাইজেশন অন্যরকম। এখন বলো, তোমার কি টাকার দরকার?

সে বলল, হ্যাঁ। তবে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি শুনলে মা আমার মুখদর্শনও করবেন না। আমার অবশ্য সেন্টিমেন্ট বা শুচিবায়ু নেই। আমি মনে করি আপনি দুশ্চরিত্র হলেও আপনাকে প্রায়শ্চিত্তের একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।

ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার ব্যাবসার অবস্থা কেমন? এত দেশ ঘুরে ব্যাবসা করছ, তোমার তো অনেক টাকা হওয়া উচিত।

এবার তাকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল। সামান্য সময় নিয়ে সে বলল, আমার ব্যাবসায় কিছু মন্দা চলছে।

ব্যাবসায় মন্দা তো আছেই। কীরকম মন্দা?

সে এবার বেশ বিনয়ী গলায় বলল, সেটা ঠিক বলবার মতো নয়। তবে মালয়েশিয়ায় আমার একটা প্রজেক্ট ছিল, সেটা ফেল মেরেছে।

তোমার ব্যাবসাটা কীসের তা আমি জানতে চাইছি না। তবে তোমার প্রকৃত আর্থিক অবস্থাটা জানা দরকার।

সেটা জানাতেই আমার আসা। আমার ব্যাবসার জন্যও কিছু অর্থের প্রয়োজন।

আমি একটু হাসলাম। বললাম, কত?

মায়ের চিকিৎসা আর আমার ব্যাবসা এই দুইয়ে মিলিয়ে টুহানড্রেড থাউজ্যান্ড ডলারস। তবে কানাডিয়ান ডলার নয়, আমেরিকান ডলার। আপনার কাছে এই টাকাটা কিছুই নয়।

কী করে জানলে?

আমি জানি।

টাকার অঙ্ক শুনে আমি মনে-মনে পিছু হটলাম। ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা পালটে বললাম, তোমার পাসপোর্টে কলকাতার একটা ঠিকানা আছে। তোমরা কি ওই ঠিকানাতেই এখন থাকো?

কী জানি কেন এ কথায় সে একটু যেন অস্বস্তি বোধ করল। তবে স্মার্ট ছেলে, চট করে সামলে নিয়ে বলল, না সবাই নয়। ব্যাবসার সুবিধের জন্য আমি কলকাতায় থাকি।

বিয়ে করেছো?

না, এখনও নয়।

আমি একটু ভেবে বললাম, তোমার মায়ের অপারেশন কোথায় করবে বলে ঠিক করেছ, সেটা আমাকে বলো। মার্কিন চিকিৎসা জগতে আমার কিছু পরিচিতি আছে। তোমার মায়ের চিকিৎসার খরচ আমি সরাসরি হাসপাতালেই পাঠিয়ে দেব।

তার মানে আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?

সে কথা নয়।

সেটাই কথা। আপনি তো আমার পাসপোর্ট দেখলেন।

মাথা নেড়ে বললাম, দেখেছি। আর এটাও জানি, আন্তর্জাতিক স্মাগলাররা ওরকম ডজন ডজন পাসপোর্ট যোগাড় করতে পারে।

তার মানে এটা ফলস্ পাসপোর্ট?

তা বলছি না। তবে দুলাখ মার্কিন ডলারও অনেক টাকা। টাকাটা হাতছাড়া করার আগে কাকে দিচ্ছি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার।

আপনি নিঃসন্দেহ নন?

না।

ছেলেটি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আপনার সন্দেহের কারণ কি?

কোন কারণ নেই। সন্দেহ আমার স্বভাবগত।

ছেলেটি হঠাৎ একটু হেসে বলল, আপনাকে বাবা বলে ডাকতে রুচিতে বাধে। শুনুন মিস্টার ঘোষ, আপনার সম্পর্কে আমি অনেক খবরই রাখি। আপনি কোন্ ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত তাও জানি। ইন্টারপোলকে যদি জানিয়ে দিই তা হলে আপনি শেষ।

আমি হেসে বললাম, তোমার হাতে যদি আমার মৃত্যুবাণ থেকে থাকে তাহলে বাপু, তুমিও জেনো যে, রেহাই তোমারও নেই। তবে তোমাকে আমি শুধু হাতে ফেরাচ্ছি না। তোমার ব্যাবসার কাগজপত্র আমাকে দেখিও এবং তোমার মাকে যদি আমেরিকায় আনতে পারো তাহলে তুমি যে টাকাটা চেয়েছ তা আমি দেব।

ছেলেটি চলে গেল। বলে গেল, ঠিক আছে। দেখব।

এই ঘটনার পরই একদিন আমার ডাক পড়ল মোসার্টের ঘরে।

মোসার্ট আমাদের ক্লিনিকের একজন কর্মচারী। তার পদমর্যাদা সামান্যই। অত্যন্ত ছোটখাটো ভূগর্ভস্থ ঘরে মোসার্টের অফিস। মধ্যবয়সে ছোটখাটো চেহারার অধিকারী এই মোসার্ট যে কী সাংঘাতিক ক্ষমতার অধিকারী তা আমরা কয়েকজনই মাত্র জানি। প্রকৃতপক্ষে ক্লিনিকের উপরিভাগ ও অন্ধকার জগতের সে-ই হল কো-অর্ডিনেটর। তার চোখের ইশারায় মানুষের আয়ু ফুরোয়। তার ইঙ্গিতেই ফকির রাজা বনে যায়।

মোসার্ট কাউকে অকারণে ডেকে পাঠায় না, ব্যাপারটা গুরুতর না হলে। তাই আমি যখন মোসার্টের ঘরে যাচ্ছিলাম তখন আমার বুক কাঁপছে।

মোসার্টকে দেখে কখনই তার মনের ভাব বোঝার উপায় নেই।

সর্বদাই নীরস তার মুখের ভাব। হাসি নেই বললেই হয়।

তার কণ্ঠস্বর অবশ্য খুব নীচু পরদায় বাঁধা। আমাকে দেখে সে বলল, সুপ্রভাত ডক্টর ঘোষ, বসো।

আমি কাঁপা বুক নিয়ে বসলাম।

মোসার্ট বলল, তোমার শরীর মন সব ভালো তো! কাজকর্মে কোনও অসুবিধে বোধ করছ না তো!

না। বেশ ভালো আছি।

টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনও অভিযোগ নেই আশা করি।

মাথা নাড়লাম। বছরে এরা আমাকে সাড়ে পাঁচ লাখ কানাডিয়ান ডলার দেয়। সুতরাং অভিযোগ থাকার কথাই নয়।

মোসার্ট এবার টপ করে কাজের কথায় এল। বলল, শোনো ডক্টর ঘোষ। তোমার কাছে সম্প্রতি একটি ছেলে এসেছিল। তার নাম মনীশ ঘোষ।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

সে কী চায়?

কিছু টাকা চায়। আমার প্রথমা স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য।

আর কোনও কারণ নেই?

সে তার ব্যাবসার জন্যও টাকা চেয়েছিল।

মোসার্ট একটু নজর করে নিল আমাকে। তারপর বলল, সে তোমার ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিল, সেটা কি তুমি বিশ্বাস করেছো?

বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই করিনি।

মোসার্ট একটা নোট বই খুলে কিছু দেখে নিয়ে বলল, ডক্টর ঘোষ, জিনাকে তুমি নিশ্চয়ই ভোলোনি।

অবাক হয়ে বললাম, না কেন বলো তো!

বেশ কয়েক বছর আগে জিনা হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়।

হ্যাঁ, মনে আছে।

সে মারা যাওয়ার পর তোমার কাছে অটোওয়া থেকে জন মোরেল নামে একটি ছেলে দেখা করতে আসে।

হ্যাঁ। মোসার্ট, আমি কিছুই অস্বীকার করছি না।

মোসার্ট তার ক্রুর চোখে আমাকে দেখে নিয়ে বলল, সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের নিয়ম অনুসারে এদের কথা আমাদের কাছে রিপোর্ট করার কথা ছিল, তুমি তা করোনি।

দুঃখিত মোসার্ট। আমার মনে ছিল না।

মোসার্ট অত্যন্ত তিক্ত মুখে বলল, মনে না থাকাটা খুবই বিপজ্জনক ঘোষ। কারণ, ছেলেটি তোমাকে একটি অডিও ক্যাসেট দিয়ে যায়। সেটি তুমি ডিকোডও করেছিলে। তাই না?

আমার বুক ভীষণভাবে কাঁপছিল। বললাম, কিন্তু আমি তো...

মোসার্ট বলল, জানি ঘোষ। তুমি ডিকোড করেও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করোনি। সেজন্যই আজও তুমি স্বাস্থ্যবান রয়েছো। কিন্তু এ ছেলেটির আগমন সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি ছেলেটিকে গুরুত্ব দিইনি।

কিন্তু আমরা দিচ্ছি। ছেলেটি কে জানো?

না। তার পাসপোর্ট ছাড়া আর কিছুই আমি দেখিনি।

ছেলেটি তোমার ছেলে নয়। তবে সে পুলিশের লোকও নয়। সে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি দলের প্রতিনিধি। খুব চালাক-চতুর, সাহসী। তোমাকে ভেঙে ফেলতে তার খুব বেশি সময় লাগবে না।

তার মানে?

মোসার্ট আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল, ডক্টর ঘোষ আমরা সর্বদাই তোমার খোঁজখবর রাখি। আমাদের ক্লিনিক সম্বন্ধে জিনা যে তোমাকে সবকিছুই জানিয়ে গেছে তাও আমরা জানি। তোমার বেঁচে থাকা তাই প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তবু যে তুমি বেঁচে আছো

তার কারণ জিনার ইনফর্মেশন তুমি কখনও কাজে লাগানোর চেষ্টা করোনি। কিন্তু এই জুনিয়র ঘোষ, এ কিন্তু খবর রাখে যে, তোমার কাছে আমাদের মরণ কাঠি রয়েছে। বুঝতে পারছ?

পারছি। একটু একটু।

সে তোমার ছেলের পরিচয় দিয়ে এসেছিল। হয়তো চেয়েছিল তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে নরম করে ফেলতে। তারপর ধীরে-ধীরে তোমার কাছ থেকে জিনার দেওয়া ইনফর্মেশন বের করে নেওয়া কঠিন কাজ নয়।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, সে ভয় নেই মোসার্ট। বলবার সময় আমার গলা কেঁপে গেল। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম, আমার আয়ু বেশিদিন নয়। কারণ, আমার কাছে সত্যিই এদের মৃত্যুবাণ রয়েছে।

কেন ভয় নেই ডক্টর ঘোষ?

কারণ সেইসব ইনফর্মেশন আমি ভুলে গেছি। অনেকদিন আগেকার কথা।

মোসার্ট মাথা নেড়ে বলে, তোমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। কোনও কিছুই তুমি ভোলো না। আমরা তোমার কথার ওপর নির্ভর করতে পারি না।

আমি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলাম না। আমার হাত-পা দৃশ্যতই কাঁপছিল।

মোসার্ট বলল, তুমি খুবই ভয় পেয়েছো ডক্টর ঘোষ। ভয় থাকা ভালো। তবে বুঝতেই পারছো তুমি আমাদের সংস্থার পক্ষে অতি মাত্রায় বিপজ্জনক হয়ে উঠেছ।

আমি শুধু বলতে পারলাম, না, না, না, না...

এনাফ ডক্টর ঘোষ। শোনো, তোমার অবস্থা বিবেচনা করে আমরা তোমার প্রতি দয়ার্দ্র আচরণই করব। ইট ইজ এ কর্পোরেট ডিসিসন যে, তোমাকে আর এই সংস্থায় রাখা যায় না।

তাড়িয়ে দেবে?

না, তাড়িয়েও দেব না। তোমাকে আমরা আর একটা হেলথ রিসোর্টে বদলি করছি। তুমি হবে সেখানকার আর এম ও। সেখানে বাইরের কেউ তোমার নাগাল পাবে না। বাকি জীবনটা সেভাবে কাটাতে তোমার কেমন লাগবে?

আমি বাঁচতে চাই।

মনীশ ঘোষ নামে সেই ছেলেটির ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই করব। একটু সময় লাগবে। তার কারণ তার পেছনে একটি মস্ত বড় দুষ্টচক্র আছে। সুতরাং কাজটা সাবধানে করতে হবে।

বুঝেছি।

এবার তুমি যাও। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখো। যে-কোনও মুহূর্তে তোমাকে আমরা সরিয়ে নিয়ে যাব। বাড়ি থেকে বেরিও না।

যথা আজ্ঞা। বলে আমি বেরিয়ে এলাম। ভয়ে আমার টাকরা অবধি শুষ্ক। বুক কাঁপছে। চোখ অন্ধকার দেখছি।

খুবই অন্যমনস্ক ছিলাম। গাড়ি চালিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি তখন হাইওয়ে ছেড়ে টার্নপাইকে নামবার সময় জঙ্গলের ধারে হঠাৎ বিশাল একটা ট্রাক উলটোদিক থেকে এসে আমার গাড়িতে একটা মৃদু ঠোক্কর দিল। কিছুক্ষণের জন্য সেই ধাক্কায় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমার সামনে দাড়িওয়ালা একটা মুখ।

কে?

ভয় পাবেন না। আমি মনীশ।

কিন্তু আমি তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম।

সেটা ঘটানো হয়েছিল। এবার মন দিয়ে শুনুন। এভাবে ছাড়া আপনার সঙ্গে যোগাযোগের উপায় নেই। আপনাকে যারা গাড়িতে ফলো করেছিল তাদের গাড়িটা ক্র্যাশ করে দেওয়া হয়েছে।

দু'জনের কেউ বেঁচে নেই।

তুমি কে?

আমি মনীশ। মনীশ ঘোষ।

তুমি আমার ছেলে নও।

আপনি না মানলে নই। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি বাস্তবিকই আপনার ঔরসজাত সন্তান। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আপনি ঘোরতর বিপন্ন।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, জানি।

আপনি যে কুকর্ম করেছেন তার ফলভোগ আপনাকে করতেই হবে। আমি আপনাকে উদ্ধার করতে আসিনি। কিন্তু চরম দণ্ড ভোগ করার আগে আপনার উচিত প্রায়শ্চিত্ত করা।

তুমি দু'লাখ ডলার চাও?

মনীশ মাথা নাড়ল, এক ডলারও নয়। টাকার কথা বলে আমি আপনাকে বাজিয়ে দেখছিলাম মাত্র। আমার মায়ের হার্টের অসুখ নেই।

তা হলে?

আমি ইন্টারপোলের লোক।

আমি দিন-দুপুরে ভূত দেখে চেয়ে রইলাম।

মনীশ আবার বলল, বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে।

বিশ্বাস করছি।

তাহলে জিনা আপনাকে যা জানিয়ে গিয়েছিল সেটি আমাদের কাছে জানিয়ে দিন।

ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা অন্তত করুন।

আমার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। মনীশ তা দেখে বলল, দেখুন, চোখের জল ফেলার সময় পরে পাবেন। এখন কিন্তু সে সময় নেই। আপনি যদি আর আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি না ফেরেন তবে মোসার্টের সন্দেহ হবে। সেখানেও নজরদার আছে।

আমি ধীরে-ধীরে তার কাছে জিনার দেওয়া কোড বলে গেলাম। সে একটা ছোট্ট রেকর্ডারে তুলে নিল। তারপর বলল, ধন্যবাদ। এবার গাড়ি চালিয়ে চলে যান। আপনার একটা হেডলাইট ভেঙেছে, আমাদের ট্রাকের নম্বরটা নিয়ে নিন। ইনসিওরেন্স ক্লেম করবেন। তাতে অ্যাক্সিডেন্টটা সত্য বলে প্রমাণ হবে।

শোনো মনীশ...

আর কোনও কথা নয়।

একটা কথা, ওরা তোমাকেও....

জানি, কিন্তু আপনার মতো আমার মৃত্যুভয় নেই।

আমি বললাম, তোমার হয়তো নেই, কিন্তু তোমার মৃত্যুর আশঙ্কা আমার আছে। হয়তো আমি অপদার্থ বাবা, তবু ছেলের জন্য বাপের ওটুকু হতেই পারে। মনীশ তুমি পালাও।

মনীশ হাসল, আমাদের প্রফেশনে পালালে চলে না। আপনি বাড়ি যান।

আমি শেষবারের মতো আমার ছেলের মুখখানা দেখে নিয়ে অসুস্থ এবং নার্ভাস অবস্থায় গাড়ি ছেড়ে দিলাম। জগৎ বড় নিষ্ঠুর। আর তা মর্মে-মর্মে অনুভব করছি।

বাড়িতে ফিরে আসার পর খানিকটা হুইস্কি গিলে যখন ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করছি তখনই হঠাৎ মোসার্টের ফোন এল, ডক্টর ঘোষ পথে কী হয়েছিল?

কাঁপা গলায় বললাম, একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

কীরকম অ্যাক্সিডেন্ট?

একটা ট্রাক ধাক্কা মেরেছিল।

কীরকম ট্রাক?

কার ডেলিভারি ট্রাক।

নম্বর নিয়েছ? বলো তো?

বললাম। মোসার্ট বলল, কোনও সন্দেহজনক কিছু মনে হয়েছে?

না। আমি তোমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই আনমনা ছিলাম।

খুব স্বাভাবিক।

আমি মৃদু স্বরে বললাম, ট্রাকটা আমাকে ধাক্কা মারার পর টাল সামলাতে না পেরে আমার পিছনে আরও একটা গাড়িতে ধাক্কা মারে।

মোসার্ট উদ্বিগ্ন গলায় বলে, সে গাড়িটা দেখেছো?

না, আমি নিজেই কিছুক্ষণের জন্য অচৈতন্য হয়ে পড়ি। জ্ঞান হওয়ার পর দেখি, ওই কাণ্ড। আমি ট্রাকটার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু লোকটা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, কথা বলতে পারছিল না। আমি ট্রাকটার নম্বর নিয়ে চলে এসেছি।

সর্বনাশ! গাড়িটা দেখতে পাওনি?

না। তবে তালগোল পাকিয়ে গেছে বলে মনে হল।

পরে কথা হবে ডক্টর ঘোষ। ছাড়ছি।

কি জানি কেন, সেই বিকেলে হঠাৎ আমার মৃত্যুভয় কেটে গেল। আমার ছেলে ঘোরতর বিপন্ন। সে ডাকাবুকো, কিন্তু তার মঙ্গলের কথা আমাকেই চিন্তা করতে হবে।

আপাতত আমি গৃহবন্দি, নিশ্চিত মোসার্টের লোক আমার ওপর নজর রাখছে। আমার টেলিফোনও ওরা ট্যাপ করে রেখেছে নিশ্চিত। তবু আমি আমার রিভলভারটা বের করলাম এবং গুলি ভরে রাখলাম।

গভীর রাতে আমি বাড়ির বেসমেন্টে নেমে গেলাম। সদর দরজা বা পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে গেলে বিপদ আছে। বেসমেন্টে নেমে একটা স্কাইলাইটের কাঁচ ভেঙে ফেললাম। এই স্কাইলাইটের লাগোয়া একটা র‍্যাসপবেরির ঝোপ ছিল। কাজেই গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে আসতে অসুবিধা ছিল না, রাতটাও ভাগ্যক্রমে ছিল অন্ধকার। আর বাগানে ছিল অযত্নে বর্ধিত আগাছা। হামাগুড়ি দিয়ে আমি অনেকটা পথ পেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে এসে জোর পায়ে হাঁটা ধরলাম। আমার বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

বাড়ি থেকে মাইল দুই দূরে একটা করে রেন্টাল এজেন্সি আছে। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে আমি রওনা হলাম।

আশ্চর্যের বিষয়, জীবনে প্রথম আমি সরাসরি একজন মানুষকে খুন করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমার কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। কোথা থেকে দুর্জয় এক সাহস এসে ভর করেছে আমার ওপর।

মোসার্ট ক্লিনিকেই থাকে। তবে দুর্ভেদ্য এক অবরোধে। তার কাছে পৌছোনো সহজ কথা নয়। ক্লিনিকে মানুষ প্রহরী বিশেষ নেই, কিন্তু আছে ইলেকট্রনিক প্রহরী। আছে অ্যালার্ম সিস্টেম। আছে এন্ট্রি কার্ডের নিরাপত্তা।

তবে আমি সেখানকার কর্মচারী বলে কারও সন্দেহ হওয়ার কথা নয়! আর ক্লিনিকের গর্ভগৃহে ঢুকবার কৌশলও আমার জানা।

তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। ক্লিনিকের বাইরে গাড়ি রেখে আমি পায়ে হেঁটে ক্লিনিকে ঢুকলাম। তারপর রিসেপশন পার হয়ে ইনার জোনে পৌঁছলাম। পকেটে ভারী রিভলবার। হাত-পা কাঁপছে। কিন্তু তবু তেমন ভয় করছে না। মোসার্টকে আমার মারতেই হবে।

ইনার এরিয়ার এন্ট্রি কোড আছে। সপ্তাহে কোড পাল্টে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা কোনও বাধা নয়। আসলে কথা হল, কে কাকে আগে দেখতে পাবে। মোসার্ট আমাকে? না আমি মোসার্টকে। জানি, মোসার্ট আমাকে দেখামাত্র চোখের পলকে ব্যবস্থা নেবে। আমার বয়স হয়েছে। রিফ্লেক্স ভালো নয়। সুতরাং ঈশ্বর সহায় থাকলে মোসার্টকে আমিই প্রথম দেখতে পাব।

ইনার এরিয়ার ঢুকতে বেগ পেতে হয়নি। লম্বা করিডোর। দুপাশে বন্ধ দরজার সারি। উজ্জ্বল আলো। ছাদে চার জায়গায় অন্তত চারটে টিভি ক্যামেরার মুখ বসানো। কেউ ঢুকলেই তা মনিটরও হয়ে যাবে। তবে ভরসা এই যে, আমি হলাম চেনা মুখ। ডক্টর ঘোষের মতো নিরীহ আর ভীতু লোককে সন্দেহ করার কিছু নেই।

আমি একটু টলতে-টলতে গিয়ে মোসার্টের দরজার কাছে দাঁড়ালাম। দরজা লক করা নেই। থাকার কথাও নয়।

আমার বয়সের পক্ষে যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে আমি দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

ঢুকে যা দেখলাম তা যেমন করুণ তেমনই জঘন্য। মোসার্ট একইসঙ্গে দুটি অত্যন্ত অল্পবয়সি মেয়ে—যাদের বালিকা বললেই চলে—তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় কামোন্মত্ত সময় কাটাচ্ছে। যৌন বিকৃতি কাকে বলে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। মেয়ে দুটির বয়স বারো-তেরোর বেশি হবে না। আমাকে দেখে তিনজনেই হতভম্ব। মেয়েদুটি যে কাঁদছিল তা তাদের মুখ দেখেই বুঝলাম। এও বুঝতে বাকি থাকল না, মোসার্টের বিকৃত কাম চরিতার্থ করতে এদের জোর করে ধরে আনা হয়েছে।

ওই অবস্থায় না পেলে অবশ্যই চিতাবাঘের মতো তৎপর মোসার্ট আমাকে খুন করত। আমি ভাগ্যবান যে, কয়েক মুহূর্ত বেশি সময় পেয়েছিলাম।

মোসার্ট চকিতে মেয়েদুটিকে টেনে নিজেকে আড়াল করে পাশের টেবিলে বা কোথাও হাত বাড়িয়েছিল তার অস্ত্রের জন্য।

আমি ঠান্ডা মাথায় একটুও তাড়াহুড়ো না করে বিছানাটা ঘুরে মোসার্টের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খুব কাছ থেকে গুলি করলাম তার মাথায়। মাথার খুলি ছিটকে গেল চতুর্দিকে।

মেয়ে দুটো আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। আমি তাদের বললাম, কোনও ভয় নেই। জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এসো। বাড়ি যাও।

তারা জামাকাপড় পরল কাঁপতে-কাঁপতে আর ফোঁপাতে-ফোঁপাতে, তার মধ্যেই একজন বলল, তোমাকে ধন্যবাদ।

জীবনে প্রথম খুন করার পর মানুষ কতটা স্বাভাবিক থাকতে পারে? আমি কিন্তু পরিণত বয়সে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধটি করার পরও খুব স্বাভাবিক ছিলাম। আমার হাত পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে, মাথা বিস্ময়কর রকমের ঠান্ডা এবং বুদ্ধিও ক্রিয়াশীল। পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা মোসার্টের মৃতদেহ রক্তের নদীতে ভেসে যাচ্ছে। আমি কার্পেটের শুকনো অংশে জুতোর রক্ত মুছে নিলাম। মেয়ে দুটোর অবস্থা দেখে ধমক দিয়ে বললাম, অত নার্ভাস হচ্ছো কেন? একটা পাগলা কুকুরকে যা করা উচিত তাই করেছি।

মেয়ে দুটি এ কথায় সান্ত্বনা পেলো না, কিন্তু ভয় পেয়ে জড়সড়ো হয়ে গেল।

একটি মেয়ের গালে ও অন্যটির হাতে রক্তের ছিটে লেগেছিল। বললুম, বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে এসো। তারপর শান্তভাবে স্বাভাবিক পায়ে বেরিয়ে যাবে আমার সঙ্গে। আমি তোমাদের পৌঁছে দেব। কিন্তু যদি নার্ভাস হও তাহলে কপালে হাজতবাস আছে।

ওরা শান্ত পায়েই আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল। আমার দুজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। টিভি ক্যামেরাতে অবশ্যই আমাদের তিনজনকে মনিটর করা হয়েছিল। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

মোসার্টের ঘরে প্রায়ই বালিকাদের ধরে আনা হয়। আর আমি তো এখানকার জলভাত।

বেরিয়ে এসে মেয়ে দুটিকে যার যার বাড়ি পৌঁছে দিলাম। শুধু সাবধান করে দিলাম, যা দেখেছে তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে। ওরা ঘাড় নাড়ল। মুখ দেখে মনে হল, তারা মরে গেলেও মুখ খুলবে না। আর খুললেই বা কী? ফাঁসি হবে তো। তাতে আমার কোনও উদ্বেগই নেই। মৃত্যুভয় আমার কেটে গেছে।

টরোন্টো অবশ্য বড়লোকদের শহর। কিন্তু এখানেও গরিবগুর্বো ভবঘুরেদের জন্য বেজায় সস্তা ব্যবস্থা আছে। ডরমিটারি বা পাইকারি ব্যবস্থায় রাত কাটানো যায়। আমি সেইরকম একটা আস্তানা খুঁজে বের করলাম রাত কাটানোর জন্য। মোসার্টের মৃত্যুর পর নিজের বাড়িতে রাত কাটানো বিপজ্জনক। এখনও কিছুদিন আমাকে বেঁচে থাকতে হবে আমার ছেলে মনীশের জন্য। আমি জানি, জিনার দেওয়া যে কোড আমি মনীশকে বলেছি তা ভেঙে সমস্ত তথ্য উদ্ধার করতে আইনসঙ্গতভাবে অনেক সময় লেগে যাবে। সে কাজে ঝুঁকিও আছে। কিন্তু আমি ভেতরকার লোক। আমি সহজেই পারব।

পরদিন সকালে আমার কাজের সময়ে আমি ক্লিনিকে হাজির হয়ে গেলাম। ভাবখানা এমন, যেন কিছুই জানি না। জানতাম মোসার্টের হত্যাকাণ্ডের জন্য এরা পুলিশ ডাকবে না। ডাকলে গর্তের ইঁদুর বেরিয়ে পড়তে পারে। মোসার্টকে কে মেরেছে সেটা এরা নিজেরাই খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে। আমার ভয় ছিল, এদের টিভি ক্যামেরার চোখ কতটা কী রেকর্ড করে রেখেছে।

ক্লিনিকে গিয়ে কিছুক্ষণ চোখ কান খোলা রেখে বুঝতে পারলাম, মোসার্টের মৃত্যুর কথা এখনও জানাজানি হয়নি। বন্ধ ঘরে এখনও তার লাশ পড়ে আছে। আমি সময় নষ্ট না করে চটপট আমার প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম। পরে ধরা পড়ি ক্ষতি নেই, কিন্তু এক্ষুণি ধরা পড়লে আমার চলবে না। আমার সময় চাই। মনিটারিং রুমের অপারেটররা সারাক্ষণ টিভি স্ক্রিনের দিকে চেয়ে থাকে না। তার দরকারও নেই। সব কিছুই রেকর্ড হয়ে থাকে। প্রয়োজনে স্পুল চালিয়ে দেখা হয়। রাতের রেকর্ডিংটা আমার সরিয়ে ফেলা দরকার। মোসার্টের খুন ধরা পড়লেই ওরা রেকর্ড চালিয়ে দেখবে কে ওই সময়ে ওর ঘরে ঢুকেছিল। আমি ধরা পড়ে যাব।

মনিটারিং রুম কোথায় তা আমার জানা, তবে ও ঘরে যাওয়ার তেমন কোনও প্রয়োজন হয় না। হঠাৎ সেখানে আমাকে দেখলে অপারেটরদের সন্দেহ হতে পারে।

কিন্তু প্রটোকল নিয়ে মাথা ঘামানোর উপায় এখন আমার নেই। আমি সোজা গিয়ে মনিটরিং রুমে ঢুকে পড়লাম। নাইট শিফটের দুজন বিদায় নিয়েছে। মর্নিং শিফটের দুজন কফির কাপ হাতে বসে বসে হাই তুলছে। তাদের মধ্যে একজন আমার মুখচেনা। হাসি মুখে বলল, হাই ডক, এনি ট্রাবল!

আমি একটা যা খুশি অজুহাত দিয়ে মনিটারিং মেশিনের সামনে বসে গেলাম। দু'জন অপারেটর অবশ্য তেমন গ্রাহ্য করল না আমাকে। তোমাকে বিস্তারিত বোঝানোর দরকার নেই। মেশিন থেকে আমি একটা স্পুল খুব সহজেই খুলে নিতে পারলাম। ওই স্পুলে ক্যামেরায় আমার ছবি ধরা পড়েছিল।

কাজ শেষ হয়নি। মনিটরিং রুম থেকে বেরিয়ে আমি গিয়ে ঢুকলাম কম্পিউটার সেকশনে। এখানে আমাকে প্রায়ই আসতে হয়। সুতরাং বাধা দেওয়ার কেউ নেই। জিনার কোড ফিড করে দেখলাম, কোনও কম্পিউটারই অ্যাকসেস দিচ্ছে না। অর্থাৎ এগুলোতে ফিড করা নেই। হঠাৎ মনে পড়ল। মোসার্টের ঘরে একটি কমপিউটার আছে সম্ভবত সেটার মধ্যেই আছে এসব তথ্য।

মোসার্টের লাশ নিশ্চয়ই এখন কাঠ হয়ে পড়ে আছে। ও ঘরে আবার ঢুকতে হবে?

কিন্তু উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে!

আমি আবার সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সমস্ত ঘরটা মৃত্যুর হিমে যেন ঠান্ডা হয়ে আছে।

কার্পেটের ওপর পড়ে আছে মোসার্টের লাশ। অন্য সময় হলে ওই দৃশ্য দেখে আমার বোধহয় স্ট্রোক হয়ে যেত। কিন্তু হল না। ছেলের নিরাপত্তার জন্য তখন আমি বাঘ।

কম্পিউটার কোড কিউ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তথ্যাবলি ফুটে উঠতে লাগল। অতি দ্রুত প্রিন্ট আউট বের করে পকেটে পুরে বেরিয়ে এলাম। বুড়ো বয়সে ধকলটা বেশ বেশিই যাচ্ছে। তবু হালকা বোধ করছি, ভয় টয় করছে না। জানি, ধরা পড়বই। তার আগে যতটা সম্ভব যথাকর্তব্য করে নিতে হবে।

মনীশের সঙ্গে দেখা হওয়ার আর কোনও উপায় নেই। অথচ প্রিন্টআউটটা তার হাতে পৌঁছনো দরকার।

আমি আমার অফিস-ঘরে এসে বসলাম এবং সিকিউরিটি ডেকে তখনই বললাম, তোমরা মিস্টার মোসার্টের ঘরে যাও। উনি খুন হয়েছেন।

সিকিউরিটির ইনচার্জ অবাক হয়ে বলল, তুমি ঠাট্টা করছ ডক্টর ঘোষ।

না, ঠাট্টা নয়। একটা বিশেষ ব্যাপারে মোসার্টের সঙ্গে আমার আজ সকালে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আমি তার ঘরে গিয়ে এইমাত্র দেখে এসেছি।

কেন খবরটা আমি ফাঁস করলাম জানো? একটু আগে মোসার্টের ঘরে গিয়েছিলাম, মনিটরে সেটা রেকর্ড হয়েছে। সুতরাং এটা অস্বীকার করা যাবে না। মোসার্টের মৃতদেহ আমি আবিষ্কার করলেও ক্ষতি নেই। কারণ অটোপসিতে মোসার্ট যে মধ্যরাতে খুন হয়েছে তা ধরা পড়বেই। সুতরাং সকাল সাড়ে আটটায় আমি তার ঘরে গিয়ে থাকলেও খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপবে না, কিন্তু যদি খুনটা রিপোর্ট না করি তাহলেই বরং কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হবে। বিপদেও মাথা কেমন কাজ করছিল দেখলে?

মোসার্টের মৃত্যু নিয়ে অবশ্য হই-চই হল না। জানতাম হবে না, পুলিশ এল না, খুব নিঃশব্দে গোপনে লাশ সরিয়ে ফেলা হল। এসব লোকের পরিণতি তো এরকমই হয়।

লাঞ্চে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা এক ট্রাভেল এজেন্টের কাছে হাজির হলাম। সরাসরি হঠাৎ ভারতবর্ষে চলে আসতে চাইলে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাবে। তাই প্রথমে কুইবেকের টিকিট কাটলাম। কুইবেক থেকে নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক থেকে কলকাতা। আমি বড্ড পরিশ্রান্ত। তবু এই এতটা লিখলাম। শুধু কথাটা তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য।

এবার শোনো। টরোন্টো থেকে কিন্তু খুব নিরাপদে আমি বেরিয়ে আসতে পারিনি। বিকেলবেলায় কর্তাব্যক্তিদের ঘরে আমার ডাক পড়ল। তাঁরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমাকে অনেক কিছু জিগ্যেস করলেন। যেমন, আজ সকালে আমাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা যায়নি এবং আমার গাড়িও গ্যারেজে রয়েছে, অথচ আমি অফিসে হাজির হয়েছি—এটা কী করে হল? লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, আমি একটা পতিতালয়ে রাত কাটিয়েছি। তাঁদের প্রশ্ন, কিন্তু বাড়ি থেকে কখন কীভাবে বেরোলে? জবাবে সত্যি কথাই জানিয়ে বললাম, আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে এটা জেনে আমি ভয় পেয়ে গোপনে স্কাইলাইট ভেঙে বেরিয়েছি। তাঁদের প্রশ্ন, কেন? পতিতালয়ে যাওয়াটা তো অপরাধ নয়। জবাবে বললাম, আমি ভারতীয় এবং রক্ষণশীল পরিবারের মানুষ। আমার কাছে ব্যাপারটা লজ্জাজনক। তারা এ জবাবে খুশি হল না।

বুঝলাম, এরপর আমার ওপর কড়া নজর রাখা হবে। হয়তো তৎপর করে দেওয়া হবে পেশাদার ঘাতকদের। আমার কফি, পানীয় জল, খাবার এবং ইত্যাকার যে কোন মাধ্যম দিয়েই মৃত্যুবীজ সঞ্চার করা এদের কাছে কোনও ব্যাপার নয়।

তবে আমি তো মরিয়া। বড়জোর খুন হব। তাতে কী? জীবনে অনেক অপরাধ করেছি, মরতে কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

ছুটির পর ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে আমি আমার ভাড়া-করা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

সেটা ছিল শুক্রবার। উইক এন্ড। সপ্তাহান্তে বেড়াতে যাচ্ছি এমন একখানা ভাব।

এয়ারপোর্টে গাড়ি রেখে বিকেলের প্লেনে কুইবেক রওনা হলাম। অনুমান করছি, অনুসরণকারী ও গুপ্তঘাতকরা কাছাকাছিই আছে। নিউইয়র্কে অবশ্যই এরা আমার ছায়া হয়ে থাকবে এবং কলকাতা অবধিও আমার কোনও নিরাপত্তা নেই। তার কারণ, এদের হাত ভীষণ লম্বা এবং সর্বত্রই এদের জাল পাতা আছে।

তবু আমি নিশ্চিন্ত। যা হওয়ার হবে। শুধু যেন কলকাতায় পৌঁছতে পারি। মনীশকে কলকাতায় পাওয়া যাবে না জানি। তবে প্যারিসে ইন্টারপোলের সদর দফতরে আমি তার নামে একটি মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। তাতে লিখেছি, তথ্যাবলির জন্য কলকাতার ঠিকানায় খোঁজ করো।

দিল্লি অবধি পৌঁছেছি, কিন্তু কেমন সন্দেহ হচ্ছে, আমার শরীরে ইতিমধ্যেই বিষের সঞ্চার ঘটে গেছে। কীভাবে কখন এদের কোন এজেন্ট ব্যাপারটা ঘটায় তা ধরা কঠিন। বিমানে হোস্টেসের হাত দিয়েই হোক বা রেস্তোরাঁয় বেয়ারার হাত দিয়েই হোক বা নিরীহ একটি চিউইং গামের ভেতর দিয়েই হোক এরা অতি নিপুণভাবে কাজটা করে। কিছুতেই রেহাই নেই। তুমি টেরও পাবে না কখন ঘটবে।

তোমার কাছে এই দীর্ঘ চিঠিটা লিখতে হচ্ছে তার কারণ, আমার সন্দেহ, কলকাতায় আমি পৌঁছতে পারব না, যদিও আমি ডাক্তার বলেই অ্যান্টিডোট নিয়ে নিয়েছি। তাতে ক্রিয়াটা বিলম্বিত হবে, কিন্তু এড়ানো যাবে না।

অচেনা যুবক, বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে এখন আর বিশেষ তফাত নেই। আমার জীবনযাপন শেষ হয়েছে। বিমানে উঠে আমি তোমার পাশেই বসব। তোমার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করব। সফল হব কি না জানি না। যদি হই তবে আমি ভাগ্যবান।

তুমি কি মানবতার খাতিরে এ কাজটুকু পারবে? আমার ছেলের কাছে পৌঁছে দেবে প্রিন্ট আউটটা? মনে রেখো এখনই নয়। অপেক্ষা করো। আমার ছেলে যদি প্যারিসের হেড কোয়ার্টার থেকে খবরটা পায় তবে সে নিশ্চিত কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় আসবে। সে এলে তার হাতে পৌঁছে দিও। পারবে না, মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধের অন্তিম এক সদিচ্ছা পূরণে সাহায্য করতে?

না, বিনা পারিশ্রমিকে নয়। অ্যাটাচির ওপরের খোপে মুখ-আঁটা একটি খামের মধ্যে আছে নগদ পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার। এ দেশের পক্ষে অনেক টাকা। এটা তোমার পারিশ্রমিক। দয়া করে এটা গ্রহণ করো। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।—হতভাগ্য সামু ঘোষ।

সিধু চিঠিটা পড়ে হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল। রাত গভীর হয়েছে। ছাদের ঘরে একা বসে তার গা ছমছম করছে। কী করবে সে ভেবে পাচ্ছে না। বিপজ্জনক এই অ্যাটাচি কেসটা সে সঙ্গে না আনলেই পারত।

অ্যাটাচির ওপরের খোপে মুখ আঁটা খামটা পেয়ে গেল সিধু। খুলে দেখল, সত্যিই তার মধ্যে পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার রয়েছে। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট টাকা। সিধু এত টাকার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

কিন্তু সে এও জানে যে, বিধিসম্মত উপায়ে এ টাকার মালিক সে হতে পারে না।

দরজায় খুটখুট শব্দ হল নাকি? সিধু টপ করে বাতি নিবিয়ে দিল। তারপর অপেক্ষা করল। না, কেউ নয়। বাতাসই হবে। ছাদে খুব বাতাস বয়।

সারা রাত এক মিনিটের জন্যও ঘুম এল না সিধুর। কখনও উঠল কখনও শুলো, পায়চারি করল। তারপর বসল, অ্যাটাচিকেসটা হাতড়াতে। নগদ আরও কিছু টাকা, বেশ কয়েকটা ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংকের কার্ড, মহার্ঘ গোটা দুই কলম, কিছু কাগজপত্র, কয়েকটা ওষুধের স্ট্রিপ, ডিজপোজেবল সিরিঞ্জ এবং অ্যাম্পুল, একটা ওষুধের স্প্রে এইসব রয়েছে। একটা চাবির ব্যাগ। আর সেই মারাত্মক

প্রিন্ট আউট। খুব দ্রুত চোখ বোলাতে গিয়েও সিধুর নজরে পড়ল, ভারতবর্ষেরও তিনজন লোকের নাম ঠিকানা তাতে আছে। একজন কলকাতার।

ভোর হতে না হতেই অ্যাটাচিকেসটা নিয়ে নীচে নেমে এল। মাকে বলল, খুব সাবধানে এই বাক্সটা তোমার কাছে রেখো। এটার জন্য কেউ আসতে পারে। কারও হাতে দিও না।

মা ভয় খেয়ে বলে, এ কার বাক্স এনেছিস? কী আছে এতে?

তোমাকে পরে বলব মা। এটা যাঁর বাক্স তিনি এক বুড়ো মানুষ। প্লেনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাক্সটা তার ছেলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা। ছেলে এখন বিদেশে, তবে শিগগিরই আসবে।

তা অত সাবধান করছিস কেন?

কারণ আছে। সব পরে বলব।

নানা দুশ্চিন্তায় সকালবেলাটা আনমনে কেটে গেল। অফিসের সময় হওয়ার একটু আগেই সিধু তার টাকায় ভরতি অ্যাটাচি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর ট্যাক্সি ধরল। সারাক্ষণ তার আজ একটা ভয়-ভয় হচ্ছে। কাল ভিআইপি রোডে যে দৃশ্য দেখেছে তাতে সামু ঘোষের বেঁচে থাকার কথাই নয়। সামু ঘোষের প্রতিদ্বন্দ্বিরা যে কী ভয়ংকর তা সে টের পাচ্ছে।

অফিসের কাজেও আজ সিধুর মন ছিল না। সে অফিস থেকে কলকাতার সবচেয়ে বড় আর বিখ্যাত নার্সিং হোমগুলোতে টেলিফোন করে জানল, গতকাল সামু ঘোষ নামে কেউ ওসব নার্সিং হোমে ভরতি হননি। সামু ঘোষ বিদেশি নাগরিক এবং যথেষ্ট ধনী। নিশ্চয়ই তাঁকে ছোটখাটো নার্সিংহোমে ভরতি করা হবে না। হলেও খোঁজ নেওয়ার উপায় নেই, কারণ ছোট নার্সিংহোম অজস্র। তবে বারো আনা সম্ভাবনাই হচ্ছে, সামু বেঁচে নেই। হার্টের রোগে যদি মারা নাও গিয়ে থাকেন গুণ্ডারাই হয়তো পিটিয়ে মেরেছে।

লালবাজারে এক কাকা আছেন সিধুর, বাবার পিসতুতো ভাই নরেশ। সাহস করে তাঁকে ফোন করল সিধু। কাকা আধঘন্টা সময় নিলেন। তারপর ফোন করে জানালেন, না ও নামে কেউ কাল খুনটুন হননি বা লাশও পাওয়া যায়নি।

সিধু সেদিন বিকেলে একটু আগেভাগেই ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বেরোল।

মনীশ ঘোষের ঠিকানাটা খুব জটিল নয়। পার্ক স্ট্রিটে। ও অঞ্চলে ফ্ল্যাট কেনা বা ভাড়া করা যার তার কাজ নয়। প্রচুর টাকার ব্যাপার।

সিধু পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে বাস থেকে নেমে হাঁটা ধরল। পার্ক হোটেল পেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁ-দিকে একটা মস্ত চত্বরে কয়েকটা পুরোনো ইংরেজ আমলের বাড়ি। তারই একটায় মনীশ থাকে। মনীশ এখনও পৌঁছয়নি নিশ্চয়ই। তবে ফ্ল্যাটটা সিধু দেখে যেতে চায়।

নম্বর মিলিয়ে সে ভেতরে ঢুকে চত্বরটার একদম শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড বাড়িটা দেখতে পেল। এসব অভিজাত বাড়িতে লোকজন বেশি দেখা যায় না। কেমন যেন ফাঁকা, ভূতুড়ে আর নির্জন।

মস্ত দরজা পেরিয়ে ভেতরে সে একটা লিফট দেখতে পেল। তবে লিফটম্যান নেই। লিফটের দরকারও ছিল না। মনীশের ফ্ল্যাট তিনতলায়, নম্বর ওয়ান এ।

কাঠের সিঁড়িতে কোনও কালে জুট কার্পেট পাতা হয়েছিল। এখন সেই কার্পেটের অতি জীর্ণ দশা। সন্তর্পণে সিধু ওপরে উঠতে লাগল। মস্ত বাড়ি, ভেতরটা ছায়াছন্ন, দিনের বেলাতেও যেন অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। দোতলার ল্যান্ডিং-এ এক বুড়ি মেম-সাহেবের দেখা মিলল, বোধহয় বছর পাঁচেকের নাতির হাত ধরে কোথাও যাচ্ছে।

তিনতলায় যখন উঠল সিধু তখনও তার মনে কোনও বিপদের আভাস ছিল না। প্রকাণ্ড ল্যান্ডিং, অনেকটা দূরে-দূরে এক-একটা ফ্ল্যাটের দরজা। দরজায় পেতলের নম্বর প্লেট লাগানো।

সামনেই ওয়ান সি। বাঁ-দিকে একদম কোণের ফ্ল্যাটটাই মনীশের হবে বলে অনুমান করেছিল সিধু। খুব সম্ভব ফ্ল্যাটে মনীশের বউ বাচ্চা আছে। একবার নক করে যাবে নাকি?

সিধু ধীর দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল।

কলিং বেল টিপতে আঙুল উদ্যত করেছিল সিধু, কিন্তু তার আগেই দরজাটা ফট করে খুলে গেল।

সিধু অবাক হয়ে দেখে, সামনেই একটা লোক দাঁড়ানো। লোকটার চেহারা দেখেই মালুম হয়, গতিক সুবিধের নয়। চোখের চাউনির মধ্যে সেই ঠান্ডা নিষ্ঠুরতা যা খুনিদের চোখে থাকে। পাকানো পোক্ত চেহারা আর গালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের শুকনো দাগ।

সিধুকে দেখে লোকটি বলে, কাকে চাই?

এই মানে মনীশ ঘোষ...

দ্বিতীয় একটি লোক প্রথম লোকটির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে সংকেতে বলে উঠল, চিড়িয়া।

সিধু সাবধান হওয়ার সময় পেল না। চোখের পলকে তাকে প্রথম লোকটা জামা ধরে হ্যাঁচকা টানে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সিধু হুমড়ি খেয়ে মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিল। হাতে ভর দিয়ে উঠে অবাক হয়ে বলল, এ কী? আপনারা এরকম করছেন কেন?

বুড়োর অ্যাটাচি কেসটা তুমিই হাতিয়েছ? সেটা কোথায়?

সিধু দারুণ ভয় খেয়ে বলে, আমি! না, আমি কেন হাতাব? কোন বুড়োর কথা বলছেন?

দ্বিতীয় লোকটা সিধুর চোয়ালে একটা ঘুষি মারল আচমকা। সিধু ফের দড়াম করে পড়ে গেল। চোখ অন্ধকার। সংবিৎ অবশ্য কয়েক সেকেন্ডেই ফিরল। মুখের ভেতরে রক্তের নোনা স্বাদ পেল সে। দাঁতে লেগে গাল কেটে গেছে ভেতরে।

এবার সহজে উঠে দাঁড়াল না সিধু। বসেই হাঁ করে চেয়ে রইল লোক দুটোর দিকে। কারা এরা? মনীশ ঘোষের মতো সম্ভ্রান্ত লোকের ঘরে এরকম দুটো ষণ্ডার তো থাকার কথা নয়।

প্রথমজন সিধুর দিকে চেয়ে বলল, তুমিই কাল বুড়োর সঙ্গে প্লেনে এসেছ?

না তো!

অ্যাম্বুলেন্সের লোকটা তোমায় দেখেছে। সে তোমাকে বুড়োর ছেলে বলে ভুল করেছিল। কিন্তু তোমার চেহারার বর্ণনা আমরা জেনে নিয়েছি। সেটা তোমার সঙ্গে হুবহু মেলে। আমরা জানি তুমি সামু ঘোষের ছেলে নও। তুমি কে?

সিধু বুঝতে পারছিল না সত্যি কথা বলবে কি না। সে মাথাটা নেড়ে বলল, আপনারা ভুল করছেন।

সেটা আমরা বুঝব। তুমি কোথা থেকে উদয় হলে আগে সেটা বলো।

সিধু দেখল, লোকদুটোর হাতে কোনও অস্ত্র নেই। অবশ্য সেটা কোনও ভরসার কথা নয়। ওদের যা পেশা তাতে খালি হাতেই সিধুর মতো আনাড়িকে তালগোল পাকিয়ে দিতে পারে।

সিধু চোয়ালে হাত বুলিয়ে বলল, দেখুন, আমি জীবনে মারধর খাইনি। আমাকে একটু দম নিতে দিন।

কথাটার প্রথম অংশটা সত্য নয়। প্রথমত সিধু স্কুলে মাস্টারমশাইদের হাতে এবং দুষ্টু ছেলেদের হাতে প্রচুর মার খেয়েছে। মারপিট তাকে করতেই হয়েছে অস্তিত্বরক্ষার জন্য। অনেককালের অনভ্যাস বটে, তবু এখনও তার শরীর মারের স্মৃতিতে ভরে আছে।

ঘরটা প্রকাণ্ড বড়। বিশাল উঁচু ছাদ। দুটো মস্ত মস্ত ঝাড়বাতি ঝুলছে। চারটে ফ্যান। ঘরে পুরোনো আমলের বার্মা সেগুনের ভারী-ভারী সোফাসেট, কাচ বসানো শো-কেস, মস্ত বড় সেন্টার টেবিল, তাস খেলার টেবিল, অনেক গদি আঁটা চেয়ার, একটা অর্গ্যান আর শ্বেত পাথরের কয়েকটা মূর্তি আছে। দেয়ালে দুটো অস্পষ্ট তৈলচিত্র। ফায়ার প্লেসও রয়েছে। এত বড় ঘর সিধু জীবনে

দেখেনি। তাদের পুরো বাড়িটা এঁটে গিয়েও এ ঘরে আরও জায়গা থাকবে। ভেতরদিকে আরও বেশ কয়েকখানা ঘর আছে। সে আন্দাজ করল, এরা দুজনে মনীশের বাড়িটা দখল নিয়েছে। অপেক্ষা করছে।

সিধু প্রথম লোকটার দিকে চেয়ে বলল, আমি সোফাটায় একটু বসি?

বসতে পারো। তবে চটপট কথাটার জবাব দেবে।

সিধু সন্তর্পণে সোফায় উঠে বসে বলে, কী কথা?

অ্যাটাচিকেসটা কোথায়?

আমার দোষ নেবেন না। অ্যাটাচিকেসটা সামুবাবু আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন।

বাঃ এই তো কথা ফুটেছে। তোমার বাড়ি কোথায়?

বাঘা যতীন। স্টেশনের কাছে।

বাড়িতে কে কে আছে?

মা বাবা আর দুটো বোন।

ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দাও। আমার এই বন্ধু তোমার বাড়িতে যাচ্ছে অ্যাটাচিটা আনতে। ওর সঙ্গে একটা হাতচিঠিও দিয়ে দাও। যতক্ষণ অ্যাটাচি না আসছে ততক্ষণ ছাড়া পাবে না।

সিধু ফাঁপরে পড়ে বলল, কিন্তু সেটা আমার বাড়িতে নেই। আমাদের বাড়ি তেমন ভালো নয় বলে সেটা আমার এক বন্ধুকে রাখতে দিয়েছি।

ঠিক হ্যায়, বন্ধুর ঠিকানা দাও।

সিধু আর মিথ্যে কথা বানাতে পারছিল না, তার অভ্যাস নেই।

তবু সে প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে বলল, আপনারা কী খুঁজছেন একটু বলবেন?

সেটা তোমার জানবার দরকার নেই।

যদি সেটা একটা কমপিউটার প্রিন্ট আউট হয়ে থাকে তবে আগেই জানিয়ে দিই যে আমি কিন্তু সেটার একগাদা জেরক্স কপি করিয়ে অনেকের হাতে দিয়ে দিয়েছি। কেউ না কেউ সেটা পৌঁছে দেবে মনীশের হাতে।

হঠাৎ তৃতীয় একটা কণ্ঠস্বর ঘরের অন্য কোণ থেকে ভেসে উঠল, শাবাশ! এই বুদ্ধি তো আমার মাথায় খেলেনি।

সিধু অবাক হয়ে দেখে, ভেতরদিকের একটা দরজা ধরে সামু ঘোষ দাঁড়িয়ে। শরীর দুর্বল, মুখ ফ্যাকাসে, তবু ঠোঁটে হাসি।

সিধু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, আপনি বেঁচে আছেন।

আছি বাবা, এখনও আছি। কিন্তু কতক্ষণ বাঁচব জানি না।

সিধু উঠতে যাচ্ছিল, প্রথম লোকটা তার মুখে একটা নির্দয় জোরাল চড় কষাল। আর দ্বিতীয় লোকটা সামু ঘোষের কাছে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, শুয়োরের বাচ্চা, এখনও শিক্ষা হয়নি!

এই বলে বৃদ্ধ দুর্বল সামু ঘোষকে মারবার জন্য লোকটা হাত তুলল। সিধু চড় খেয়ে টলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তবু দৃশ্যটা সহ্য করতে পারল না। মস্ত সেন্টার টেবিলের ওপর অন্তত এক কেজি ওজনের একটা অ্যাশট্রে ছিল। সিধু সেটা তুলে নিয়ে চোখের পলকে সজোরে ছুড়ে মারল।

দৈব সহায়, অ্যাশট্রেটা যেন যদিচ্ছাচালিত হয়ে সোজা গিয়ে লাগল লোকটার মাথার পিছন দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল। লোকটা 'বাপ রে' বলে বসে পড়ল মেঝের ওপর।

দ্বিতীয় লোকটা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠার আগেই সিধু পা তুলে প্রাণপণে লোকটার

তলপেটে জুতোসুদ্ধ পায়ে একটা লাথি জমিয়ে দিল।

কিন্তু এ লোকটা মুরগি নয়। লাথি খেয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেও লাফিয়ে পড়ল সিধুর ওপর, দু-হাতে কালান্তক পাশব আর দুর্দান্ত গায়ের জোরওয়ালা এ লোকের সঙ্গে পেরে ওঠার কথা নয় সিধুর।

কিন্তু নির্ভুল শান্ত হাতে অ্যাশট্রেটা ফের কুড়িয়ে নিয়ে নিরুদ্বেগে এগিয়ে এলেন সামু ঘোষ। তারপর দুর্বল হাতেও খুব হিসেব কষে অ্যাশট্রেটা লোকটার মাথায় দুবার বসিয়ে দিলেন। লোকটা সিধুর পায়ের কাছে পড়ে গেল গড়িয়ে।

সামু ঘোষ একটা সোফায় বসে হাঁফাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কথা ফুটল না মুখে। তারপর ধীরে মুখ তুলে বললেন, সরি ফর দা ট্রাবল।

সিধু মাথা নেড়ে বলল কিছু নয়। আপনার ট্রাবল অনেক বেশি।

আমার বিপদ কিছু নয়। আমি ভাবছি মনীশের কথা। এ দুজন পাহারাদারকে ঘায়েল করে কিছু হবে না। ওদের মস্ত গ্যাং। তারা চারদিকে ওৎ পেতে বসে আছে। তুমি যদি প্রিন্ট আউটের জেরক্স কপি করে থাকো তবে বুদ্ধিমানের কাজ করেছো।

সিধু মাথা নেড়ে বলল, করিনি। মিছে কথা বলেছি।

সাবাস। সেটাও বুদ্ধিমানের কাজই হয়েছে। কাগজটা কোথায়?

অ্যাটাচি কেসে। আমার মায়ের কাছে।

সামু ঘোষ বিবর্ণ মুখে একটু হাসলেন, তাহলে বাড়ি গিয়ে তুমি মিথ্যেটাকেই সত্যি করে তোলার চেষ্টা করো। যত টাকা লাগে ওটার পঞ্চাশ ষাটটা জেরক্স কপি করে বন্ধুবান্ধবদের বিলি করে দাও। মনীশের ঠিকানাটা দিয়ে দিও। কেউ না কেউ হয়তো পৌঁছে দেবে। একটা কপি ইন্টারপোলে পাঠিয়ে দিও।

ঠিক আছে, তাই হবে। বলে উঠতে যাচ্ছিল সিধু, এমন সময়ে দরজার নকারে শব্দ হল। কেউ এসেছে।

সামু ঘোষ হতাশায় মাথা নেড়ে বললেন, লাভ নেই। আর লাভ নেই। ওদের অজস্র লোক। ওই এসে গেছে আরও দুজন।

ওরা ক'জন আছে?

সব মিলিয়ে ছ'সাতজন তো হবেই। আশে-পাশে আরও আছে।

তুমি পালাতে পারলেও তোমাকে এখন ফলো করে যাবে ওরা। হয়তো তোমার মায়ের বিপদ ঘটবে।

তা হলে?

নকারে জোরাল অধৈর্যের শব্দ হল।

সামু ঘোষ বললেন, খুলো না। এ দুটো লোককে ওই দিকের কোণার ঘরটায় টেনে নিয়ে যেতে পারবে? তুমিও ওই ঘরেই লুকিয়ে থাকো।

পারব।

সামু সিধু একজন একজন করে দুজন সংজ্ঞাহীন লোককেই কোণের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে।

দরজায় ঘন ঘন শব্দ হচ্ছে।

সিধু ভয়ে ঘামছে বন্ধ দরজার সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে।

সামু ঘোষ দরজা খুললেন।

এ কী? ওরা কোথায়?

ওরা! জানি না তো?

তার মানে?

আমি কিছুই জানি না। শুয়ে ছিলাম। দরজায় নক হচ্ছে অথচ কেউ খুলছে না বলে দরজা খুলতে উঠে এসেছি।

ওরা যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে তবে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করল কে?

হয়তো ওরা আছে। বাথরুমে থাকতে পারে।

বাথরুম! বলে লোকটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত হল, আচ্ছা দেখছি।

লোকটা ভেতরের কোনও ঘরে গেল। সিধু নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সামু ঘোষ ইশারায় ডান দিকের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন।

সিধু অস্ত্র হিসেবে একটা পাথরের মূর্তি ফায়ার প্লেসের ওপর থেকে তুলে নিতে যাচ্ছিল। সামু ঘোষ শশব্যস্তে বললেন, ওটা নয়। ওটা একটা বিউটিফুল পিস অফ স্কালপচার। এই অ্যাশট্রেটা নাও। এটা মোর লেথাল।

লোকটা ভেতরে ঘর থেকে একরকম ছুটে এল, কোথায় ওরা?

দরজার পাশেই গা ঢাকা দিয়েছিল সিধু। বিনা দ্বিধায় লোকটার মুখে ভারী অ্যাশট্রেটা দিয়ে মারল।

সামু ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলেন, আরও একবার। এবার কপালে।

সিধু তাই করল।

লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

সামু ঘোষ নির্বিকার চোখে লোকটাকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, আরও আছে। অনেক। একটা অ্যাশট্রে সম্বল করে কত লড়াই জেতা যাবে সিদ্ধেশ্বর?

সিধু তৃতীয় লোকটাকে ভেতরের আর একটা ঘরে টেনে রেখে এসে বলল, খুব বেশি নয়।

তা হলে?

সেটাই ভাবছি। এখান থেকে পালানোর কোনও উপায় নেই?

না। ওই একটিই দরজা বাইরে যাওয়ার। আর খুব হনুমান হলে জানলা দিয়ে দড়ি বেয়ে নামা যায়, তবে বাইরের পাহারাদাররা দেখে ফেলবে।

আর কোনও উপায় নেই।

সামু ঘোষ মাথা নাড়লেন, না। যদি মনীশ এসে যায় তাহলে অন্য কথা। কিন্তু আমার মনে হয় ওরা যখন প্রিন্ট আউটটা পায়নি তখন চেষ্টা করবে মনীশকে মেরে ফেলতে। সেটা ওদের পক্ষে মন্দের ভালো। ওরা জানে আমি প্রিন্ট আউটটা নিয়ে পালাতে পারব না।

সামু ঘোষ গম্ভীর মুখে বসে রইলেন সোফায়। মুখোমুখি সিধু।

কিন্তু বসে থাকারও কোন মানে হয় না।

সিধু উঠে সাবধানে গিয়ে দরজাটা খুলে উঁকি দিল। করিডোর ফাঁকা। সে ক্ষীণ লিফটের শব্দ শুনতে পেল। সন্ধে হয়ে গেছে, ফ্ল্যাটের লোকেরা কাজকর্ম সেরে ফিরছে। তবে এরা নির্বিরোধ লোক। একটু স্বার্থপরও। কারও কাছ থেকেই সাহায্যের আশা নেই।

## ॥ তিন ॥

একটি লম্বা চেহারার যুবক বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি থেকে দমদম এয়ারপোর্টে এসে নামল। তার হাবভাব খুবই সপ্রতিভ। সিঁড়ি বেয়ে নেমে সে সোজা এয়ারপোর্টে লাউঞ্জে এসে ঢুকেই একটা

টেলিফোন করল। তারপর কোনও দিকে দৃকপাত না করে বেরিয়ে এল বাইরে।

একটা ছোট গাড়ি যেন রিমোট কন্ট্রোলে চালিত হয়ে এসে গেল তার সামনে।

যুবকটি পিছনের সিটে উঠে বসে বলল, দে আর দেয়ার।

গাড়ির চালক সংক্ষেপে বলল, আই নো।

ওদিককার খবর কী?

দে আর দেয়ার অলসো।

ফাইন। চালাও। জলদি।

গাড়িটা হঠাৎ তীব্র থেকে তীব্রতর গতিতে ছুটতে লাগল।

যুবকটির পাশেই একটা স্যাচেল ব্যাগ। অভ্যস্ত নিপুণ হাতে ব্যাগটা খুলে যুবকটি তার মুখের কিছু প্রসাধন সেরে নিল। দশ মিনিট পর দেখা গেল, যুবকটি সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ শিখে রূপান্তরিত হয়েছে।

পার্ক স্ট্রিটে মনীশের ফ্ল্যাটে সন্ধেবেলা অন্য একটি নাটক ঘটেছে। বৃদ্ধ সামু ঘোষ এবং সিধুকে ঘিরে সাতজন সশস্ত্র মানুষ। প্রত্যেকের মুখে চোখেই বিস্ময় এবং ক্রোধ।

সর্দার গোছের একটা তেড়িয়া ছোকরা বলল, এই চিংড়ি মাছের মতো ছেলেটা আর ওই অথর্ব বুড়ো মিলে কালু মন্টা আর পতিতকে ঘায়েল করেছে বলছিস? কলিযুগ কি শেষ হয়ে গেল নাকি? এরা তো ছারপোকারও অধম।

কালুর মাথায় ব্যান্ডেজ। একটু দূরে বিরস মুখে চেয়ারে বসেছিল। বলল, সামনাসামনি হয়েছে নাকি? পিছন থেকে মারল যে।

ছেলেটা গোখরো সাপের মতো ফুঁসে উঠে বলল, না, তা কেন, তোমাকে আগে থেকে নোটিশ দিয়ে অনুমতি নিয়ে তবে মারবে না? কোথাকার জামাই এলেন রে! চারদিকে চোখ রাখতে পারিস না? পিছন থেকে মারল আর উনিও মরা কোলাব্যাঙের মতো চিৎ হয়ে পড়লেন।

কালু মিনমিন করে বলল, মাপ করে দে সুমন্ত।

ফোন বাজছিল। সুমন্ত গিয়ে ফোন ধরে কয়েক সেকেন্ড শুনেই বলল, ঠিক আছে।

তারপর সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল, আসল লোক এসে গেছে। তোরা পজিশন নে। বাইরে যারা আছে তাদের অ্যালার্ট করে আয় তো হীরা।

হীরা নামের ছেলেটি দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

সুমন্ত পকেট থেকে পিস্তল বের করে সিধুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠান্ডা গলায় বলল, ঠিকানা বলো।

সিধু সভয়ে চেয়ে রইল সুমন্তর দিকে। মুখে কথা ফুটল না।

সুমন্ত সোজা তার পিস্তলের নলটা দিয়ে প্রবল এক খোঁচা দিল সিধুর থুতনিতে। সঙ্গে-সঙ্গে থুতনির চামড়া কেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। সুমন্ত ঠান্ডা গলায় বলল, মেরে দেব।

সিধু হাতের তেলোয় ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে যন্ত্রণা সহ্য করল। চোখে জল এসে গেছে। তারপর ধীরে মাথা তুলে ঠিকানাটা বলল।

ওঠো। এই ওকে একটা প্যাড আর কলম দে। ওই টেবিলে আছে। যাও, গিয়ে মাকে একটা চিঠি লেখো যেন পত্রবাহকের কাছে অ্যাটাচিটা দিয়ে দেন। যাও, দেরি কোরো না।

সিধু গিয়ে টেবিলের ওপর রাখা প্যাডে মাকে চিঠি লিখল।

সুমন্ত একজনের হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, মারুতি গাড়িটা নিয়ে চলে যা। সঙ্গে রূপাকে নিস। বেশি ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে যা করতে হয় তাই করবি। দেড় ঘণ্টার মধ্যে ফেরা চাই।

ছেলেটা চলে গেল।

সুমন্ত সামু ঘোষের দিকে চেয়ে বলল, আপনার ছেলে আসছে। তাকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে চালাকির চেষ্টা করবেন না।

আমরা প্রিন্ট আউটটা হাতে পেলে আপনাদের ছেড়ে দেব।

সামু ঘোষ মৃদুস্বরে বলেন, তোমরা সোনমের লোক।

সোনম! সে আবার কে?

প্রিন্ট আউটে সোনম নামে একজনের ঠিকানা আছে। কলকাতার দক্ষিণে, বোধহয় বালিগঞ্জে থাকে। তাই না?

হতে পারে। আমি অত জানি না।

শোনো বাপু সুমন্ত, প্রিন্ট আউটটা হাতে পেলেও আমাদের ছেড়ে দেওয়াটা তোমাদের মতলবে নেই। আমার বা মনীশের বেঁচে থাকাটা তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

দেখুন মশাই, অনেক বকবক করছেন। এবার চুপচাপ বসুন।

আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? আমি ভয়ডর পার হয়ে গেছি।

জানি। আপনার বয়সে মানুষের মৃত্যুভয় তেমন থাকে না। কিন্তু মশাই, নিজের ছেলের জন্য চিন্তা সকলেরই থাকে। মনীশবাবুর কথা একটু ভাবুন।

সামু ঘোষ মাথা নাড়লেন, লাভ নেই।

সুমন্ত একটু হাসল, আপনার মাথায় কেন যে ভূত চাপল কে বলবে। দিব্যি খেয়ে পরে সাহেবদের দেশে আরামে ছিলেন। কেন যে ভীমরুলের চাকে ঢিল দিলেন। আর এই যে ছোকরা সিদ্ধেশ্বর, এরও বুদ্ধি বলিহারি। এ কেন যে প্রিন্টআউটটার জেরক্স কপি করিয়ে বিলি করল কে জানে। ফলে কী হল জানেন? আপনার বা মনীশের আর বেঁচে থাকার অধিকার রইল না। এ ছোকরাকেও আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। আমাদের দুনিয়ার নিয়মটাই এই, কাউকে মেরে কাউকে বাঁচতে হয়।

তবে দেরি করছ কেন? গো অ্যাহেড।

সুমন্ত মাথা নাড়ল, এত তাড়া কিসের? মনীশ আসুক। একটু কথাবার্তা হোক। তারপর তিনজনকে একসঙ্গে ফেয়ারওয়েল পার্টি দেওয়া যাবে।

এই বলে সুমন্ত ঘড়ি দেখে ভ্রূ কোঁচকালো, এত দেরি হচ্ছে কেন রে? মনীশ কি তবে সোজা ফ্ল্যাটে আসছে না? খোঁজ নে তো।

মারুতি গাড়ির আরোহী ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলল, বাইপাস।

ঠিক আছে।

পার্ক সার্কাস কানেক্টরের কাছাকাছি এসে তীব্রগতি গাড়ি একটু শ্লথ হল।

আরোহী যুবকটি পিছন দিকে চেয়ে অন্তত তিনশো গজ দূরে একটা জিপগাড়ি দেখতে পেল। যুবকটি তার ব্যাগ থেকে একটা ছোট চাকতির মতো কিছু বের করে চাকতির গায়ে একটা ডায়াল ঘুরিয়ে আপনমনেই বলল, চার সেকেন্ড। তারপর চাকতিটা রাস্তায় ছুড়ে দিল।

চার সেকেন্ড বাদে পিছনে যে বিস্ফোরণের একটা শব্দ হল তাতে ফিরেও চাইল না যুবকটি।

ড্রাইভার শুধু বলল, বুলস আই। কারেক্ট টাইমিং।

হীরা হাঁফাচ্ছিল, সুমন্তদা, পুরো ফলস ঠিকানা। ও ঠিকানায় এ নামে কেউ নেই।

আন্দাজ করেছিলাম। পিঁপড়েটার পাখা গজিয়েছে মরার জন্য।

বলে সুমন্ত সিধুর দিকে তাকাল।

সিধু শূন্য চোখে চেয়েছিল। তার কিছু করার নেই।

সুমন্ত এগিয়ে এসে বলল, মুখ খুলবে না তো! তাতে কোনও ক্ষতি নেই। তোমাকে আর

মনীশকে মেরে দিলে প্রিন্ট আউটটা অর্থহীন হয়ে যাবে, তা জানো?

জানি।

তাহলে তৈরি হও।

এই বলে সুমন্ত তার পিস্তলটা টপ করে তুলল। সিধু চোখ বুজল।

ঠিক এই সময়ে ছাদের ওপর একটা আওয়াজ হল। বেশ জোরাল আওয়াজ। সুমন্ত ওপর দিকে চেয়ে দেখল, কাঠের ফলস সিলিঙে একটা চৌকো ফোকর দেখা দিয়েছে।

কেউ কিছু বুঝবার আগেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল। তীব্র জ্বালাময়ী ধোঁয়ায় আর আলোর ঝলকানিতে ঘর অদৃশ্য হয়ে গেল সকলের চোখের সামনে থেকে।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল সিধুর তা সে জানে না।

তবে চোখ চেয়ে দেখল, সামনে একজন যুবক দাঁড়িয়ে। সে সোফায় শুয়ে আছে।

পাশের সোফায় সামু ঘোষ। তিনিও শোওয়া, তবে তার দিকে চেয়ে আছেন।

সিধু প্রশ্নাতুর চোখে যুবকটির দিকে চাইতেই যুবকটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি মনীশ ঘোষ। থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।

তার মানে?

আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন। তবে আর ভয় নেই। সোনম এখন আন্ডার অ্যারেস্ট। কিন্তু প্রিন্ট আউটটা আমাদের দরকার।

সিধু উঠে বসল, কিন্তু কাণ্ডটা কী হল?

মনীশ মৃদু হেসে বলল, এরা শুধু মাস্তানি জানে, বুদ্ধি রাখে না। এ ফ্ল্যাট ওরা দখল করেছিল। কিন্তু আমাকে তো নানারকম এসকেপ রুট রাখতে হয়। ওপরের ফ্ল্যাটটাও আমারই। তবে অন্য নামে। দুটো ফ্ল্যাটের মধ্যে যোগাযোগ আছে। ওরা সেটা জানত না। সময়মতো এসে না পড়লে...

আমার লাশ এতক্ষণে মেঝেয়ে পড়ে থাকত।

সাত দিনের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নেপথ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে গেল। আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অনেক ভিআইপি গ্রেপ্তার হলেন, চারজন আত্মহত্যা করলেন, আর দুজন হলেন নিরুদ্দেশ।

সিধু তার পুরোনো চাকরি ছেড়েছে। প্যারিসে একটা ইন্টারভিউয়ের ডাক পেয়েছে সে। ইউনেসকোর একটি সমাজ কল্যাণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ দপ্তরে।

পঁচিশ হাজার ডলার সে সামু ঘোষকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সামু ঘোষ বলেছেন, চরিত্রবানরাই শেষ অবধি জয়ী হয়। তুমিও হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, সামু ঘোষকে বাবা বলে ডাকছে মনীশ। কলকাতার উপকণ্ঠে লেক টাউনের বাড়িতে সামু ঘোষ আজকাল স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের সঙ্গেই বাস করছেন।

# ছায়াময়

ধৃতির রিভলভার নেই কিন্তু হননেচ্ছা আছে। এই ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে তার জীবনে তেমন কোনও মহিলার আগমন ঘটল না, তা বলে কি তার হৃদয়ে নারীপ্রেম নেই? ঈশ্বর বা ধর্মে তার কোনও বিশ্বাসই নেই, তবু সে জানে যে পঞ্চাশ বছর বয়সের পর সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। একজন বা একাধিক জ্যোতিষী তাকে ওই সতর্কবাণী শুনিয়েছে।

রাত দুটো। তবু এখন টেলিপ্রিন্টার চলছে ঝড়ের বেগে। চিফ সাব-এডিটর উমেশ সিংহ প্রেসে নেমে গেছেন খবরের কাগজের পাতা সাজাতে। দেওয়ার মতো নতুন খবর কিছু নেই আজ। বাকি তিনজন সাব-এডিটরের একজন বাড়ি চলে গেছে, দুজন ঘুমোচ্ছে। ধৃতি একা বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে পাজামা। টেলিপ্রিন্টারের খবর সে অনেকক্ষণ দেখছে না। কাগজ লম্বা লম্বা হয়ে হয়ে মেশিন থেকে বেরিয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছে। এবার একটু দেখতে হয়।

ধৃতি উঠে জল দিয়ে দুটো মাথা ধরার বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নেয়। তারপর মেশিনের কাছে আসে। মাদ্রাজে আমের ফলন কম হল এবার, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন, যুগোশ্লাভিয়া ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রশংসা করেছে, ইজরায়েলের নিন্দা করছে আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র। কোনও খবরই যাওয়ার নয়। একটা ছোট্ট খবর কাগজের লেজের দিকে আটকে আছে। প্লেন ক্র্যাশে ব্যাঙ্গালোরে দুজন শিক্ষার্থী পাইলট নিহত। যাবে কি খবরটা? ইন্টার-কম টেলিফোন তুলে বলল—উমেশদা, একটা ছোট প্লেন ক্র্যাশের খবর আছে। দেব?

—কোথায়?

—ব্যাঙ্গালোর।

—ক'জন মারা গেছে?

—দুজন।

—রেখে দাও। আজ আর জায়গা নেই। এমনিতেই বহু খবর বাদ গেল। ত্রিশ কলম বিজ্ঞাপন।

—আচ্ছা।

ধৃতি বসে থাকে চুপ করে। অনুভব করে তার ভেতর হননেচ্ছা আছে, প্রেম আছে, আর আছে সুপ্ত সন্ন্যাস। বয়স হয়ে গেল ত্রিশের কাছাকাছি। ত্রিশ কি খুব বেশি বয়স?

টেলিফোন বেজে ওঠে। এত রাতে সাধারণত প্রেস থেকেই ফোন আসে। উমেশদা হয়তো কোনও হেডিং পাল্টে দিতে বলবে বা কোনও খবর ছাঁট-কাট করতে ডেকে পাঠাবে। তাই ধৃতি গিয়ে ইন্টার-কম রিসিভারটা তুলে নেয়। তখনই ভুল বুঝতে পারে। এটা নয়, অন্য টেলিফোনটা বাজছে। বাইরের কল।

দ্বিতীয় রিসিভারটা তুলেই সে বলে—নিউজ।

ওপাশে অপারেটরের গলা পাওয়া যায়—এলাহাবাদ থেকে পি. পি. ট্রাঙ্ককল। ধৃতি রায়কে চাইছে।

রাত দুটোর সময় মাথা খুব ভালো কাজ করার কথা নয়। তাই এলাহাবাদ থেকে তার ট্রাঙ্ককল শুনেও সে তেমন চমকায় না। একটু উৎকর্ণ হয় মাত্র। তার তেমন কোনও প্রিয়জন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। কাজেই দুঃসংবাদ পাওয়ার কোনও ভয়ও নেই তার।

এলাহাবাদি কণ্ঠটি খুবই ক্ষীণ শোনা গেল—হ্যালো! আমি ধৃতি রায়ের সঙ্গে—

—ধৃতি রায় বলছি।

—মাত্র তিন মিনিট সময়, কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার আছে।

—বলে ফেলুন।

—বলা যাবে না। শুধু বলে রাখি, আমি টুপুর মা। টুপুকে ওরা মেরে ফেলেছে, বুঝলেন? খবরটা আপনার কাগজে ছাপবেন কিন্তু! শুনুন, সবাই এটাকে আত্মহত্যা বলে ধরে নিচ্ছে। প্লিজ, বিশ্বাস করবেন না। আপনি লিখবেন টুপু খুন হয়েছে।

অধৈর্য ধৃতি বলে—কিন্তু টুপু কে?

—আমার মেয়ে।

—আপনি কে?

—আমি টুপুর মা।

—আপনি আমাকে চেনেন?

—চিনি। আপনি খবরের কাগজে কাজ করেন। মাঝে মাঝে আপনার নামে লেখা বেরোয় কাগজে। নামে চিনি।

—আমি যে নাইট শিফটে আছি তা জানলেন কী করে?

—আজ বিকেলে আপনার অফিসে আর একবার ট্রাঙ্ক-কল করি, তখন অফিস থেকে বলেছে।

--শুনুন, আপনার মুখের খবর তো আমরা ছাপাতে পারি না, আপনি বরং ওখানে আমাদের যে করেসপন্ডেন্ট আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

—না, না। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না। টুপুকে মেরে ফেলা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন।

ধৃতি বুঝতে পারে এলাহাবাদি পুরো পাগল। সে তাই গলার স্বর মোলায়েম করে বলল—তাহলে বরং ঘটনাটা আদ্যোপান্ত লিখে ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

—ছাপবেন তো?

—দেখা যাক।

—না, দেখা যাক নয়। ছাপতেই হবে। টুপু যে খুন হয়েছে সেটা সকলের জানা দরকার। খবরের সঙ্গে ওর একটা ছবিও পাঠাব। দেখবেন টুপু কী সুন্দর ছিল। অদ্ভুত সুন্দর। ওর নামই ছিল মিস এলাহাবাদ।

—তাই নাকি?

—পড়াশুনাতেও ভালো ছিল।

অপারেটর তিন মিনিটের ওয়ার্নিং দিতেই ধৃতি বলল--আচ্ছা ছাড়ছি।

—ছাপবেন কিন্তু।

ধৃতির কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। ফোন ছেড়ে সে উঠে মেশিন দেখতে থাকে। বাণিজ্য-মন্ত্রীর বিশাল এক বিবৃতি আসছে পার্টের পর পার্ট। এরা যে কী সাংঘাতিক বেশি কথা বলতে পারে! আর কখনও নতুন কথা বলে না।

টেবিলের ওপর বিছানা পাতা রয়েছে। ধৃতি আর মেশিন পাহারা না দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। সিগারেট শেষ হলেই চোখ বুজবে।

চোখের দুটো পাতা চুম্বকের টানে জুড়ে আসছে ক্রমে। মাথার দিকে অল্প দূরেই টেলিপ্রিন্টার ঝড়ো শব্দ তুলে যাচ্ছে। রিপোর্টারদের ঘরে নিষ্ফল টেলিফোন বেজে-বেজে একসময় থেমে গেল। মাথার ওপরকার বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়েছে সহদেব বেয়ারা। আবছা অন্ধকারে হলঘর ভরে গেল।

সিগারেট ফেলে পাশ ফিরে শুলো ধৃতি। উমেশদা প্রেস থেকে কাগজ ছেড়ে উঠে এল, আধো ঘুমের মধ্যে টের পেল সে।

অনেক দিন আগে স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়েছিল ধৃতি। তখন ব্যাঙ্কের অল্পবয়সী কর্মীদের কয়েকজন তাকে ধরল—আপনি ধৃতি রায়? খবরের কাগজে ফিচার লেখেন আপনিই তো?

সেই থেকে তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। স্টেট ব্যাঙ্কের ওপর তলায় কমন রুম আছে। সেখানে আজকাল বিকেলের দিকে অবসর পেলে এসে টেবিল টেনিস খেলে।

আজও খেলছিল। টেবিল টেনিস সে ভালোই খেলে। ইদানীং সে জাপানি কায়দায় পেন হোল্ড গ্রিপে খেলার অভ্যাস করছে। এতে একটা অসুবিধে যে ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না। বাঁ-দিকে বল পড়লে হয় কোনওক্রমে ফিরিয়ে দিতে হয়, নয়তো বাঁ-দিকে সরে গিয়ে বলটাকে ডানদিকে নিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হয়। তবে এই কলম ধরার কায়দায় ব্যাট ধরলে মারগুলো হয় ছিটেগুলির মতো জোরালো। সে চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য খেলে না, এমনিতেই খেলে। কিন্তু ধৃতি যাই করে তাতেই তার অখণ্ড মনোযোগ।

আর এই মনোযোগের গুণেই সে যখনই যা করে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেয় সে যে কয়েকটা ফিচার লিখেছে তার সবগুলোই ভালোভাবে উতরে যায়। তার ফলে বাজারে সে সাংবাদিক হিসেবে মোটামুটি পরিচিত। নাম বলতেই অনেকে চিনে ফেলে। অবশ্য এর এক জ্বালাও আছে।

যেমন স্টেট ব্যাংকে যে নতুন এক টেকো ভদ্রলোক এসেছেন সেই ভদ্রলোকটি তাকে আজকাল ভারী জ্বালায়। নাম অভয় মিত্র, খুবই রোগা, ছোট্ট ক্ষয়া একটি মানুষ। গায়ের রং ময়লা। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, কিন্তু এর মধ্যেই অসম্ভব বুড়িয়ে রসকষহীন হয়ে গেছে চেহারা। চোখ দুটোতে একটা জ্বলজ্বলে সন্দিহান দৃষ্টি। অভয় মিত্র তার নাম শুনেই প্রথম দিনই গম্ভীর হয়ে বলেছিল—দেশে যত অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে তার বিহিত করুন। আপনারাই পারেন। কে না জানে যে এ দেশে প্রচুর অন্যায় আর অবিচার হচ্ছে। আর এও সকলেরই জানা কথা যে কিছু করার নেই।

কিন্তু অভয় মিত্র ধৃতিকে ছাড়েন না। দেখা হলেই ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকেন—আপনারা কী করছেন বলুন তো? দেশটা যে গেল!

ধৃতি খুবই ধৈর্যশীল, সহজে রাগে না। কিন্তু বিরক্ত হয়। বিরক্তি চেপে রেখে ধৃতি বলে—আমার কাগজ আমাকে মাইনে দেয় বটে, কিন্তু দেশকে দেখার দায়িত্ব দেয়নি অভয়বাবু। দিলেও কিছু তেমন করার ছিল না। খবরের কাগজ আর কতটুকু করতে পারে?

অভয় হাল ছাড়েন না। বলেন—মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা কিছু লিখুন, শয়তানদের মুখোশ খুলে দিন।

অভয় মিত্রের ধারণা খুবই সহজ ও সরল। তিনি জানেন কিছু মুখোশপরা লোক আড়াল থেকে দেশটার সর্বনাশ করছে। শোষণ করছে, অত্যাচার করছে, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, কালো টাকা জমানো থেকে সবরকম দুষ্কর্মই করছে একদল লোক।

—তারা কারা? একদিন জিগ্যেস করেছিল ধৃতি।

—তারাই দেশের শত্রু। আমি আপনাকে অনেকগুলো কেস বলতে পারি।

—শুনব'খন একদিন।

এইভাবে এড়িয়েছে ধৃতি।

আজও টেবিল টেনিস খেলার দর্শকের আসনে অভয় মিত্র বসা। তিনি কোনদিনই খেলেন না। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে বসে থাকেন।

ধৃতি স্টেট ব্যাংকের সবচেয়ে মারকুটে খেলোয়াড় সুব্রতকে এক গেমে হারিয়ে এসে চেয়ারে বসে দম নিচ্ছিল।

অভয় মিত্র বললেন—আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি দেশের ইন্টেলেকচুয়ালরা সি. আই. এর টাকা খায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে নির্বিকারভাবে বলল—খায়।

—সে কথা আপনারা কাগজে লেখেন না কেন?

—আমিও খাই যে। বলে ধৃতি হাসল।

—না-না ইয়ার্কির কথা নয়। আমি আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলি।

ময়নাগুড়িতে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গেল একবার। অতি সৎ লোক। কিন্তু কন্ট্রাক্টররা তাকে কিছুতেই ঘুষ না দিয়ে ছাড়বে না। তাদের ধারণা ঘুষ না নিলে ছোকরা সব ফাঁস করে দেবে। যখন কিছুতেই নিল না তখন একদিন দুম করে ছেলেটাকে অন্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হল। এ ব্যাপারটাকে আপনি কী মনে করেন?

—খুব খারাপ।

—ভীষণ খারাপ ব্যাপার নয় কি?

—ভীষণ।

—এইসব চক্রান্তের পিছনে কারা আছে সে তো আপনি ভালোই জানেন। এইসব চক্রান্ত ফাঁস করে দিন।

—দেব। সময় আসুক।

—সময় এসেছে, বুঝলেন! সময় এসে গেছে। ইন্ডিয়া আর চায়নার বর্ডারে এখন প্রচণ্ড মবিলাইজেশন শুরু হয়ে গেছে।

—বটে? খবর পাইনি তো!

—খবর আপনারা ঠিকই পান, কিন্তু সেগুলো চেপে দেন। আপনাকে আরও জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে নেতাজীর রেগুলার টেলিফোনে কথাবার্তা হয়। নেতাজী সন্ন্যাস ছেড়ে আসতে চাইছেন না। কিন্তু হয়তো তাঁকে আসতেই হবে শেষ পর্যন্ত। আপনারাও জানেন যে নেতাজী বেঁচে আছেন, কিন্তু খবরটা ছাপেন না।

ধৃতি বিরক্ত হয় না। মুখ গম্ভীর করে বলে—তা অবশ্য ঠিক। সব খবর কি ছাপা যায়?

কিন্তু মুখোশ একদিন খুলে যাবেই। সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে।

ধৃতির সময় নেই। আবার নাইট শিফট। ঘড়ি দেখে সে উঠে পড়ে।

ধৃতি আগে থাকতো একটা মেসে। তার বন্ধু জয় নতুন একটা ফ্ল্যাট কিনল বিস্তর টাকার ঝুঁকি নিয়ে। প্রথমেই থোক ত্রিশ হাজার দিতে হয়েছিল, তারপর মাসে-মাসে সাড়ে চারশো করে গুনে যেতে হচ্ছে।

চাকরিটা জয় কিছু খারাপ করে না। সে বিলেতফেরত ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতার একটা এ-গ্রেড ফার্মে আছে। হাজার তিনেক টাকা পায়। কাটছাঁট করে আরও কিছু কম হাতে আসে।

জয়ের বয়স ধৃতির মতোই। বন্ধুত্বও খুব বেশি দিনের নয়। তৃতীয় এক বন্ধুর ওলিম্পিয়া রেস্টুরেন্টে ভাব হয়ে গিয়েছিল। পরে খুব জমে যায়।

জয় একদিন এসে বলল—একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। একটা ঘর আছে, তুমি থাকবে?

একটু দোনা-মোনা করেছিল ধৃতি। মেসের মতো অগাধ স্বাধীনতা তো বাড়িতে পাবে না।

দ্বিধাটা বুঝে নিয়ে জয় বলল—আরে আমার হাউসহোল্ড কি আর পাঁচজনের মতো

নাকি। ইউ বি ফ্রি অ্যাজ লাইট এ্যান্ড এয়ার। মান্থলি ইনস্টলমেন্টটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে ভাই, একা বিয়ার করতে পারছি না। তুমি যদি শেয়ার করো তাহলে আমি বেঁচে যাই।

ওরা ব্যাচেলার সাবটেনান্ট খুঁজছে। ধৃতির চেয়ে ভালো লোক আর কাকে পাবে? ধৃতির আত্মীয়-স্বজন নেই, বন্ধুবান্ধবী নেই। ফলে হুটহাট লোকজন আসবে না।

ধৃতি রাজি হয়ে গেল। সেই থেকে সে জয়ের একডালিয়ার ফ্ল্যাট-বাড়িতে আছে। দু-তলার দক্ষিণ-পূর্বমুখী দারুণ আস্তানা। সামনের দিকের বেডরুমটা ধৃতি নিয়েছে। ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে থাকে। খাওয়া দাওয়া সে বাইরেই সারে। তবে জয়ের বউ পরমা তাকে সকালের দিকে চা আর ব্রেকফাস্ট দেয়। বাড়িতে পার্টি হলে বা জোর খাওয়া-দাওয়া থাকলে ধৃতির বাঁধা নেমন্তন্ন থাকে। ধৃতি প্রতি মাসে দু'শো টাকা করে দেয়।

ধৃতি যখন ফিরল তখন প্রায় সাতটা বাজে। নাইট শিফট শুরু হবে ন'টায়। সময় আছে।

কলিং বেল টিপতে হল না দরজা খোলাই ছিল। সামনের সিটিং-কাম ডাইনিং হলের মাঝখানের বিশাল টানা পরদাটা সরানো। খাওয়ার টেবিলের ওপর প্লেটে পেঁয়াজকুচি করছিল পরমা। আর আঁচলে চোখ মুছছিল।

পরমা দারুণ সুন্দরী। ইদানীং সামান্য কিছু বেশি মেদ জমে গেছে, নইলে সচরাচর এত সুন্দরী দেখাই যায় না। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে পরমা অত্যন্ত সচেতন। কখনও তাকে না সাজা অবস্থায় ঘরেও দেখেনি ধৃতি। যখনই দেখে তখনই পরমার মুখে মৃদু বা অতিরিক্ত প্রসাধন, চোখে কাজল, ঠোঁটে কখনও হালকা কখনও গাঢ় লিপস্টিক, পরনে সবসময় ঝলমলে শাড়ি। তেইশ-চব্বিশের বেশি বয়স নয়।

ধৃতি শিস দিতে-দিতে দরজা দিয়ে ঢুকেই বলল...পরমা কাঁদছ?

—কাঁদব না? পেঁয়াজ কাটতে গেলে সবারই কান্না আসে।

—আমার চিঠি-ফিঠি কিছু এল শেষ ডাকে?

—কে চিঠি দেবে বাবা! রোজ কেবল চিঠি।

—চিঠি দেওয়ার লোক আছে।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে—সে-সব তো আজে-বাজে লোকের চিঠি। কে লেখা ছাপাতে চায়, কে খবর ছাপাতে চায়, কে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। ওসব কি চিঠি নাকি? আপনি প্রেমপত্র পান না কেন বলুন তো?

ধৃতি নিজের ঘরে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে বলে—দ্যাখো ভাই বন্ধুপত্নী, যাদের পারসোনালিটি থাকে তাদের সকলেই ভয় পায়। আমাকে প্রেমপত্র দিতে কোনও মেয়ে সাহস পায় না।

—ইস্। বেশি বকবেন না। নিজে একটি ভীতুর ডিম। মেয়ে দেখলে তো খাটের তলায় লুকোন।

—কবে লুকিয়েছি?

—জানা আছে।

ঠোঁট ওলটালে পরমাকে বড় সুন্দর লাগে। এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। ধৃতি তাই স্থির চেয়ে থাকে একটু। মৃদু একটু মুগ্ধতার হাসি তার মুখে।

কোন মেয়ে না পুরুষদের দৃষ্টির সরলার্থ করতে পারে। পরমা বরং তা আরো বেশি পারে। কেন না সুন্দরী বলে সে ছেলেবেলা থেকেই বহু পুরুষের নজর পেয়ে আসছে।

ধৃতি বলল—পরমা তোমার কেন একটা ছোট বোন নেই বলো তো?

—থাকলে বিয়ে করতেন?

—আহা, বিয়ের কথাটা ফস করে তোলা কেন? অন্তত প্রেমটা তো করা যেত।

—প্রেম করতে কলজের জোর চাই সাংবাদিক মশাই। যত সস্তা ভাবছেন অত নয়।

—বিয়ের আগে তুমি ক'টা প্রেম করেছ? কমিয়ে বলো না, ঠিক করে বলো তো।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে—অনেক। কতবার তো বলেছি।

—কোনওবারই সঠিক সংখ্যাটা বলোনি।

—হিসেব নেই যে।

—সেই সব রোমিওদের সঙ্গে এখন আর দেখা হয় না?

—একেবারে হয় না তা নয়। বলে পরমা একটু চোখ পাকিয়ে মৃদু হাসে।

—তাদের এখন অবস্থা কী?

—প্রথম প্রথম অক্সিজেন কোরামিন দিতে হত। এখন সব সেরে উঠছে। ধৃতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল—বাস্তবিক, একজন সুন্দরী মেয়ে যে কত পুরুষের সর্বনাশ করতে পারে!

—পুরুষরা তো সর্বনাশই ভালোবাসে।

শিস দিতে-দিতে ধৃতি ঘরে ঢোকে। পরমা বাইরে থেকে বলে—চা চাই নাকি?

—দেবে?

খেলে দেব না কেন? আহা, কী কথা!

—দাও তাহলে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট ফিস্কুট দিও না আবার। আমি নেকেড চা ভালোবাসি।

পরমা অত্যন্ত দুষ্টু একটা জবাব দিল—অত নেকেড ভালোবাসতে হবে না।

ঘরে একা ধৃতি একটু হাসল।

তার ঘরটা অগোছালো বটে, কিন্তু দামি জিনিসের অভাব নেই। একটা স্টিলের হাফ-সেকরেটারিয়েট টেবিল জানলার পাশে, টেবিলের সামনে রিভলভিং চেয়ার, তার সিংগল খাটে ফোম রবারের তোশক। মহার্ঘ্য বুককেস। একটা চারহাজারি স্টিরিও গ্রামোফোন, একটা ছোট্ট জাপানি রেডিও। যা রোজগার তার সবটাই কেবলমাত্র নিজের জন্য খরচ করতে পারে সে।

নিকট আত্মীয় বলতে এক দাদা আর দিদি আছে তার। দাদা বেনারসে রেলের বুকিং ক্লার্ক। দিদি স্বামী-পুত্র নিয়ে দিল্লি প্রবাসিনী। সারা বছর ভাই-বোনে কোনও যোগাযোগ নেই। বিজয়া বা নববর্ষে বড়জোর একটা পোস্টকার্ড আসে, একটা যায়। তাও সব বছর নয়। আত্মীয়তার বন্ধন বা দায় নেই বলে ধৃতির খারাপ লাগে না। বেশ আছে। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে, যেবার সে অফিসের কাজে দিল্লি যায়। দিদির বাড়িতে ওঠেনি, অফিস হোটেল-খরচ দিয়েছিল। দেখা হয়েছিল এক বেলার জন্য। ধৃতি দেখেছিল দিদি নিজের সংসারের সঙ্গে কী গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। ভাই বলে ধৃতিকে আদরের ত্রুটি করেনি, তবু ধৃতির নিজেকে পর মনে হয়েছিল। দাদা অবশ্য সে তুলনায় আরও পর। দিদি সেবার একটা দামি প্যান্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য টাকা দেয়, ভাইয়ের হাত ধরে বিদায়ের সময় কেঁদেও ফেলে। কিন্তু দাদা সে-রকম নয়। বছর খানেক আগে বেনারসে দাদার ছেলের পৈতে উপলক্ষ্যে গিয়ে ধৃতি প্রথম বুঝতে পারে যে না এলেই ভালো হত। দাদা তার সঙ্গে তেমন করে কথাই বলেনি, আর বউদি নানাভাবে তাকে শুনিয়েছে তোমার দাদার একার হাতে সংসার, কেউ তো আর সাহায্য করার নেই। খোঁজই নেয় না কেউ। এসব খোঁটা দেওয়া ধৃতির ভালো লাগে না। সে নিজে একসময়ে দাদার পয়সায় খেয়েছে পরেছে ঠিকই, কিন্তু বউদি যখন বলল—তোমার দাদা তো সকলের জন্যই করেছে, এখন তার জন্য কেউ যদি না করে তবে তো বলতেই হয় মানুষ অকৃতজ্ঞ, তখন ধৃতির ভারী ঘেন্না করে ভিখিরিপনা দেখে। কলকাতায় এসে সে দু-মাসে হাজারখানেক টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়।

পরমা নিজেই চা নিয়ে আসে। ধৃতি লক্ষ করে অল্প সময়ের মধ্যেই পরমা শাড়ি পালটেছে। কতবার যে দিনেব মধ্যে শাড়ি পালটায় পরমা।

ধৃতি বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়েছিল। পরমা বিছানার ওপর এক টুকরো পিসবোর্ডে চায়ের কাপ রেখে রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে-খেতে বলল—আজ নাইট শোতে সিনেমায় যাচ্ছি।

—জয়কে খুব ধসাচ্ছ ভাই বন্ধুপত্নী।

—আহা, সিনেমায় গেলে বুঝি ধসানো হয়?

—শুধু সিনেমা? ফি হপ্তায় যে শাড়ি কিনছ। টিভি কেনার বায়না ধরেছ। সব জানি। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলেও খাওয়া দাওয়া হচ্ছে প্রায়ই।

পরমা তার প্রিয় মুদ্রাদোষে ঠোঁট উলটে বলে—আমরা তো আপনার মতো রসকষহীন হাড়কঞ্জুস নই।

—আমি কঞ্জুস?

—নয় তো কী? খরচের ভয়ে তো বিয়েই করছেন না। পাছে প্রেমিকাকে সিনেমা দেখাতে কি হোটেলে খাওয়াতে হয় সেই ভয়ে বোধহয় প্রেমেও অরুচি হচ্ছে।

উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে চায়ে চুমুক মেরে ধৃতি বলল—তোমাদের বিবাহিতদের যা কাণ্ড-কারখানা দেখছি এরপর আহাম্মক ছাড়া কে বিয়ে করতে যায়?

—মারব থাপ্পড়, কী কাণ্ড দেখলেন শুনি?

—রোজ তো তোমাদের দুজনে খটামুটি লেগে যায়।

—আহা, সে হাঁড়ি-কলসি এক জায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি হয়ই। তা ছাড়া ওসব ছাড়া প্রেম জমে নাকি? একঘেয়ে হয়ে যায়।

—যা-ই বলো ভাই, জয়টার জন্য আমার কষ্ট হয়।

পরমা থমথমে মুখ করে বলে—বললেন তো? আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি। একটা চিঠি এসেছে আপনার। নীল খামে। কিছুতেই সেটা দেব না।

—মাইরি? বলে ধৃতি উঠতে চেষ্টা করে।

পরমা লঘু পায়ে দরজা পেরিয়ে ছুটে চলে যায়। ধৃতি একটু উঠতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ওঠে না। চা খেতে থাকে আস্তে-আস্তে।

হলঘরে জয়ের গলা পাওয়া যায়—ওঃ, যা একখানা কাণ্ড হয়ে গেল আজ। এই পরমা, শোনো না।

পরমা কোনওদিনই জয়ের ডাকে সাড়া দেয় না। স্বামীরা আজকালকার মেয়েদের কাছে সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন। পরমা কোনও জবাব দিল না।

—এই পরমা! জয় ডাকে।

ভারী বিরক্তির গলায় পরমা বলে—অত চেঁচাচ্ছ কেন বলো তো। এখন যেতে পারছি না।

—ডোন্ট শো মি বিজিনেস। কাম হিয়ার। গিভ মি এ—

—আঃ! কী যে করো। দাঁড়াও, ধৃতিকে ডাকছি, এসে দেখে যাক।

—ওঃ, ধৃতি দেখে কী করবে? হি ইজ ভারচুয়ালি সেক্সলেস। ওর কোনও রি-অ্যাকশন নেই।

পরমা চেঁচিয়ে ডাকল—ধৃতিবাবু! এই ধৃতি রায়।

ধৃতি শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ স্বরে ঘর থেকেই জবাব দেয়—ভাই, তোমাদের বসন্ত উৎসবে আমাকে ডেকো না। আমি কোকিল নই, কাক।

পরমা পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বলে—একজন বিপন্ন মহিলাকে উদ্ধার করা পুরুষের কর্তব্য। আপনাদের শিভালরি কোথায় গেল বলুন তো?

—অগাধ জলে। পরমা, আমাদের সব ভেসে গেছে। নারী প্রগতির এই যুগে পুরুষ নাসবন্দি অপদার্থ মাত্র।

পরদার ওপাশে ঝটপটির শব্দ হয়। আসলে ওটা জয়েন্ট প্রেম নয়, টিকলিং। ধৃতি নির্বিকারভাবে ধোঁয়ার রিং করার চেষ্টা করতে থাকে শুয়ে শুয়ে। সে জানে জয় সুব্রতর বোনের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করেছে সম্প্রতি। জানে বলে, ধৃতির এক ধরনের নির্বিকার ভাব আসে।

একটু বাদে জয় ঘরে এল। তার পরনে পাজামা, কাঁধে তোয়ালে। হাতে এক গ্লাস ফ্রিজের ঠান্ডা জল। এসে চেয়ারে বসল—দিন-দিন ডাবি হয়ে যাচ্ছি মাইরি।

—মানে?

—মানে আর কী? কোথাও আমার কোনও ওপিনিয়ন অ্যাকসেপটেড হচ্ছে না। না ঘরে, বাইরে। কোম্পানি আগ্রার কাছে তাদের প্রোডাকশন তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। আমাকে যেতে হবে সাইট আর আদার ফেসিলিটিজ দেখতে। এ নিয়ে আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দু-ঘণ্টা মুখের ফেকো তুলে বকলাম। কী মাল মাইরি! আসানসোলে কারখানা খোলবার লেটার অফ ইনডেন্ট পেয়ে গেছে, তবু সেখানে করবে না, আগ্রায় যাবে। হেডস্ট্রং যাকে বলে!

—কবে যাচ্ছিস?

—ঠিক নেই এখনও। মে বি নেক্সট মান্থ, মে বি নেক্সট উইক, ইভন টু-মরো।

—ঘুরে আয়। সেকেন্ড হানিমুন হয়ে যাবে।

—আর হানিমুন! ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে লালবাতি জ্বলছে। এই ফ্ল্যাটটা না বেচে দিতে হয়। আজকাল যে যতবড় চাকরি করে তার তত মানিটরি ওবলিগেশন। হ্যাঁ রে, তোরা ট্যাক্সসেশন নিয়ে কি কিছুই লিখবি না? খোদ অ্যামেরিকায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পারসেন্টের বেশি ট্যাকসেশন নেই। আর এই ভুক্খা দেশে কেন এরকম আনহাইজনিক ট্যাকসেশন!

—কে জানে।

—এটা নিয়ে কিন্তু লেখা দরকার। একটা তিন হাজারি মাস মাইনের লোক আজকাল পুরো প্রলেটারিয়েট। আর ওদিকে যত ট্যাক্স রেট বাড়ছে তত বাড়ছে ট্যাক্স ক্রাইম আর হ্যাজার্ডস।

ধৃতি চিৎ থেকে উপুড় হয়ে বলল—তুই তো এই ফ্ল্যাটটা তোর কোম্পানিকে লিজ দিয়েছিস। তারাই তো ভাড়া গুনছে।

—না করে কী করব? টাকা আসবে কোত্থেকে? আমার একমাত্র ট্যাক্স-ফ্রি ইনকাম কোনটা জানিস? তোর দেওয়া মাসে-মাসে দুশো টাকা।

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। বাস্তবিকই বড় চাকুরেরা আজকাল সুখে নেই।

জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ, ঠান্ডা জল খেলো।

ধৃতি বলল—তোর বউ আমার একটা চিঠি চুরি করেছে। মেয়েদের-নিন্দে করেছিলাম বলে পানিশমেন্ট।

নিন্দে করেছিস? সর্বনাশ! সে তো সাপের লেজে পা।

ওপাশের হলঘর থেকে পরমা চেঁচিয়ে বলে—খবরদার সাপের সঙ্গে তুলনা দেবে না বলে দিচ্ছি। আমরা কি সাপ?

—সাপ কি খারাপ? জয় প্রশ্ন করে উচ্চস্বরে।

পরমা ঘরে ঢুকে আসে। হাতে এক কোষ জল। সেটা সজোরে জয়ের গায়ে ছুড়ে দিয়ে বলে—সাপ ভালো কিনা নিজে জানো না?

ধৃতি বালিশে মুখ গুঁজে বলে—আচ্ছা বাবা, আমিই না হয় সাপ, জয় ভেড়া, আর

পরমা সিংহী।

—সিংহী না হাতি। পরমার সরোষ উত্তর।

—তবে হাতিই। দ্যাট ইজ ফাইনাল। ধৃতি বলে।

জয় হেসে বলে—হাতি বলছে কেন জানো তো। তোমার যে একটু ফ্যাট হয়েছে তাইতেই ওর চোখ টাটায়। ওর গায়ে এক মগ জল ঢেলে দাও।

পরমা 'ঠিক বলেছ' বলে দৌড়ে গেল জল আনতে।

জয় এক প্যাকেট আবদল্লা সিগারেট ধৃতির বিছানায় ছুড়ে দিয়ে বলল—এটা তোর জন্য। রাখ।

ধৃতি পরম আলস্যে পাশ ফিরে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে বলে—কোথায় পেলি? ফরেনের মাল দেখছি।

—অফিসে একজন ক্লায়েন্ট চার প্যাকেট প্রেজেন্ট করে গেল। সদ্য ফরেন থেকে এসেছে।

ধৃতি একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে-শুয়ে টানে।

জয় বলে—একটু গার্ড নে, পরমা বোধহয় সত্যিই জল আনছে।

—মাইরি! বলে ধৃতি লাফিয়ে ওঠে।

পরমা একটা লাল প্লাস্টিকের মগ থেকে জল হাতের আঁজলায় তুলে ওপর বাগে ছিটিয়ে দেয়, নানা কায়দায় ধৃতি ছাতা এদিক ওদিক করে জল আটকাতে আটকাতে বলে—আমি কী করেছি বলো তো?

—হাতি বললেন কেন?

—মোটেই বলিনি। তুমিই বলেছ।

—ইস! আপনিই বলেছেন।

মাপ চাইছি।

—কান ধরুন।

ধৃতি ছাতা ফেলে কান ধরে দাঁড়ায়।

পরমা মগ রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—মেয়েদের সম্মান করতে কবে যে শিখবেন আপনারা।

—কেন, খুব সম্মান করি তো।

—করলে জাতটা উদ্ধার পেয়ে যেত।

জয় মৃদু হাসছিল। বলল—ওর কথা বিশ্বাস কোরো না পরমা। ধৃতি এক নম্বরের উওম্যান-হেটার! নারী প্রগতির বিরোধী। আড়ালে ও মেয়েদের নামে যা তা বলে। ও যদি কখনও প্রাইম মিনিস্টার হয় তবে নাকি শ্লোগান দেবে—মেয়েরা রান্নাঘরে ফিরে যাও।

—বটে? পরমা চোখ বড়-বড় করে তাকায়।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে—মাইরি না। আমি মেয়েদের ক্রিকেট খেলা দেখতেও যাই।

পরমা শ্বাস ফেলে বলে—আমি অবশ্য মেয়েদের ক্রিকেট খেলা পছন্দ করি না। কিন্তু মেয়েদের লিবার্টিকে সাপোর্ট করি।

—তোমরা তো ভাই লিবারেটেড। কেউ আজকাল মেয়েদের বাঁধে না। ছাড়া মেয়েরা কেমন চারিদিকে পাখি প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে!

—ফের? ছাড়া মেয়ে মানে?

—মানে যারা লিবারেটেড।

সন্দেহের চোখে চেয়ে পরমা বলে—ব্যাড সেনসে বলছেন না তো?

—আরে না।

জয় বলে—ব্যাড সেনসেই বলছে। ওকে ছেড়ো না।

পরমা জয়ের দিকে চেয়ে বলে—তুমি ফুট কাটছ কেন বলো তো?

আমাকে খেপিয়ে দিয়ে বিনি পয়সায় মজা দেখতে চাইছ?

ধৃতি কথাটা লুফে নিয়ে বলে—একজ্যাক্টলি। এবার জয়কেও একটু শাসন করো পরমা, বর বলে অতটা খাতির কোরো না।

—কে খাতির করছে? বলে ধৃতিকে একটা ধমক দিয়ে পরমা জয়কে বলে—আমি জোকার না কি?

জয় খুব বিষণ্ণ হয়ে বলে—যার জন্য করি ভালো সে-ই বলে চোর!

—থাক, আর সাধু সাজতে হবে না।

—তুমি নারীরত্ন।

পরমা ঠোঁট উলটে বলে—ডিকশনারি কিংবা বঙ্কিমের বই খুললেই ওসব শব্দ জানা যায়। কমপ্লিমেন্ট দিতেও পারো না বুদ্ধু কোথাকার!—তোমার দিকে চাইলে আমার যে কথা হারিয়ে যায়। আত্মহারা হয়ে পড়ি।

খুব সন্তর্পণে ধৃতি বলল—পরমা সুন্দরী।

পরমা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, এটা আবার কবে থেকে?

—এইমাত্র মনে এল। ভালো না?

—ভেবে দেখি।

—বলছিলাম পরমা সুন্দরী, আজকের ডাকে আমার কি কোনও চিঠি এসেছে?

—এসেছে, কিন্তু দেব না।

—না, না, চাইছি না, এলেই হল। আমার যে চিঠি আসছে, তার মানে হল এখনও লোকে আমাকে ভুলে যাচ্ছে না, আমি যে বেঁচে আছি তা এখনও কিছু লোক জানে, আর কষ্ট করে যে চিঠি লিখছে তার অর্থ হল আমার মতো অপদার্থকেও লোকের কিছু জানানোর আছে, বুঝলে? চিঠি আসাটাই ইম্পর্ট্যান্ট। চিঠিটা নয়।

—ওঃ, খুব ফিলজফার? আচ্ছা দেব না চিঠি।

—চাইনি তো। চাইছিও না। ধৃতি বলে।

—চাইছে না আবার! ভেতরে-ভেতরে ছটফটাচ্ছে। কে চিঠি দিয়েছে বলুন তো? মেয়েলী হাতের লেখা আমি ঠিক চিনি।

—হয়তো দিদি। ধৃতি বলে।

—না দিদি নয়, খামের বাঁদিকে চিঠি যে দিয়েছে তার নাম-ঠিকানা আছে।

—তাই বল। ধৃতি একগাল হেসে বলে—আমি ভাবছি, পরমার এত বুদ্ধি কবে থেকে হল যে হাতের লেখা দেখে মেয়ে না ছেলে বুঝে ফেলবে!

—শুনলে পরমা? জয় ফের খোঁচায়।

পরমা বলে—আমি কালা নই।

—তোমাকে বোকা বলছে।

—বোকা নয়। ধৃতি বলে—আমি বলতে চাইছি...পরমা কুটিল নয়, পরমা সরল ও নিষ্পাপ।

—হয়েছে। এই নিন চিঠি। আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

বিছানার ওপর একটা খাম ফেলে দিয়ে পরমা চলে যায়।

ধৃতি ঘড়ি দেখে। সময় আছে। চিঠিটা নিয়ে বিছানায় ফের চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। খামের ওপর বাঁ-ধারে লেখা, টুম্পা চৌধুরী। নামের নীচে মধ্য কলকাতার ঠিকানা।

ধৃতি টুম্পা নামে কাউকে মনে করতে পারলো না। চিঠি বেশি বড়ও নয়। খুলে দেখল কয়েক ছত্র লেখা—শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার দাদা আপনার সঙ্গে পড়ত। দাদার নাম অশোক চৌধুরী। মনে আছে? একটা দরকারে এই চিঠি লিখছি। আমি একটা ডেফিসিট গ্র্যান্টের স্কুলে কাজ করি। আমাদের বিল্ডিংয়ের জন্য একটা গ্র্যান্ট দরকার। আমরা দরখাস্ত করেছি, কিন্তু ধরা করা ছাড়া তো এসব হয় না। আপনার সঙ্গে তো মিনিস্টারদের জানা-শোনা আছে। আমি সামনের সপ্তাহে আপনার অফিসে বা বাসায় গিয়ে দেখা করব। প্রণাম জানবেন।—টুম্পা চৌধুরী।

টুম্পা মেয়েটা দেখতে কেমন হবে তা ভাবতে-ভাবতে ধৃতি উঠে পোশাক পরতে থাকে। জয় চেয়ারে বসে ঘাড় কাত করে ঘুমোচ্ছে।

ধৃতি মেয়েদের অপছন্দ করে না। তবে কি না তার কিছু বাছাবাছি আছে। মেয়ে মাত্রই তাকে আকর্ষণ করে না। এই যেমন পরমা। এত অসহনীয় সুন্দরী, এত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব-সাব তবু পরমার প্রতি কখনও দুর্বলতা বোধ করে না ধৃতি। অর্থাৎ পরমার চেহারা বা স্বভাবে এমন একটা কিছুর অভাব আছে যা ধৃতির কাছে ওকে কাম্য করে তোলেনি।

এসব বলার মতো কথা নয়। শুধু মনের মধ্যেই এসব কথা চিরকাল থেকে যায়। পরমা বন্ধুপত্নী এবং পরস্ত্রী। কাজেই কোনওরকমেই কাম্য নয়। কিন্তু সে হল বাইরের সামাজিক ব্যাপার। মানুষের মনের মধ্যে তো সমাজ নেই। সেখানে রাষ্ট্রের শাসন নেই, সেখানে নীতি নিয়ম নেই, অনুশাসন নেই, আছে কেবল মোটা দাগের কামনা, বাসনা, লোভ, ভয়।

## ॥ দুই ॥

টুপুর ছবি দেখলেন? কেমন? সুন্দরী নয়? টুপু ছিল মিস এলাহাবাদ। টুপুর কথা আপনাকে কিন্তু লিখতেই হবে।

বিশাল চিঠি। তাতে টুপুর খুন হওয়ার নানা সম্ভব ও অসম্ভব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। টুপু ছিল নিষ্পাপ পবিত্র, স্বর্গীয় একটি মেয়ে।

চিঠিটা রেখে ধৃতি বরং ফটোটাই দেখে। মিথ্যে নয় যে মেয়েটি সুন্দরী। এবং মিস এলাহাবাদ হলেও কোনও আপত্তির কারণ নেই। লম্বাটে ছাদের মুখ, বড়-বড় চোখের দৃষ্টিতে কথা ফুটে আছে। কী অসম্ভব সুন্দর টসটসে ঠোঁট দু-খানা। অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

পাশ থেকে অমিত উঁকি দিয়ে বলে—কার! কার ছবি দেখছেন? দেখি! দেখি!

ধৃতি ছবিটা অমিতের হাতে দিয়ে বলে—পাত্রীর মা ছবিটা পাঠিয়েছে।

—বেশ দেখতে। একে বিয়ে করুন।

ধৃতি হেসে চলে—বিয়ে করা শক্ত।

—কেন?

—মেয়েটা এখন অনেক দূরে। সেখানে জ্যান্ত যাওয়া যায় না।

—মরে গেছে?

—তাই তো জানিয়েছে।

—তবে যে বললেন পাত্রী।

পাত্রী মানে কি বিয়ের পাত্রী? পাত্রীর অর্থ এখানে একটি ঘটনার পাত্রী। মেয়েটা খুন হয়েছে।

—ওঃ! দেখতে ভারী ভালো ছিল মেয়েটা।

ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে—হ্যাঁ, কিন্তু পাস্ট টেনস।

—আপনাকে ছবি পাঠিয়েছে কেন?

কত পাগল আছে।

নিউজ এডিটর তার ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত পায়ে চলে যেতে-যেতেও হঠাৎ থমকে ধৃতির সামনে ঘুরে এসে বললেন—এ সপ্তাহে আপনার ইভনিং শিফট চলছে তো?

—হ্যাঁ।

—কালকের মধ্যে একটা ফিচার লিখে দিতে পারবেন?

—কী?

—ম্যারেজ ল অ্যামেন্ডমেন্ট।

—লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে?

—আরে না, না। তাহলে আপনাকে বলা হোত না। আপনি শুধু সোস্যাল ইমপ্যাক্টটার ওপর লিখবেন। কিন্তু কাল চাই।

ধৃতি মাথা নাড়ল।

এখন ইমারজেন্সি চলছে। খবরের ওপর কড়া সেনসর। বস্তুত দেওয়ার মতো কোনও খবর নেই। তাই এত ফিচারের তাগিদ। টেলিপ্রিন্টারে যাও বা খবর আসে তার অর্ধেক যায় সেনসরে। ট্রেনে ডাকাতি হওয়ার খবরটাও নিজের ইচ্ছেয় ছাপা যায় না।

ধৃতি উঠে লাইব্রেরিতে চলে আসে। লাইব্রেরিয়ান অতি সুপুরুষ জয়ন্ত সেন। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে, দেখলে ত্রিশও মনে হয় না। চমৎকার গোছানো মানুষ। লাইব্রেরিটা ঝকঝক তকতক করছে।

জয়ন্ত গম্ভীর মানুষ, চট করে কথা বলেন না, একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে একটা মস্ত পুরোনো বই দেখতে থাকেন।

ধৃতি উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলে—দাদা, ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট ল নিয়ে লিখতে হবে।

জয়ন্ত এবার মৃদু একটু হাসলেন। বই থেকে মুখ তুলে বললেন—ফিচার?

—হ্যাঁ।

জয়ন্ত মস্ত টেবিলের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলেন, হাতটা দেখি। জয়ন্তর ওই এক বাতিক। হাত দেখা আর কোষ্ঠী বিচার। গত শীতে কলকাতা আর ব্যাংগালোর টেস্ট ম্যাচের ফলাফল আশ্চর্যজনক নিখুঁত বলে দিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে এক আধটা দারুণ কথা বলে দেন। রিপোর্টার সুশীল সান্যালকে গত বছর জুন মাসে হঠাৎ একদিন ডেকে বললেন—কিছু টাকা-পয়সা হাতে রাখো। তোমার দরকার হবে। আর এই হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছ ফুর্তি লুটছ, তাও কিছুদিন বন্ধ। চুপটি করে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

ঠিক তাই হয়েছিল। সুশীলবাবুর পেটে টিউমার ধরা পড়ল পরের মাসে। অপারেশনের পর পাক্কা তিনমাস বিছানায় শোওয়া। টাকা গেল জলের মতো। জয়ন্ত সেনকে তাই সবাই কিছু খাতির করে। এমনিতে মানুষটি বেশি কথা বলেন না বটে কিন্তু বাতিক চাড়া দিলে অ্যাসট্রোলজি নিয়ে অনেক কথা বলতে পারেন।

ধৃতির হাতটা দেখে তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কোষ্ঠী আছে।

—ছিল এখন নেই।

—হারিয়ে ফেলেছেন?

—আমার কিছু থাকে না। আমি হলাম নাগা সাধু। ভূত ভবিষ্যতও নেই।

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললেন—হাতের রেখা তো তা বলছে না!

—কী বলছে তবে?

—ভূত ছিল, ভবিষ্যতও আছে।

ধৃতি একটু নড়ে বসে বলে—কীরকম?

জয়ন্ত হাতটা ছেড়ে নির্বিকারভাবে বললেন—দুম করে কি বলা যায়। তবে খুব ইন্টারেস্টিং হাত।

ধৃতি কায়দাটা বুঝতে পারে। খুব আগ্রহ নিয়ে হাতটা দেখে একটু রহস্য জাগানো কথা বলেই যে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন ওর পিছনে ছোট একটা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা আছে। ধৃতি যে হাত দেখায় বিশ্বাসী নয় তা বুঝে তিনি ওই চাল দিলেন। দেখতে চাইছেন এবার ধৃতি নিজেই আগ্রহ দেখায় কি না।

ধৃতি আগ্রহ দেখায় না। আবার বলে—কিন্তু আমার ল-এর কী হবে?

—হবে। আমার কাছে কাটিং আছে। বলে জয়ন্ত আবার মৃদু হেসে যোগ করলেন—কেবল আমার কাছেই সব থাকে।

—সেটা জানি বলেই তো আসা।

কলিং-বেলে বেয়ারা ডেকে কাটিং বের করে দিতে বললেন জয়ন্ত।

রিডিং-এর ফাঁকা টেবিলে বসে বিভিন্ন খবরের কাগজের কাটিং থেকে ধৃতি অ্যামেন্ডমেন্ট ল সম্পর্কে তথ্য টুকে নিচ্ছিল প্যাডে। এসব অবশ্য খুব কাজে লাগবে না। তাকে ঘুরে-ঘুরে কিছু মতামত নিতে হবে। সাক্ষাৎকার না হলে ব্যাপারটা সুপাঠ্য হবে না। আইন শুকনো জিনিস, কিন্তু মানুষ কেবল আইন মানা জীব নয়।

নতুন সংশোধিত আইনে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে সহজলভ্য। মামলা করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেপারেশন পাওয়া যাবে। আগে আইন ছিল, ডিভোর্সের পর কেউ এক বছর বিয়ে করতে পারবে না, নতুন আইনে সে সময় কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া হচ্ছে। এসব ভালো না মন্দ তা ধৃতি জানে না। ডিভোর্স সহজলভ্য হলে কী হয় তা সে বোঝে না। তবে এটা বোঝে যে ডিভোর্সের কথা মনে রেখে কেউ বিয়ে করে না।

জয়ন্ত উঠে বাইরে যাচ্ছিলেন। টেবিলের সামনে ক্ষনেক দাঁড়িয়ে বললেন—পেয়েছেন সবকিছু?

ধৃতি মুখ তুলে হেসে বললে—এভরিথিং।

—চলুন চা খেয়ে আসি। ফিরে এসে লিখবেন।

ধৃতি উঠে পড়ে। শিফটে এখনও কাজ তেমন শুরু হয়নি। সন্ধ্যের আগে বড় খবর তেমন কিছু আসে না। তা ছাড়া খবরও নেই। প্রতিদিনই ব্যানার করবার মতো খবরের অভাবে সমস্যা দেখা দেয়। আজ কোনটা লিড হেডিং হবে সেটা প্রতিদিন মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়। সারাদিন টেলিপ্রিন্টার আর টেলেক্স বর্ণহীন জোলো খবরের রাশি উগরে দিচ্ছে। কাজেই খবর লিখবার জন্য এক্ষুনি তাকে ডেস্কে যেতে হবে না।

ধৃতি ক্যান্টিনের দিকে জয়ন্তর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে বলে—আপনি মানুষের মুখ দেখে কিছু বলতে পারেন?

জয়ন্ত বলেন—মুখ দেখে অনেকে বলে শুনেছি। আমি তেমন কিছু পারি না। তবে ভূত ভবিষ্যত বলতে না পারলেও ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু বলা যায়।

—ফটো দেখে বলতে পারেন।

—ফটো প্রাণহীন বস্তু, তবু তা থেকেও আন্দাজ করা সম্ভব। কেন বলুন তো?

ক্যান্টিনে চা নিয়ে মুখোমুখি বসার পর ধৃতি হঠাৎ খুব কিছু না ভেবেচিন্তে টুপুর ফটোটা বের করে জয়ন্তকে দেখিয়ে বলে—বলুন তো কেমন মেয়ে?

জয়ন্ত চায়ে চুমুক দিয়ে ফটোটা হাতে নিয়ে বলেন—তাই বলুন। এত দিনে তাহলে বিয়ের ফুল ফুটতে যাচ্ছে। তবে ম্যাট্রিমোনিয়াল ব্যাপার হলে ফটোর চেয়ে কোষ্ঠী অনেক সেফ। মেয়েটার কোষ্ঠী নেই?

ধৃতি ঠোঁট উলটে বলে—মেয়েটাই নেই।

—সে কী! বলে জয়ন্ত ছবিটা আর একবার দেখে ধৃতির দিকে তাকিয়ে বলেন—তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক জেনে কী হবে? মারা গেছে কবে?

—তা জানি না। তবে বলতে পারি খুন হয়েছে।

—খুন! ও বাবাঃ, পুলিশ কেস তাহলে। বলে জয়ন্ত ছবিটা ফেরত দিতে হাত বাড়িয়ে বললেন—তাহলে আর কিছু বলার নেই।

—আছে। ধৃতি বলে—ধরুন, মেয়েটার চরিত্রে এমন কী আছে যাতে খুন হতে পারে তা ছবি থেকে আন্দাজ করা যায় না?

জয়ন্তী গম্ভীর চোখে চেয়ে বলেন—মেয়েটি আপনার কে হয়?

কেউ না।

—পরিচিত তো। প্রেম-ট্রেম ছিল নাকি?

—আরে না দাদা, চিনতামই না।

—তবে অত ইন্টারেস্ট কেন? পুলিশ যা করবার করবে।

—পুলিশ তার কাজ করবে। আমার কৌতূহল মেয়েটির জন্য নয়।

—তবে?

—অ্যাসট্রোলজির জন্য।

ছবিটা আবার নিয়ে জয়ন্ত তার প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পকেট থেকে বের করে চোখে আঁটলেন। তাতেও হল না। একটা খুদে আতস কাচ বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ছবিটা। চা ঠান্ডা হয়ে গেল।

প্রায় আট-দশ মিনিট বাদে জয়ন্ত আতস কাচ আর চশমা রেখে ছবিটা দু-আঙুলে ধরে নাড়তে-নাড়তে চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন—মেয়েটা খুন হয়েছে কে বলল?

—ওর মা।

—তিনি আপনার কে হন?

—কেউ না। চিনিই না। একটা ফোন-কলে প্রথম খবর পাই। আজ একটা চিঠিও এসেছে। দেখুন না। বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দেয়।

জয়ন্ত খুব আলগাভাবে চিঠিটা পড়লেন না। পড়লেন খুব মন দিয়ে। অনেক সময় নিয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট চলে গেল।

তারপর মুখ তুলে বললেন,—আমি মুখ দেখে তেমন কিছু বলতে পারি না বটে, কিন্তু আমার একটা ফিলিং হচ্ছে যে মেয়েটা মরেনি।

—বলেন কী?

জয়ন্ত আবার চা আনালেন। গম্ভীর মুখে বসে চা খেতে-খেতে চিন্তা করে বললেন—আপনি জ্যোতিষবিদ্যা মানেন না?

—না, মানে, তেমন মানি না।

—বুঝেছি। কিন্তু মানেন না কেন? যেহেতু সেকেন্ড হ্যান্ড নলেজ তাই না?

—তাই।

—তবে আপনাকে যুক্তিবাদী বলতে হয়। না?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আসলে আপনি যুক্তিবাদী নন, আপনার মনন বৈজ্ঞানিক সুলভ নয়।

—কেন?

—একটা ফোন-কল, একটা চিঠি আর একটা ফোটো-মাত্র এই জিনিসগুলোর ভিত্তিতে আপনি কী করে বিশ্বাস করছেন যে মেয়েটা খুন হয়েছে?

—তবে কি হয়নি?

—না। আমার মন বলছে শি ইজ ভেরি ম্যাচ অ্যালাইভ।

—কী করে বললেন?

—বলছি তো আমার ধারণা।

—কোনও লজিক্যাল বেস নেই ধারণাটার?

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললেন—আপনি আচ্ছা লোক মশাই। মেয়েটা যে মরে গেছে, আপনার সে ধারণাটারও তো কোনও লজিক্যাল বেস নেই। আপনাকে একজন জানিয়েছে যে টুপু মারা গেছে বা খুন হয়েছে। আপনি সেটাই ধ্রুব বলে বিশ্বাস করছেন।

জয়ন্ত সেন ছবিটার দিকে আবার তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আপন মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন—খুব সেনসিটিভ, অসম্ভব সেন্টিমেন্টাল, মনের শক্তি বেশ কম, অন্যের দ্বারা চালিত হতে ভালবাসে।

—কে? ধৃতি চমকে প্রশ্ন করে।

জয়ন্ত ছবিটার দিকে চেয়ে থেকেই বলে—আপনার টুপু সুন্দরী।

—আমার হতে যাবে কেন?

—দেখি আপনার হাতটা আর একটু! বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে ধৃতির ডান হাতটা টেনে নিলেন।

ফটোগ্রাফার সৌরীন এক প্লেট মাংস আর চার পিস রুটি খেয়ে মৌরী চিবোতে-চিবোতে টেবিলের ধারে এসে বলে—আমার হাতটা দেখবেন না জয়ন্তদা?

—পরে। জয়ন্তর গম্ভীর উত্তর।

—অনেকদিন ধরে ঝোলাচ্ছেন। ধৃতিবাবু, কী খবর?

—ভালো।

সৌরীন হঠাৎ ঝুঁকে ছবিটা দেখে বলে—বাঃ দারুণ ছবিটা তুলেছে তো! ফটোগ্রাফার কে?

ধৃতি হাসল। সৌরীন পেশাদার ফটোগ্রাফার, তাই মেয়েটার চেয়ে ফটোর সৌন্দর্যই তার কাছে বেশি গুরুতর।

ধৃতি বলে—মেয়েটা কেমন?

—ভালো। সৌরীন বলে—তবে ফ্রন্ট ফেস যতটা ভালো প্রোফাইল ভালো কিনা কে জানে! মেয়েটা কে?

—চিনবেন না। ধৃতি বলল।

সৌরীন চলে গেলে জয়ন্ত ধৃতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন,—হুঁ।

—হুঁ মানে?

—মানে অনেক ব্যাপার আছে। আপনার বয়স এখন কত?

উনত্রিশ বোধ হয়। কম বেশি হতে পারে।

—একটা ট্র্যানজিশন আসছে।

—কি রকম?

—তা হুট করে বলি কেমন করে?

—কবে?

—শিগগিরই।

ধৃতি অবশ্য এসব কথার গুরুত্ব দেয় না। সারা জীবনে সে কখনও ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। যা কিছু হয়েছে বা করেছে সে, তা সবই নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে।

ধৃতি বলল—খারাপ নয় তো?

—হয়তো খারাপ। হয়তো ভালো।

ধৃতি হাসল। বলল,—এবার আসুন ডিম খাই—আমি খাওয়াচ্ছি।

দুজনে ওমলেট খেতে লাগল। খেতে-খেতে ধৃতি বলে—জয়ন্তদা, আপনি টুপুর কেসটা যত সিরিয়াসলি দেখছেন ততটা কিছু নয়।—তাই নাকি? নিস্পৃহ জবাব জয়ন্তর।

—ওর মা চাইছে খবরের কাগজে বেরোক।

—খবরদার বের করবেন না।

—আরে মশাই আমি ইচ্ছে করলেই কি খবর বের করতে পারি নাকি? কাগজ তো আমার ইচ্ছেয় হাবিজাবি খবর ছাপবে না।

—তা হলেও আপনি কোনও ইনিশিয়েটিভ নেবেন না। মেয়েটার মা ফোনে আপনাকে কি বলেছিল?

—এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করেছিল। রাত তখন দুটো-আড়াইটে। শুধু বলেছিল টুপুকে খুন করা হয়েছে, আপনি খবরটা ছাপবেন।

—চিঠিটা কবে এল?

—আজ।

—দেখি। বলে জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর চিঠি ফেরত দিয়ে জয়ন্ত হেসে বললেন—আপনি মশাই দিনকানা লোক।

—কেন?

—চিঠিটা ভালো করে দেখেছেন?

—দেখেছি তো।

—কিছুই দেখেননি। চিঠির ওপর এলাহাবাদের ডেটলাইন। কিন্তু খামের ওপর কলকাতা ঊনত্রিশ ডাকঘরের শিলমোহর, সেটা লক্ষ করেছেন?

ধৃতি একটা চমক খেয়ে তাড়াতাড়ি খামটা দেখে। খুবই স্পষ্ট ছাপ। ভুল নেই।

ধৃতি বলে—তাই তো?

জয়ন্ত বলেন—এবার টেলিফোনটার কথা বলুন তো।

—সেটা এলাহাবাদের ট্রাঙ্ক-কলই ছিল।

—কি করে বুঝলেন?

—অপারেটর বলল যে।

—অপারেটরের গলা আপনি চেনেন?

—না।

—তবে?

—তবে কি?

—অপারেটার সেজে যে-কেউ ফোনে বলতে পারে এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ক-কলে আপনাকে ডাকা হচ্ছে। অফিসের অপারেটরও সেটা ধরতে পারবে না।

—সেটা ঠিক।

—আমার সন্দেহ সে ফোন-কলটা কলকাতা থেকেই এসেছিল।

ধৃতি হঠাৎ হেসে উঠে বলে—কেউ প্র্যাকটিকাল জোক করেছিল বলছেন?

—জোক কিনা জানি না, তবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফেকটিভ। আপনি তো ভোঁতা মানুষ নন, তবে মিসলেড হলেন কী করে? এবার থেকে একটু চোখ কান খোলা রেখে চলবেন।

ধৃতি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল ফের।

## ॥ তিন ॥

ধৃতি মদের ভক্ত নয়। কোনও গোঁড়ামি নেই, কিন্তু মদ খেলেই তার নানারকম শারীরিক অসুবিধে হতে থাকে। কখনও আধকপালে মাথা ধরা, কখনও পেটে প্রচণ্ড গ্যাস জমে, কখনও দমফোট হয়ে হাঁসফাঁস লাগে। কাজেই পারতপক্ষে সে মদ ছোঁয় না।

অফিস থেকে আজ একটু আগে আগে কেটে পড়ার তালে ছিল সে। ছ'টায় ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে গ্যাবি কুপারের একটা ফিল্ম দেখাবে। ধৃতি কার্ড পায়। প্রায়ই ছবি দেখা তার হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ ছবিটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তার।

আজ চিফ সাব-এডিটর তারাপদবাবু কাজে বসেছেন। বয়স্ক লোক এবং প্রচণ্ড কাজপাগল। কোন খবরের কতটা ওজন তা তাঁর মতো কেউ বোঝে না।

ধৃতি গিয়ে বলল—তারাপদদা আজ একটু আগে আগে চলে যাব।

—যাবে? বলে তারাপদবাবু মুখ তুলে একটু হেসে বললেন—তোমার আর কি? কর্তারা ফিচার লেখাচ্ছেন তোমাকে দিয়ে। তুমি হলে যাকে বলে ইম্পর্ট্যান্ট লোক।

এটা অবশ্য ঠেস দেওয়া কথা। কিন্তু তারাপদবাবুর মধ্যে হিংসা-দ্বেষ বড় একটা নেই। ভালমানুষ রসিক লোক। তাই কথাটার মধ্যে বিষ নেই।

ধৃতি হেসে বলে—ইম্পর্ট্যান্ট নয় তারাদা, আমি হচ্ছি আসলে ইম্পোটেন্ট।

তারাপদবাবু মুখখানা খুব কেজো মানুষের মতো গম্ভীর করে পিন আঁটা একটা মোটাসোটা খবরের কপি ধৃতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এ খবরটা করে দিয়ে চলে যাও। এটা কাল লিড হতে পারে। বেশি বড় কোরো না।

ঘড়িতে চারটে বাজে। কপি লিখতে ধৃতির আধঘন্টার বেশি লাগবে না। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধৃতি নিজের টেবিলে কপিটা চাপা দিয়ে রেখে সিনেমার ডিপার্টমেন্টে আড্ডা মারতে গেল।

কালীবাবু চুলে কলপ দিয়ে থাকেন। চেহারাখানা জমিদার জমিদার ধরনের। ভারী শৌখিন লোক। এক সময়ে সিনেমায় নেমেছিলেন, পরে কিছুদিন ডিরেকশন দিলেন। তিন-চারটে ছবি ফ্লপ করার পর হলেন সিনেমার সাংবাদিক। এখন এ পত্রিকার সিনেমার পাতা এডিট করেন।

ধৃতিকে দেখে বলেন—কী ভায়া, হাতে নাকি একটা ভালো মেয়ে আছে! থাকলে দাও না, সিনেমায় নামিয়ে দিই। বাংলা ছবিতে নায়িকার দুর্ভিক্ষ চলছে দেখছ তো!

ধৃতি অবাক হয়ে বলে—ভালো মেয়ে! আমার হাতে কোত্থেকে মেয়ে থাকবে কালীদা?

—কেন, এই তো সৌরীন বলছিল তুমি নাকি একটা ঘ্যাম মেয়েছেলের ছবি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ!

—ওঃ! বলে ধৃতি বসে।

—দাও না মেয়েটার ঠিকানা। তোমার রিলেটিভ হলেও ক্ষতি নেই। আজকাল লাইন অনেক পরিষ্কার, কারো চরিত্র নষ্ট হয় না।

—সে জন্য নয়। অন্য অসুবিধা আছে।

—কেন লেজে খেলাচ্ছ ভাই?

—সৌরীন কিছু জানে না। শুধু ছবিটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে এসে আপনাকে বলেছে।

—অসুবিধেটা কী?

—যতদূর শুনছি মেয়েটা বেঁচে নেই।

ধৃতি দ্বিধায় পড়ে যায়। জয়ন্ত সেন বারবার বলেছিলেন—শি ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ। সে কথাটা মনে পড়ে যায়।

ধৃতি বললে—ঠিক চিনি না। তবে জানি। মরার খবরটা অবশ্য উড়ো খবর।

কালীবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন—সুন্দরী মেয়েরা মরবে কেন?

—সেটাই তো প্রবলেম।

—মোটেই কাজটা ভালো নয়। সুন্দরী মেয়েদের মরা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ধৃতি একটু মৃদু হেসে বলে—এ মেয়েটাকে নিয়ে একটু মিস্ট্রি দেখা দিয়েছে। জয়ন্তদা ছবিটা দেখে বললেন—মেয়েটা নাকি মরেনি। অথচ আমার কাছে খবর আছে—

—দেখি ছবিটা। আছে? বলে হাত বাড়ায় কালীবাবু। ছবিটা আজকাল ধৃতির সঙ্গেই থাকে। কেন থাকে তা বলা মুশকিল। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে ধৃতি এই ছবিটার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সব সময় তার মনে হয় এ ছবিটা খুব মারাত্মক একটা দলিল।

কালীবাবু ছবিটা নিয়ে দেখলেন। সিনেমা লাইনের অভ্যস্ত প্রবীণ চোখ। উলটেপালটে দেখে ছবিটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে বলেন—মেয়েটার নাম ঠিকানা দিতে পারো?

—নাম টুপু। ঠিকানা মুখস্থ নেই, তবে আছে বাড়িতে। এলাহাবাদের মেয়ে।

—ও। একটু দূর হয়ে গেল, নইলে আজই বাড়িতে হানা দিতাম গিয়ে।

—কেমন বুঝছেন ছবিটা?

—খুব ভালো। তবে সিঙ্গল ফোটোগ্রাফ নয়।

—তার মানে?

—মানে একটা জোড়ার ছবি। এর পাশে আর কেউ ছিল। কিন্তু নেগেটিভ থেকে আলাদা করে শুধু মেয়েটার ছবি প্রিন্ট করা হয়েছে।

ধৃতি অবাক হয়ে বলে—কী করে বুঝলেন?

কালীবাবু হেসে বলেন—যা বলছি তা হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট বলে ধরে নিতে পারো। ছবিটা আবার ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ধৃতি ছবিটা ফের নেয়। এ পর্যন্ত অসংখ্য বার দেখেছে তবু বুঝতে পারেনি তো।

কালীবাবু বুঝিয়ে দেন—এই ডান পাশে মেয়েটার হাত ঘেঁসে একটু সাদা জমি দেখতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ। ওটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড।

—তোমার মাথা।

—তবে কী ওটা?

—ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে লাইট অ্যাশ কালার, এই সাদাটে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা। ভালো করে দ্যাখো, দেখেছ?

মানুষের কাঁধের ঢালু, বুঝতে পারো না? কাঁধের ওপর অংশটা একটু বেঁকে গেছে দেখছ?

হ্যাঁ।

—অর্থাৎ মেয়েটির পাশে সাদা বা লাইট রঙের কোনও জামা পরা এক রোমিও ছিল। এ ছবিটায় তাকে বাদ রাখা হয়েছে। মেয়েটাকে তুমি একদম চেনো না?

—না।

—তবে এ ছবিটা এল কোথা থেকে?

—এলো।

—খোঁজ নাও। এ মেয়েটা ফিল্মে এলে হইচই পড়ে যাবে।

খোঁজ নিতে তো এলাহাবাদ যেতে হয়।

—যাবে। আমি ফিনান্স করব।

ধৃতির ফের মনে পড়ে, চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসেনি, এসেছে কলকাতা থেকে। মনে পড়ে, জয়ন্ত সেন সেদিন বলেছিলেন, ট্রাঙ্ক-কলটা স্রেফ ধোঁকাবাজি হতে পারে।

ধৃতি নড়েচড়ে বসে বলে—আচ্ছা কালীদা, আপনার কি মনে হয় মেয়েটা বেঁচে আছে?

কালীবাবু ফের ছবিটা দেখছিলেন হাতে নিয়ে। পুরু চশমার কাচের ভেতর দিয়ে চেয়ে বললেন—থাকাই উচিত। মরবে কেন হে?

—ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারেন? মানে কোনও ফিলিং হয়।

খুব হয়। একটাই ফিলিং হয়। বলে কালীবাবু বদমাসের মতো হেসে বলেন—সেক্স জেগে ওঠে।

—দুর! কোনও আনক্যানি ফিলিং হয় না?

—তুমি একটা বুদ্ধু। সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে আনক্যানি ফিলিং হতে যাবে কোন্ দুঃখে?

—যাই কপি পড়ে আছে। বলে ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল।

—আরে বসো-বসো। চা খাও। রাগ করলে নাকি? আমি আবার একটু স্পষ্ট কথা বলি তো? বলে কালীবাবু ধৃতিকে বসিয়ে টেলিফোনে ক্যান্টিনকে চা পাঠাতে বলেন।

ধৃতি সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে বলে—আপনারা আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললেন দেখছি।

—কীরকম?

—আমাকে মেয়েটার মা জানিয়েছিল যে টুপু মরে গেছে। আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম।

—তারপর?

—তারপর জয়ন্তবাবু ছবিটা দেখে বললেন তাঁর মনে হচ্ছে যে মেয়েটা বেঁচে আছে।

—বটে! তাঁর কথা উড়িয়েও দিতে পারছি না। তার কারণ হল চিঠিটা এলাহাবাদ থেকে আসার কথা, কিন্তু এসেছে কলকাতা থেকে।

—ভারী রহস্যময় ব্যাপার তো।

—আরও রহস্য হল যে আপনি আবার মেয়েটার পাশে এক অদৃশ্য রোমিওকে আবিষ্কার করলেন। তার মানে আরো জট পাকাল। মেয়েটার মা চেয়েছিল আমি মৃত্যু সংবাদটা কাগজে বের করে দিই।

—খবর্দার ওসব কোরো না।

—কেন?

—সুন্দরীরা মরে না। তারা অমর। স্ত্রীলিঙ্গে বোধহয় অমর বা অমরী কিছু একটা হবে।

—সে যাই হোক খবর বের করার এক্তিয়ার আমার নেই। এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু আমি বেশ ফাঁপড়ে পড়ে যাচ্ছি ক্রমে।

—ফাঁপরের কী আছে? খোঁজ নাও। তবে পুলিশ কেস হলে গা বাঁচিয়ে সরে এসো। ছবিটার মধ্যে একটু বদ গন্ধ আছে।

—তার অর্থ?

—অর্থাৎ মেয়েটা খুব ইনোসেন্ট নয়। চোখ-মুখ যত সুন্দরই হোক, এর মধ্যে একটা ইনহেরেন্ট দুষ্টুমি আছে। অ্যাডভেনচারাস টাইপ। পাশের ছোকরাটিকে দেখতে পেলে হত। যাকগে, তুমি গা বাঁচিয়ে চলবে।

ধৃতি উঠতে যাচ্ছিল। কালীবাবু হাত তুলে থামিয়ে ফের বললেন—সিনেমায় নামাটা তেমন কোনও ব্যাপার নয়। ভেবো না যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমি তাকে সিনেমায় নামাবার জন্য পাগল হই।

—বুঝলাম।

কালীবাবু একটু হেসে বলেন—আসলে জয়ন্তই আমাকে ব্যাপারটা বলছিল গতকাল। তখন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে একটু ওয়ার্নিং দিই।

—ওয়ার্নিং কেন?

—তুমি কাঁচা বয়সের ছেলে, কোথায় কোন ঘুরচক্করে পড়ে যাবে। মেয়েছেলে জাতটা যখন ভালো থাকে ভালো, যখন খারাপ হয় তখন হাড়বজ্জাত।

—তাই বলুন! জানতেন।

—জানতাম। আর এও বলি যে টুপুর মা ফের তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

—তা করবে।

—তুমি একটু রসের কথা-টথা বোলো। সিমপ্যাথি দেখাবে খুব। যদি দেখা করতে চায় রাজি হয়ে যেও।

—আচ্ছা।

ধৃতি উঠল।

## ॥ চার ॥

বুধবার জয় গেল দিল্লি। স্বভাবতই একা বাড়িতে ধৃতি আর পরমার থাকা সম্ভব নয়। ধৃতির যাওয়ার জায়গা নেই তেমন। পরমার আছে। তাই পরমা গেল বাপের বাড়ি। সেই সঙ্গে ছুঁড়ি ঝিটাকেও নিয়ে গেল। গোটা ফ্ল্যাটে ধৃতি একা।

অবশ্য ধৃতি আর কতটুকুই বা ফ্ল্যাটে থাকে। তার আছে অফিস, আড্ডা, ফিচার লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে ঘুরে বেড়ানো। রাতে নাইট ডিউটি নেই বলে শুধু সেই সময়টুকু সে ফ্ল্যাটে থাকে।

রাত ন'টা নাগাদ ধৃতি অফিসে একটা পলিটিক্যাল কপি লেখা শেষ করল। খুব পরিশ্রম গেছে। এইবার ছুটি। চলে যাওয়ার আগে সে এর ওর তার সঙ্গে কিছু খুনসুটি করে রোজই। আজ বুড়ো ডেপুটি নিউজ এডিটর মদনবাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করছিল।

ঠিক এই সময়ে চিফ সাব-এডিটর ডেকে বললেন—তোমার ফোন হে। ধৃতি 'হ্যালো' শুনেই কেঁপে ওঠে একটু। টুপুর মা।

—বলুন। ধৃতি বলে।

—চিঠি তো পেয়েছেন!

—পেয়েছি!

—ছবিটা দেখলেন?

—হুঁ।

—কেমন?

—টুপু খুবই সুন্দরী।

—আপনাকে তো বলেছিলাম যে টুপুকে সবাই মিস এলাহাবাদ বলতো। আমার টুপু ছিল সাংঘাতিক সুন্দরী।

—হুঁ।

—খবরটা কবে ছাপা হবে?

ধৃতি একটু ইতস্তত করে বলে—দেখুন এসব খবর ছাপার এক্তিয়ার তো আমাদের নেই।

—আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

—না পারি না।

—দোহাই! প্লিজ! আমার টুপু আপনাদের কাছে কিছুই না জানি। কিন্তু ওর খবরটা ছাপা হলে আমি বড় শান্তি পাব। মায়ের ব্যাথা তো বোঝেন না আপনারা।

—শুনুন। প্রথম কথা, টুপু যদি নাম করা কেউ হত তবে খবরটা ছাপা সহজ হয়ে যেত। যদি খুনের কেস আদালতে উঠত তাও অসুবিধে হত না। কিন্তু শুধু অ্যাসাম্পশনের ওপর তো আমরা কিছু করতে পারি না।

—দু-চার লাইনও নয়?

—না। তবে আপনি ইচ্ছে করলে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবরটা ছাপতে পারেন। কিন্তু তাতে খুনের উল্লেখ থাকলে চলবে না।

—কিন্তু আমি যে সবাইকে টুপুর খুনের খবরটাই জানাতে চাই।

—তাহলে আপনি পুলিশের থ্রুতে প্রসিড করুন। যদি মামলা হয় তাহলে আমি খবরটা ছেপে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। আর নইলে খুনের যথেষ্ট এভিডেন্স চাই। এলাহাবাদের লোকাল কাগজে কি খবরটা বেরিয়েছিল?

—না।

—তবে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকে কিছু জানাননি?

—জানিয়েছি, কিন্তু তারা কোনও গা করছে না যে। তারা লাশ চায়।

—লাশ! কেন, লাশ পাওয়া যায়নি?

—না। কী করে যাবে? টুপুকে যে একটা পাহাড়ি নদীতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

কোথায়?

টুপুর মা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলেন,—কোথায় তা আমি ঠিক জানি না।

তাহলে খুন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? সাক্ষী আছে?

—ন্ ন্ নাঃ।

—তবে কী করে জানলেন?

—ওরা কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে যায় আরও অনেক জায়গায়। সবশেষে ঘটনাটা ঘটে মাইথনে।

—মাইথনে?

—খুব নির্জন জায়গা। ওরা ফরেস্ট বাংলোতে থাকত।

—কারা? টুপু আর কে?

—ওঃ সে ঠিক জানি না।

—না জানলে কী করে হবে? টুপু কার সঙ্গে গিয়েছিল তা আপনার খোঁজ নেওয়া

উচিত।

—কী করে নেব? আমি অনাথা বিধবা। টুপুর তো বাবা নেই। টুপু একটিমাত্র। তবে আমাদের টাকা আছে। অনেক টাকা। খবরটা ছাপানোর জন্য যদি টাকা খরচ করতে হয় তো আমি পিছুপা হব না। বুঝলেন? টুপু যখন নেই তখন এত টাকা আমার কোন কাজে লাগবে? আমি আপনাকে খবরটা ছাপানোর জন্য হাজার টাকা দিতে পারি। রাজি?

—না। ধৃতি গম্ভীর হয়ে বলে—টাকা থাকলে আপনি বরং তা সৎ কাজেই ব্যয় করুন। খবরটা ছাপা গেলে আমি এমনিতেই ছাপতাম।

—কিছুতেই ছাপা যাবে না?

ধৃতি হঠাৎ প্রশ্ন করে—আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

টুপুর মা খানিক নিস্তব্ধ থেকে বললেন—কেন বলুন তো?

—এলাহাবাদ থেকে কি?

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর টুপুর মা বলেন—না—

—তবে কি কলকাতা থেকে?

—হ্যাঁ। আমি কাল কলকাতায় এসেছি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—আপনার চিঠিটাও কিন্তু কলকাতা থেকে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও চিঠিতে ডেটলাইন ছিল এলাহাবাদের।

টুপুর মা লজ্জার স্বরে বলেন,—সে একটা কাণ্ড। আমার একজন চেনা লোককে চিঠিটা ডাকে দিতে দিই। সে সেইদিনই কলকাতা যাচ্ছিল। তাই একেবারে কলকাতা গিয়ে ডাকে দিয়েছে। কিছু মনে করেছিলেন বোধহয়!

—না, মনে কী করব? এরকম হতেই পারে।

—আপনি হয়তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন?

বিরক্ত ধৃতি বলে—না-না।

—আমি কলকাতায় এসেছিলাম টুপুর ব্যাপারেই। টুপু কলকাতায় কোথায় ছিল তা আমি জানি না। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় আমি খোঁজ নিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

—টুপু কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল।

—কেন, বলিনি আপনাকে সে কথা?

—না।

টুপুর মা একটু হেসে বললেন—ওমা! আমারই ভুল তবে। যাহোক, আজকাল আমার মেমরিটা একদম গেছে। হ্যাঁ, টুপু তো পালিয়েই এসেছিল। টুপু যত সুন্দরী ছিল ততটা শান্ত বা বাধ্য ছিল না। খুব অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ।

—ও। তা পালাল কেন?

—আমি যা বারণ করতাম তাই করবে, এই ছিল স্বভাব টুপুর। ও খানিকটা ছেলের মতো মানুষ হয়েছিল তো। সাইকেল, সাঁতার, গাড়ি চালানো, বন্দুক ছোঁড়া সব জানতো।

—খুব চৌখোস মেয়ে তো।

—খুব। এক্সট্রা-অর্ডিনারি যাকে বলা যায়।

—পালাল কেন তা তো বললেন না।

—টুপুর যে বিয়ের ঠিক হয়েছিল।

—টুপু বিয়েতে রাজি ছিল না বুঝি?

—না। ও বলত আর একটু বয়স হলে সে মাদার টেরেসার আশ্রমে চলে যাবে বা সৎসঙ্গ কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যাবে। সারা জীবন সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে।

—কেন?

—ও পুরুষদের পছন্দ করত না। না, কথাটা ভুল বলা হল। আসলে ও কখনও তেমন পুরুষ দেখেনি যাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করা যায়। সব পুরুষমানুষকেই ও খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। বলত—এদের কাউকে বিয়ে করা যায় না।

—কিন্তু পালানোর ব্যাপারটা তো বললেন না।

—বলছি। আমরা ওর বিয়ে ঠিক করি একজন ব্রিলিয়ান্ট আমেরিকা ফেরত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। দারুণ ছেলে। টুপুর আপত্তি আমরা শুনিনি।

কেন?

—শুনিনি তার কারণ চট করে এরকম, ভালো পাত্র কি পাওয়া যায়, বলুন? যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব, দেদার টাকা রোজগার করে, হাই পজিশনে চাকরি করছে।

—তারপর?

—আশীর্বাদের আগের দিন টুপু একটা চিঠি লিখে রেখে চলে গেল। কাউকে, এমনকি আমাকে পর্যন্ত জানিয়ে যায়নি।

—সঙ্গে কেউ যায়নি?

—কী করে বলব?

—কলকাতায় গিয়েছিল কী করে জানলেন?

—সেখান থেকে আর একটা চিঠি দেয়। তাতে লেখে—আমি খুব ফুর্তিতে আছি। এবার বেড়াতে যাব দার্জিলিং, নেতারহাট, মাইথন, আরও কয়েকটা জায়গার নাম লেখে। সব মনে নেই।

—কিন্তু মারা যাওয়ার ব্যাপারটা?

—ওঃ হ্যাঁ। মাইথন থেকে ওর শেষ চিঠি। তাতে ও খুব মন খারাপের কথা লিখেছিল। জানিয়েছিল কে বা কারা ওর পিছু নিয়েছে। তারা ওর ভালো করতে চায় না, ক্ষতি করতে চায়।

—তারপর?

—তারপর আর কোনও খবর নেই। তবে আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখি যে টুপু উঁচু থেকে জলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে।

—আপনি কখনও মাইথনে গেছেন?

—গেছি।

—আমি যাইনি। জায়গাটা কেমন?

—সুন্দর।

—সেখানে পাহাড় আছে?

—আছে। তবে ছোট পাহাড়।

—টুপুও তাই লিখেছিল। সেখানে কি একটা বিখ্যাত মন্দির আছে না?

—আছে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির।

—সেখানে সেই মন্দিরে ঢোকবার গলিতে নাকি কারা টুপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শাসিয়েছিল যে মেরে ফেলবে।

—কিন্তু কেন?

—সে তো জানি না। টুপুর মতো মেয়ের কি শত্রু থাকতে পারে? তবু ছিল, জানেন। আর টুপু যে অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের ছিল।

—বুঝলাম। কিন্তু টুপুর সঙ্গে কেউ ছিল না?

—হয়তো ছিল। তাদের কথা টুপু লিখত না।

—কলকাতায় আপনাদের আত্মীয়স্বজন নেই?

—আমার শ্বশুরবাড়ি এখানে। তবে আমার দিককার কোনও আত্মীয় এদিকে থাকে না। আমার বাপের বাড়ি গোরক্ষপুরে, তিন পুরুষের বাস।

—টুপু কি তার বাপের বাড়িতে উঠেছিল?

টুপুর মা হেসে বললেন, টুপুর বাপের বাড়ি বলতে অবশ্য এলাহাবাদের বাড়িই বোঝায়। তবে এখানে আমার স্বামীর খুড়তুতো ভাই টাই আছেন! বাড়ির একটা অংশ অবশ্য আমাদের। সে অংশ তালা দেওয়া থাকে, আমরা কলকাতায় এসে সেখানেই উঠি। কিন্তু টুপু এ বাড়িতে আসেনি।

ধৃতি এতক্ষণ পরে টের পেল সে খামোখা এত কথা বলছে বা শুনছে। শুনে তার কোনও লাভ নেই। টুপুর ব্যাপারে তার করারও কিছু নেই।

ধৃতি বলল—সবই বুঝলাম। কিন্তু সিমপ্যাথি জানানো ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন?

—শুনুন। দয়া করে আপনার বাসার ঠিকানাটা দেবেন?

—কেন?

—বিরক্ত হবেন না। ঠিকানাটা থাকলে আমি যদি দরকারে পড়ি তাহলে কনট্যাক্ট করতে পারবো। আমি কলকাতার কিছুই চিনি না। আমার দেওররাও খুব সিমপ্যাথেটিক নয়। আমি আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য পেলে খুব উপকৃত হব। অবশ্য যদি কখনও দরকার হয়, নইলে এমনিতে বিরক্ত করব না।

একটু দ্বিধা করেও ধৃতি ঠিকানাটা বলল।

—আপনার বাসায় ফোন নেই?

—না।

—আচ্ছা, ছাড়ছি।

ভদ্রমহিলা ফোন রাখলেন। ধৃতি হাঁফ ছাড়ল।

## ॥ পাঁচ ॥

পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে দামি ডিনার খেল ধৃতি। মাঝে-মাঝে খায়। বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। যতদিন এরকম একা আছে ততদিন আমিরি করে নিতে পারবে।

বিয়ে ধৃতি করতে চায় না। কিন্তু বউয়ের কথা ভাবতে তার খারাপ লাগে না। কিন্তু ভয় পায়। সে একটু প্রাচীনপন্থী। আজকালকার মেয়েদের হাব-ভাব আর চলা-ফেরা দেখে তার ভয় লাগে। এরা তো ঠিক বউ হতে পারবে না। বড়জোর কম্প্যানিয়ন হতে পারে, আর বেড ফ্রেন্ড।

ট্যাক্সি ছেড়ে ধৃতি ফ্ল্যাটে উঠে এল। দরজা ভালো করে বন্ধ করল। নিজের ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে টেবিলের সামনে বসে সিগারেট ধরাল। এখন রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকবে। কয়েকটা থ্রিলার কেনা আছে। পড়বে। তার আগে একটু কিছু লিখবে। এই একা নিশুত রাতে জেগে থাকা তার প্রিয়। এইটুকু একেবারে তার নিজস্ব সময়।

শৌখিন রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে চিঠির বাক্সটা দেখে আসেনি।

আবার উঠে নীচে এল ধৃতি। চিঠি পেতে সে ভীষণ ভালোবাসে। রোজ চিঠি এলে

কত ভালো হয়।

চিঠি ছিল। দুটো। দুটোই খাম। একটার ওপর দিদির হাতের লেখা ঠিকানা। বোধহয় দীর্ঘকাল পর মনে পড়েছে ভাইকে। আর একটা খামে কোনও ডাকটিকিট নেই, হাতের লেখা অচেনা।

নিজের ঘরে এসে ধৃতি প্রথমে চিঠিটা খুলল। ভাইয়ের জন্য দিদি একটি পাত্রী দেখেছে। চিঠির সঙ্গে পাত্রীর পাসপোর্ট সাইজের ফটোও আছে। দেখল ধৃতি। মন্দ নয়। তবে একটু আপস্টার্ট চেহারা। দিল্লিতে বিএ পড়ে। বাবা সরকারি অফিসার।

ধৃতি অন্য চিঠিটা খুলল। সাদা কাগজে লেখা—একা বাসায় ভূতের ভয় পাচ্ছেন তো। ভূত না হলেও পেত্নীরা কিন্তু আছে। সাবধান। আপনার ঘর গুছিয়ে রেখে গেছি। যা অন্যমনস্ক আপনি, হয়তো লক্ষই করেননি। ফ্রিজে একটা চমৎকার খাবার রেখে যাচ্ছি। খাবেন। মেয়েরা কিন্তু খারাপ হয় না পুরুষগুলোই খারাপ। চিঠিটা লেটার বক্সে রেখে যাচ্ছি যাতে চট্ করে নজরে পড়ে।—পরমা। পুঃ পরশু হয়তো আবার আসব। দুপুরে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে।

ধৃতি উঠে গিয়ে ডাইনিং হলে ফ্রিজ খুলল।

কথা ছিল ক'দিন ফ্রিজ বন্ধ থাকবে। ছিলও তাই। পরমা আজ চালিয়ে রেখে গেছে। একটা কাচের বাটিতে ক্ষীরের মতো কী একটা জিনিস। ঠান্ডা বস্তুটা মুখে ঠেকিয়ে ধৃতি দেখে পায়েস। তাতে কমলালেবুর গন্ধ। কাল খাবে।

ফ্রিজ বন্ধ করে ধৃতি হলঘর যখন পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ খেয়াল হল বাইরের দরজাটি কী সে বন্ধ করেছে? এগিয়ে গিয়ে দরজার নব ঘোরাতেই বেকুব হয়ে বুঝল, সত্যিই বন্ধ ছিল না দরজাটা।

সকালে উঠে ধৃতি টের পায় সারা রাত ঘুমের মধ্যে সে কেবলই টুপুর কথা ভাবছে। খুবই আশ্চর্য কথা।

টুপুর কথা সে ভাববে কেন? টুপু কে! টুপুকে সে তো চোখেও দেখেনি। মনটা বড় ভার হয়ে আছে। নিজের কোনও দুর্বলতা বা মানসিক শ্লথভার ধরা পড়লে ধৃতি খুশি হয় না।

টুপু বা টুপুর মা-র সমস্যা নিয়ে তার ভাববার কিছু নেই। ঘটনাটার মধ্যে হয়তো কিছু রহস্য আছে। তা থাক। সে রহস্য না জানলেও তার চলবে। টুপুর মা কি পাগল? হলেই বা তার তাতে কী?

টুপু কি বেঁচে আছে? টুপু কি সত্যিই বেঁচে নেই? এসব জানবার বা প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না। ধৃতি স্বপ্ন-দেখা মানুষ নয়, কল্পনার ঘোড়া ছাড়তেও সে পটু নয় তেমন।

তবু কাল সারা রাত, ঘুমের মধ্যে সে কেন টুপুর কথা ভেবেছে?

দাঁত মেজে ধৃতি নিজেই চা তৈরি করে খেল। পত্রিকাটা বারান্দা থেকে এনে খুলে বসল। খবর কিছুই নেই। তবু যথাসম্ভব সে যখন খবরগুলো পড়ে তখনও টের পেল বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে তার নানা চিন্তা-ভাবনা ঢুকে যাচ্ছে।

এবং ফের টুপুর কথাই ভাবছে সে। জ্বালাতন।

পত্রিকা ফেলে রেখে সিগারেট ধরিয়ে নিজের এই অদ্ভুত মানসিক অবস্থাটা বিশ্লেষণ করতে থাকে ধৃতি। কিন্তু বিশ্লেষণ করে কিছুই পায় না! টুপুর সঙ্গে তার সম্পর্ক মাত্র একটি ফটো দিয়ে। সে ফটোটাও খুব নির্দোষ নয়। আর টুপুর মা টেলিফোনে এবং চিঠিতে টুপুর সম্বন্ধে যা লিখেছে সেইটুকু মাত্র জানা। অবশ্য যোগ বিয়োগ করে নিয়ে একটা রক্তমাংসের মেয়েকে কল্পনা করা যায় না এমন নয়। কিন্তু ততদূর কল্পনাপ্রবণ তো ধৃতি এতকাল ছিল

না।

অন্যমনস্কতার মধ্যেই সে কখন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে, ফ্রিজ থেকে পরমার রেখে যাওয়া পায়েস বার করে খেয়েছে, আবার চা করেছে। ফের সিগারেটও ধরিয়েছে।

বিকেলের শিফটে ডিউটি। সারাটা দিনের অবকাশ পড়ে আছে। কাজ নেই বলে ধৃতি বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসল। চমৎকার বারান্দাটা। নীচে রাস্তা। সারাদিন বসে-বসে লোক চলাচল দেখা যায়।

দেখছিল ধৃতি। কিন্তু আবার দেখছিলও না। তার কেবলই মনে হয়, টুপুর মা যা বলছে তার সবটা সত্যি নয়। টুপু যে মারা গেছেই তার কোনও প্রমাণ নেই। সেটা হয়তো কল্পনা বা গুজব। টুপু বেঁচে আছে ঠিকই। একটি কথা কাল টুপুর মাকে জিগ্যেস করতে ভুল হয়ে গেছে—টুপুর ফটোতে তার পাশে কে ছিল, যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

ধৃতির অবকাশ যে অখন্ড তা নয়। সেই ফিচারটা সে এখনও লিখে উঠতে পারেনি। প্রায় দুসপ্তাহ আগে অ্যাসোসিয়েটেড এডিটর তাকে ডেকে পণপ্রথা নিয়ে আর একটা ফিচার লিখতে বলেছেন। দু-সপ্তাহ সময় দেওয়া ছিল। বিভিন্ন বাড়ির গিন্নি, কলেজ ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রী, সমাজের নানা স্তরের মানুষজনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। সে কাজ পড়ে আছে ধৃতির। এক অবান্তর চিন্তা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতদিন তেমন প্রকট কিছু ছিল না, কিন্তু কাল বহুক্ষণ টুপুর মা-র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর থেকেই তাব মাথাটা অশরীরী বা নিরুদ্দেশ টুপুর হেপাজতে চলে গেছে।

আজ সময় আছে। ধৃতি টুপুর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সাজপোশাক করে বেরিয়ে পড়ল।

প্রফেসরদের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে পুলক নিমীলিতচোখে আধশোয়া হয়ে চুরুট টানছে, এমন দৃশ্যই দেখবে বলে আশা করেছিল ধৃতি। হুবহু মিলে গেল। প্রফেসরদের চাকরিটা আলসেমিতে ভরা। সপ্তাহে তিন চারদিন ক্লাশ থাকে, বছরে লম্বা লম্বা গোটা দুই তিন ছুটি, আলসে না হয়ে উপায় কী, এই পুলক যে একসময় ফুটবলের ভাল লেফট আউট ছিল তা আজকের মোটাসোটা চেহারাটা দেখে মালুম হয় না। মুখে সর্বদা স্নিগ্ধ হাসি, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত চাউনি, হাঁটাচলায় আয়েসি মন্থরতা।

ধৃতিকে দেখে সোজা হওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে-করতে বলল, আরে! আজই কি তোমার আসবার কথা ছিল নাকি? স্টুডেন্টরা তো বোধহয় একটা সেমিনারে গেল।

ধৃতি একটা চেয়ার টেনে বলল, আজই আসবার কথা ছিল না ঠিকই। তবে এসে যখন গেছি তখন দুচারজনকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো। ইন্টারভিউটা আজ না নিলেই নয়।

—দেখছি, তুমি বোসো। বলে পুলক দু-মনি শরীর টেনে তুলল। রমেশ নামক কোনও বেয়ারাকে ডাকতে-ডাকতে করিডোরে বেরিয়ে গেল।

পুলকদের কমপারেটিভ লিটারেচরের ছাত্র নগণ্য, ছাত্রীই বেশি। এসব ছাত্রীরাও আবার অধিকাংশই বড়লোকের মেয়ে। পণপ্রথাকে এরা কোন দৃষ্টিতে দেখে তা ধৃতির অজানা নয়। চোখা চালাক আলট্রা স্মার্ট এসব মেয়েদের পেট থেকে কথা বের করাও মুশকিল। কিছুতেই সহজ সরলভাবে অকপট সত্যকে স্বীকার করবে না। বাকি দুজনের একজন একটু বয়স্কা এবং বিবাহিতা, অন্যটা সুন্দরী নয় বটে, কিন্তু কালো আভরণহীন রূপটানহীন চেহারাটায় এক ধরনের ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

ধৃতি আজকাল মেয়েদের লজ্জা পায় না, আগে পেত। সুন্দরীদের ছেড়ে সে কালো মেয়েটিকেই প্রথম প্রশ্ন করে, আপনার বিয়েতে যদি পাত্রপক্ষ পণ চান তাহলে আপনার রিঅ্যাকশন কী হবে?

—আমি কালো বলে বলছেন?

—তা নয়, বরং আপনাকেই সবার আগে নজরে পড়ল বলে।

মেয়েটি কাঁধটা একটু বাঁকিয়ে বলে, প্রথমত আমার বিয়ে নেগোশিয়েট করে হবে না, আমি নিজেই আমার মেট বেছে নেব, পণের প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নটাকে অত পারসোনালি নেবেন না। আমি পণপ্রথা সম্পর্কে আপনার মত জানতে চাইছি।

—কীরকম কন্ডিশন?

—বাবা-মার সঙ্গে থাকা চলবে না, সন্ধে ছ'টার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে, ঘরের কাজে হেলপ করতে হবে, উইক এন্ডে বাইরে নিয়ে যেতে হবে, রান্না ঘরের সব কাজের জন্য লোক রাখতে হবে, স্বামীর পুরো রোজগারের ওপর স্ত্রীর কন্ট্রোল থাকবে...এরকম অনেক কিছু।

সুন্দরীদের একজন ভারী সুরেল গলায় বলে ওঠে, অলকা আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে।

ধৃতি লিখতে-লিখতে মুখ তুলে হেসে বলে তাহলে আপনিই বলুন।

—আমি! ওঃ পণপ্রথা শুনলে এমন হাসি পায় না। বলে মেয়েটি বাস্তবিকই হাতে মুখ ঢেকে হেসে ওঠে। সঙ্গে অন্যরাও।

ধৃতি একটু অপেক্ষা করে। হাসি থামলে মৃদু স্বরে বলে, ব্যাপারটা অবশ্য হাসির নয়।

মেয়েটি একটু গলা তুলে বলে, সিস্টেমটা ভীষণ প্রিমিটিভ।

—আধুনিক সমাজেও বিস্তর প্রিমিটিভনেস রয়ে গেছে যে!

—তা জানি। সেই জন্যই তো হাসি পায়।

এই সিস্টেমটার বিরুদ্ধে আপনি কী করতে চান?

—কেউ পণটন চাইলে আমি তাকে বলব, আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে।

বিবাহিতা মহিলাটি উশখুশ করছিলেন। এবার বললেন, না না, শুনুন। আমি বিবাহিতা এবং একটি মেয়ের মা। আমি জানি সিস্টেমটা প্রিমিটিভ এবং হাস্যকর। তবু বলি, এই ইভিলটাকে ওভাবে ট্যাকল করা যাবে না। আমার মেয়েটার কথাই ধরুন। ভীষণ সিরিয়াস টাইপের, খুব একটা স্মার্টও নয়। নিজের বর নিজে জোগাড় করতে পারবে না। এখনও মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যদি আমি একটা ভালো পাত্র পাই এবং সেক্ষেত্রে যদি কিছু পণের দাবি থাকেও তবে সেটা অন্যায় জেনেই মেয়ের স্বার্থে হয়তো আমি মেনে নেব।

সুন্দরী মেয়েটি বলল, তুমি শুধু নিজের মেয়ের কথাই ভাবছো নীতাদি।

—মেয়ের মা হ' আগে, তুইও বুঝবি।

ধৃতি প্রসঙ্গ পালটে আর একজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে, পণপ্রথা ভীষণ খারাপ তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা টিফলিশ প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা আপনাকে করব?

—খুব শক্ত প্রশ্ন নয় তো?

পুলক পাশেই একটা চেয়ারে বসে নীরবে চুরুট টেনে যাচ্ছিল। এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, তুমি একটি আস্ত বিচ্ছু ইন্দ্রানী। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি তোমার চেয়েও বিচ্ছু। ওয়াচ ইওর স্টেপ।

ইন্দ্রানী উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলে, কংগ্র্যাটস মিস্টার বিচ্ছু। বলুন প্রশ্নটা কী?

ধৃতি খুব অকপটে মেয়েটির দিকে চেয়ে ছিল। এতক্ষণ ভালো করে লক্ষ করেনি। লক্ষ করে এখন হাঁ হওয়ার জোগাড়। ছবির টুপুর সঙ্গে আশ্চর্য মিল। কিন্তু গল্পে যা ঘটে, জীবনে তা ঘটে খুবই কদাচিৎ। এ মেয়েটির আসল টুপু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই, ধৃতি তাও জানে। সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমরা লক্ষ করেছি পাত্রপক্ষ আজকাল যতটা দাবিদাওয়া

করে তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি থাকে পাত্রীর।

—তাই নাকি?

—মেয়েরা আজকাল বাবা মায়ের কাছ থেকে নানা কৌশলে অনেক কিছু আদায় করে নেয়। পণপ্রথার চেয়ে সেটা কি ভালো?

ইন্দ্রানীর মুখ হঠাৎ ভীষণরকম গম্ভীর ও রক্তাভ হয়ে উঠল। মাথায় একটা ঝাপটা খেলিয়ে বলল, কে বলেছে ওকথা? মোটেই মেয়েরা বাপের কাছ থেকে আদায় করে না। মিথ্যে কথা।

ধৃতি নরম গলায় বলে, রাগ করবেন না। এগুলো সবই জরুরি প্রশ্ন, আপনাকে অপ্রতিভ করার জন্য প্রশ্নটা করিনি।

বিবাহিতা মহিলাটি আগাগোড়া উশখুশ করেছিলেন, এখন হঠাৎ বলে উঠলেন, ইন্দ্রানী যাই বলুক আমি জানি কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েরা আজকাল বড্ড ওরকম হয়েছে।

একথায় ইন্দ্রানী চটল। বলল, মোটেই না নীতাদি। তোমার এক্সপেরিয়েন্স অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু আমরা এই জেনারেশনের মেয়েরা মোটেই ওরকম নই। বরং আমরা মেয়েরা যতটা মা-বাবার দুঃখ বুঝি ততটা এযুগের ছেলেরা বোঝে না।

নীতা বললেন, সেকথাও অস্বীকার করছি না।

—তাহলে? আজকালকার ছেলেরা তো বিয়ে করেই বাবা-মাকে আলাদা করে দেয়। দেয় না বলো?

নীতা হেসে বললেন, সে তো ঠিকই, কিন্তু এ যুগের ছেলেরা বিয়ে করে কাকে সেটা আগে বল, তোর মতো একালের মেয়েদেরই তো।

—তা তো করেই।

—সেই মেয়েরাই তো বউ হয়ে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দেয়।

ইন্দ্রানী মাথা নেড়ে বলে, ওটা একপেশে কথা হল। সবসময়ে বউরাই পরামর্শ দেয় না, ছেলেরা নিজেরাই ডিশিসন নেয়। তোমার ডিফেক্ট কী জানো? ওভার সিমপ্লিফিকেশন।

ধৃতি বিপদে পড়ে চুপ করে ছিল। এবার গলা খাঁকরি দিয়ে বলল, আমরা প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। পণপ্রথা নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ইন্দ্রানী তার উজ্জ্বল ও সুন্দর মুখখানা হঠাৎ ধৃতির দিকে ফিরিয়ে ঝাঁজাল গলায় বলল, এবার বলুন তো রিপোর্টার মশাই, নিজের বিয়ের সময় আপনি কী করবেন?

—আমি! ধৃতি একটু অবাক হল। তারপর এক গাল হেসে বলল, আমার বিয়ে তো কবে হয়ে গেছে। আমি ইনসিডেন্টালি তিন ছেলেমেয়ের বাপ।

ইন্দ্রানীর চোখে আচমকাই একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কিন্তু টক করে মাথাটা নুইয়ে নিল সে। তারপর ফের নিপাট ভালোমানুষের মতো মুখটা তুলে বলল, আপনি পণ নেননি?

ধৃতি খুব লাজুকভাবে চোখ নামিয়ে বলল, সামান্য চাকরি, তাই পণও সামান্যই নিয়েছিলাম, হাজার পাঁচেক।

এই স্বীকারোক্তিতে সকলে একটু চুপ মেরে গেল। কিন্তু একটা নিঃশব্দ ছিছিকার স্পষ্ট টের পাচ্ছিল ধৃতি।

হঠাৎ পুলক হেসে ওঠায় অ্যাটমসফিয়ারটা মার খেয়ে গেল।

ইন্দ্রানী বলল, ইয়ার্কি মারছেন, না?

—কেন?

—আপনি মোটেই বিয়ে করেননি।

আমার বিয়েটা ফ্যাক্টর নয়। আপনি এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। ইন্দ্রানী

বল্ল, জবাব দিইনি কে বলল? আমরা মোটেই ওরকম নই। আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করল ধৃতি কিন্তু তেমন কোনও লাভ হল না। বারবার তর্ক লেগে যেতে লাগল। শেষে ঝগড়ার উপক্রম।

অবশেষে ইন্টারভিউ শেষ করে ধৃতি উঠে পড়ল। যেটুকু জানা গেছে তাই যথেষ্ট।

পুলক নিয়ে গিয়ে কফি খাওয়াল। নিজে থেকেই যেচে বলল, ইন্দ্রানী মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগল?

—খারাপ কী?

শি ইজ ইন্টারেস্টিং। পরে ওর কথা তোমাকে বলব। শি ইজ ভেরী ইন্টারেস্টিং। ধৃতি ফিরে এল বাসায়।

## ॥ ছয় ॥

টুপুর খোঁজ যদি ধৃতিকে করতেই হয় তবে তার কিছু সহায় সম্বল দরকার। তামাম কলকাতা, মাইথন, এলাহাবাদ বা ভারতবর্ষের সমগ্র জনবসতির মধ্যে কোথায় টুপু লুকিয়ে আছে তা একা খুঁজে দেখা ধৃতির পক্ষে অসম্ভব। টুপু মরে গেছে কি না তাও বোধহয় সঠিক জানা যাবে না। মাইথনের পুলিশের কাছে কোনও রেকর্ড না থাকারই সম্ভাবনা।

এক দুপুরে ধৃতি টুপু সংক্রান্ত চিঠি ও ফোটো বের করে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে বসল। টেলিফোনে টুপুর মার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে লিখল ডায়েরিতে। জয়ন্ত সেন আর কালীবাবুর সঙ্গে যা সব কথাবার্তা হয়েছে তাও বাদ দিল না। পুরো একখানা কেস হিস্ট্রি তৈরি করছিল সে। মাঝপথে কলিংবেল বাজল এবং রসভঙ্গ করে উদয় হলেন পরমা। সঙ্গে বাচ্চা ঝি।

—ইস! কতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি! বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে কানটাও গেছে দেখছি।

ধৃতি নীরস মুখে বলে—কতক্ষণ জ্বালাবে বলো তো! ঘরের কাজ কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে কেটে পড়ো। আমার জরুরি লেখা আছে।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে চোখ গোল করে বলে—বলি এ ফ্ল্যাটটা আমার না আর কারও? আমারই ফ্ল্যাট থেকে আমাকেই কি না সরে পড়তে বলা হচ্ছে। মগের রাজত্ব নাকি?

—ফ্ল্যাট তোমার হতে পারে কিন্তু আমারও প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে।

—ইঃ প্রাইভেসি! ব্যাচেলারদের আবার প্রাইভেসি কী? তারা হবে সরল, দরজা জানলা খোলা ঘরের মতো, আকাশের মতো, শিশুর মতো।

—থাক থাক। তুমি যে কবিতা লিখতে তা জানি।

—খারাপও লিখতাম না। বিয়ে হয়েই সর্বনাশ হয়ে গেল। কবিতা উবে গেল, প্রেম উবে গেল।

ধৃতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানও।

—তার মানে?

—কিছু বলিনি।

পরমা চোখ এড়িয়ে বলল,—আমার এ্যাবসেনসে ঘরে কাউকে ঢোকাননি তো! ছেলেরা চরিত্রহীন হয়! বলতে বলতে পরমা ধৃতিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তার ঘরের পরদা সরাল। পরমুহূর্তেই 'ওম্মা' বলে ভেতরে ঢুকে গেল।

ধৃতি বুঝল সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন টুপুর ফটো লুকোনোর চেষ্টা বৃথা। তার সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর ও ভ্রূকুটিকুটিল করে নিজের ঘরে এল।

পরমা খাটের ওপর সাজানো কাগজপত্র আর ফটো আঠা মাখানো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। শ্বাস ফেলে বলল,—চরিত্রহীন! আগাপাশতলা চরিত্রহীন।

কে?

পরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে বলে—ছিঃ-ছিঃ, প্রায় আমার মতোই সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন, আর সে খবরটা একবার জানাননি পর্যন্ত!

তোমার চেয়ে ঢের সুন্দরী।

—ইস। আনুন না একবার কাছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখি। সাহস আছে?

—আস্তে পরমা, কেউ শুনলে হাসবে।

—কে আছে এখানে শুনি! আর হাসবারই বা কী আছে।

উদাসভাবে ধৃতি বলে, পাখি-টাখিও তো আসে জানালায়, বাতাসও তো আসে, তারাই শুনে হাসবে।

চোখ পাকিয়ে পরমা বলে, হাসবে কেন?

—তোমার চ্যালেঞ্জ-এর কথা শুনে। মেয়েটা কে জানো?

—কে, সেটাই তো জানতে চাইছি।

—মিস ক্যালকাটা ছিল, এখন মিস ইন্ডিয়া। হয়তো মিস ইউনিভার্স হয়ে যাবে।

—ইল্লি। অত সোজা নয়। এবারের মিস ক্যালকাটা রুমা চ্যাটার্জি আমার বান্ধবীর বোন।

—তুমি একজন সাংবাদিককে সংবাদ দিচ্ছো?

পরমা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা হার মানলাম। রুমা গতবার হয়েছিল।

—এ এবার হয়েছে।

—সত্যি?

—নাম কী?

—টুপু।

—যাঃ টুপু একটা নাম নাকি? ডাকনাম হতে পারে। পোশাকি নাম কী?

—তোমার বয়স কত হল পরমা?

—আহা, বয়সের কথা ওঠে কীসে?

—ওঠে, হে ওঠে, ইউ আর নট কিপিং উইথ দা টাইম। তোমার আমলে পোশাকি নাম আর ডাকনাম আলাদা ছিল। আজকাল ও সিস্টেম নেই। এখন ছেলেমেয়েদের একটাই নাম থাকে। পল্টু, ঝন্টু, পুসি, টুপু, রুণু, নিনা...

—থাক থাক, নামের লিস্টি শুনতে চাই না। মেয়েটার সঙ্গে আপনার রিলেশন কী?

পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরীর সঙ্গে আমার একটাই রিলেশন। দাতা এবং গ্রহীতার।

—তার মানে?

—অর্থাৎ তারা সৌন্দর্য বিতরণ করে এবং আমি তা আকণ্ঠ পান করি।

আর কিছু না?

ধৃতি মাথা নেড়ে করুণ মুখ করে বলে, তোমার চেহারাখানা একেবারে ফেলনা নয় বটে, কেউ কেউ সুন্দরী বলে তোমাকে ভুলও করে মানছি, কিন্তু আজ অবধি বোধহয় ভুল করেও তোমাকে কেউ বুদ্ধিমতী বলেনি!

পরমা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, এ মা, কী সব অপমান করছে রে মুখের ওপর!

—ভাই বন্ধুপত্নী, দুঃখ কোরো না, সুন্দরীদের বুদ্ধিমতী না হলেও চলে। কিন্তু এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, একজন যৎসামান্য বেতনের সাব এডিটরের সঙ্গে মিস ক্যালকাটার দেবীর ভক্ত ছাড়া আর কোনও রিলেশন হতে পারে না!

—খুব পারে। নইলে ফটোটা আপনার কাছে এল কী করে?

—সে অনেক কথা। আগে তোমার ওই বাহনটাকে এক কাপ জমাট কফি বানাতে বলো।

—বলছি। আগে একটু শুনি।

—আগে নয়, পরে। যাও।

—উঃ, বলে পরমা গেল।

পরমুহূর্তে ফিরে এসে বলল, কফি আসছে, কফি আসছে, বলুন।

—মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগছে?

—মন্দ কী?

—না-না, ওরকম ভাসা-ভাসা করে নয়। বেশ ফিল করে বলো। ছবিটার দিকে তাকাও, অনুভব করো, তারপর বলো।

—নাকটা কি একটু চাপা?

—তাই মনে হচ্ছে?

—ফটোতে বোঝা যায় না অবশ্য। ঠোঁট দুটো কিন্তু বাপু বেশ পুরু।

আগে কহো আর।

—আর মোটামুটি চলে।

ধৃতি হেসে ফেলে বলে, বাস্তবিক মেয়েরা পারেও।

—তার মানে?

—এত সুন্দর একটা মেয়ের এতগুলো খুঁত বের করতে কোনও পুরুষ পারত না।

পরমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ইঃ পুরুষ। পুরুষদের আবার চোখ আছে নাকি? মেয়ে দেখলেই হ্যাংলার মতো হামলে পড়ে।

—সব পুরুষই হ্যাংলা নয়, বন্ধুপত্নী। এত পুরুষের মাথা খেয়েছ তবু পুরুষদের এখনও ঠিকমতো চেনোনি।

—চেনার দরকার নেই। এবার বলুন তো ফটোটা সত্যিই কার?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, আগে আমার কথা একটু-আধটু বিশ্বাস করতে, আজকাল বিশ্বাস করাটা একদম ছেড়ে দিয়েছ।

—আপনাকে বিশ্বাস! ও বাবা, তার চেয়ে কেউটে সাপ বেশি বিশ্বাসী। যা পাজি হয়েছেন আজকাল।

—তা বলে সাপখোপের সঙ্গে তুলনা দেবে?

—দেবই তো। সবসময় আমাকে টিজ করেন কেন?

—মুখ দেখে তো মনে হয় টিজিংটা তোমার কিছু খারাপ লাগে না।

—লাগে না ঠিকই, তা বলে সবসময় নিশ্চয়ই পছন্দ করি না। যেমন এখন করছি না। এখন সিরিয়াস প্রশ্ন কেবলই ইয়ার্কি মেরে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বলে পরমা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা কটাক্ষ করল।

ধৃতি নিজের বুকে দুহাত চেপে ধরে বলল, মর গয়া। ওরকম করে কটাক্ষ করো না মাইরি। আমার এখনও বিয়ে হয়নি, মেয়েদের কটাক্ষ সামাল দেওয়ার মতো ইমিউনিটি নেই আমার।

—খুব আছে। কটাক্ষ কিছু কম পড়ছে বলে মনে তো হয় না। আগে মেয়েদের ছবি ঘরে আসত না, আজকাল আসছে।

—আরে ভাই, মেয়েটার ফোটো নয়। মিস ক্যালকাটা অ্যান্ড মিস ইন্ডিয়া। এর ওপর

একটা ফিচার হচ্ছে আমাদের কাগজে। আমাকেই এর ইন্টারভিউ নিতে হবে। তাই...

পরমা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এ যদি মিস ইন্ডিয়া হয়ে থাকে তবে তো খেঁদি-পেঁচিদেরই যুগ এল।

কফি এসে যেতে দুজনেই একটু ক্ষান্ত দিল কিছুক্ষণ, কিন্তু পরমা চেয়ারে বসে ঠ্যাং দোলাতে-দোলাতে খুব দুষ্টু চোখে লক্ষ করছিল ধৃতিকে। ধৃতি বলল, তুমি কফি খেলে না?

—আমি তো আপনার আর আপনার বন্ধুর মতো নেশাখোর নই।

উদাস ধৃতি বলল, খেলে পারতে। কফিতে বুদ্ধি খোলে। বিরহের জ্বালাও কমে যায়।

—আপনার মাথা। যাই বাবা, ঘরদোর সেরে আবার ফিরে যেতে হবে। পরমা উঠল এবং দরজার কাছ বরাবর গিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, আচ্ছা একটা কথা বলব?

—বলে ফ্যালো।

—এই যে আমার স্বামী দিল্লি গেছে বলে আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে এটার কোনও অর্থ হয়?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

পরমা বেশ তেজের গলায় বলে, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। সব বুঝেও অমন না বোঝার ভান করেন কেন বলুন তো! আমি বলছি, জয় এখানে নেই বলে আমার এই ফ্ল্যাটে থাকা চলছে না কেন?

ধৃতি অকপট চোখে পরমার দিকে বোকা সেজে বলে. আমি আছি বলে।

—আপনি থাকলেই বা কী? আমরা দুজনেই থাকতে পারতাম। দিব্যি আড্ডা দিতাম, রান্না করতাম, বেড়াতাম।

—ও বাবা তুমি যে ভারী সাহসিনী হয়ে উঠছ।

—না-না, ইয়ার্কি নয়! আজকাল খুব নারীমুক্তি আন্দোলন-টন হচ্ছে শুনি, কিন্তু মেয়েদের এত শুচিবায়ু থাকলে সেটা হবে কী করে? পুরুষ মানেই ভক্ষক আব মেয়ে মানেই ভক্ষ্য বস্তু এরকম ধারণাটা পালটানো যায় না?

ধৃতি পরমার সামনে এই বোধহয় প্রথম সত্যিকারের অস্বস্তি আর অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। মেয়েদের নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা খুব বেশি গম্ভীর নয়। ভাববার দরকারও পড়েনি। কিন্তু পরমার প্রশ্নটি ভীষণ জরুরি বলেই তার মনে হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে দিতে পণ লাগে, মেয়েরা একা সর্বত্র যেতে পারে না, মেয়েদের জীবনে অনেক বারণ।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, পুরুষরা এখনও পুরোপুরি পশুত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরমা। যেদিন পারবে সেদিন তোমরা অনেক বেশি ফ্রিডম পাবে।

পরমা মাথা নেড়ে বলল, পুরুষদের খামোখা পশু ভাবতে যাব কেন? বড় জোর তারা ডমিন্যান্ট, কিন্তু পশু নয়। আমার বাবা পুরুষ, আমার ভাই পুরুষ, আমার স্বামী পুরুষ। আমার পুরুষ ওয়েল উইশারেরও অভাব নেই। তাদের আমি পশুর দলে ভাবতে পারি না।

—আলোচনাটা বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে পরমা।

পরমা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক পরদা নীচু গলায় বলল, আমি সত্যিই বাপের বাড়িতে থাকতে ভালোবাসি না। আপনার সঙ্গে আড্ডা মারাটাও আমার বেশ প্রিয়। কিন্তু তবু দেখুন, আপনার মতো একজন নিরীহ পুরুষের সঙ্গ বর্জন করার জন্য আমাকে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে হচ্ছে। এটা মেয়েদের পক্ষে অপমান নয়?

ধৃতি হেসে বলল, পুরুষদের পক্ষেও। আমার ভয়ে যে তুমি পালিয়ে আছ এটা তো আমার পক্ষে সম্মানের নয়।

পরমা হঠাৎ ধৃতিকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল, আমি ভাবছি আজ আর বাপের বাড়ি

যাব না। এখানেই থাকব। রাজি?

ধৃতি একটু হাসল। হাত দুটো উলটে দিয়ে বলল, আপকি মর্জি। আমি বারণ করার কে পরমা? এ তো তোমারই ফ্ল্যাট।

—ওসব বলে দায়িত্ব এড়াবেন না। এটা কার ফ্ল্যাট সেটা এ প্রসঙ্গে বড় কথা নয়। আসল কথা হল আমি একজন যুবতী, আপনি একজন পুরুষ। আমরা এই ফ্ল্যাটে থাকলে আপনি কী মনে করবেন?

ধৃতি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, কিছু মনে করব না। কলকাতায় ওরকম কতজনকে থাকতে হচ্ছে। কেউ মাথা ঘামায় না। তুমি অত ভাবছ কেন?

—ভাবছি আপনার জন্যই। জয় দিল্লি যাওয়ার আগে এই ব্যবস্থাটা করে গেছে। বিলেত আমেরিকায় ঘুরে এসেও কেন যে ওর শুচিবায়ু কাটেনি তা কে বলবে? অথচ এতে করে খামোখা আপনাকে অপমান করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অপমান আমারও।

ধৃতি স্মিতমুখে বলল, জয়টা একটু সেকেলে। কিন্তু আমার মনে হয় ও বিশেষ তলিয়ে ভাবেনি।

—ভাবা উচিত ছিল।

—সকলেরই কি অত ভাবাভাবি আসে?

—আপনার বন্ধুর না এলেও আমার আসে। তাই ঠিক করেছি থাকব। ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, থেকে যাও তাহলে।

—খুশি মনে মত দিলেন তো!

—দিচ্ছি, শুধু একটু কম টিকটিক করবে।

—আমি কি বেশি টিকটিক করি?

—না-না, তা বলছি না, তোমার টিকটিক করাটাও শুনতে ভারী ভালো। তবে কি না—

—বুঝেছি। বলে পরমা রাগ করে বা রাগের ভান করে চলে গেল।

ধৃতি তাকে বেশি ঘাঁটাল না, বরং পণপ্রথা বিষয়ক সাক্ষাৎকারগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে রাখতে লাগল। তার ভাগ্য ভালো যে, প্রথম শ্রেণির একটি দৈনিক পত্রিকায় সে চাকরি করে এবং সাব-এডিটর হয়েও স্বনামে নানারকম লেখার সুযোগ পায়। প্রাপ্ত এইসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ওপরে ওঠার পথ খোলা। সে লেখে ভালো, নামও আছে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার পাঠকদের স্মৃতি খুবই কম। বারবার নামটা তাদের চোখে না পড়লে তারা তাকে মনেও রাখবে না। তবে ধৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে লেখে এবং মোটামুটি সত্য ও তথ্যের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করে।

পরমা রাত্তিরে চমৎকার ডিনার খাওয়াল। আলুর দম, ডাল, পাঁপড় ভাজা আর স্যালাড। টুকটাক কথা হল, তবে ধৃতি অন্যমনস্ক ছিল, পরমাও।

রাত্রিবেলা ধৃতি একটা বই নিয়ে কাত হল বিছানায়। রোজকার অভ্যাস কিছু না পড়লে ঘুম আসতে চায় না, ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। পড়তে-পড়তেই শুনতে পেল, পরমা তার ঘরের দরজা সন্তর্পণে ভেজাল, এবং আরও সন্তর্পণে ছিটকিনি দিল। একটু হাসল ধৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পরমা জানতে পারলে কি দুঃখিত হবে যে ধৃতি কখনওই পরমার প্রতি কোনও দৈহিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করে না? পরমা খুব সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ধৃতি সবসময় সবরকম সুন্দরী মেয়েদের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তার একটা বাছাবাছি আছে। অনেক সময় আবার কালো কুচ্ছিৎ মেয়ের প্রতিও তীব্র আকর্ষণ বোধ করে।

সকালে পুলিশ এল।

আতঙ্কিত পরমা দৌড়ে এসে ঢুকল ধৃতির ঘরে। বিস্ফারিত চোখ, চাপা উত্তেজিত গলায়

বলল, কোথায় কী করে এসেছেন বলুন তো! এত সকালে পুলিশ কেন?

ধৃতি খুব নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়ছিল। চোখ তুলে বলল, গত সাতদিনে মোটে তিনটে খুন আর চারটে ডাকাতি করাতে পেরেছি। এত কম অপরাধে তো পুলিশের টনক নড়ার কথা নয়। যাকগে, আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি।

বলে ধৃতি উঠল।

পরমা কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, সবসময়ে ইয়ার্কি একদিন আপনার বেরোবে।

—হ্যাঁ, যেদিন পালে বাঘ পড়বে।

বলে ধৃতি একটু হাসল। পুলিশ কেন এসেছে তা ধৃতি জানে। প্রধানমন্ত্রীর চা-চক্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। অল্প সময়ে সঠিক ঠিকানায় আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য লালবাজারের পুলিশকে সেই ভার দেওয়া হয়।

ধৃতি পিওন বুক-এ সই করে আমন্ত্রণপত্রটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে ফেলে রাখল। একটু অবহেলার ভঙ্গি। একটা চেয়ার টেনে বসে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আর একবার একটু গরম জল খাওয়াও পরমা। আগেরবারেরটা জমেনি।

—দিচ্ছি। বলে পরমা কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখল, তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ।

ধৃতি লক্ষ করছিল পরমাকে। বলল, ওটা আসলে ওয়ারেন্ট। পরমা উজ্জ্বল চোখে ধৃতির দিকে চেয়ে বলল, ইস, কী লাকি আপনি। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চায়ের নেমন্তন্ন। ভাবতেই পারছি না।

ধৃতি উদাস মুখে বলল, অত উচ্ছ্বাসের কিছু নেই। ভি আই পি'দের সঙ্গ খুব সুখপ্রদ নয়, অনেক বায়নাক্কা আছে।

পরমা বলল, তবু তো কাছ থেকে দেখতে পাবেন, কথাও বলবেন। আচ্ছা, আমি যদি সঙ্গে যাই?

—কী পরিচয়ে যাবে?

পরমা চোখ পাকিয়ে বলে, পরিচয় আবার কী? এমনি যাব।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঢুকতে দেবে কেন? বউ হলেও না হয় কথা ছিল। পরমা মুখ টিপে হেসে বলল, যদি তাই সেজেই যাই?

—তোমার খুব উন্নতি হয়েছে পরমা।

—তার মানে?

—তুমি আর আগের মতো সেকেলে নেই। বেশ আধুনিকা হয়েছো। আমার বউ সেজে রাজভবন অবধি যেতে চাইছ।

—আহা, তাতে দোষ কী?

—জয় শুনলে মূর্ছা যাবে।

পরমা মুখোমুখি বসে বলল, কোন ড্রেসটা পরে যাবেন?

—ড্রেস? ও একটা পরলেই হল।

মাথা নেড়ে পরমা বলে, না, যা খুশি পরে গেলেই চলবে নাকি? চকোলেট রঙের সেই বুশ শার্ট আর সাদা প্যান্ট—বুঝলেন?

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, ও বাবা তুমি আমার পোশাকেরও খবর রাখো দেখছি।

—রাখব না কেন? ছোট ভাইয়ের মতোই দেখি, তাই খবর রাখতে হয়।

ধৃতি খুব হোঃ-হোঃ করে হেসে ফেলে বলল, আজ তুমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছ না যে, আমাকে কোন প্লেসটা দিলে ভালো হয়। একটু আগে আমার বউ সাজতে চাইছিলে,

এখন আবার বলছ ছোট ভাই। এরপর কি ভাসুর না মামাশ্বশুর?

পরমা লজ্জা পেয়ে বলে, যা বলেছি মনে থাকে যেন। সাদা প্যান্ট আর চকোলেট বুশ শার্ট।

—ঠিক আছে।

—প্রাইম মিনিস্টারকে কি জিগ্যেস করবেন?

—করব কিছু একটা।

—এখনও ঠিক করেননি?

—প্রশ্ন করার স্কোপ কতটা পাওয়া যাবে তা বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় উনি বলবেন, আমাদের শুনে যেতে হবে।

—তবে কিছু প্রশ্ন করে রাখা ভালো।

ধৃতি কফি খেয়ে চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ি কামাল, স্নান করল, খেলো। তারপর পরমার কথা মতো পোশাক পরে বাইরের ঘরে এলো। বলল, এই যে পরমা, দ্যাখো।

পরমা খাচ্ছিল, মুখ তুলে দেখে বলল, বাঃ, এই তো স্মার্ট দেখাচ্ছে।

—এমনিতে দেখায় না?

—যা ক্যাবলা আপনি।

—আমি ক্যাবলা?

—তা ছাড়া কী? বলে পরমা হাসল। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, আজ আর বাইরে খেয়ে আসবেন না। আমি রেঁধে রাখব।

—রোজ খাওয়ালে যে জয়টা ফতুর হয়ে যাবে।

—যতদিন ও না আসছে ততদিন ওর বরাদ্দ খাবারটাই আপনাকে খাওয়াচ্ছি।

ধৃতি হাসল। বলল,—ভাগ্যিস জয়ের আর সব শূন্যস্থানও পূরণ করতে হচ্ছে না।

বলেই টুক করে বেরিয়ে দরজা টেনে দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় করে নেমে গেল সে।

## ॥ সাত ॥

ধৃতি অফিসে এসেই শুনল, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের চা চক্রের রিপোর্টিং তাকেই করতে হবে। সে নিজেও যে আমন্ত্রিত এ কথাটা জেনে চিফ সাব এডিটর বঙ্কুবাবু বিশেষ খুশি হলেন না! বললেন, সবই কপাল রে ভাই। আমি পঁচিশ বছর এ চেয়ারে পশ্চাদ্দেশ ঘষে যাচ্ছি, কিছুই হয়নি।

ধৃতি জবাব দিল না। মনে-মনে একটু দুঃখ হল, কপাল যে তার ভালো একথা সে নিজেও অস্বীকার করে না। মাত্র কিছুদিন হল সে এ চাকরি পেয়েছে। সাব এডিটর হিসেবেই। তবু তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফিচার লিখতে দেওয়া হয় এবং গুরুতর ঘটনার রিপোর্টিং-এ পাঠানো হয়। ধৃতিকে যে একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে অফিস তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ অফিসে ভালো ফিচার-লেখক এবং ঝানু রিপোর্টারের অভাব নেই।

প্রধানমন্ত্রী ময়দানে মিটিং সেরে রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বসবেন সন্ধে সাড়ে-ছটায়। এখনও তিনটে বাজেনি। ধৃতি সুতরাং আড্ডা মারতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সম্প্রতি কয়েকজন ট্রেনি জার্নালিস্ট নেওয়া হয়েছে অফিসে। মোট চারজন। তারা প্রত্যেকেই স্কুল কলেজে দুর্দান্ত ছাত্র ছিল। বুধাদিত্য হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হয়েছিল হিউম্যানিটিজে। নকশাল আন্দোলনে নেমে পড়ায় পরবর্তী রেজাল্ট তেমন ভালো নয়। রমেন

স্টার পাওয়া ছেলে। এম-এ-তে ইকনমিক্সে প্রথম শ্রেণি। তুষার হায়ার সেকেন্ডারির সায়েন্স স্ট্রিমে শতকরা আটাত্তর নম্বর পেয়ে স্ট্যান্ড করেছিল। বি-এসসি ফিজিক্স অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস। এম-এসসি করছে। দেবাশিস দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষায় শতকরা একাশি পেয়ে পাশ করেছিল। বিএ, এমএ-তে তেমন কিছু করতে পারেনি। চারজনের গায়েই স্কুল কলেজের গন্ধ। কারোই ভালো করে দাড়ি গোঁফ পোক্ত হয়নি।

এদের মধ্যে রমেনকে একটু বেশি পছন্দ করে ধৃতি। ছেলেটি যেমন চালাক তেমন গম্ভীর। কথা কম বলে এবং সবসময়ে ওর মুখে একটা আনন্দময় উজ্জ্বলতা থাকে।

ধৃতি আজ রমেনকে একা টেবিলে কাজ করতে দেখে সামনে গিয়ে বসল।

—কী হে ব্রাদার, কী হচ্ছে?

—একটা রিপোর্টিং লিখছি। কৃষিমন্ত্রীর ব্রিফিং।

ও বাবা, এতটা লিখছ কেন? অত বড় রিপোর্ট যাবে নাকি? ডেস্‌কে গেলেই হয় ফেলে রাখবে, না হলে কেটে-ছেঁটে সাত লাইন ছাপবে।

রমেন করুণ মুখে বলে, তাহলে না লিখলেই তো ভালো হত।

—মন্ত্রীদের ব্রিফিং মানেই তো কিছু খোঁড়া অজুহাত। ওসব ছেপে আজকাল কেউ কাগজের মূল্যবান স্পেস নষ্ট করে না। খুব ছোট করে লেখো, নইলে বাদ চলে যাবে।

—এই অবধি আমার মোটে চারটে খবর বেরিয়েছে। অথচ পঞ্চাশ ষাটটা লিখতে হয়েছে।

—এরকমই হয়। তবু তো তোমরা ফুল টাইম রিপোর্টার। যারা মফস্বলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাদের অবস্থা কত করুণ ভেবে দ্যাখো। কুচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে কত খবর লিখে পাঠাচ্ছে, বছরে বেরোয় একটা কি দুটো।

—তাহলে আমাদের কভারেজে পাঠানোই বা কেন?

—নেট প্র্যাকটিসটা হয়ে যাচ্ছে। এর পরে যখন পোক্ত হবে, স্কুপ করতে শিখবে তখন তোমাকে নিয়েই হবে টানাটানি। যদি মানসিকতা তৈরি করে নিতে পারো তাহলে জার্নালিজম দারুণ ক্যারিয়ার।

—তা জানি। আর সেইজন্যেই লেগে আছি। আপনি কি আজ পি এম-এর রাজভবনের মিটিং কভার করছেন?

—হুঁ, আমি অবশ্য আলাদা ইনভিটেশনও পেয়েছি।

রমেন একটু হেসে বলে, আশ্চর্যের বিষয় হল, আমিও পেয়েছি।

ধৃতি একটু অবাক হয়ে বলে, তুমিও পেয়েছো! বলোনি তো!

—চানস পাইনি। আজ সকালেই লালবাজার থেকে বাড়িতে এসে দিয়ে গেল। আসলে কী জানেন? আমি একসময়ে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করতাম, কবিতাও লিখতাম, সেই সূত্র ধরে আমাকেও ডেকেছে।

—এখন লেখো না?

—লিখি। অল্প স্বল্প। গত মাসেই দেশ-এ আমার কবিতা ছিল।

—বটে, ধৃতি খুশি হয়ে বলে, মনে পড়েছে। আমি দেশ খুলেই আগে কবিতার পাতা পড়ে ফেলি। রমেন সেন তুমিই তাহলে।

—অত অবাক হবেন না। আমার মতো কবি বাংলাদেশে কয়েক হাজার আছে।

তা থাক না। কবি কয়েক হাজার আছে বলেই কি তোমার দাম কমে যাবে?

—ডিমান্ড এ্যান্ড সাপ্লাইয়ের নিয়ম তো তাই বলে। কবিতার ডিমান্ড নেই, কিন্তু সাপ্লাই অঢেল। প্রাইস ফল করতে বাধ্য।

—ইকনমিকসের নিয়ম কি আর্টে প্রযোজ্য?

—খানিকটা তো বটেই। কবিতা লিখি বলে ক'জন আমাকে চেনে?

ধৃতি একটু হেসে বলে, একটা মনের মতো কবিতা লিখে তুমি যে আনন্দ পাও তা অকবিরা কজন পায়?

রমেনের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হল। উষ্ণ কণ্ঠে বলল, কবিতা লিখে আমি সত্যিই আনন্দ পাই। এত আনন্দ আর বুঝি কিছুতেই নেই।

—তবে! দামটা সেই দিক দিয়ে বিচার কোরো, খ্যাতি বা অর্থ দিয়ে তা মাপাই যায় না। যাকগে, যাচ্ছো তো রাজভবনে?

—যাব। বড্ড ভয় করে। কী হবে গিয়ে?

—চলোই না। আর কিছু না হোক, রাজভবনের ইন্টিরিয়ারটা তো দেখা হবে।

—তা বটে। ঠিক আছে যাব।

—কাগজ-কলম নিয়ে যেও। যা দেখবে বা শুনবে তার নোট নিও।

—আমি নোট নেব কেন? কী হবে?

রিপোর্ট তো করবেন আপনি।

—তাতে কী? আমি যা মিস করব তুমি হয়তো তা করবে না। দুজনের রিপোর্ট মিলিয়ে নিয়ে করলে জিনিসটা ভালো দাঁড়াবে।

মাথা নেড়ে রমেন বলল, ঠিক আছে।

ডেস্ক থেকে বিমান হাত উঁচু করে ডাকল, ধৃতি! এই ধৃতি। তোর টেলিফোন।

ধৃতি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফোন ধরল, ধৃতি বলছি।

—আমি বলছি।

—কে বলছেন?

—গলা শুনে চিনতে পারছেন না? আমি টুপুর মা।

ধৃতি একটু স্তব্ধ হয়ে বলল,—আপনি এখনও কলকাতায় আছেন?

—মাইথন থেকে ঘুরে এলাম।

—সেখানে কোনও খবর পেলেন?

—না, কেউ কিছু বলতে চায় না। তবে আমার মনে হয় ওরা সবাই জানে যে টুপু খুন হয়েছিল।

—ওরা মানে কারা?

—ওখানকার লোকেরা।

—কী বলছে তারা?

—কিছুই বলছে না, আমি অনেককে টুপুর কথা জিগ্যেস করেছি।

—শুনুন, আপনি এলাহাবাদ ফিরে যান। এভাবে ঘুরে-ঘুরে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।

—একেবারে যে পারিনি তা নয়। একজন বুড়ো লোক স্বীকার করেছে যে সে টুপুকে বা টুপুর মতো একটি মেয়েকে দেখেছে।

—টুপুর মতো মেয়ে কি আর নেই? ভুলও তো হতে পারে!

—পারেই তো। সেইজন্য আমি পারসেন্ট ধরছি। টুপুর ঘাড়ের দিকে বাঁ-ধারে একটা জরুল আছে। সেটাই ওর আইডেনটিটি মার্ক। বুড়োটাকে সেই জরুলের কথা বলেছিলাম। সে বলল, হ্যাঁ ওরকম সেও মেয়েটির ঘাড়ে দেখেছে। এতটা মিলে যাওয়ার পরও ব্যাপারটা উড়িয়ে দিই কী করে বলুন!

তা বটে।

—টুপুর সঙ্গে একজন লোককেও দেখেছে বুড়োটা। খুব দশাসই চেহারা। বিশাল লম্বা। লোকটা নাকি টুপুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলছিল।

—বুড়োটা কে?

—একজন ফুলওয়ালা। টুপু লোকটার কাছ থেকে ফুল কিনেছিল।

ধৃতি একটু ঘামছিল, উত্তেজনায়, ভয়ে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নির্বিকার রেখে সে বলল, ঠিক আছে, শুনে রাখলাম। কিন্তু আমি একজন সামান্য সাব-এডিটর। টুপুর ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনও সাহায্যই করতে পারছি না। যা করার পুলিশই করবে।

টেলিফোনে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এলো। টুপুর মা বলল,—এখন তো ইমার্জেন্সি চলছে, তাই পুলিশ খুব এলার্ট। কিন্তু কেন যেন টুপুর ব্যাপারে তারা ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না। এমনকি খুনটা পর্যন্ত বিশ্বাস করছে না।

—বিশ্বাস করাটা নির্ভর করে এভিডেন্সের ওপর। আপনি আপনার মেয়ের খুনের কোনও এভিডেন্সই দিতে পারছেন না।

—মায়ের মন সব টের পায়।

—কিন্তু পুলিশ তো আর মা নয়?

—ঠিক আছে, আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না, কিন্তু কখনও-সখনও দরকার হলে ফোন করব। বিরক্ত হবেন না তো!

—না, বিরক্ত হব কেন?

—আমি খবরের কাগজের অফিস কখনও দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছে করে। একদিন যদি আপনার অফিসে গিয়ে হাজির হই, তো দেখাবেন? যদি অসুবিধে না থাকে?

—নিশ্চয়ই। কবে আসবেন?

—এ যাত্রায় হবে না। এলাহাবাদে আমার অনেক সম্পত্তি। সব পরের ভরসায় ফেলে এসেছি। শিগগিরই ফিরে যেতে হচ্ছে! তবে আমি প্রায়ই কলকাতায় আসি।

—বেশ তো, যখন সুবিধে হবে আসবেন।

—বিরক্ত হবেন না তো!

—না, এতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আজ ছাড়ি তাহলে?

—আপনার বুঝি খুব কাজ অফিসে?

—কাজ না করলে মাইনে দেবে কেন বলুন?

—আজ আপনার কী কাজ?

—আজ প্রাইম মিনিস্টারের একটা মিটিং কভার করতে হবে।

—ওমা! প্রাইম মিনিস্টার? আপনারা কত ভাগ্যবান! কোথায় মিটিং বলুন তো।

—রাজভবনে।

—ইস, কী দারুণ? আপনি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবেন?

—বলব হয় তো।

—ভয় করবে না?

—ভয় কীসের? পি এম নিজেই তো মিটিং ডেকেছেন। আমাদের কথা শুনবার জন্যই।

—কী বলবেন?

—ঠিক করিনি। কথা জুগিয়ে যাবে।

—একটা কথা পি এমকে বলবেন?

—কী কথা?

—বলবেন এদেশে মেয়েদের বড় কষ্ট।

—উনি নিজেও তো মেয়ে। উনি কি আর ভারতবর্ষের মেয়েদের কথা জানেন না?

—জানেন। উনি সব জানেন। এ দেশের মেয়েরা ওঁর মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছে। তবু আপনি তো পুরুষ মানুষ, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের কষ্টের কথা শুনলে তিনি খুশি হবেন।

—ওঁকে খুশি করা তো আমার উদ্দেশ্য নয়।

টুপুর মা একটু চুপ করে থেকে বলে, তা ঠিক। তবে কী জানেন, ওঁকে খুশি করতে কেউ চায় না, সবাই শুধু ওঁর দোষটাই দেখে। পি এম একজন মহিলা বলেই কি আপনারা পুরুষেরা ওঁকে সহ্য করতে পারেন না?

—তা কেন? পি এম মহিলা না পুরুষ সেটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়, আমরা দেখব ওঁর কাজ।

—আমার মনে হয় পুরুষেরা ওঁকে হিংসে করে।

—তাহলে পি এম পুরুষদের ভোটই পেতেন না। আপনি ভুল করছেন। এদেশের লোকেরা ইন্দিরা গান্ধীকে মায়ের মতোই দেখে।

—বলছেন! কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

—অবিশ্বাসের কিছু নেই। দেশটা একটু ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন।

—তা অবশ্য ঠিক। আমি দেশের কতটুকুই বা দেখেছি! কলকাতা আর এলাহাবাদ। আপনি খুব ঘুরে বেড়ান, না?

—খুব না হলেও কিছু ঘুরেছি, আর লোকের সঙ্গেও মিশি। আমি তাদের মনোভাব বুঝতে পারি।

—জানেন আমাদের এলাহাবাদের হাইকোর্টেই ওঁর মামলাটা হচ্ছিল, আমরা তখন প্রায় কোর্টে যেতাম। কী থ্রিলিং! তারপর উনি যখন হেরে গেলেন, কী মন খারাপ!

—হতেই পারে। আপনি খুব ইন্দিরা ভক্ত।

—আপনি নন?

—আমি? আমার কারো ভক্ত হলে চলে না।

—ইন্দিরা এলাহাবাদের মেয়ে জানেন তো! আমাদের বাড়ি থেকে ওঁদের আনন্দ ভবন বেশি দূরেও নয়। ছাদে উঠলে দেখা যায়। আপনি তো গেছেন এলাহাবাদে, তাই না?

—হ্যাঁ, তবে খুব ভালো করে শহরটা দেখিনি।

—এবার গেলে দেখে আসবেন। খুব সুন্দর শহর।

—আচ্ছা দেখব।

—আর একটা কথা।

—বলুন।

—আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের।

—তেমন কিছু নয়।

—বলছিলাম কি, আমাকে দয়া করে পাগল ভাববেন না।

—ভেবেছি নাকি?

—হয়তো ভেবেছেন। ভাবলেও দোষ দেওয়া যায় না। সেই এলাহাবাদ থেকে মাঝরাতে ট্রাংক কল করা, তারপর মাঝে-মাঝেই এইভাবে টেলিফোনে উত্ত্যক্ত করা, তার ওপর টুপুর ঘটনা নিয়ে উটকো দায় চাপানো—আমি জানি আমার আচরণ খুব অদ্ভুত হচ্ছে। তবু আমি কিন্তু পাগল নই।

—আপনি যা করেছেন তা স্বাভাবিক অবস্থায় করেন নি।

—ঠিক তাই। শোকে তাপে অস্থির হয়ে কী করব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

—আমি আপনাকে পাগল ভাবিনি। কিন্তু আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। টুপুর বাবা কোথায়?

—ওমা। বলিনি আপনাকে?

—বলেছিলেন। তবে বোধহয় ভুলে গেছি।

আমার স্বামী বেঁচে থেকেও নেই।

—তার মানে?

—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপুর মা বলে, মানে বুঝে আর কাজ নেই। আমার স্বামী ভালো লোক নন। তবে বড়লোকের ছেলে, তাই তাঁকে সবই মানিয়ে যায়।

—তিনি এখন কোথায়?

—যতদূর জানি বোম্বেতে। একটি কচি মেয়ের সঙ্গে থাকেন।

—তিনি বেঁচে থাকতে আপনি তাঁর সম্পত্তি পেলেন কী করে?

—তাঁর সম্পত্তি পেলাম শাশুড়ি সেই রকম বন্দোবস্ত করে রেখে গিয়েছেন বলেই। তা ছাড়া আমার বাপের বাড়িও খুব ফেলনা ছিল না। সেদিক থেকেও কিছু পেয়েছি।

—মাপ করবেন, এসব প্রশ্ন করা বোধহয় ঠিক হল না।

টুপুর মা একটু হাসলেন, আমাকে যে কোনও প্রশ্নই করতে পারেন। আমার আর অপ্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই। শোকে তাপে জ্বালায় এখন কেমন একরকম হয়ে গেছি। আচ্ছা, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। ছাড়ছি।

—আচ্ছা।

ধৃতি টেলিফোন রেখে দিল। তার ভ্রূ একটু কোঁচকানো। মুখ চিন্তান্বিত। নিউজ এডিটর ডেস্কের সামনে দিয়ে একপাক ঘুরে যাওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ধৃতি আজ তো তুমি পি এম-এর রাজভবনে মিটিং কভার করবে।

—হ্যাঁ।

—কোনও পলিটিক্যাল ইস্যু তুলো না কিন্তু। মোটামুটি ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রবলেমের ওপর প্রশ্ন করতে পারো। ইমার্জেন্সি নিয়েও কিছু বলতে যেও না।

—না, ওসব বলব না।

—আমাদের কাগজের ওপর রুলিং পার্টি খুব সন্তুষ্ট নয়। টেক-ওভারের কথাও উঠেছিল। সাবধানে এগিও।

—ঠিক আছে।

—ইয়ং রাইটারদের কাকে কাকে চেনো?

—কয়েকজনকে চিনি।

—তাহলে তো ভালোই। পি এমকে কী জিগ্যেস করবে বলে ঠিক করেছ?

ধৃতি মৃদু হেসে বলে—দেখি।

প্রধানমন্ত্রীকে ধৃতির অনেক কথা জিগ্যেস করার আছে। যেমন, আপনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভালোই করেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনী মামলায় হেরে যাওয়ার পর করলেন কেন? এতে আপনার ইমেজ নষ্ট হল না? কিংবা বিরোধীরা কোনও রাজ্যে সরকার গড়লেই কেন্দ্র তার পিছনে লাগে কেন? কেনই বা নানা উপায়ে সেই সরকারকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে? আপনার কি মনে হয় না যে এতে সেই রাজ্যের ভোটাররা অপমানিত বোধ করতে থাকে এবং ফলে দ্বিগুণ সম্ভাবনা থেকে যায় ফের ওই রাজ্যে বিরোধীদের ক্ষমতায় ফিরে আসার? কিংবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর

যখন আপনার ভাবমূর্তি অতি উজ্জ্বল, যখন স্বতস্ফূর্ত ভোটের বন্যায় আপনি অনায়াসে ভেসে যেতে পারতেন, তখন বাহাত্তরের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক রিগিং হয় তার কোনও দরকার ছিল কি? আপনি এমনিতেই বিপুল ভোট পেতেন, তবু রিগিং করে এখানকার ভোটারদের অকারণে চটিয়ে দেওয়া কি অদূরদর্শিতার পরিচয় নয়? কিংবা আপনি যেমন ব্যক্তিত্বে, ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে অতীব উজ্জ্বল প্রাণবন্ত মানুষ, আপনার আশেপাশে বা কাছাকাছি তেমন একজনও নেই কেন? আপনার দলের সকলেই কেন আপনারই মুখাপেক্ষী, আপনারই করুণাভিক্ষু? কেন আপনার দলে তৈরি হচ্ছে না পরবর্তী নেতৃবৃন্দের সেকেন্ড লাইন অফ লিডারশিপ?

কিন্তু এসব প্রশ্ন করা যাবে না। ধৃতি জানে, এই জরুরি অবস্থায় এসব প্রশ্ন করা বিপজ্জনক। তা ছাড়া এই চা-চক্রটি নিতান্তই বুদ্ধিজীবীদের। এখানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক কথাই উঠতে পারে।

ধৃতি একটু হেসে বলে—কবি সাহিত্যিকদের আমি জানি। তারা খুব সেয়ানা লোক। কোনও বিপজ্জনক প্রশ্ন তারা করবে না।

—সে তো জানি। তবু ওয়াচ কোরো। আর দরকার হলে গাড়ি নিয়ে যেও। মোটর ভেহিকেলসে তোমার নামে গাড়ি বুক করা আছে।

—দরকার নেই।

—নেই? তাহলে কী আছে?

মোটর ভেহিকেলসে গাড়ি নেওয়ার ঝক্কি অনেক। এই অফিসের সবচেয়ে কুখ্যাত বিভাগ হচ্ছে ওই মোটর ভেহিকেলস, গাড়ি মানেই চুরি। পার্টস। পেটরোল, টায়ার। এই কারণে দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলি তিতি-বিরক্ত হয়ে নিজস্ব মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্ট তুলেই দিচ্ছে। দিয়ে বাইরের গাড়ি ভাড়া করে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধৃতি কয়েকবারই অফিসের কাজে গাড়ি নিয়েছে। নিতে গিয়ে দেখেছে গাড়ির ইনচার্জ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে, দয়া করার মতো গাড়ি দেয়, গাড়ির ড্রাইভারও ভদ্র ব্যবহার করে না, সব জায়গায় যেতে চায় না। বলতে গেলে মহাভারত। তাই ধৃতি অফিসের গাড়ি পারতপক্ষে নেয় না। আজও নেবে না।

পাঁচটার পর ধৃতি আর রমেন বেরোলো।

রাজভবনের ফটকে কড়া পাহারা। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কার্ড দেখাতেই ফটকের পুলিশ অফিসার উলটেপালটে দেখে বলল—যান।

দুজনে ভেতরে ঢুকতেই আবার পুলিশ ধরল এবং আবার কার্ড দেখাতে হল। এবং আবার এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মিলল। রমেন নীচুস্বরে বলল, ধৃতিদা!

—বলো।

—বেশ ভয়-ভয় করছে।

—কেন বলো তো!

—আপনার করছে না?

—নাঃ। এক গণতান্ত্রিক দেশের প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ভয় কীসের? আমিও গণ তিনিও গণ।

রমেন একটু হেসে বলে—পুলিশ তা মনে করে না।

—তা অবশ্য ঠিক। তবে সিকিউরিটির ব্যবস্থা স্টেট গভর্নমেন্টই করেছে। পি এম-র কিছু হলে সরকারের বদনাম।

রমেন মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ বলল—আচ্ছা, রাজভবনের ভেতরের এই রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন তা জানেন?

—এমনি, পেবলের রাস্তা আরও কত জায়গায় আছে। বেশ লাগে।

রমেন মাথা নেড়ে বলল—না। এর একটা অন্য কারণও আছে।

—তাই নাকি?

—আমার কাকা পুলিশে চাকরি করতেন। বিগ অফিসার ছিলেন। নাম বললে হয়তো চিনেই ফেলবেন, তাই আপাতত নাম বলছি না। যখন চৌ এন লাই কলকাতায় এসে রাজভবনে ছিলেন তখন কাকা ছিলেন তাঁর সিকিউরিটি ইনচার্জ। তিনিই কাকাকে জিগ্যেস করেছিলেন, তোমাদের রাজভবনের রাস্তায় নুড়ি পাথর ছড়ানো কেন।

—তোমার কাকা কী বলেছিলেন?

—আপনার মতোই সৌন্দর্যের কথাই বলেছিলেন। চৌ এন লাই মজার হাসি হেসে বলেছিলেন, মোটেই তা নয়। নুড়িপাথরের ওপর গাড়ি চললে শব্দ হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে লাটসাহেবদের সিকিউরিটির জন্যই ওই ব্যবস্থা। তারপর চৌ এন লাই কাকাকে একটা গাড়ির শব্দ শোনালেন। শুনিয়ে বললেন, নাউ ইউ সি দ্যাট অন এ পেবল রোড দি সাউন্ড অফ এ কার কামিং অর গোয়িং ক্যানট বি সাপ্রেসড!

ধৃতি হেসে বলল—তাই হবে। সাহেবদের খুব বুদ্ধি ছিল।

—চৌ এন লাইয়েরও কম ছিল না। আমার কাকা পুলিশ হয়েও যেটা বুঝতে পারেনি উনি ঠিক পেরেছিলেন।

সিঁড়ির মুখে আর এক দফা বাধা ডিঙিয়ে যখন লাউঞ্জে ঢুকল তারা, তখন সেখানে ভীরু ও সঙ্কুচিত মুখে এবং সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেশ কয়েকজন কবি সাহিত্যিক ও আর্টিস্ট জড়ো হয়েছে। রাজভবনের কালো প্রাচীন লিফটের সামনে বেশ একখানা ছোটখাটো ভিড়। এদের অনেককেই ধৃতি চেনে, রমেনও।

কয়েক ব্যাচ লিফট-বাহিত হয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার পরই ধৃতি আর রমেনের পালা এল। লিফটম্যান সাফ জানিয়ে দিল, দোতলায় মিটিং বটে কিন্তু লিফট খারাপ বলে দোতলায় থামছে না। তিনতলায় উঠে দোতলায় নামতে হবে।

ধৃতি লিফটের ব্যাপারটা মনে-মনে নোট করল। খরচের ওপর এখন কড়া সেনসর। কাজেই রাজভবনের লিফট ত্রুটিযুক্ত এ খবরটা লেখা হলেও ছাপা যাবে কি না এতে ঘোর সন্দেহ।

তিনতলা থেকে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দুজনে কিছু আতান্তরে পড়ে গেল। লিফটের সামনে সংকীর্ণ করিডোরে নেমে কোন দিকে যেতে হবে বুঝতে না পেরে সকলেই গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খেতেও কেউ সাহস করছে না। ফিসফাস কথা বলছে শুধু।

সেই ভিড়ে ধৃতি আর রমেনও দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন সকলেই খানিকটা উশখুশ করছে তখনই অত্যন্ত সুপুরুষ এবং তরুণ এক মিলিটারি অফিসার করিডোরে ঢুকেই হাত নেড়ে সবাইকে প্রায় গরু তাড়ানোর মতো করে নিয়ে তুলল দক্ষিণের প্রকাণ্ড বারান্দায়।

বারান্দার পরেই একখানা হলঘর। তাতে মস্ত টেবিল পাতা টেবিলে খাবার সাজানো থরে থরে। উর্দিপরা বেয়ারা ছাড়া সে ঘরে কেউ নেই। বোঝা গেল এই ঘরেই ইন্দিরার সঙ্গে তারা সবাই চা খাবে। তবে আপাতত প্রবেশাধিকার নেই। দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় কয়েকজন সিগারেট ধরাল। কে এসে চুপিচুপি খবর দিল ময়দানের মিটিং শেষ হয়েছে। ইন্দিরা রাজভবনে রওনা হয়েছেন। সকলেই কেমন যেন উদ্বিগ্ন, অসহজ, অপ্রতিভ। যারা জড়ো হয়েছে তারা সবাই কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক বটে, কিন্তু সকলেই সাধারণ

মধ্যবিত্ত পরিবারের। রাজভবনে আসা বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাদের জীবনে খুব একটা গা ছমছমে ব্যাপার আছেই।

খুবই আকস্মিকভাবে একটা চঞ্চলতা বয়ে গেল ভিড়ের ভেতর দিয়ে।

এলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। স্মার্ট চেহারা, মুখে সপ্রতিভ হাসি, হাতজোড়। বললেন—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন তো! আসুন, আসুন, এ ঘরে আসুন।

আবহাওয়াটা কিছু সহজ হয়ে গেল। হাত পায়ে সাড় এল যেন সকলের।

হলঘরে ঢুকে ভালো করে থিতু হওয়ার আগেই ধৃতি অবিশ্বাসের চোখে দেখল, ইন্দিরা ঘরে ঢুকছেন।

সে কখনও ইন্দিরা গান্ধীকে এত কাছ থেকে দেখেনি। দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। ছবিতে যেরকম দেখায় মোটেই সেরকম নন ইন্দিরা। ছোটখাটো ছিপছিপে কিশোরীপ্রতিম তাঁর শরীরের গঠন। গায়ের রং বিশুদ্ধ গোলাপি! মুখে সামান্য পথশ্রমের ছাপ আছে। কিন্তু হাসিটি অমলিন!

ইন্দিরা ঘরে ঢুকেই আবহাওয়াটা আরও সহজ করে দিলেন। ঘুরে-ঘুরে অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন। সঙ্গে ঘুরছেন রাজ্যপাল ডায়াসের পত্নী।

ধৃতি প্রস্তুত ছিলেন না, হঠাৎ ইন্দিরা তার মুখোমুখি এসে গেলেন।

ধৃতি চিন্তা না করেই হঠাৎ ইংরিজিতে জিগ্যেস করল—ম্যাডাম, আপনি কবিতা গল্প উপন্যাস পড়েন?

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ইন্দিরা বললেন—সময় তো আমার খুব কমই হাতে থাকে। তবু পড়ি। আমি পড়তে ভালোবাসি।

—কীরকম লেখা আপনার ভালো লাগে?

একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, হতাশাব্যঞ্জক কিছুই আমার পছন্দ নয়, জীবনের অস্তিবাচক দিক নিয়ে লেখা আমি পছন্দ করি।

—মহান ট্র্যাজেডিগুলো আপনার কেমন লাগে?

—যা মহান তা তো ভালো বলেই মহান।

আর সুযোগ হল না। আর একজন মৃদু ঠেলায় সরিয়ে দিল ধৃতিকে।

ধৃতি সরে এল।

ইন্দিরা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। থাক করা প্লেট থেকে একটা দুটো তুলে দিলেন অভ্যাগতদের হাতে। ধৃতি সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন যে ইন্দিরার হাত থেকে প্লেট নিতে পারল। প্লেটটা নিয়েই সে মৃদু স্বরে বলল, ধন্যবাদ ম্যাডাম, আমি আপনার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দরী মহিলা জীবনে দেখিনি। সুন্দরীরা সাধারণত বোকা হয়।

ইন্দিরা তার এই দুঃসাহসিক মন্তব্যে রাগ করলেন না। শুধু মৃদু হেসে বললেন, জীবনে কোনও লক্ষ্য না থাকলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

চমৎকার কথা। ধৃতি মনে-মনে কথাটা টুকে রাখল।

রাজভবনের জলখাবার কেমন তা সাংবাদিক হিসেবেই লক্ষ করছিল ধৃতি। খুব যে উঁচুমানের তা নয়। মোটামুটি খেয়ে নেওয়া যায়। খারাপ নয়, এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। তবে ইন্দিরা গান্ধীও এই খাবার মুখে দিচ্ছেন, এইটুকুই যা বলার মতো।

রমেন একটা প্যাস্ট্রি কামড়ে ধৃতিকে নীচু স্বরে বলল, পিএম-কে আমার হয়ে প্রশ্ন করবেন?

—কী প্রশ্ন?

—উনি কবিতা পড়েন কি না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমি অলরেডি অনেক বাচালতা করে ফেলেছি। এবার তুমি করো।

—ও বাবা আমার ভয় করে।

—ভয়। ইন্দিরাজিকে ভয়ের কী?

—আপনার গাটস আছে, আমার নেই।

—গাটস নয়। আমি জানি ইন্দিরাজি সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধ্বে। ওঁর একটা দারুণ কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যা পলিটিক্যাল দলবাজিতে মার খায়নি। উনি হিউমার বোঝেন, আর্ট ভালোবাসেন, সৌন্দর্যবোধ আছে, যা পলিটিকসওয়ালাদের অধিকাংশেরই নেই। এই মানুষকে যদি ভয় পেতে হয় তবে পাবে ওঁর প্রতিপক্ষরা, আমরা পাব কেন?

আপনি কি ইন্দিরাভক্ত ধৃতিদা?

—আমি তো পলিটিকস বুঝি না, কিন্তু মানুষ হিসেবে এই মহিলাকে আমার দারুণ ভালো লাগে তবে তোমার প্রশ্নের জবাবে আমিই বলে দিতে পারি, ইন্দিরাজি কবিতা না ভালোবেসে পারেন না। ওঁকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

আচমকাই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পড়ে গেল দুজনে। মুখ্যমন্ত্রী রায় সকলকেই বদান্যভাবে স্মিতহাসি বিতরণ করছিলেন। ধৃতির দিকে চেয়ে সেই হাসি মাখা মুখেই বললেন, চা খেয়েই হলঘরে চলে যাবেন, কেমন?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

হলঘর অর্ধচন্দ্রাকৃতি গ্যালারির মতো। ডায়াসে পাঁচখানা চেয়ারে উপবিষ্ট ইন্দিরা, রাজ্যপাল ডায়াস ও তাঁর স্ত্রী, সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধিজীবীরা একে একে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। নাম, কী লেখেন বা আঁকেন ইত্যাদি। ইংরাজি বা হিন্দিতে। ধৃতি দ্রুত নোট নিতে নিতেই নিজের পালা এলে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে নিল।

ধৃতি স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। প্রত্যেকেই আড়ষ্ট, নিজেকে আড়াল করতে ব্যস্ত এবং কেউই আজকের আলোচনায় প্রাধান্য চায় না। সবকিছুরই মূলে রয়েছে ইমার্জেন্সি, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যা একটি অভূতপূর্ব জুজুর ভয়। ইউ পি তে নাসবন্দির কথা শোনা যাচ্ছে, দিল্লিতে বস্তি এবং বসত উচ্ছেদের কথা কানাকানি হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার উৎস সঞ্জয় গান্ধী ও তাঁর অত্যুৎসাহী সাঙ্গোপাঙ্গোদের কথা। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীরাও ভীত, বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন। সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা ততোধিক। বিরোধী নেতাদের অনেকেই কারাগারে, ঠোঁটকাটা কতিপয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরাও অনুরূপ রাজরোষের শিকার। আর সবকিছুর মূলে যিনি, সেই অখণ্ড কর্তৃত্বময়ী নারী এখন ধৃতির চোখের সামনে ওই বসে আছেন। কিন্তু ধৃতি কিছুতেই মহিলাকে অপছন্দ করতে পারছিল না। একটু অস্বস্তি তারও আছে ঠিকই, কিন্তু এই মহিলার মানবিক আকর্ষণটাও তো কম নয়। এঁকে সে ডাইনি ভাববে কী করে?

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার পর দু-চারজন উঠে একে একে ভয়ে ভয়ে দুচার কথা বলল। তেমন কোনও প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়। কেউ বলল, লেখক ও কবিদের জন্য একটা স্টুডিও করে দেওয়া হোক, কারও প্রস্তাব, সরকার তাদের গ্রন্থ প্রকাশে কিছু সাহায্য করুক। এইরকম সব এলেবেলে কথা।

ইন্দিরা সাধ্যমতো জবাব দিলেন। কিছু জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রীও। তবে কেউ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছল না।

সবশেষে ইন্দিরা দু-চারটে কথা খুব শান্ত গলায় বললেন। প্রধান কথাটা হল, এখন

নিরাশার সময় নয়। নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। শিল্পে বা সাহিত্যেও কিছু দায়বদ্ধতা থাকা উচিত এবং কিছু স্বতঃপ্রণোদিত দায়িত্ববোধও।

সবাই খুশি। তেমন কোনও ওপর-চাপান দেননি ইন্দিরা, শাসন করেননি, ভয় দেখাননি। স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল সবাই। জরুরি অবস্থায় শুধু একটু সামলে লিখতে বা আঁকতে হবে।

ধৃতি জানে, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশেরই কোনও রাজনৈতিকবোধ বা দলগত পক্ষপাতিত্ব নেই। রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতার চাষ তাঁরা বেশিরভাগই করেন না। একমাত্র বামপন্থী লেখক কবি বা শিল্পীরা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় তেমন বেশি নন।

তা ছাড়া বামপন্থী বা মার্কসীয় সাহিত্য বাংলায় তেমন সফলও হয়নি। সুতরাং তাঁদের কথা না ধরলেও হয়। বাদবাদবকিরা রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী। রাজনীতির দলীয় কোন্দল থেকে তাঁদের বাস বহুদূরে। সেটা ভালো না মন্দ সে বিচার ভিন্ন। তবে এই জরুরি অবস্থার দরুণ তাঁরা কেউ আতঙ্কিত নন। কিন্তু অস্বস্তি একটা থাকেই। সেই অস্বস্তি ইন্দিরা কাটিয়ে দিলেন।

অফিসে এসে রিপোর্ট লিখতে ধৃতির ন'টা বেজে গেল। কপিটা নিউজ এডিটরের টেবিলে রেখে সে বলল, শরীরটা ভালো লাগছে না। যাচ্ছি।

—শরীর ভালো নেই তো অফিসের গাড়ি নিয়ে যাও। বলে দিচ্ছি।

—না, চলে যেতে পারব।

—তাহলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—দেখছি। রিপোর্টটা আপনি যতক্ষণ পড়বেন ততক্ষণ অপেক্ষা করব কি?

—না, দরকার নেই। কিছু অদলবদল দরকার হলে আমিই করে নিতে পারব। সেনসর থেকে আগে ঘুরে আসুক তো।

ধৃতি বেরিয়ে এল। কাউকে সঙ্গে নিল না। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। আর ট্যাক্সিতে বসেই বুঝতে পারল তার প্রবল জ্বর আসছে। জ্বরের এই লক্ষণ ধৃতি খুব ভালোভাবে চেনে। ছাত্রাবস্থা থেকেই হোটেলে মেসে এবং রেস্তোরায় আজেবাজে খেয়ে তার পেটে একটা বায়ুর উপসর্গ দেখা দিয়েছে। যখনই উপসর্গটা দেখা দেয় তখনই তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে যায় একশো তিন-চার ডিগ্রি। এক ডাক্তার বন্ধু একবার বলেছিল, তোর জ্বর হলে পেটের চিকিৎসা করাবি, জ্বর সেরে যাবে।

এ জ্বরটা সেই জ্বর কি না বুঝতে পারছিল না সে। তবে যখন বাসার সামনে এসে নামল তখন সে টলছে এবং চোখে ঘোর দেখছে।

নিতান্তই ইচ্ছাশক্তির জোরে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেতে চেষ্টা করল। থেমে থেমে, দম নিয়ে নিয়ে। পরমা বাসায় আছে তো! যদি না থাকে তবে একটু বিপাকে পড়তে হবে তাকে।

দোতলা অবধি উঠে তিনতলায় সিঁড়িতে পা রেখে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধৃতি। মাথাটা বড্ড টলমল করছে।

—কী হয়েছে আপনার?

ধৃতি আবছা দেখল, একটা মেয়ে, চেনা মুখ। এই ফ্ল্যাটবাড়িরই কোনও ফ্ল্যাটে থাকে। বেশ চেহারাখানা, বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি ঘন এবং গাঢ় শ্বাস ফেলছিল, শরীরটা বাস্তবিকই যে কতটা খারাপ তা এতক্ষণ সে টের পায়নি, এবার পাচ্ছে, তবু মর্যাদা বজায় রাখতে বলল, আমি পারব।

—আপনার যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

—পারব। ও কিছু নয়।

—সত্যিই পারবেন? আমার দাদা আর বাবা ঘরে আছে, তাদের ডাকি? ধরে নিয়ে

ওপরে দিয়ে আসবে।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, পারব, একটু রেস্ট নিয়ে নিই তাহলেই হবে।

—তবে আমাদের ফ্ল্যাটে বসে রেস্ট নিন। আমি পরমাদিকে খবর পাঠাচ্ছি।

সহৃদয় পুরুষ এবং সহৃদয়া মহিলার সংখ্যা আজ খুব কমে গেছে। আজকাল ফুটপাথে পড়ে-থাকা মানুষের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। দায়িত্ব নিতে সকলেই ভয় পায়। মেয়েটির আন্তরিকতা তাই বেশ লাগছিল ধৃতির। সে রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু দু-ধাপ সিঁড়ি নামতে গিয়েই মাথাটা একটা চক্কর দিয়ে ভোম হয়ে গেল। তারপরই চোখের সামনে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। ধৃতি একবার হাত বাড়াল শেষ চেষ্টায় কিছু ধরে পতনটা সামলানোর জন্য। কিন্তু বৃথাই। নিজের শরীরের ধমাস করে শানে আছড়ে পড়ার শব্দটা শুনতে পেল ধৃতি। তারপর আর জ্ঞান রইল না।

যখন চোখ চাইল তখন পরমা তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। মুখে উদ্বেগ।

ধৃতি চোখ মেলতেই পরমা মৃদু স্বরে জিগ্যেস করল, কেমন লাগছে? একটু ভালো?

ধৃতি পূর্বাপর ঘটনাটা মনে করতে পারল না। শুধু মনে পড়ল, সিঁড়ির ধাপে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। শরীরটা আগে থেকেই দুর্বল লাগছিল তার। শরীরে জ্বর। কিন্তু এই জ্বর তার হয় পেটের গোলমাল থেকে। দীর্ঘকাল মেসে হোটেলে খেয়ে তার একটা বিশ্রী রকমের অম্বলের অসুখ হয়। এখনও পুরোপুরি সারেনি। সেই চোরা অম্বল থেকে পেটে গ্যাস জমে মাঝে-মাঝে জ্বর হয় তার। আর এই অবস্থায় শরীর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে।

ধৃতি পরমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছ না?

—ভয় হবে না! কীভাবে পড়ে গিয়েছিলেন। ওরা সব ধরাধরি করে যখন নিয়ে এল তখন তো আমি সেই দৃশ্য দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার এসে বলে গেল, তেমন ভয়ের কিছু নেই।

ধৃতি একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, ভয় পেও না। এরকম জ্বর আমার মাঝে মাঝে হয়।

—জ্বর হতেই পারে। কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন কেন?

ধৃতি ফের একটু মুখ টিপে হেসে বলল, ওই মেয়েটাকে দেখেই বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

—যাঃ! ইয়ার্কি হচ্ছে?

—কেন, মেয়েটা সুন্দর নয়?

—সুন্দর নয় তো বলিনি। তবে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয় বটেই।

পৃথাকে আপনি বহুবার দেখেছেন।

ধৃতির আর ইয়ার্কি দেওয়ার মতো অবস্থা নয়। সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

—শুনছেন? ডাক্তার আপনাকে গরম দুধবার্লি খাইয়ে দিতে বলে গেছেন।

—দুধ বার্লি আমি জীবনে খাইনি। ওয়াক।

—অসুখ হলে লোক তবে কী খায়?

—ও আমি পারব না।

—না খেলে দুর্বল লাগবে না?

—পি এম-এর পার্টিতে খেয়েছি। খিদে নেই।

—কী খাওয়ালে ওখানে?

—অনেক কিছু।

—পি এম-কে দেখলেন?

—দেখলাম।

—আপনি ভাগ্যবান। আমাকে দেখালেন না তো। আচ্ছা আপনি ঘুমোন। একটু বাদে তুলে খাওয়াব।

—ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে আর ডেকো না পরমা। একটানা কিছুক্ষণ ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তাই কি হয়? খেতে হবে।

—হবেই?

—না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন।

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওরা আমাকে চ্যাংদোলা করে ওপরে এনেছিল, না?

—প্রায় সেইরকম। কেন বলুন তো!

—আমিও বুঝতে পারছি না হঠাৎ একটা সুন্দর মেয়ের সামনে গাড়লের মতো আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন। বিশেষ করে মেয়েটা যখন ওদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে।

পরমা সামান্য হেসে বলে, অজ্ঞান কি কেউ ইচ্ছে করে হয়?

—ইচ্ছাশক্তিও এক মস্ত শক্তি। ইচ্ছাশক্তি খাটাতে পারলে আমি কিছুতেই অজ্ঞান হতাম না।

—এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কেউ তো আর কিছু বলেনি।

—বলার দরকারও নেই; আমি শুধু ভাবছি আমার ইচ্ছাশক্তি এত কম কেন।

—মোটেই কম নয়। আজ আপনার খুব ধকল গেছে। সেইজন্য।

ধৃতি একটু গুম হয়ে থেকে বলে, আচ্ছা কী খাওয়াবে খাইয়ে দাও। শোনো তোমাদের রাত্রে রুটি হয়নি?

—হচ্ছে।

—তাই দু-খানা নিয়ে এসো। সঙ্গে ডাল-ফাল যা হোক কিছু।

শঙ্কিত গলায় পরমা বলে, রুটি খেলে খারাপ হবে না তো?

—আরে না। বার্লি-ফার্লি আমি কখনও খাই না। দুধও চুমুক দিয়ে খেতে পারি না। রুটিই আনো।

পরমা উঠে গেল।

ধৃতি চেয়ে রইল সিলিঙের দিকে। বড় আলো নেভানো। ঘরে একটা কমজোরি বালবের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে মাত্র। ধৃতি চেয়ে রইল। স্মরণকালের মধ্যে সে কখনও অজ্ঞান হয়নি। শরীর শত খারাপ হলেও না। তবে আজ তার এটা কী হল? ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হচ্ছে না তো তার? জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে না তো?

নিজেকে নিয়ে ধৃতির চিন্তার শেষ নেই।

পরমা রুটি নিয়ে এল। দু-খানার বদলে ছ'খানা। ডাল, তরকারি, আলুভাজা, মাংস অবধি। ও বাবা এ যে ভোজের আয়োজন।

—রুটিতে ঘি মাখিয়ে দিয়েছি।

—বেশ করেছো। আমার বারোটা তুমিই বাজাবে।

—ওমা আমি বারোটা বাজাব কী করে?

—জ্বরো রুগিকে কেউ ঘি খাওয়ায়?

—রুটি শুকনো কেউ খায়?

ধৃতি একটু হাসল। পরমাকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই। গ্রে ম্যাটার ওর মাথায় খুবই কম। তবে পরমা মেয়েটা বড় ভালোমানুষ। ধৃতি তাই খেতে শুরু করে দিল। কিন্তু বিস্বাদ

মুখে তেমন কিছুই খেয়ে উঠতে পারল না। পরমার অনেক তাগিদ সত্ত্বেও না।

ওষুধ খেয়ে সে ক্লান্তিতে চোখ বুজল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু জ্বর-যন্ত্রণায় কাতর শরীরে নিপাট নিশ্ছিদ্র ঘুম হয় না। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘুমের চটকা ভেঙে চোখ চেয়েই সে পিপাসায় 'ওঃ' বলে শব্দ করল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কে যেন কাছে এল। একটা সুন্দর গন্ধ পেল ধৃতি। ঘুম জড়ানো চোখে অবাক হয়ে দেখল, পরমা।

—তুমি! তুমি জেগে আছ কেন?

—ওমা! আপনার এত জ্বর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোবো?

ধৃতি ম্লান একটু হেসে বলে, বন্ধুপত্নী, তুমি বড়ই সরলা।

—সরল! হোয়াট ডু ইউ মিন? বোকা নয় তো।

—বোকা ছাড়া আর কী বলা যায় বলো তো তোমাকে। একেই পরপুরুষের সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে বাস করছ। তার ওপর আবার এক ঘরে এবং এত রাতে।

—তাতে কী হয়েছে বলুন তো!

—এখনও কিছু হয়নি বটে তবে হতে কতক্ষণ! কথাটা বাইরে জানাজানি হলে যা একখানা নিন্দে হবে দেখো।

ঠোঁট উলটে পরমা বলে, হোক গে। তা বলে একশো চার জ্বরের একজন রুগিকে একা ঘরে ফেলে রাখতে পারব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধৃতি বলে, একটু জল দাও।

পরমা জল দেয় এবং ধৃতি শোয়ার পর তার কপালে জলে ভেজা ঠান্ডা করতলটি রেখে নরম স্বরে বলে, ঘুমোন, আমি আরও কিছুক্ষণ আপনার কাছে থাকব।

—থাকার দরকার নেই। এবার গিয়ে ঘুমোও।

—জ্বরটা আরও একটু কমুক। তারপর যাব।

—এত ভাবছ কেন বলো তো!

—কী জানি কেন, তবে কারো অসুখ করলে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। আপনাকে তো দেখার কেউ নেই।

ধৃতি একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ক্বচিৎ কদাচিৎ তারও একথাটা মনে হয়। তার বাস্তবিকই কেউ নেই। দাদা-দিদি এরা থেকেও অনাত্মীয়। তবে বয়সের গুণে এবং কাজকর্মের মধ্যে থাকার দরুন আত্মীয়হীনতা তাকে তেমন উদ্বিগ্ন করে না। বরং কেউ না থাকায় সে অনেকটাই স্বাধীন। তবু এইরকম অসুখ বিসুখের সময় বা হঠাৎ ডিপ্রেসন এলে একাকিত্বটা সে বড় টের পায়।

পরমা কপালে একটা জলপটি লাগাল। বলল, মাথাটা একটু ধুয়ে দিতে পারলে হতো।

—এত রাতে আর ঝামেলায় যেয়ো না। আমি অনেকটা ভালো ফিল করছি।

—একশোচার জ্বরে কেমন ভালো ফিল করে লোকে তা জানি।

—তুমি সত্যিই জেগে থাকবে নাকি?

—থাকব তো বলেছি।

ধৃতি পরমার দিকে তাকাল। আবছা আলোয় এক অদ্ভুত রহস্যময় সৌন্দর্য ভর করেছে পরমার শরীরে। এলো চুলের ঘেরা মুখখানা যে কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ধৃতি পরমার প্রতি কখনওই কোনও শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেনি। আজও করল না। কিন্তু মেয়েটার প্রতি সে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাতীত মায়া আর ভালোবাসা টের পাচ্ছিল। জ্বরতপ্ত দু-খানা হাতে পরমার হাতখানা নিজের কপালে চেপে ধরে ধৃতি বলল, তোমার মনটা যেন চিরকাল এরকম থাকে পরমা। তুমি বড় ভালো।

হঠাৎ পরমার মুখখানা তার মুখের খুব কাছাকাছি সরে এল।

গাঢ়স্বরে পরমা বলল, আর কমপ্লিমেন্ট দিতে হবে না। এখন ঘুমোন। ধৃতি ঘুমালো। এক ঘুমে ভোর।

জ্বরটা ছাড়লেও দিন দুই বেরোতে পারেনি ধৃতি। তিন দিনের দিন অফিসে গেল।

ফোনটা এল চারটে নাগাদ।

—এ ক'দিন অফিসে আসেননি কেন? আমি রোজ আপনাকে ফোন করেছি।

ধৃতি একটু শিহরিত হল গলাটা শুনে। বলল, আমার জ্বর ছিল।

—আপনার গলার স্বরটা একটু উইক শোনাচ্ছে বটে। যাই হোক, সেদিন পি এম এর সঙ্গে আপনাদের ইন্টারভিউয়ের রিপোর্ট কাগজে পড়েছি। বেশ লিখেছেন। কিন্তু আপনারা কেউই পি এম কে তেমন অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি।

পি এম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাকে রংফুটে ফেলা কি সহজ?

—তা বটে।

—আপনি এখনও এলাহাবাদ ফিরে যাননি?

—না। রোজই যাব-যাব করি। কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে যায়। আবার ভাবি, গিয়েই বা কী হবে। টুপু নেই, ফাঁকা বাড়িতে একা-একা সময় কাটে না ওখানে।

—এখানে কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন?

—এখানে! ও বাবাঃ, কলকাতায় কি সময় কাটানো অসুবিধে? ছবির একজিবিশনে যাই, ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনি, থিয়েটার দেখি, মাঝে-মাঝে সিনেমাতেও যাই, আর ঘুরে বেড়ানো বা মার্কেটিং তো আছেই।

—হ্যাঁ, কলকাতা বেশ ইন্টারেস্টিং শহর।

—আপনারও কি কলকাতা ভালো লাগে?

—লাগে বোধহয়, ঠিক বুঝতে পারি না।

—বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

—আমার! আমার প্রায়ই কেউই নেই। এক বন্ধুর বাড়িতে পেইং গেস্ট থাকি।

—ওমা। বলেননি তো কখনও?

—এটা বলার মতো কোনও খবর তো নয়।

—আপনার মা-বাবা নেই?

—না।

—ভাই বোন?

—আছে, তবে না থাকার মতোই।

—আপনি তাহলে খুব একা?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আমার মতোই।

—আপনার একাকিত্ব অন্যরকম। আমার অন্যরকম।

—আচ্ছা, একটা প্রস্তাব দিলে কি রাগ করবেন?

—রাগ করব কেন?

—আমাদের বাড়িতে আজ বা কাল একবার আসুন না।

—কী হবে এসে? টুপুর ব্যাপারে আমি তো কিছু করতে পারিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা বললেন, কারোরই কিছু করার নেই বোধহয়। কিন্তু তাতে কি? আমি আপনার একটু সঙ্গ চাই। রাজি হবেন না?

—না, রাজি হতে বাধা নেই। আচ্ছা যাব'খন।

—ওরকম ভাসা-ভাসা বলা মানেই এড়িয়ে যাওয়া। আপনি কাল বিকেলে আসুন। আমি অপেক্ষা করব।

—কখন?

—চারটে।

—বিকেলে যে আমার অফিস।

—কখন ছুটি হয় আপনার?

—রাত ন'টা।

—তাহলে সকালে আসুন। এখানেই দুপুরে খেয়ে অফিস যাবেন।

ধৃতি হেসে ফেলে বলে, চাক্ষুষ পরিচয়ের আগেই একেবারে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করে ফেলছেন! আমি কেমন লোক তাও তো জানেন না।

ওপাশে একটু হাসি শোনা গেল। টুপুর মা একটু বেশ তরল স্বরেই বলল, বরং বলুন না যে, আমি আপনার অচেনা বলেই ভয়টা বরং আপনার।

ধৃতি বলে, আমি ভবঘুরে লোক, আত্মীয়হীন আমার বিশ্বে ভয়ের কিছু নেই। পুরুষদের বেলায় বিপদ কম। মহিলাদের কথা আলাদা।

—আপনার কিছুই তেমন জানি না বটে, চাক্ষুষও দেখিনি, কিন্তু পত্র পত্রিকায় আপনার ফিচার পড়ে জানি যে আপনি খুব সৎ মানুষ।

—ফিচার পড়ে? বাঃ ফিচার থেকে কিছু বুঝি বোঝা যায়?

—যায়। আপনি না বুঝলেও আমি বুঝি। ভুল আমার কমই হয়। আরও একটা কথা বলি। আপনার মতোই আমিও কিন্তু একা, আমার কেউ নেই বলতে গেলে। একা থাকি বলেই আমার নিরাপত্তার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। সামান্য কারণে অহেতুক ভয় বা সংকোচ করলে আমার চলে না। এবার বলুন আসবেন।

—ঠিক আছে, যাব।

—সকালেই তো?

—খুব সকালে নয়। এগারোটা নাগাদ।

—ঠিক আছে। ঠিকানাটা বলছি, টুকে নিন।

ঠিকানা নিয়ে ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পর ধৃতি ভাবতে লাগল কাজটা ঠিক হল কি না, না ঠিক হল না। তবে এই ভদ্রমহিলা আড়াল থেকে তাকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে আসছেন কিছুদিন হল। টুপু নামে এক ছায়াময়ীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক পরোক্ষ রহস্য। হয়তো মুখোমুখি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হলে সেই রহস্যের কুয়াশা খানিকটা কাটবে। তাই ধৃতি এই ঝুঁকিটুকু নিল। বিপদে যদি-বা পড়ে তার তেমন ভয়ের কিছু নেই। বিপদ তেমন আছে বলেও মনে হচ্ছে না তার।

একটু অন্যমনস্কতার ভেতর দিয়ে দিনটা কাটল ধৃতির। পত্রিকার ফিচার লিখলে প্রচুর চিঠি আসে। ধৃতিরও এসেছে। মোট সাতখানা। সেগুলো অন্য দিন যেমন আগ্রহ নিয়ে পড়ে ধৃতি, আজ সেরকম আগ্রহ ছিল না। কয়েকটা খবর লিখল, আড্ডা মারল, চা খেল বারকয়েক সবই অন্যমনস্কতার মধ্যে। শরীরটাও দুর্বল।

একটু আগেভাগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল ধৃতি। সাড়ে আটটায় ফিরে এসে দেখে, পরমা দারুণ সেজে ডাইনিং টেবিলে খাবার গোছাচ্ছে।

—কী পরমা? তোমার পতিদেবটি ফিরেছে নাকি?

—না তো! হঠাৎ কী দেখে মনে হল?

—তোমার সাজ আর ব্যস্ততা দেখে।

—খুব ডিটেকশন শিখেছেন।

—তবে আজ এত সাজের কী হল?

—বাঃ, সাজটাই বা কী করেছি! মুগার শাড়িটা অনেককাল পরি না, একটু পরেছি, তাই আবার একজনের চোখ কটকট করছে।

—আহা, অত ঝলমলে জিনিস চোখে একটু লাগবেই। ব্যাপারটা একটু বললেই তো হয়। কেসটা কী?

পরমা খোঁপার মাথাটা ঠিক করতে-করতে বলল, ফ্ল্যাটবাড়ি হল একটা কমিউনিটি, জানেন তো!

—জানব না কেন, বুদ্ধু নাকি? ছ'মাস আগেই কলকাতার এই ফ্ল্যাটবাড়ির নিও কমিউনিটি নিয়ে ফিচার লিখেছিলাম।

—জানি। পড়েওছি। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে গেলে সকলের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে চলতে হয়। আজ দোতলায় দোলাদের ফ্ল্যাটে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। ওদের মেয়ের জন্মদিন।

—খুব খাওয়ালো?

—প্রচুর। মুরগি, গলদা, ভেটকি ফ্রাই, ফিস রোল, লুচি, ফ্রায়েড রাইস, পায়েস...

—রোখকে ভাই। তুমি ক্যালোরি হিসেব করে খাও নাকি?

—তার মানে?

—ওরকম গাণ্ডেপিণ্ডে খেলে যে দু-দিনেই হাতির মতো হয়ে যাবে।

—আহা আমার ফিগার নিয়ে ভেবে-ভেবে তো চোখে ঘুম নেই। আমি এত বোকা নই মশাই, একখানা মুরগির ঠ্যাং দু-ঘণ্টা ধরে চিবিয়ে এসেছি মাত্র।

—রোল খাওনি?

—আধখানা।

—গলদা ছেড়ে দিলে? চল্লিশ টাকা কিলো যাচ্ছে।

—ওই একটু।

—দইটা কেমন ছিল।

—দই! না দই করেনি তো। আইসক্রিম।

—কেমন ছিল?

—বাঃ, আইসক্রিম আবার কেমন হবে? ভালোই।

—মিষ্টির আইটেম করেনি তাহলে! ছ্যাঁচড়া আছে।

—মোটেই না। তিনরকম সন্দেশ ছিল মশাই।

ধৃতি মাথা নেড়ে-নেড়ে বলল, না! তোমার ফিগার কিছুতেই রাখতে পারবে না পরমা। এত যে কেন খাও!

—নজর দেবেন না বলছি।

—দিচ্ছি না। কেউ আর দেবেও না।

—খুব হয়েছে। দোলা আপনার জন্যও চর্বচোষ্য পাঠিয়েছে। এতক্ষণ ঘরে সেগুলো নীচু আঁচে রেখে বসে আছি। দয়া করে এবার গিলুন।

—আমার জন্য! আমার জন্য পাঠাবে কেন? তারা কি আমাকে চেনে?

—এমনিতে চেনে না। তবে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে মনে করে হঠাৎ চিনতে শুরু করেছে। যান তো, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

ধৃতি হাতমুখ ধুয়ে এল বটে, কিন্তু মুখে এক বিচ্ছিরি অরুচি জ্বরের পর থেকেই তার খাওয়ার আনন্দকে মাটি করে দিয়েছে। টেবিলে বসে বিপুল আয়োজনের দিকে চেয়ে সে শিউরে

উঠে বলল, এক কাজ করো না পরমা, মুরগি আর লুচি বাদে সব সরিয়ে নাও। ফ্রিজে রেখে দাও, পরে খাওয়া যাবে।

—অরুচি হচ্ছে, না?

—ভীষণ, খাবার দেখলেই এলার্জি হয় যেন।

—কী করি বলুন তো আপনাকে নিয়ে!

—আমাকে নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা আছে ভবিষ্যতে। বুঝবে।

—এখনই কি বুঝছি না নাকি?

বলে পরমা সযত্নে তাকে খাবার বেড়ে দিল। একটা বাটিতে খানিকটা চাটনি দিয়ে বলল, এটা মুখে দিয়ে দিয়ে খাবেন রুচি হবে।

খেতে-খেতে ধৃতি বলল, একটা মুশকিল হয়েছে পরমা।

—কী মুশকিল?

—টুপুর মা নেমন্তন্ন করেছে কাল।

—কে টুপুর মা?

—ওই যে সেদিন সুন্দর মেয়েটার ফোটো দেখলে, মনে নেই?

—ওঃ তা সে তো মরে গেছে।

—বটেই তো, কিন্তু তার মা তো মরেনি!

—নেমন্তন্নটা কীসের?

—বোধহয় একটু আলাপ করতে চান।

—আলাপও নেই?

—নাঃ, শুধু ফোনে কথা হত।

—কী বলতে চায় মহিলা?

—তা কী করে বলব? হয়তো টুপুর কথা।

—বেচারা।

—যাব কি না ভাবছি।

—যাবেন না কেন?

—একটু ভয়-ভয় করছে। অচেনা বাড়ি, অচেনা ফ্যামিলি..

—তাতে কী, আলাপ হলেই অচেনা কেটে গিয়ে চেনা হয়ে যাবে। আপনি অত ভীতু কেন?

—আমি খুব ভীতু বুঝি?

—ভীতু নন? আমার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন।

ধৃতি চোখ দুটো একটু বুজে খুব নিরীহভাবে জিগ্যেস করল, তোমার কোচটি কে বলো তো!

—কোচ! কিসের কোচ?

—তোমাকে এইসব আধুনিক কথাবার্তার ট্রেনিং দিচ্ছে কে?

—কেন, আমার বুঝি কথা আসে না?

—খুব আসে, হাড়ে হাড়ে আসে, কিন্তু ভাই বন্ধুপত্নী, তুমি তো এত প্রগতিশীল ছিলে না এতদিন।

—হচ্ছি। আপনার পাল্লায় পড়ে। সে যাকগে, সব সময়ে অত ইয়ার্কি ভালো নয়। ভদ্রমহিলা ডাকল কেন সেটা ভেবে দেখা ভালো।

—আমি বলি কি পরমা, মেয়েছেলের কেস যখন তুমিও সঙ্গে চলো।

—আমি! ওমা, আমাকে তো নেমন্তন্ন করেনি!

—গুলি মারো নেমন্তন্ন।

—তাহলে কী বলে গিয়ে দাঁড়াবো? একটা কিছু পরিচয় তো চাই।

—বউ বলেই চালিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি যে ব্যাচেলর তা ভদ্রমহিলা জানেন।

—ইস, ওঁর বউ সাজতে বয়েই গেছে।

—একটা কাজ করা যাক পরমা, গিয়ে দুজনে আগে হাজির হই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

পরমা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ইচ্ছে করছে না এমন নয়। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। গিয়ে দেখেই আসুন না।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলল, তাই হবে। বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ।

পরমা কিছুক্ষণ ধৃতির দিকে চেয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, রাত হয়েছে। রোগা শরীরে আর জেগে থাকতে হবে না। শুয়ে পড়ুন গে। শুয়ে-শুয়ে ভাবুন।

ধৃতি উঠল।

## ॥ আট ॥

এত নিরস্ত্র এবং অসহায় ধৃতি এর আগে কদাচিৎ বোধ করেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও অকারণ দুর্বলতা বা ভয়-ভীতি নেই। কিন্তু এই এলাহাবাদি ভদ্রমহিলা সম্পর্কে একটা রহস্যময়তার বোধ জমেছে ধৃতির। মহিলার কথাবার্তায় উলটোপালটা ব্যাপার আছে, মানসিক ভারসাম্যও হয়তো নেই। একটু যেন বেশি গায়ে-পড়া। তা ছাড়া এলাহাবাদের ট্রাংক কল, চিঠিতে পোস্ট অফিসের ছাপ এবং টুপুর ছবি এর সবকটাই সন্দেহজনক। কাজেই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হতে আজ ধৃতিব খুব কিন্তু কিন্তু লাগছিল।

সকালে ধৃতি চা খেল তিন কাপ।

পরমা বলল, চায়ের কেজি কত তা মশায়ের জানা আছে?

—কেন, চা-টা তো সেদিন আমিই কিনে আনলাম। লপচুর হাফ কেজি।

—ও আপনার পয়সায় কেনাটা বুঝি কেনা নয়?

—মাইরি, তুমি জ্বালাতেও পারো।

—আর শুধু চা কিনলেই তো হবে না। দুধ চিনি এসবও লাগে।

—পরের বার চিনি দুধ ছাড়াই দিও।

—আর দিচ্ছিই না। চিনি দুধ লিকার কোনওটাই পাচ্ছেন না আপনি।

—আজ নার্ভ শক্ত রাখতে হবে পরমা। আজ এক রহস্যময়ীর রহস্যময় সাক্ষাৎকার।

—আহা, রহস্যের রস তো খুব। মাঝবয়সি আধপাগল এক মহিলা, তার আবার রহস্য কীসের? খুব যে রহস্যের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে।—স্বপ্ন নয় হে, স্বপ্ন হলে তো বাঁচতাম। কী কুক্ষণেই যে নেমন্তন্নটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম।

—আবার ফোন করুন না, নেমন্তন্ন ক্যানসেল করে দিন। ভীতুর ডিমদের এইসব কাজ করতে যাওয়াই ঠিক নয়। এখন দয়া করে আসুন, রোগা শরীরে খালি পেটে চা না গিলে একটু খাবার খেয়ে উদ্ধার করুন।

—তোমার ব্রেকফাস্টের মেনু কী?

—লুচি আর আলু ভাজা।

—কুকিং মিডিয়াম কি বনস্পতি নাকি?

—কেন, গাওয়া ঘি চাই নাকি? গরিবের বাড়ি এটা, মনে থাকে না কেন? এখনও ফ্ল্যাটের দাম শোধ হয়নি।

ধৃতি ওঠার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ছেলেবেলায় তখনও ওই অখাদ্যটা কারও বাড়িতে তেমন ঢুকতে দেখিনি। বনস্পতি হল পোস্ট পার্টিশন বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সিনেম। কে ওটা আবিষ্কার করেছে জানো?

—না। গরিবের কোনও বন্ধু হবে!

—তার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

—আর বনস্পতির নিন্দে করতে হবে না। আমাদের পেটে সব সয়।

—ছাই সয়। সাক্ষাৎ বিষ।

—আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। রুগি মানুষকে বনস্পতি খাওয়াব আমি তেমন আহাম্মক নই। ময়দায় ঘিয়ের ময়েন দিয়ে বাদাম তেলে ভাজা হচ্ছে। ভয় নেই, আসুন।

ধৃতি বিরস মুখে বলে, এর চেয়ে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট ভালো ছিল পরমা। টোস্ট, ডিম, কফি।

—কাল থেকে তাই হবে। খাটুনিও কম।

ধৃতি উঠল, খেল। তারপর দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে স্নান করে প্রস্তুত হতে লাগল।

পরমা হঠাৎ উড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, কী ড্রেস পরে যাচ্ছেন দেখি!

এ মা! ওই সাদা শার্ট আর ভুসকো প্যান্ট! আপনার রুচি-টুচি সব যাচ্ছে কোথায় বলুন তো!

—কেন, এই তো বেশ। তাহলে কী পরব?

—সেই নেভি ব্লু প্যান্টটা কোথায়?

—আছে।

—আর মাল্টি কালার স্ট্রাইপ শার্ট?

—আছে বোধহয়।

—ওই দুটো পরে যান।

অগত্যা ধৃতি তাই করল। পরমা দেখে-টেখে বলল, মন্দ দেখাচ্ছে না। রুগ্ন ভাবটা আর চোখে পড়বে না বোধহয়।

ধৃতির পোশাকের দিকে মন ছিল না। মনে উদ্বেগ, অস্বস্তি। রওনা হওয়ার সময় পরমা দরজার কাছে এসে বলল, অফিসে গিয়ে একবার ফোন করবেন। লালিদের ফ্ল্যাটে আমি ফোনের জন্য অপেক্ষা করব।

—কেন পরমা, ফোন করব কেন?

—একটু অ্যাঙ্গজাইটি হচ্ছে।

—এই যে এতক্ষণ আমাকে সাহস দিচ্ছিলে!

—ভয়ের কিছু নেই জানি, কিন্তু আপনার ভয় দেখে ভয় হচ্ছে। করবেন তো ফোন? তিনটে পনেরো মিনিটে।

—আচ্ছা, তাহলে আমার জন্য তুমি ভাব?

—যা নাবালক। ভাবতে হয়।

ধৃতি একটু হালকা মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

টুপুর মায়ের ঠিকানা খুব জটিল নয়। বড়লোকদের পাড়ায় বাস। সুতরাং খুঁজতে অসুবিধে হল না।

ট্যাক্সি থেকে নেমে কিছুক্ষণ হাঁ করে বাড়িটা দেখল। বিশাল এবং পুরোনো বাড়ি। জরার চিহ্ন থাকলেও জীর্ণ নয় মোটেই। সামনেই বিশাল ফটক। ফটকের ওপাশ থেকেই অন্তত দশগজ চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে, উঁচু প্রকাণ্ড বারান্দায়। বারান্দায় মস্ত গোলাকার থামের বাহার। তিনতলা বাড়ি, কিন্তু এখনকার পাঁচতলাকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে বসে আছে।

ফটকে প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা এক দারোয়ান মোতায়েন দেখে ধৃতি আরও ঘাবড়ে গেল।

দারোয়ান ধৃতিকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেছে। উপরন্তু ওর পোশাক-আশাক এবং চেহারাটা বোধহয় দারোয়ানের খুব খারাপ লাগল না। ধৃতি সামনে যেতেই টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম গোছের ভঙ্গি করে ভাঙা বাংলায় জিগ্যেস করল, কাকে চাইছেন?

—টুপুর মা। মানে—

দারোয়ান গেটটা হড়াস করে খুলে দিয়ে বলল, যান।

ধৃতি অবাক হল। যাবে, কিন্তু কোথায় যাবে? বাড়িটা দেখে তো মনে হচ্ছে সাতমহলা। এর কোন মহল্লায় কে থাকে তা কে জানে?

ধৃতি আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার কেমন যেন এই দুপুরেও গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে খুব তীক্ষ্ণ নজরে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

বারান্দায় পা দিয়ে ধৃতি দেখল, একখানা হলঘরের মতো প্রকাণ্ড জায়গা! সবটাই মার্বেলের মেঝে। বারান্দার তিন দিকেই প্রকাণ্ড তিনটে কাঠের ভারী পাল্লার দরজা। দুপাশের দরজা বন্ধ, শুধু সামনেরটা খোলা।

ধৃতি পায়ে পায়ে এগোলো।

দরজার মুখে দ্বিধান্বিত ধৃতি দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম পুরোনো জমিদারি কায়দার বাড়ি ধৃতি দূর থেকে দেখেছে অনেক, তবে কখনও ভেতরে ঢোকাব সুযোগ হয়নি। এসব বাড়িতেই কি একদা ঝাড়-লণ্ঠনেব নীচে বাইজি নাচত আর উঠত ঝনাঝন মোহরের প্যালা ফেলার শব্দ? এইসব বাড়িরই অন্দর মহলে কি গভীর রাত অবধি স্বামীর প্রতীক্ষায় জেগে থেকে অবিরল অশ্রুমোচন করত অন্তঃপুরিকারা? চাষির গ্রাস কেড়ে নিয়েই কি একদা গড়ে ওঠেনি এইসব ইমারত? এর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে কি ঢুকে আছে পাপ আর অভিশাপ?

বাইরের ঘরটা বিশাল। এতই বিশাল যে তাতে একটা বাস্কেটবলের কোর্ট বসানো যায়। সিলিং প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে। কিন্তু আসবাব তেমন কিছু নেই। কয়েকটা পুরোনো প্রকাণ্ড কাঠের আলমারি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। ঘরের মাঝখানে একটা নীচু তক্তপোষে সাদা চাদর পাতা, কয়েকটা কাঠের চেয়ার, মেঝেয় ফাটল, দাগ। দেয়ালে অনেক জায়গায় মেরামতির তাপ্পি। তবু বোঝা যায়, এ বাড়ির সুদিন অতীত হলেও একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়নি।

ধৃতি কড়া নাড়ল না বা কাউকে ডাকার চেষ্টা করল না। কারণ ধারেকাছে কেউ নেই। ঘরটা ফাঁকা। ছাদের কাছ বরাবর কড়ি বরগায় পায়রারা বক-বক করছে। কিন্তু ধৃতির মনে হচ্ছিল, ঘর ফাঁকা হলেও কেউ কোনও এক রন্ধ্রপথে বা ঘুলঘুলি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাকে ঠিকই লক্ষ্য কবছে। এমন মনে করার কারণ নেই, অনুভূতি বলে একটা জিনিস তো আছেই।

ধৃতি সাহসী নয়, আবার খুব ভীতুও নয়। মাঝামাঝি। তার বুক একটু দুরদুর করছিল ঠিকই, তবে সেটা অনিশ্চিত এবং অপরিচিত পরিবেশ বলে। কয়েক বছর আগে এক বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করতে গিয়ে সে একটা ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেই বাড়ির এক সন্দিগ্ধ ও খিটকেসে বুড়ো তাকে বাইরের ঘরে ঘণ্টা খানেক বসিয়ে রেখে বিস্তর জেরা করে এবং নানাবিধ প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়। ধৃতি সেই থেকে অচেনা বাড়িতে ঢুকতে একটু অস্বস্তি বোধ করে আসছে।

প্রায় মিনিট খানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে যাতায়াতকারী কোনও লোকের সঙ্গে

দেখা হওয়ার আশায়। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। কিন্তু ধৃতি একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ক্ষীণ হলেও নির্ভুল শব্দ। কাছেপিঠে হলেও, হলঘরের আশেপাশে কোনও ঘরে কারা যেন টেবিল টেনিস খেলছে।

বুকপকেটের আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে একবার দেখে নেয় ধৃতি। সে এক মস্ত খবরের কাগজের সাব-এডিটর। এই পরিচয়-পত্রখানা যে-কোনও প্রতিকূল পরিবেশে কাজে লাগে। রেলের রিজার্ভেশনে, থানায়, বাইরের রিপোর্টিং-এ। এ বাড়িতে কেউ তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তুললে কাজে লাগাতে পারে।

ধৃতি ভেতরে ঢুকল এবং শব্দটির অনুসরণ করে বাঁ-দিকে এগোল। হল ঘরের পাশের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লম্বাটে। সবুজ বোর্ডের দুপাশে একটি কিশোর এবং একটি কিশোরী অখণ্ড মনোযোগে টেবিল টেনিস খেলছে। মেয়েটির পরনে লাল শার্ট এবং জিনসের শর্টস। ছেলেটির পরনেও জিনসের শর্টস, গায়ে হলুদ টি-শার্ট। দুজনেরই নীল কেডস। মেয়েটির চুল স্টেপিং করে কাটা। ছেলেটির চুল লম্বা। দুজনের বয়সই পনেরো ষোলোর মধ্যে।

ধৃতি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে প্রথম লক্ষ্য করল মেয়েটিই। একটা মারের পর বল কুড়িয়ে সোজা হয়েই থমকে গেল। তারপর রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলল, হুম ডু-ইয়া ওয়ান্ট?

কলকাতাব ইংলিশ মিডিয়ামের শেখা হেঁচকি তোলা ইংরিজি নয়। রীতিমতো মার্কিন অ্যাকসেন্ট।

ধৃতি মৃদু একটু হেসে পরীক্ষামূলকভাবে বলল, টুপুর মা আছেন?

মেয়েটা ছেলেটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, আছে বোধহয়। দোতলায়। পিছন দিকে সিঁড়ি আছে। গিয়ে দেখুন।

ধৃতি তবু দ্বিধার সঙ্গে বলল, ভেতরে কি খবর না দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে?

মেয়েটি সার্ভ করার জন্য হাতের স্থির তেলোয় বলটা রেখে বাঘিনীর মতো খাপ পেতে শরীরটাকে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছেড়ে দেওয়াব জন্য তৈরি ছিল। সেই অবস্থাতেই ধৃতির দিকে একঝলক দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, উড শি মাইন্ড? নো প্রবলেম। শি ইজ আ বিট গা-গা। গো অ্যাহেড। আপস্টেয়ার্স, ফাস্ট রাইট হ্যান্ড রুম। নোবডি উইল মাইন্ড। নান মাইন্ডস হিয়ার। নান হ্যাজ এনিথিং লাইক মাইন্ড।

ধৃতি একসঙ্গে মেয়েটির মুখে এত কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। এত কথার মানেই হয় না। তার মানে হল, এরা দুটি ভাইবোন কোনও সমৃদ্ধ দেশে হয়তো অ্যামেরিকায় থাকে। এদেশে এসেছে ছুটি কাটাতে এবং সময়টা খুব ভালো কাটাচ্ছে না। নিজেদের বাড়ি কি এটা ওদের? হলে বলতে হবে, নিজেদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে ওরা মোটেই খুশি নয়। সেই বিরক্তিটাই তার কাছে প্রকাশ করল।

বেশ খোলা হাতে টপ স্পিন সার্ভ করল মেয়েটি। ছেলেটি পেন হোল্ড গ্রিপ-এ খেলছে। পিছনে দু-পা সরে গিয়ে সপাটে স্ম্যাশ করল। মেয়েটি টেবিল থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়ে স্ম্যাশটা তুলে দিল টেবিলে...

ধৃতির হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল এদের এলেম দেখে। তবে সে র‍্যালিটা দাঁড়িয়ে দেখল। মেয়েটাই তুখোড়। বারবার ছেলেটার ব্যাক হ্যান্ডে ফেলছে বল। পেন হোল্ড গ্রিপ এ ব্যাকহ্যান্ডে মারা যায় না বলে ছেলেটিকে হাত ঘুরিয়ে ফোরহ্যান্ডে মারতে হচ্ছিল, মেয়েটা পয়েন্ট নিয়ে নিল।

ধৃতি এটুকু দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে সিঁড়ি আছে। কিন্তু কোনদিক দিয়ে যেতে হবে তা মেয়েটা বলে দেয়নি। ধৃতি হলঘরটা পার হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঁকি

মারতেই পুরোনো চওড়া পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দেখতে পায়। বাড়িটা খুবই নির্জন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু সাহস সঞ্চয় করতেই হবে। নইলে এতটা এসে ফিরে গেলে সে নিজের কাছেই নিজে কাপুরুষ থেকে যাবে চিরকাল।

সিঁড়ি ভেঙে আস্তে-আস্তে ওপরে উঠে এল ধৃতি। এবং ওপরে উঠে মুখোমুখি হঠাৎ একজন দাসী গোছের মহিলাকে দেখতে পেল সে। হাতে একটা জলের বালতি।

ধৃতি খুব নরম গলায় বলল, টুপুর মা আছেন?

ঝি খুব যেন অবাক হয়েছে এমন মুখ করে বলল, কার মা?

টুপুর মা। আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ঝি-টার অবাক ভাব গেল না। বলল, আসতে বলেছিলেন? ওমা! সে কী গো?

এই উক্তির পর কী বলা যায় তা ধৃতির মাথায় এল না। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

ঝিটা একটু হেসে বলল, আসতে বলবে কী? সে তো পাগল।

গা-গা বলতে নীচের মেয়েটা তাহলে বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু পাগল কেন হবে টুপুর মা? একটু ছিটগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু খুব পাগল কি?

—কোন ঘরটা বলুন তো? ধৃতি জিগ্যেস করে।

—ওই তো দরজা। ঠেলে ঢুকে যান।

ধৃতির হাত পা ঠান্ডা আর অবশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গোটা ব্যাপারটাই একটা সাজানো ফাঁদ নয় তো? কিন্তু সামান্য একটু রোখও আছে ধৃতির। যে কোনও ঘটনারই শেষ দেখতে ভালোবাসে।

দ্বিধা ঝেড়ে সে ডানদিকের দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড ঘর। খুব উঁচু সিলিং। মেঝে থেকে জানলা। ঘরের মধ্যে এক বিশাল পালঙ্ক, কয়েকটা পুরোনো আমলের আসবাব, অর্গান, ডেস্ক, চেয়ার, বুকশেলফ, আলনা, থ্রি পিস্ আয়নার ড্রেসিং টেবিল, আরও কত কী।

খাটের বিছানায় এক প্রৌঢ়া রোগা-ভোগা চেহারার মহিলা শুয়ে আছেন।

চোখ বোজা। গলা পর্যন্ত টানা লেপ। বালিশে কাঁচা পাকা চুলের ঢল। একসময়ে সুন্দরী ছিলেন, এখনও বোঝা যায়।

ধৃতি শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করল যাতে উনি চোখ মেলেন।

মেললেন, এবং ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, কে?

—আমি ধৃতি রায়।

—ধৃতি রায়! কে বলো তুমি!

—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

—না তো! হ্যারিকেনটা উসকে দাও তো, তোমাকে দেখি।

—এখন তো দিনের আলো।

—কোথায় আলো? আলো আবার কবে ছিল? তোমার সাঁইথিয়ায় বাড়ি ছিল না?

—না।

টুপুর মা উঠে বসেছেন। চোখে খর অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

—কার খোঁজে এসেছেন?

—আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন ফোনে। মনে নেই?

—ও তাই বলো। তা বসো-বসো। আমি খুব ফোনের শব্দ পাই, বুঝলে। কেন পাই

বলো তো! এত ফোন কে করে জানো?

—না।

টুপুর মার পরনে থান, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে প্রাচীন সব আঁকিবুকি। টুপুর মার যে গলা ধৃতি টেলিফোনে শুনেছে এঁর গলা মোটেই তেমন নয়।

—তুমি কে বললে?

ধৃতি রায়! আমি খবরের কাগজে লিখি।

—খবরের কাগজ! এখন পুরোনো খবরের কাগজ কত করে কিলো যাচ্ছে বলো তো! আমাকে সেদিন এক কাগজওয়ালা খুব ঠকিয়ে গেছে।

—জানি না।

—তোমার দাঁড়ি-পাল্লা কোথায়? বস্তা কোথায়?

—আমি কাগজওয়ালা নই।

—শিশিবোতল নেবে? অনেক আছে।

ধৃতি ফাঁপড়ে পড়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। সন্দেহের লেশ নেই। সে ভুল জায়গায় এসেছে, ভুলে পা দিয়েছে। তবু মরিয়া হয়ে সে বলল, আপনি আমাকে ফোন করে টুপুর খবর দিয়েছিলেন, মনে নেই? এলাহাবাদ থেকে ট্রাঙ্ক কল!

টুপুর মা অন্য দিকে চেয়ে বললেন, সে কথাই তো বলছি তোমাকে বাগদি বউ অত ঘ্যানাতে নেই। পুরুষমানুষ কি ঘ্যানানি ভালোবাসে?

ধৃতি একটু একটু ঘামছে।

আচমকাই সে আয়নায় দেখল, দরজাটা সাবধানে ফাঁক করে ঝিটা উঁকি দিল।

—শুনছেন?

ধৃতি ফিরে চেয়ে বলল, কী?

—উনি কি আপনার কেউ হন?

—না। চেনাও নয়। ফোন পেয়ে এসেছি।

—আপনি একটু বাইরে আসুন। মেজগিন্নিমা ডাকছেন।

ধৃতি হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়ল। টুপুর মা তাকে আর আমল না দিয়ে ফের গায়ে লেপ টেনে শুয়ে পড়ল।

সাবধানে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঝি বলল, ওই ঘর, চলে যান।

—মেজগিন্নিমা কে?

—উনিই কর্ত্রী। যান না।

ধৃতি এগোল। এ ঘরের দরজা খোলা এবং সে ঘরে ঢোকার আগেই পরদা সরিয়ে একজন অত্যন্ত ফরসা ও মোটাসোটা মহিলা বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আসুন ভাই, ভেতরে আসুন।

ঘরটা বেশ আধুনিক কায়দায় সাজানো। যদিও প্রকাণ্ড সোফা সেট আছে, দেয়ালে যামিনী রায় আছে।

তাকে বসিয়ে ভদ্রমহিলা মুখোমুখি একটা মোড়া টেনে বসে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো! টুপুর মা নাকি আপনাকে ডেকে এনেছে। কী কাণ্ড।

ধৃতি থমথমে মুখ করে বলল, কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে আপনি জানতে চাইলে ব্যাপারটা ডিটেলসে বলতে পারি।

—বলুন না। আগে একটু চা খেয়ে নিন, কেমন?

ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। একটু বাদে চা এল, একটু সন্দেশের জলখাবারও।

ধৃতি শুধু চা নিল, তারপর মিনিট পনেরো ধরে আদ্যোপান্ত বলে গেল, ঘটনাটা।

ভদ্রমহিলা স্থিরভাবে বসে শুনলেন। কোনও উঃ, আঃ, আহা, তাই নাকি, ওমা এসব বললেন না। সব শোনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার আশ্চর্য লাগছে কী জানেন?

—কী বলুন তো?

টুপুর ঘটনাটা মোটেই মিথ্যে নয়। এরকমই ঘটেছিল। তবে তা ঘটেছিল বছর সাতেক আগে। সেই থেকে টুপুর মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। এখন আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি। যতদিন বাঁচবেন ওরকমই থাকবেন। তবে গল্পটার শেষটাই রহস্য। আপনাকে যে ফোন করত সে আর যেই হোক টুপুর মা নয়।

—তাহলে কে?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, উনি ঘর থেকেই বেরোন না। ফোন করতে জানেনও না বোধহয়। তবে যেই করুক সে আমাদের অনেক খবর রাখে।

—টুপু কি সত্যিই মারা গেছে?

মাথা নেড়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বলা অসম্ভব। পুলিশও কোনও হদিশ পায়নি। কোথায় যে গেল মেয়েটা!

—কিছু মাইন্ড করবেন না, উনি মানে টুপুর মা আপনার কে হন?

—আমার বড় জা। ওঁরা তিন ভাই। বড় জন নেই, ছোট অর্থাৎ আমার দেওর অ্যামেরিকায় থাকে। ওখানকারই সিটিজেন। ছুটি কাটাতে এসেছে। দু-ভাই মিলে আজ মাছ ধরতে গেছে ব্যান্ডেলে।

—নীচের তলায় যে দুটি ছেলেমেয়েকে টেবিল টেনিস খেলতে দেখলাম ওরা কারা? আপনার দেওরের ছেলেমেয়ে?

—হ্যাঁ। বলে মেজগিন্নি একটু তেড়চা হেসে বললেন, একেবারে সাহেব-মেম। এদেশের কিছুই পছন্দ নয়। কেবল নাক সিঁটকে থাকে সবসময়ে।

—আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায়?

—মেয়ে শান্তিনিকেতনে। ছেলে দুটি। দুজনেই ব্যাঙ্গালোরে ডাক্তারি পড়ে।

—ব্যাঙ্গালোরে কেন?

—আমরা ওখানেই থাকতাম। আমার হাজব্যান্ডের তখন ওখানে পার্টনারশিপের ব্যাবসা ছিল। উনি একটু খেয়ালি। হঠাৎ "ভালো লাগছে না" বলে নিজের শেয়ার বেচে চলে এলেন। ছেলেরা হোস্টেলে থাকে।

—আর কেউ নেই এ বাড়িতে?

মেজগিন্নি খুব অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, টুপুর মা সেজে ফোন করার মতো কেউ তো এ বাড়িতে আছে বলে মনে হয় না!

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, না ঠিক তা বলি নি। আমি ব্যাপারটায় নিজেকে জড়াতে চাইছিলাম না। বুঝতে পারছি না ঘটনাটার মানে কী?

—হয়তো কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করার চেষ্টা করেছিল। হয়তো আপনার পরিচিতা কেউ। তবে আশ্চর্যের কথা হল, টুপু সম্পর্কে সে কিছু জানে। যাকগে, আপনি তো নিজের চোখেই দেখে গেলেন, এখন ঘটনাটা ভুলে যেতে চেষ্টা করুন।

মেজগিন্নিকে ধৃতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গোলগাল ফরসা, জমিদারগিন্নি ধরনের চেহারা। বয়স খুব বেশি হলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। চোখে মুখে বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে।

ধৃতি খুব হতাশ বোধ করে উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা, আজ চলি।

—আসুন ভাই। আপনার খবরের কাগজের লেখা আমিও কিন্তু পড়েছি। আপনি তো

ফেমাস লোক।

ধৃতি ক্লিষ্ট একটু হাসল।

—ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তার রিপোর্টটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আবার কখনও ইচ্ছে হলে আসবেন।

—আচ্ছা।

ধৃতি একা ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ক্লান্ত লাগছে, হতাশ লাগছে। সে একটা প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। সেটা যে কী তা স্পষ্ট নয়। তার বদলে যা দেখল তা বিকট।

ধৃতি যখন মাঝ-সিঁড়িতে তখন তলা থেকে দুদ্দাড় করে সেই কিশোরী মেয়েটি উঠে আসছিল, পথ দিতে একটু সরে দাঁড়াল ধৃতি। মেয়েটা উঠতে-উঠতে তাকে দেখে থমকে গেল। মুখে জবজব করছে ঘাম। একটু লালচে মুখ।

—ডিড ইয়া মিট হার?

—হ্যাঁ।

মেয়েটা একটু হাসল। সুন্দর মুখশ্রী যেন আরও ফুটফুটে হয়ে উঠল।

—পাগলি নয়?

ধৃতিও একটু হাসল। বলল, তাই মনে হল।

—আপনি কি কোনও রিলেটিভ?

—না! পরিচিত।

—টেক হার সামহোয়ার। নার্সিং হোম বা মেন্টাল হোম কোথাও নিয়ে গেলেই তো হয়। জেঠু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, তাই দেওয়া উচিত। আচ্ছা, এ বাড়ির ফোনটা কোন ঘরে?

—জেঠুর ঘরে। ফোন করবেন? আসুন না আমার সঙ্গে।

—না। তার দরকার নেই। ভাবছিলাম ফোন করলে টুপুর মাকে পাওয়া যাবে কি না। আচ্ছা নম্বরটা কত?

মেয়েটা নম্বর বলল। ধৃতি মনে-মনে দু-একবার আউড়ে মুখস্থ করে নিল। মেয়েটা বলল, যাই। তারপর উঠে গেল দ্রুত পায়ে।

—বাই। বলে ধৃতি নেমে এল নীচে। মনটা বিস্বাদে ভরে গেছে। হতাশা এবং গ্লানি বোধ করছে সে। কেন যে কে জানে! এতটা আশাহত হওয়ার মতো কিছু নয়। ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই হয়। পারছে না। তার মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল জোক নয়, ভেতরে আর একটা কিছু আছে। সেটা সে ধরতে পারল না।

মোটামুটিভাবে ব্যর্থ হয়েই ধৃতি যখন বেরোতে যাচ্ছিল তখন দেখল, হলঘরে সেই ঝিটা মেঝে মুছছে উবুড় হয়ে বসে। তাকে দেখে কৌতূহলভরে একটু চেয়ে রইল।

ধৃতি তাকে উপেক্ষা করে যখন পেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, একজন যে বসে আছে আপনার জন্য।

ধৃতি চমকে উঠে বলল, কে?

ঝি ফিক করে হেসে বলল, বাঃ বুড়োকর্তা আছে না?

—সে আবার কে?

—সে-ই তো সব। দেখা কববেন না?

—বুড়ো মানুষ, খিটখিটে নন তো?

—না গো, তবে খুব বকবক করেন। নতুন মানুষ পেলে তো কথাই নেই, ওইদিকে ঘর। চলে যান।

হলঘরের ডানপ্রান্তে একটা ভেজানো কপাট দেখা যাচ্ছিল। মরিয়া ধৃতি পায়ে পায়ে গিয়ে দরজায় শব্দ করল।

—এসো, চলে এসো। এভরিবডি অলওয়েজ ওয়েলকম।

ধৃতি দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। লম্বাটে এবং বড়সড়ো ঘরখানা। দক্ষিণের জানালা দরজা খোলা বলে ধপধপ করছে আলো। একখানা মজবুত ও ভারী চৌকির ওপর সাদা বিছানা পাতা। দরজার পাশেই একখানা ডেক চেয়ার। তাতে সাদা দাড়িওয়ালা এবং অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো চেহারার মানুষ বসে আছেন। পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে একটা সুতির গেঞ্জির ওপর একটা উলের গেঞ্জি। শরীরের কাঠামো প্রকাণ্ড। বোঝা যায় একসময়ে খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। এখনও শরীরে মেদের সঞ্চার নেই। বয়স আশি বা তার ওপর। কিন্তু চোখে গোল রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমার ভেতরে দুটি চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ এবং কৌতুকে ভরা।

মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার পাতা। সেটা দেখিয়ে বললেন, বোসো। এ বাড়িতে নতুন কেউ এলেই আমি তাকে ডেকে পাঠাই। কিছু মনে করোনি তো।

ধৃতি বসল এবং মাথা নেড়ে বলল, না।

—কার কাছে এসেছিলে?

ধৃতি হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমি একটা ভুল খবর পেয়ে এসেছিলাম। যার কাছে এসেছিলাম আসলে তার সঙ্গে আমার কোনও দরকার নেই।

—একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন! কার কাছে এসেছিলে বলো তো?

—টুপুর মা। ওই নাম নিয়ে কে যেন আমাকে অফিসে প্রায়ই টেলিফোন করত। কালও টেলিফোনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই জন্যই আসা।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম হয়ে গেলেন। সামনের শূন্যে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখ স্বপ্নাতুর ও ভাসা ভাসা হয়ে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোমাকে কি সে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল?

ধৃতি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, সেইরকমই। তবে সেটা বড় কথা নয়।

বুড়োকর্তা তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই দুপুরের খাওয়া খেয়ে আসোনি?

—আপনি খাওয়ার ব্যাপারটা বড় করে দেখছেন কেন? ওটা কোনও ব্যাপার নয়।

বুড়োকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, আমাকে একটু বুঝতে দাও। বুড়ো হলে মগজে ধোঁয়া জমে যায় বটে, তবু অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। তোমার নাম কি? কী করো?

ধৃতি বলল।

বুড়োকর্তা মাথা ওপর নীচে দুলিয়ে বললেন, জানি। তোমার লেখা আমি পড়েছি। খবরের কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়া আমার রোজকার কাজ।

ধৃতি বিনয়ে একটু মাথা নোয়ালো। তারপর বলল, আপনি অযথা এই ঘটনাটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না। কেউ একটু আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেয়েছিল।

—রসিকতা! বলে বুড়োকর্তা একটু অবাক হলেন যেন। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, এমনও হতে পারে যে সে কোনও একটি সত্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। নইলে একটি মেয়ে তোমাকে বারবার ফোন করবে কেন?

—সেটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তা ছাড়া সে সবটাই কিন্তু মিথ্যে বলেনি। আমার নাতনি টুপুর সত্যিই কোনও ট্রেস নেই। কয়েক বছর। আমরা ধরে নিয়েছি যে সে মারা গেছে। সম্ভবত খুন হয়েছে। এগুলো তো মিথ্যে নয়।

—সম্ভবত সে ঘটনাটা জানে।

—তা তো জানেই! কিন্তু কে হতে পারে সেটাই ভাবছি।

—হয়তো আপনাদের চেনা কেউ।

—তোমার কি আজ কোনও জরুরি কাজ আছে?

—কেন বলুন তো?

—যদি সঙ্কোচ বোধ না করো তবে আমার সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নাও। যে-ই তোমাকে নিমন্ত্রণ করুক সে এ বাড়িকে জড়িয়েই তো করেছে। নিমন্ত্রণটা অন্তত সত্যিকারের হোক। আমার রান্না আলাদা হয়, আলাদা ব্রাহ্মণ পাচক রাঁধে, আমি ওদের সঙ্গে খাই না। এ ঘরেই সব ব্যবস্থা হবে।

—আমার একদম খিদে নেই।

—তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ এবং এ বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইছো বলে খিদে টের পাচ্ছো না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমার মনে হয়, তোমাকে যে এতদূর টেনে এনেছে তার কোনও পজিটিভ উদ্দেশ্য আছে। হয়তো আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারব, যদি অবশ্য টুপুর রহস্য ভেদ করতে আগ্রহ বোধ করো।

ধৃতি মাথা নেড়ে বলল, আমার আগ্রহ নেই। টুপুর কেসটা মনে হয় ক্লোজড চ্যাপটার। আর পুলিশই যখন কিছু পারেনি তখন আমার কিছু করার প্রশ্ন ওঠে না। আমি ডিটেকটিভ নই।

বুড়োকর্তা খুব সমঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, ঠিক কথা। অর্বাচীনের মতো দুম করে অন্য কারও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ভালো নয়। তবে এই বুড়ো মানুষটার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে দুপুরবেলা তোমার সঙ্গে বসে দু'টি খেতে, তাহলে তোমার আপত্তি হবে কেন?

ধৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, একটিমাত্র কারণে। যে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সে একটা ফ্রড। আমি সেই নিমন্ত্রণ মানতে পারি না।

—ফ্রড। বুড়োকর্তা আবার অন্যমনস্ক হলেন। তারপর বললেন, হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। ঘটনাটা আমাকে আর একটু ডিটেলসে বলতে পারো? যদি বিব্রত বোধ না করো?

ধৃতি আবার একটু দম নিল। তারপর সেই নাইট ডিউটির রাত থেকে শুরু করে সব ঘটনাই বলে গেল। বুড়োকর্তা চুপ করে শুনলেন। সবটা শুনে তারপর মুখ খুললেন।

—ফটোটা তোমার কাছে আছে?

—আছে।

—দেখাতে পারো?

ধৃতির ব্যাগে ফটোটা প্রায় সবসময়েই থাকে। সে বের করে বুড়োকর্তার হাতে দিল। উনি একপলক তাকিয়েই বললেন, টুপুই। কোনও সন্দেহ নেই।

ফটোটা ফেরত নিয়ে ধৃতি বলে, এই ফটো কার হাতে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বুড়োকর্তা হাত উলটে অসহায় ভাব করে বললেন, কে বলতে পারে তা? চিঠিটা দেখাতে পারো?

—পারি। বলে ধৃতি চিঠিটা বের করে দিল।

বুড়োকর্তা চিঠিটা দেখলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর পড়লেন। ফের মাথা নেড়ে বললেন, হাতের লেখা কার কেমন তা আমি জানি না। সুতরাং এ বাড়ির কেউ লিখে থাকলেও আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

ধৃতি মৃদু হেসে বলল, চিনেই বা লাভ কী? ব্যাপারটা সিরিয়াসলি না ধরলেই হয়।

—তা বটে তবে তুমি যত সহজে উড়িয়ে দিতে পারছ আমার পক্ষে তা অত সহজ নয়। ঘটনাটা তো এই বংশেরই। টুপুর সমস্যার কোনও সমাধানও তো হয়নি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই চিঠি আর ফোটো আপনি রেখে দিন বরং।

—লাভ কী? আমি বুড়ো, অক্ষম। আমার পক্ষে কি কিছু করা সম্ভব? বরং তোমার কাছেই থাক। তুমি হয়তো বা কোনদিন কোনও সূত্র পেয়ে যেতে পারো।

—বলছেন যখন থাক। কিন্তু আমার মনে হয় এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

—এবার খেতে দিতে বলি?

ধৃতি মাথা নেড়ে বলে, না। আমি খাব না। প্লিজ, আমাকে আপনি জোর করবেন না।

বুড়োকর্তা একটু ঝুম হয়ে বসে রইলেন ফের। তারপর দাঁড়ি গোঁফের ফাঁকে চমৎকার একটু হেসে বললেন, ঠিক আছে। শুধু একটা অনুরোধ, যদি কখনও ইচ্ছে হয় তো বুড়োর কাছে এসো। তোমাকে আমার বেশ লাগল।

## ॥ নয় ॥

অফিসে ধৃতি আজ বহুক্ষণ আনমনা রইল। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেড়াল। তারপর ফের এসে বসে রইল টেলিফোনটার কাছে।

উমেশবাবু টেলিপ্রিন্টারের কপি কাটতে-কাটতে তলচোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, আজ যেন একটু বিরহী-বিরহী দেখাচ্ছে। ব্যাপারখানা কী?

—বিরহই। বউ বাপের বাড়ি গেছে।

—হুঁ। বাপের বাড়ি থেকে টোপর পরে গিয়ে টেনে আনো গে না! বিয়ে করতে মুরোদ লাগে বুঝলে! এত টাকা মাইনে পাও তবু বিয়ে করার সাহস হয় না কেন? পণপ্রথার ওপর তো খুব গরম গরম ফিচার ছাড়ছো, নিজে একটা অবলা জীবকে উদ্ধার করে দেখাও না। আমি যখন বিয়ে করি তখন চাকরি ছিল না, বাপের হোটেলে খেতাম। প্রথম চাকরি হল আটাশ টাকা মাইনেয়, বুঝলে...

কথার মাঝখানেই ফোন বাজল।

উমেশবাবু 'হ্যালো' বলেই ফোনটা ধৃতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও বাপের বাড়ি থেকেই বোধহয় করছে ফোন।

ধৃতি একটু কেঁপে উঠল। বুকটা দুরুদুরু করল। ফোনটা কানে চেপে ধরে বলল, হ্যালো।

ওপাশে সেই কণ্ঠস্বর। একটু কোমল। একটু বিষণ্ণতর।

—আপনি না খেয়েই চলে গেলেন।

—আপনার লজ্জা করে না?

—শুনুন প্লিজ। রাগ করবেন না।

—রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

—জানি। আমার চেয়ে বেশি সে কথা আর কে জানে? তবু পায়ে পড়ি রাগ করবেন না।

—তাহলে আপনার পরিচয় দিন।

—সেটা এখন সম্ভব নয়। তবে আমি টুপুর মা নই!

—তবে কি আপনি টুপু?

—উঃ কী যেসব বলছেন না। আপনার টেবিলের লোক নিশ্চয়ই শুনছে আর হাঁ করে

চেয়ে আছে!

উমেশবাবু ঠিক হাঁ করে চেয়েছিলেন না। তবে স্বভাবসিদ্ধ তলচোখের চাউনিটা ধৃতির দিকেই নিবদ্ধ রেখেছেন। ধৃতি গলা আরও নামিয়ে বলল, পরিচয় না দিলে আর কোনও কথা নেই।

—আপনি সবই জানতে পারবেন। শুধু যদি একটু সময় দেন।

ধৃতি দৃঢ় গলায় বলে, আর নয়। সময় এবং প্রশ্রয় আমি অনেক দিয়েছি আপনাকে। আজ রীতিমতো অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আপনি এতটা কেন করলেন? আমি তো কোনও ক্ষতি করিনি আপনার!

—না। আপনার মতো ভদ্রলোক হয় না। আমি কাণ্ডটা করেছি শুধু টুপুর মায়ের অবস্থাটা আপনি নিজের চোখে দেখবেন বলে।

—তাতে কী লাভ? আমি তো কিছু করতে পারব না!

—আপনি কি জানেন যে টুপুর মায়ের অনেক সম্পত্তি?

—না। আপনার মুখে শুনেছি মাত্র।

—বিশ্বাস করুন, সম্পত্তি জিনিসটা খুবই খারাপ। টুপু ছিল সম্পত্তির ওয়ারিশান।

—তা হবে। শুনে আমার লাভ কী?

—আপনার লাভ না হলেই কি কিছু নয়? ধৈর্য ধরে একটু শুনবেন তো!

—শুনছি।

—টুপুর মৃত্যুসংবাদ আমি রটাতে চেয়েছিলাম টুপুর জন্যেই। আমার বিশ্বাস টুপু বেঁচে আছে। কিন্তু ওর আত্মীয়রা ওকে বেঁচে থাকতে দিতে চায় না। মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে ও নিরাপদ। কেউ আর ওকে মারতে চাইবে না।

—কেন? টুপুর মৃত্যুতে ওদের কী লাভ?

—টুপু বেঁচে থাকলে ওদের চলবে কী করে? অতবড় বাড়ি দেখলেন, কিন্তু ফোঁপড়া। কিছু নেই ওদের; পুরো সংসার চলছে টুপুদের টাকায়।

—এত কথা আমাকে বলছেন কেন?

—তা জানি না। বোধহয় কাউকে জানানো দরকার বলে জানাচ্ছি।

—তাহলে আইনের আশ্রয় নিন, উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পুলিশেও যেতে পারেন।

—আমি কে যে সব করতে যাব?

—তবে আমিই বা কে?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল, তা অবিশ্যি সত্যি। আপনাকে আজ হয়রান করা আমার উচিত হয়নি, আপনি রেগে আছেন।

—তা আছি।

—আপনার অফিসের টেলিফোনের ডাইরেক্ট লাইন নেই? থাকলে দিন না! পি বি একস লাইনে তো কোনও কথাই গোপন থাকে না।

—আর কী বলার আছে আপনার?

—প্লিজ দিন, আর টেলিফোনের কাছে থাকুন দয়া করে। আমি এক্ষুণি রিং করব।

ধৃতি রিপোর্টিং-এর একটা নম্বর দিল এবং ফোনটা রেখে রাগে ভেতরে ভেতরে গজরাতে-গজরাতে টেলিফোনের কাছে গিয়ে বসল। এখন রিপোর্টিং ফাঁকা। প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে।

ফোনটা বাজতেই লাইন ধরল ধৃতি, হ্যাঁ বলুন।

—আপনিই তো?

—তবে আর কে হবে?

একটা হাসি শোনা গেল, না মানে ভীষণ ভয় করে। কী করছি কে জানে।

—মজা করছেন। আর কী?

—মোটেই না। রেগে আছেন বলে আপনি আমার সমস্যা বুঝতে চাইছেন না।

—আপনি কে আগে বলুন। তারপর অন্য কথা।

—বলব। একটু ধৈর্য্য ধরুন। আগে আর দু-একটা কথা বলার আছে।

—বলে ফেলুন। কিন্তু প্লিজ আর গল্প ফেঁদে বসবেন না।

—টুপু একটু অন্যরকম ছিল। খুব ভালো মেয়ে নয়। অনেক অ্যাফেয়ার ছিল তার।

বিরক্ত হয়ে ধৃতি বলে, এরকম কথা আগেও শুনেছি।

—আর একটু শুনুন! প্লিজ।

—সংক্ষেপে বলুন।

—টুপু অবশেষে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছেলেটা বাজে। কিন্তু টুপুও ভালো নয়। ছেলেটার রোজগারপাতি কিছু ছিল না। তবে খুব হ্যান্ডসাম ছিল। আর সেইটেই একমাত্র তার প্লাস পয়েন্ট। রূপনারায়ণপুরে তারা কিছুদিন ঘর ভাড়া করেছিল। তারপর ছেলেটা পালায়। টুপুর তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। চেহারা সুন্দর বলে আবার একজন জুটে যায়। এ বড় কন্ট্রাক্টর। বিবাহিত। ক্রমে টুপু গাঁজা, মদ, ড্রাগ-এর নেশা করতে থাকে। একসময় তার জীবনে একটা গভীর জটিল অন্ধকার নেমে আসে। সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল একবার। পারেনি।

ধৃতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে এখনও বেঁচে আছে জানলেন কী করে?

—জানি না। অনুমান করি।

—অনুমানের কোনও বেস নেই?

—আছে। টুপু এখনও রূপনারায়ণপুরে আছে বলে খবর পেয়েছি।

—আপনি কি তাকে উদ্ধার করতে চান?

—যদি চাই তাহলে সেটা খুব অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছে কি?

—হচ্ছে। কারণ এসব মেয়েরা বড় একটা ফেরে না। মূল উপড়ে ফেললে কি গাছ বাঁচে?

—যদি টুপুর অনুশোচনা এসে থাকে?

ধৃতি একটু হাসল। অনুশোচনা জিনিসটা ভালো। কিন্তু ফেরার পথটাও যে বন্ধ। সংসার তো তার জন্য কোল পেতে বসে নেই। সে এখন কীরকম জীবন কাটাচ্ছেন তার খবর রাখেন?

—খুব লোনলি।

—পুরুষ সঙ্গী কেউ নেই?

—না। টুপুকে এখন সবাই ভয় পায়। তার রূপ গেছে, টাকা নেই, নেশা করে কেমন যেন বেকুবের মতোও হয়ে গেছে।

—তার চলে কী করে?

—যেভাবে চলে তাকে ঠিক চলা বলে না বোধহয়। ধরুন একরকম ভিক্ষে করেই চলে।

—ভিক্ষে?

—শুনেছি সে একটা নাচগানের স্কুল করছে।

—কীরকম স্কুল? চালু?

—সে সেই স্কুলে চাকরি করে। নাচ, গান শেখায়, সামান্য মাইনে।

—তবে তো সে ভালোই আছে।

—না, মোটেই ভালো নেই। সে ফিরতে চায়।

—ফিরতে বাধা কী?

—সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কোথায় সে ফিরবে?

—কেন, নিজেদের এলাহাবাদের বাড়িতে?

—সে বাড়ি আর ওদের দখলে নেই। বিক্রি হয়ে গেছে। কলকাতার বাড়িতে আত্মীয়রা তাকে ঢুকতেই দেবে না। তার বিয়ে করারও আর চান্স নেই। তবু সে মাঝে-মাঝে ফিরতে চায়। কোথায় তা বুঝতে পারে না।

—আমি কী করতে পারি বলুন?

—আমার অনুরোধ আপনি একবার ওকে দেখে আসুন।

—আপনি কি পাগল? টুপুকে দেখতে যাব কেন?

—আপনি তো হিউম্যান স্টোরি খুঁজে বেড়ান। টুপুর ঘটনা কি হিউম্যান স্টোরি নয়?

—মোটেই নয়। একটা বেহেড বেলেল্লা মেয়ের অধঃপাতে যাওয়ার গপ্পো, তাও যদি সত্যি হয়ে থাকে। আমি এখনও টুপুর গল্প বিশ্বাস করি না। করলেও ইন্টারেস্টেড নই।

—আমি যদি সঙ্গে যাই?

—আপনি কে?

—সেইটেই তো বলতে চাইছি না। তবে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

—কাল কেন? আজই নয় কেন?

—প্লিজ, কাল। আমি অফিসেই আসব। তিনটেয়। কাল দেরি করবেন না, লক্ষীটি।

ফোন কেটে গেল।

টেবিলে ফিরে আসতেই উমেশবাবু একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, কেসটা কী হে?

—আছে একটা কেস। তবে প্রেমঘটিত নয়।

মেয়েছেলের ব্যাপারে বেশি থেকো না। বরং একটা দেখেশুনে ঝুলে পড়ো। ল্যাঠা চুকে যাক। বাঙালির শেষ সম্বল বউয়ের আঁচল।

ধৃতি খুব কষ্টে মুখে হাসি আনল। মনটা একদম হাসছে না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখল, পরমা বাপের বাড়ি গেছে। ডাইনিং টেবিলে একটা চিরকুট : ফোন করে-করে অফিসের লাইন পেলাম না। চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। বাবার শরীর ভীষণ খারাপ। প্রেশার হাই। ফ্রিজে রান্না-বান্না আছে, গরম করে খেয়ে নেবেন। পরমা। পুঃ বাবার প্রেসারটা ডিপ্লোমেটিকও হতে পারে। জামাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে মেয়ে এক ফ্ল্যাটে আছে এটা বোধহয় পছন্দ নয়। আপনি যে ভেজিটেবিল তা তো আর সবাই জানে না। ওখানে কী হল? টুপুর মা কী বলল জানতে খুব ইচ্ছে করছে।

রাতটা কোনওক্রমে কাটাল ধৃতি। কিছুক্ষণ হাকসলি পড়ল, কিছুক্ষণ গীতা। ঘুমিয়ে অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে ভারী ভ্যাবলা লাগল নিজেকে।

যখন মুখ ধুচ্ছে তখন কলিংবেল। তোয়ালেয় মুখ মুছতে-মুছতে দরজা খুলে দেখে ফুটফুটে এক যুবতী দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের কাপ।

মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, আমি নন্দিনী। পরমা বউদি আপনাকে সকালের চা-টা দিতে বলে গেছে।

—আপনি কোন ফ্ল্যাটে থাকেন?

—ওই তো উলটোদিকে। একদিন আসবেন।

—আচ্ছা।

—কাপটা থাক। পরে আমাদের কাজের মেয়ে নিয়ে যাবে।

ধৃতি সকালবেলাটা খবরের কাগজ পড়ে কাটাল। তারপর সাজগোজ করে হাতে সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়ল। অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নেবে।

অফিসেও সময় বড় একটা কাটছিল না। তিনটেয় মেয়েটা আসবে। অন্তত আসার কথা। একটু ভয়-ভয় করছে ধৃতির। সে বুঝতে পারছে একটা জালে জড়িয়ে যাচ্ছে সে।

তিনটের সময় রিসেপশনে নেমে এল ধৃতি। অপেক্ষা করতে লাগল।

কেউ এল না। ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে সোয়া তিন, সাড়ে তিন ছুঁইছুঁই। ধৃতি যখন হাল ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল তখনই আচমকা রিসেপশন কাউন্টারে একটি মেয়ের গলা বলে উঠল, ধৃতি রায় কি আছেন?

মেয়েটা লম্বাটে, রোগাটে, এক বেনিতে বাঁধা চুল। ফরসা? হ্যাঁ বেশ ফরসা। মুখশ্রী এককথায় চমৎকার। তবে না, এ আর যাই হোক, টুপু নয়।

রিসেপশনিস্ট কিছু বলার আগেই ধৃতি এগিয়ে গিয়ে বলল, আমিই ধৃতি রায়।

মেয়েটা ধৃতির দিকে চাইল। চমকাল না, বিস্মিত হল না, কোনও রিঅ্যাকশন দেখা গেল না চোখে। তবে একটু ক্ষীণ হাসল।

ধৃতি কাউন্টার পেরিয়ে কাছে গিয়ে বলল, এখানে বসে কথা বলবেন, না বাইরে কোথাও?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, আপনি আমাকে আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন? আমি তো অনিমা।

—অনিমা?

—চিনতে পারছেন না? লক্ষ্মণ কুণ্ডু আমার দাদা। আপনার বন্ধু লক্ষ্মণ।

ধৃতি দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তাই তো। এ তো অনিমা, উত্তেজনায় সে চিনতেই পারেনি।

—কী চাস তুই?

—আমি স্বদেশি আমলের একটা পিরিয়ডের ওপর রিসার্চ করছি। লাইব্রেরিতে পুরোনো খবরের কাগজের ফাইল দেখব। একটু বলে দেবেন?

ধৃতি বিরক্তি চেপে ফোন তুলে লাইব্রেরিয়ানকে বলে দিল। অনিমা চলে গেলে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর রাগে হতাশায় প্রায় ফেটে পড়তে-পড়তে উঠে এল নিউজ রুমে। কে তার সঙ্গে এই লাগাতার রসিকতা করে যাচ্ছে? কেনই বা? সে কি খেলার পুতুল?

গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ধৃতি। তারপর নিজেকে ডুবিয়ে দিল কাজে। কপির পর কপি লিখতে লাগল। সঙ্গে চা আর সিগারেট। রাগে মাথা গরম, গায়ে জ্বালা।

কিন্তু সারাক্ষণ রূপনারায়ণপুর নামটা ঘোরাফেরা করছে। মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠছে।

ধৃতি রূপনারায়ণপুর গিয়েছিল একবার মাত্র। একজন পলাতক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নেতা ধরা পড়েছিল রূপনারায়ণপুরে। সেটা কভার করতে। তখন অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল তার। কারও কথা বিশেষ করে মনে নেই। কিন্তু নামটা গুনগুন করছে। রূপনারায়ণপুর। রূপনারায়ণপুর।

তিন দিন বাদে ইনল্যান্ডে চিঠিটা পেল ধৃতি।

*খুব রাগ করে আছেন তো! থাকুন গে। রাগটুকু আমার কথা সারাজীবন আপনাকে বারবার মনে পড়িয়ে দেবে। আপাতত এটুকুই যা আমার লাভ।*

*টুপুর কথা বলে কান ঝালাপালা করেছি। আসলে তা নিজেরই কথা। আমিই টুপু। যা বলেছি তার এক বিন্দু মিথ্যে নয়। দেখা করার কথা ছিল। পারলাম না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। একবার শিকড় উপড়ে ফেললে গাছ কি বাঁচে? বাঁচলেও*

*আগের মতো আর হয় না।*

*রূপনারায়ণপুরে আপনাকে যখন দেখেছিলাম তখন ভীষণ ভালো লেগেছিল। কৌতূহলী, উদ্যমী, সত্যানুসন্ধানী এক সাংবাদিক। উজ্জ্বল, ধারালো স্ট্রেটকাট। তখন থেকেই আপনার কথা খুব মনে হয়। ভেবেছিলাম, আপনার কাছে একবার এসে সব বলব।*

*এলামও, কিন্তু সোজা গিয়ে হাজির হতে পারলাম না। কেমন বুক কাঁপছিল, ভয় করছিল। জীবনে কখনও তো সত্যিকারের প্রেমে পড়িনি। এই বোধহয় প্রথম। কিংবা অন্য এক আকর্ষণ। নানারকম ছলছুতো করলাম। কিন্তু তাতে আড়াল বাড়ল, ব্যবধান হয়ে উঠল দুস্তর।*

*মরেই গেছি যখন আর বেঁচে উঠবার আকাঙক্ষা কেন? এর কোনও মানে হয় না। নিজে নষ্ট হয়েছি, আপনাকেও নষ্ট করে দেব হয়তো। সুন্দর মুখের অসাধ্যি কী আছে?*

*নেশার কথা যা বলেছি তার সবটা সত্যি নয়। হ্যাস খেয়েছি, মদও। নেশা করিনি। কিন্তু অভ্যেস আছে। আর বিয়ের ব্যাপারটা সত্যি। কিন্তু কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তা অত ব্যাখ্যা করে হবেই বা কী?*

*সেদিন তিনটের সময় গিয়েছিলাম কিন্তু। রিসেপশনের এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম। খুব ভিড় ছিল। আপনি আমাকে লক্ষ করেননি। চিনতেও পারতেন না। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ আপনাকে চোখ ভরে দেখলাম। খুব উদ্বিগ্ন, রাগি, উত্তেজিত। মনে-মনে হাসছিলাম। আর বুকের মধ্যে সে কী দপদপানি!*

*পায়ে পড়ি, মাঝে-মাঝে একটু মনে করবেন। আর কিছু চাই না।*

*কাছে আসতে পারলাম না, সে আমারই ক্ষতি। আপনার কিছুই হারায়নি। এ দুঃসহ জীবন বহন করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে একটা স্বপ্ন অন্তত চাই। মিথ্যে হোক, তবু চাই। আপনাকে স্বপ্ন করে নিলাম।*

*রাগিয়েছি, ভাবিয়েছি, হয়রান করেছি বলে একটুও দুঃখিত নই। বেশ করেছি। আবার যে হাত গুটিয়ে নিলাম, নিজেকে সরিয়ে নিলাম সেইটেই কি কম?*

*ভালো থাকবেন।*

*কী জানাব আপনাকে বলুন তো? ভালোবাসা? প্রণাম? শুভেচ্ছা? যাঃ সবটাই ভারী কৃত্রিম। তার চেয়ে কিছু জানালাম না। জানানোর কী আছে?*

*আসি।*

ধৃতি একবার পড়ল। দুবার। চিঠিটা সে ফেলে দিতে পারত দুমড়ে-মুচড়ে। পারল না।

তবে দিনটা তার আজ ভালো গেল না। বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। চিঠিটা তাকে আরও বহুবার পড়তে হবে জানে। গভীর রাত্রে, শীতে বা বৃষ্টিতে, দুঃখে বা আনন্দে, একটা মানুষ যে কত সাবলীলভাবে চিঠি হয়ে যায়।